ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রদত্ত থিসিস

শিরোনাম "কবি হাফেজদ্দীন রচিত 'বসন্তের দুঃখ': সম্পাদনা ও মূল্যায়ন।"

মোঃ হাবিবুর রহমান খান
এম. ফিল. গবেষক
রেজিঃ ৫০/২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষ
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

403654
Dhaka University Library
403654

অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ
(পি.এইচ.ডি, ডি.লিট)
উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

403654

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

১. অভিজ্ঞান পত্র ক

২. অঙ্গীকার পত্র খ

৩. কৃতজ্ঞতা স্বীকার গ

৪. ভূমিকা ঘ, ঙ,

৫. প্রথম অধ্যায় - পাণ্ডুলিপির পরিচিতি ১–১৪

৬. দ্বিতীয় অধ্যায় – বিষয়, কাহিনী, উৎস ও চরিত্র ১৫-১২৭

৭. তৃতীয় অধ্যায়– কাব্য বিচার ও শিল্পরূপ ১২৮--১৬০

৮. কাব্য সংকলন ১৬১--৩৩৭

৯. টীকা – ৩৩৮-৩৫৬

১০. গ্রন্থপঞ্জী – ৩৫৭--৩৬৫

১১. (ক) আলোকচিত্র ৩৬৬--৩৭১

(খ) মানচিত্র ৩৭২-৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞান পত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি মোঃ হাবিবুর রহমান খান বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিসাবে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য আমার তত্ত্বাবধানে - "কবি হাফেজদ্দীন রচিত 'বসন্তের দুঃখ'ঃ সম্পাদনা ও মূল্যায়ন" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করেছে। সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে ও মৌলিক তথ্যের বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত এ অভিসন্দর্ভটি তার একক গবেষণার ফল। আমি অভিসন্দর্ভটির প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার সুপারিশ করছি।

403654

ওয়াকিল আহমদ
২১-১১-০৫

অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ
(পি, এইচ. ডি, ডি.লিট)
উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা- তত্ত্বাবধায়ক।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পত্র

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি "কবি হাফেজদ্দীন রচিত 'বসন্তের দুঃখ'ঃ সম্পাদনা ও মূল্যায়ন" শিরোনামে এ গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানামতে ইতিপূর্বে এ বিষয়ের উপর অন্য কেউ অথবা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা প্রতিষ্ঠানে গবেষণাকার্য পরিচালিত হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য লিখিত এবং এটি বা এর কোন অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

মোঃ হাবিবুর রহমান খান
২৭-১১-২০০৫

মোঃ হাবিবুর রহমান খান
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ ৫০-২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষ
বাংলা বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এম,ফিল গবেষণার শিরোনাম "কবি হাফেজদ্দীন রচিত 'বসন্তের দুঃখ'ঃ সম্পাদনা ও মূল্যায়ন।" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে ২০০০-২০০১শিক্ষা বর্ষে নিবন্ধন লাভ করি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদের তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনা করি।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ সাহেবের প্রজ্ঞাবান বিবেচনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টিতে তাঁর অনুপ্রেরণা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

বর্তমান গবেষণা কর্ম পরিকল্পনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান মোঃ আবু জাফর মহোদয়ের উপদেশ, প্রফেসর ড. এস.এম.লুৎফর রহমান, পাণ্ডুলিপির বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান সমুদ্রে নিমজ্জিত কাণ্ডারীকে পাঞ্জেরীর মত আশা ও আলো দিয়ে গবেষণা কর্মকে তরান্বিত করেছেন। আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

গবেষণা চলাকালে নানা পর্যায়ে পরামর্শ ও মূল্যবান অভিমত দিয়ে প্রখ্যাত লোকসাহিত্যিক ড. আশরাফ সিদ্দিকী ও আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক ড. সাইদুর রহমান, আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও বাংলা একাডেমীর ক্যাটালগার জনাব আব্দুর রশিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর মি. আলমাজ হোসেন, মি. রতন বাবু, কুমিল্লার রামমালার লাইব্রেরীয়ান প্রমুখ সকলের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ।

বন্ধুবর গবেষক মি.নজরুল ইসলাম মিশা, আহমেদ মাওলা, মিলটন বিশ্বাস, মি.নজরুল ইসলাম, মাহমুদা বেগম, নুরজাহান বেগম, আফজাল হোসেন, ইব্রাহীম খান, স্কাইনেটের মি. আমিনের সান্নিধ্য, আন্তরিক অনুপ্রেরণা এবং সহযোগিতার কথা আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। আমি এঁদের সকলের নিকট ঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

১৭৯৭-১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কবি হাফেজদ্দীন তাঁর "বসন্তের দুঃখ" কাব্যটি লিখেন। এটি একটি রূপকথা জাতীয় বীরত্বব্যঞ্জক উপাখ্যান। কাব্যটির প্রথম চার পাতা নেই। পাণ্ডুলিপিতে প্রথমে বা শেষের দিকে সংখ্যায় অথবা শব্দের মাধ্যমে সন তারিখ লেখার নিয়ম ছিল। প্রাচীন থেকে মধ্যযুগের সকল পাণ্ডুলিপিতে এই নিয়মের ব্যবহার রয়েছে। এই কাব্যে হয়তো ছিল। কিন্তু খণ্ডিত হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট সন তারিখ পাওয়া যায়নি। খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি থেকে সন তারিখ নির্ণয় করা অত্যান্ত দুরূহ ব্যাপার। তারপরও যদি একাধিক কপি পাওয়া যায়, তবে তার কোন না কোনটা থেকে হয়ত সন তারিখ পাওয়া সম্ভব হতে পারে। আর যদি একটি মাত্র কপি নিয়েই কাজ করতে হয় তাহলে তা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনাক্ষেত্রে চারটি পদ্ধতি চালু রয়েছে

১. Heuristics, (মূলপাঠোদ্ধারে কালানুক্রমিক পদ্ধতি)।

২. Recensio, (মূলপাঠ পুনরুদ্ধার পদ্ধতি)।

৩. Emendatio (পাঠ সংশোধন পদ্ধতি)।

৪. Higher criticism (পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি)।

এই মহাদেশের মনীষিগণ Heuristics, Recensio, Emendatio পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি-সম্পাদনা করেছেন। Higher criticism পদ্ধতি অবলম্বনে বাংলা ভাষায় কোন পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি সম্পাদনা হয়নি। কেবলমাত্র গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে এই পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা হয়েছে। Higher criticism পদ্ধতিতে কবির ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্য ও উপকরণের পরীক্ষামূলক বিচার বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক। কবি হাফেজদ্দীন রচিত 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যটি সম্পাদনা ও মূল্যায়নে Higher criticism পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

Heuristics পদ্ধতিতে সম্পাদক সমস্ত তথ্য ও উপকরণের কালানুক্রমিক বিন্যাস করেন। তারপর বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি ও প্রতিলিপির সমন্বয়ে বংশপীঠিকা নির্ণয় করেন। শুধু কালানুক্রমিক বংশপীঠিকাই নয়; প্রয়োজনবোধে অঞ্চলভিত্তিক শ্রেণীকরণ করে সম্পাদক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মহাভারত এর উদাহরণ।

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলভেদে মহাভারত দুটি ভাগে বিভক্ত – (ক) উদীচ্য পাঠ (খ) প্রাচ্যপাঠ। সম্পাদক পাণ্ডুলিপির পরস্পর সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, স্থান, কাল, ও লিপি বিচারের সাহায্য গ্রহণ করেন। মূল পাঠ পুনর্গঠনের সহায়ক হিসাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য ও উপকরণের সাহায্যে পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ণয় করেন।

Recensio-পদ্ধতিতে সম্পাদকের প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের সাহায্যে মূল পাঠ পুনরুদ্ধার করে থাকেন। সম্পাদক পাণ্ডুলিপির পাঠ বিচার, বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের পুনঃপুন পরীক্ষা করে রচয়িতার মূল পাঠ বা তার কাছাকাছি বিশুদ্ধপাঠ নির্ণয় করে থাকেন।

Emendatio-পদ্ধতিতে সম্পাদক কবির মূলপাঠ উদ্ধারের জন্য পাণ্ডুলিপির পাঠের বিকৃতি, বিচ্যুতি ও প্রক্ষেপগুলি দূর করার চেষ্টা করে থাকেন। সম্পাদক পাঠ সংশোধনের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও অস্বীকার করেন। এজন্য এই পদ্ধতিকে অনেকে নেতিবাচক পদ্ধতি বলে অভিহিত করেন। অনেক সময় পাণ্ডুলিপির লিখিত প্রমাণাদিকেও যাচাইয়ের জন্য সম্পাদক বিভিন্ন বাহ্য প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করেন। F.W. Hall বাহ্য প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করাকে অনুসন্ধানী বলে অভিহিত করেন।

উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা যথেষ্ট নয়। কারণ উক্ত তিনটি পদ্ধতিতে রচয়িতার ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্য ও প্রমাণাদি উপেক্ষিত থাকে। ফলে, পাণ্ডুলিপির পূর্ণাঙ্গ বিষয় অজানা থেকে যায়। বিশেষ করে তারিখ বিহীন বা খণ্ডিত পাণ্ডুলিপির সময়কাল, রাজনৈতিক স্থিতিকাল ও ভৌগোলিক অবস্থান এবং লোককাহিনী, শ্রুতি ও স্মৃতি Higher criticism পদ্ধতির প্রধান অবলম্বন। এই পদ্ধতিতে রচয়িতার কাব্যে বিভিন্ন তথ্য ও উপকরণের পরীক্ষামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে সময়কাল নির্ণয় করে, নিশ্চিত একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

পাণ্ডুলিপি পরিচিতি

কবি হাফেজদ্দীন রচিত "বসন্তের দুঃখ" শীর্ষক একটি পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি সংগৃহীত হয়েছে। এই পাণ্ডুলিপির আনুমানিক রচনাকাল অষ্টাদশ শতক। "বসন্তের দুঃখ" একটি রূপকথা জাতীয় বীরত্বব্যঞ্জক উপাখ্যান। আমার জানা মতে এই হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি এখনও মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়নি। দ্বিতীয়ত ঃ "বসন্তের দুঃখ" পাণ্ডুলিপিটির এখন পর্যন্ত অন্য আর কোন পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে অনুরূপ কাহিনী ভিত্তিক "শীত ও বসন্ত" নামে কয়েকটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলোর সাথে "বসন্তের দুঃখ" এর কাহিনীগত মিল ছাড়া রচনাগত কোন মিল নেই। "শীত ও বসন্ত" হল পূর্ব খণ্ড। মধ্যযুগের কবি বিশ্বেশ্বর ধর, মহাদেব প্রসাদ সিংহ, গোলাম কাদের লিখেছেন পদ্যে। রিয়াজ উদ্দিন আহম্মদ, এবং আরো অজ্ঞাত কবি, কথক, গায়েন, শীত-বসন্তের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার রূপকথার সংগ্রহ ঠাকুরমার ঝুলিতে "শীত ও বসন্ত" গদ্যাকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন, মৈমনসিংহ থেকে চন্দ্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত (পদ্যে) পালা "তিলক বসন্ত" নামে প্রকাশ করেছেন। এগুলোর কাহিনী সবই পূর্ব খণ্ডের সাথে মিল রয়েছে। বসন্তের দুঃখ উত্তর খণ্ড নামে আমি আখ্যায়িত করেছি।

কবি হাফেজদ্দীন অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ১৭৯৭-১৮১০ খ্রীঃ মধ্যে "বসন্তের দুঃখ" কাব্যখানি লিখেছেন। তিনি ১৮৪০ খ্রিঃ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি খাগের কলম দিয়ে বাম দিক থেকে ডান দিকে লিখেছেন। লেখা মাঝে মাঝে অস্পষ্ট ১০ইঞ্চি×৭১/২ ইঞ্চি সাইজের পুরু কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখেছেন। গাছের পাতার বানানো কালি ব্যবহার করেছেন এবং কালির রঙের কিছুটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না। হাতের লেখা চমৎকার ও ঝকঝকে। কবি ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেননি বটে, তবে আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় বেশ দক্ষ ছিলেন। পাণ্ডুলিপিটির পাতা জীর্ণ ও শীর্ণ। অনেক পাতা ধরার সাথে সাথেই খুলে যায়।

পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত, প্রথম দিকে চার পাতা এবং শেষে কয়েক পাতা নেই। তা কালের অতলে হারিয়ে গেছে। পাণ্ডুলিপিতে ৩২টি পরিচ্ছেদ পাওয়া যায়। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে কবি তার নামের সাথে ভণিতা বা অভিধা ব্যবহার করেছেন

১. সুধাইলা প্রেমভাবে সুনিতে কারণ।
কহিব কিঞ্চিত দুঃখ শুন দিয়া মন ॥

পুরু কাগজ-হাতের তৈরী কাগজ। তৎকালীন সময় গ্রামে গঞ্জে ঢেঁকিতে ছাটাইকরে কাগজ তৈরী করা হত। আধুনিক কালেও গৌরনদী ও আগৈলঝারা অঞ্চলে কাগজী পারা রয়েছে। এই কাগজী পারায়-এখনোও হাতে কাগজ তৈরী করা হয়। কাগজ তৈরীর উপাদান হিসাবে গাছের পাতা, কুচুরীপানা ও বিভিন্ন লতা জাতীয় উদ্ভিদ ব্যবহার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

হীন হাফেজদ্দীন কহে দরগায়ে আল্লার।
হেন দসা দুনিয়াতে নাহি ঘটে কার ॥
পয়ার ছারিয়া দিনু ত্রিপদি লিখিয়া।
বসন্তের দুঃখ যাহা কহি বিবরিয়া ॥

২ .পলাইলাম পিতার ঠাঁই, নির্ব্বদ এরাণ নাই,
বিচার করিবে নরপতি ॥
অধীন হাফেজদ্দীন, প্রভূয়ার সুখী হয়,
দুঃখ খণ্ডে প্রতিমিতে ॥

প্রত্যেক পরিচ্ছেদের একটা নাম দিয়েছেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদের (আপন পরিচয় ব্যক্তকরণ) ৫২ লাইনের পর পয়ার ছন্দের মধ্যে ত্রিপদী ছন্দে ছয়টি (৬) লাইন লিখিত হয়েছে প্রক্ষিপ্তভাবে। ৩২টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭তম, ৮ম, ১০ম, ১৩তম, ১৪তম, ১৭তম, ১৯তম, ২০তম, ২১তম, ২২তম, ২৩তম, ২৪তম, ২৫তম, ২৭তম, ২৯তম, ৩১তম, ৩২তম মোট ২২টি পরিচ্ছেদ পয়ার ছন্দে লিখিত হয়েছে। ৩য়, ৫ম, ১২তম, ১৫তম, ১৬তম ও ২৬তম, ২৮তম ও ৩০তম পরিচ্ছেদ সহ ৮টি পরিচ্ছেদ ত্রিপটি ছন্দে লিখিত হয়েছে। ৯বম পরিচ্ছেদ লাচারি রাগ ভাও করুণা ত্রিপদি ছন্দে, ১১তম পরিচ্ছেদ ধৃয়া ও একাবলী ছন্দে এবং ১৮তম পরিচ্ছেদ রাগ ত্রিপদি দীর্ঘ ছন্দে লিখিত হয়েছে। কবি হাফেজদ্দীন সাধু ভাষায় কাব্যটি লিখেছেন। তবে স্থানে স্থানে দোভাষী পুথির ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা ॥

পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ সালের ৬ই জুন মীর জাফর আলী খান ও তার সহযাত্রীদের নাট্যাভিনয়ে বাংলার আজাদী দু'শ বছরের গোলামীর জিঞ্জরে বাঁধা পড়ে। মুসলমানরা ইংরেজদের ভাল চোখে দেখত না। আর ইংরেজরা ঐ সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজকে উৎসাহ যোগিয়েছে। ঠিক এই সময় প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত লোকসাহিত্য থেকে কাহিনী নিয়ে কবি হাফেজদ্দীন অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে রচনা করেছেন "বসন্তের দুঃখ"। এই কাব্যে হিন্দু মুসলমানের সমন্বিত ইতিহ্য প্রকাশ পেয়েছে সুন্দরভাবে। হিন্দুর বিয়ের অনুষ্ঠানে 'অধিবাস' হয়ে যাওয়ার পর ব্রাহ্মণের পরিবর্তে কাজী এসে নিকাহ্ পড়ালেন। এমন মিলনাত্মাক দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। কবির সময় মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজদের রোপিত বিষবৃক্ষ ডাল পালা মেলে বিরাট মহীরুর আকার ধারণ করতে পারেনি। সুতরাং কবি হাফেজদ্দীন রচিত "বসন্তের দুঃখ" হিন্দু- মুসলমানের ঐতিহ্য মিলনের এক অপূর্ব বীরত্বব্যঞ্জক মিলনাত্মক রূপকথা জাতীয় উপাখ্যান।

Dhaka University Institutional Repository

লিপিকাল

কবি হাফেজদ্দীন রচিত "বসন্তের দুঃখ" পাণ্ডুলিপিটি প্রথম ও অন্তে খণ্ডিত হওয়ায় লিপিকাল পাওয়া যায়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিরা ভণিতায় নিজের নাম পরিচয় ও রচনাকাল পাণ্ডুলিপির শেষে লিখে রাখতেন। কখন অংকে বা সংখ্যায় এবং হেঁয়ালী মূলক শব্দ সংখ্যায় রচনাকাল প্রকাশ করতেন। এই হেঁয়ালীপূর্ণ কবিতাই 'শকাঙ্ক' নামে পরিচিতি পেয়েছে। কবি হাফেজদ্দীন কবিতাকারে ত্রিপদি ছন্দে নিজ জেলার নাম উল্লেখ করেছেন। হয়ত লিপিকালও লেখা ছিল কিন্তু খণ্ডিত হওয়ায় তা লোপ পেয়েছে। অতএব জনশ্রুতি ও বিভিন্ন তথ্য এবং উপকরণ লিপিকাল নির্ণয়ের একমাত্র পথ।

কবিবর (বর্তমান পটুয়াখালী জেলার মূর্জাগঞ্জ থানাধীন মহিষকাটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন) অর্থ্যাৎ তৎকালীন বুজুর্গ উমেদপুর জেলার আওরঙ্গপুর পরগণার মহিষকাটা গ্রামে আনুমানিক ১৭৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কবি তাঁর জন্মস্থান 'ত্রিপদী ছন্দে' উল্লেখ করেছেন ।

"জিলা বাখেরগঞ্জ বাস, ভ্রমি আমি নানা দেশ,
অল্প বিদ্যা থোরাই বয়েস ॥
ত্রিপদি ছারিয়া তবে, পয়ারেতে লিখি যবে,
শুন সবে বসন্তের কাহিনী ॥

কবি তার জন্মস্থান জেলা-"বাখেরগঞ্জ" বলেছেন কিন্তু কোন থানা, কোন গ্রাম তা বলেননি। আসলে কবির জন্মস্থান ছিল বুজুর্গউমেদপুর জেলার আওরঙ্গপুর পরগণার "মহিষকাটা" গ্রাম। কবির উত্তর সূরীরা এখনও এই গ্রামে বসবাস করছেন। ইংরেজরা বাংলার স্বাধীনতা হরণ করে বাংলাকে শাসন করা ও স্বাধীনচেতা মানুষদের দমনের জন্য ৩৫টি জেলায় ভাগ করে। তৎকালীন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কমন্স সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৭৮১ সালে 'বুজুর্গ উমেদপুরকে' স্বাতন্ত্র্য জেলা ঘোষণা করে। জেলার কার্যক্রম "বারৈকরণ" নামক স্থানে স্থাপন করা হয়। এই অঞ্চলের বাসিন্দারা মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়। তারা অপেক্ষাকৃত ধনী ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। স্বাধীনতা হরণকারী ইংরেজদের মেনে নিতে পারেনি। মুসলমান-হিন্দুদের সম্মিলিত আক্রমণে কয়েকজন ইংরেজ নিহত হয়। শুধু ইংরেজরাই নয় রাজবল্লভ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আগা বাকের খানের জমিদারি কেড়ে নেয় এবং ১১ জন অনুচরসহ তাকে হত্যা করে 'বার আউলিয়া' নামক স্থানে মাটি চাঁপা দিয়ে রাখে। সেইস্থান আজ পর্যন্ত "বারো আউলিয়ার দরবার" নামে পরিচিত। আগাবাকের খানের অন্যায় হত্যা ও জবরদস্তীমূলক জমিদারি হরণকে এই অঞ্চলের মুসলমান-হিন্দুরা মেনে নিতে পারেনি। তারা রাজবল্লভকে প্রত্যাখান করে এবং খাজনা দেয়া বন্দ করে দেয়। রাজবল্লভ গোয়া থেকে একদল সৈন্য (ফিরিঙ্গী) এনে শক্তি প্রয়োগ করে ও খাজনা আদায় ব্যর্থ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের স্বাধীনচেতা মনোবৃত্তি ও স্বাধীনতা হরণকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে সব সময় বিদ্রোহের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত ছিল। তাই ইংরেজরা কমন্স সভার সিদ্ধান্তকে অকার্যকর ঘোষণা করে "বুজুর্গউমেদপুর" জেলা বন্ধ করে দেয় এবং ১৯৯৭ সালে ৭ নম্বর রেগুলেশন ধারার অনুবলে সুন্দরবন কমিশনার পদ বিলুপ্ত করে বাখেরগঞ্জকে স্বাতন্ত্র্য জেলা ঘোষণা করা হয়, (সিরাজউদ্দীন আহম্মদ-বরিশালের ইতিহাস পৃ.২৭) বুজুর্গউমেদপুর জেলা সদর বারৈকরণ থেকে জেলার কার্যক্রম বাখেরগঞ্জে স্থানান্তিরত করা হয়। তখন মৃর্জাগঞ্জ থানাকে আওরঙ্গপুর পরগণা বলা হত। ১৮১২ সালে মৃর্জাগঞ্জ থানা সৃষ্টি করা হয়। এর আগে এই থানার কোন অস্তিত্ব ছিল না।

কবি উল্লেখ করেছেন অল্প (থোরাই) বয়সে কাব্যখানা লিখেছেন –

পূর্ব্ব পুঁথি হস্তে করি কহে মিষ্ঠ স্বরে।
শুন নরপতি আমি কহি যে তোমারে ॥

কোন পুঁথির নামোল্লেখ করেননি। "বসন্তের দুঃখ" পুঁথির আর কোন পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাহলে ধরা যায় কবি হাফেজদ্দীন ১৭৯৭ সালের পরে এবং ১৮১২ সালের পূর্বে- "বসন্তের দুঃখ" কাব্যখানা লিখেন। তাই তিনি জেলা বাখেরগঞ্জ বলে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থেকেছেন।

লিপিকর

পাণ্ডুলিপির ৮ম পরিচ্ছেদের এক পাতার পর প্রক্ষিপ্তভাবে একটি পাতা পাওয়া যায়। তাতে "জয় বিনয়ের পুঁথি" নামে আর একখানা কাব্যের নাম পাওয়া যায়।এখানে পর পর দুইজন লিপিকরের নাম উল্লেখ আছে তাদের হাল (বর্তমান) ঠিকানা সহ। প্রথমে যার নাম পাওয়া যায়, তিনি নিজ পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন

"আব্দুল আপিছ নাম মোর শোন মন দিয়া।
বিদ্যা বুদ্ধি নাহি মোর আমি অভাগিয়া ॥
কলাগাছিয়া গ্রাম পিছে বসতি আমার।
পিতা ইসমাইল সিকদার শুনেন বেরাদার ॥
আল্লা নবীর নাম আমি মুখেতে লইয়া।
কবিতা করিনু সুরু বেছমিল্লা বলিয়া ॥
আমি অতি বিদ্যাহীন শুনেন যুবাগণ।
কবিতা লিখিতে আমি না পারি কখন ॥

মৃর্জাগঞ্জ থানার ২নং মৃর্জাগঞ্জ ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম কলাগাছিয়া। কলাগাছিয়া গ্রামের সিকদারদের বেশ নাম ডাক ছিল এক সময়। এখন এই গ্রামে সিকদার বংশের লোকজন

Dhaka University Institutional Repository

বসবাস করছেন। মরহুম ইসমাইল সিকদারের এক ছেলে ছিল আব্দুল আপিছ নামে। আব্দুল আপিছ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কর্ম উপলক্ষে নিজ গ্রাম ত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে বের হয়ে যান। তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে কলিকাতায় যান এবং সেখানে তিনি বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের সাথে তার পরিচয় হয়। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক ছিলেন 'প্রজা আন্দোলনের' অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। প্রজা আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন আব্দুল আপিছ। ১৯২৪ সনে এ. কে. ফজলুল হক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। এই অবিসংবাদী নেতার মাধ্যমে আব্দুল আপিছ কলিকাতা খাদ্য বিভাগের একজন সাধারণ কর্মচারী হিসাবে যোগদান করেন। (সিরাজউদ্দিন আহম্মেদ-হাসেম আলী খান, পৃষ্ঠা-৭৬, ঢাকা)।

আব্দুল আপিছ কলিকাতা ছেড়ে আর কখনো বাংলাদেশে আসেননি। ওখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। কিন্তু তাঁর অনুলিখিত কোন পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়নি। বরং জনশ্রুতিতে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে অনুমান করা যায় কলিকাতা যাওয়ার পূর্বেই কাব্যখানি নকল করেছিলেন।

কবি হাফেজদ্দীনের আরো একটি পাণ্ডুলিপি ছিল তার নাম "জয় বিনয়"। এই পুঁথির কোন হদিছ মিলেনি। সম্ভবতঃ আব্দুল আপিছ "জয় বিনয়ের" পুঁথিটিও নকল করেছিলেন। তাঁর দেশ ত্যাগ ও রাজনৈতিক কর্মকোলাহলে হয়ত সবকিছু হারিয়ে ফেলেছেনে, সংরক্ষণ করতে পারেননি। আব্দুল আপিছ নিজে স্বীকার করেছেন "কবিতা লিখিতে আমি না প্যারি কখন" এ থেকে প্রমাণীত হয় , তিনি একজন "লিপিকর" ছিলেন।

দ্বিতীয় লিপিকরের পরিচয় একই পাতায় মাত্র চার (৪) লাইনে বর্ণিত হয়েছে

শ্রী জবেদ আলি মৃধা সাং ঝাটিবুনিয়া।
উপরেতে জার নাম লিখা আছে ভাই।
বড় দুষ্ট লোক সেই জানিবে সবাই ॥
তার পিতা আরসেদালী মৃধা আছিল।
সে বড় দুষ্ট হাম্মার্দ দুনিয়াতে ছিল ॥

বর্তমান মৃর্জাগঞ্জ থানাধীন ৩নং আমড়াগাছিয়া ইউনিয়নের ঝাটিবুনিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন শ্রী জবেদ আলী মৃধা। তাঁর পিতা ও পিতামহ ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানার ভাগ্যকুলের জমিদার রাজা জানকীনাথ রায়ের নায়েব অম্বিকাচরণ মিত্রের মৃধা ছিলেন। রাজা জানকীনাথ রায়ের কাচারী ছিল বর্তমান বরগুনা জেলার বেতাগী থানার ১নং বিবিচিনি ইউনিয়নের গরিয়াবুণিয়া গ্রামে। এখানে তাঁদের পূরাকীর্তি এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। অম্বিকাচরণ মিত্রের 'লাঠিয়াল' বর্তমানে 'গাজী' উপাধি ধারণ করে ঐ কাচারী দখল নিয়ে বসবাস করছে। জনৈক

Dhaka University Institutional Repository

হাশেম গাজী রাজা জানকীনাথ রায়ের পূরাকীর্তি ধ্বংশ করে (কিছু অংশবাদে) নিজ বসত বাড়ী তৈরী করেছেন। ঐ বাড়ীর প্রবেশদ্বারের দেয়ালটি পূরাকীর্তির পরিচয় বহন করে।

রাজা জানকীনাথ রায় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ১৮ ভাটির বেতাগী থানার উত্তরাংশে জমিদারীর পত্তনি করেন। এই জমিদারের নায়েবের মৃধা ছিলেন পিতামহ আলেফ মৃধা ও পিতা আরশেদ আলী মৃধা। আরশেদ আলী মৃধা সাধারণ মানুষের উপর খুব অত্যাচার করত। জনশ্রুতি বঙ্গোপসাগর নিকটবর্তী হওয়ায় মগ ও পতুর্গীজ জলদস্যুদের সাথে তার বেশ ভাল সম্পর্ক ছিল। তাদের সাথে ডাকাতি, চুরি ও লুটতরাজ করত। সাধারণ মানুষকে ঠকাত ও তাদের দ্রব্য হরণ, জমি-জিরাত, গরু-বাছুর জোর করে নিয়ে আসত। তাকে খবরদারী করার মত হিম্মত তখনকার সময় কারোর ছিল না। এভাবে ঠক ও প্রতারণার মাধ্যমে সে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়। এই অত্যাচারী আরশেদ আলী মৃধার ছেলে 'দ্বিতীয় লিপিকর' শ্রী জবেদ আলী মৃধা। তবে তার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের কিছু কাহিনী শোনা যায়। শ্রী জবেদ আলী মৃধা ছিলেন সংস্কৃতিবান। তিনি কবি হাফেজদ্দীন রচিত "বসন্তের দুঃখ" পাণ্ডুলিপি খানা লিখেন এবং তিনিই শেষ লিপিকর। ৬০ বছর পূর্বে তিনি পরলোক গমন করেন। "জয় বিনয়" পুঁথি সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

প্রাপ্তিস্থান

কবি হাফেজদ্দীন রচিত "বসন্তের দুঃখ" এর পাণ্ডুলিপিটি মূর্জাগঞ্জ থানার ৩নং আমড়াগাছিয়া ইউনিয়নের আমড়াগাছিয়া গ্রামের আলহাজ্ব হামেদআলী সিকদারের স্ত্রী ফকরুন্নেছার বড় ছেলে জনাব আব্দুর রহিম মাষ্টারের কাছ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হই। কবির জন্মস্থান মহিষকাটা নামক গ্রাম। লিপিকারের বাড়ী ঝাটিবুনিয়া গ্রামে ছিল। অথচ এই দুই গ্রামের কোথাও পাণ্ডুলিপিখানা পাওয়া যায়নি। পেয়েছি ঐ গ্রাম থেকে ৩ (তিন) মাইল দূরবর্তী আমড়াগাছিয়া গ্রামে।

"বসন্তের দুঃখ" পাণ্ডুলিপিটির সংরক্ষণকারী ছিলেন ফকরুন্নেছা বেগম। তিনি লিপিকরের চার নম্বর বোন। লিপিকর জবেদ আলী মৃধার আরো চার জন ভাইবোন ছিল। তন্মধ্যে বড় ছিলেন লিপিকর, ২য় হাতেম আলী মৃধা, ৩য় বোন নুরুন্নেছা, ৪র্থ বোন ফকরুন্নেছা, ৫ম বোন জীবনন্নেছা। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে জবেদ আলী মৃধা ও ফকরুন্নেছা ছিলেন শিক্ষিত ও সংস্কৃতি ভাবাপন্ন। গ্রাম্য শালিস ব্যবস্থায় বেশ নাম ডাক ছিল। জবেদ আলী মৃধার মৃত্যুর পর এই পাণ্ডুলিপিখানা ফকরুন্নেছা সংরক্ষণ করেন। বিয়ের পর পাণ্ডুলিপিখানা সাথে করে শ্বশুর বাড়ী নিয়ে যান। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপিখানা কারো কাছে হস্তান্তর করেননি। একটি কাঠের বাক্সে

Dhaka University Institutional Repository

তালা দিয়ে রাখতেন। ১৯৯১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তারই জ্যেষ্ঠ পুত্র আঃ রহিম মাষ্টার এ পাণ্ডুলিপির অধিকারী হন। তিনি পাণ্ডুলিপি খানা হস্তান্তর করেন।

কবি পরিচিতি

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল রাজদরবার কেন্দ্রিক। মধ্যযুগের শেষ নাগাদ বাংলা সাহিত্য রাজদরবার ছেড়ে সাধারণ মানবমুখী হতে থাকে। সাহিত্যের বাহন ছিল তখন পাণ্ডুলিপি। মানুষের রস পিপাসা নিবারণের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করতে হত।

উনিশ শতকে কলিকাতায় মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়, তাতে প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ ছিল নগণ্য। মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের পরও হাতে পাণ্ডুলিপি লেখা হত এবং পাণ্ডুলিপি থেকে প্রতিলিপি লেখা হত। এখনো গ্রামাঞ্চলে প্রচুর পাণ্ডুলিপি রয়েছে।

ইংরেজদের হাতে পরাজয়ের পর মুসলমানরা শুধু রাজত্ব হারায়নি, তাঁর সাথে নৈতিকতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, সামাজিক প্রতিপত্তি ও ধর্মীয় আদর্শ হারিয়ে অনুদারবৃত্তি জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে তারা আত্মনির্ভরতা হারিয়ে ফেলে। বাংলার মুসলমানরা মিশ্রীতিতে তখন প্রণয়োপাখ্যান, যুদ্ধ বিষয়ক, পীর পাঁচালী, ধর্মশাস্ত্রীয় রচনা, মসীর্য়া, বীরত্বব্যঞ্জক, রূপক, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে পুঁথির মাধ্যমে মশগুল থেকে আত্মতৃপ্তি খুঁজেছে ও সাহিত্যের গণচাহিদা মেটানোর চেষ্টা করেছে। ইংরেজদের ভেদনীতির কারণে মুসলিম-হিন্দু সমাজে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ তীব্র হয়ে উঠে। ঠিক এই মুহূর্তে মুসলমান-হিন্দুদের মিলনাকাঙ্খা নিয়ে হাফেজদ্দীন আপন গৃহ কোনে বসে লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী নিয়ে উত্তর খণ্ড "বসন্তের দুঃখ" নামক বীরত্বব্যঞ্জক মিলনাত্মক রূপকথাশ্রিত উপাখ্যান লিখেন।

কবি হাফেজদ্দীন 'নিজ পরিচয়' দিতে গিয়ে বলেছেন

সর্ব্ব দুঃখ পাসরিয়া প্রভুনাম ভজ গিয়া
অধীন হাফেজদ্দীন বলে ॥
জিলা বাখেরগঞ্জ বাস ভ্রমি আমি নানা দেশ
অল্পবুদ্ধি থোরাই বয়েস।
ত্রিপদি ছাড়িয়া তবে পয়ারেতে লিখি যবে
শুন সবে বসন্তের কাহিনী ॥ (২৬ তম পরিচ্ছেদ)

Dhaka University Institutional Repository

কবি অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে অর্থাৎ আনুমানিক ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান পটুয়াখালী জেলা সদর থেকে ১৭ মাইল পশ্চিমে এবং মৃর্জাগঞ্জ থানা সদর থেকে থেকে ৭ মাইল উত্তরে মহিষকাটা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাখেরগঞ্জ জেলা সদর থেকে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণে কবির জন্মস্থান। আজও তাঁর উত্তরসূরীরা বসবাস করছেন। কবি বিভিন্ন দেশ ঘুরে ফিরে এসে অল্প (থোরাই) বয়সে কাব্যখানা লিখতে শুরু করেন বৈশাখ মাসে এবং শেষ করেন চৈত্র মাসে।

কবির 'অল্প বয়স' যখন, তখন কাব্যখানা লিখতে আরম্ভ করেন। এই অঞ্চলের রাজনৈতিক চড়াই উৎড়াই পার হয়ে বুজুর্গউমেদপুর জেলা বাখেরগঞ্জ জেলায় রূপান্তরিত হয়। মূলত: কবির জন্মের সময়কালটা ছিল বুজুর্গউমেদপুর জেলার উদ্ভবকাল। কবির জন্ম বুজুর্গ উমেদপুর জেলা হলেও পরবর্তীতে লেখার সময় রূপান্তরিত জেলার নামই লিখেছেন। বুজুর্গ উমেদপুর জেলার উদ্ভব ও নামকরণ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে বিস্তৃত বর্ণনা করা হল।

ইংরেজ বণিকরা এই অঞ্চলে সাধারণ মানুষের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন আরম্ভ করে। ইংরেজ বণিকদের অত্যাচার বন্ধ করতে সার্জেন্ট ব্রোগোকে পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি বণিকদের অত্যাচার বন্ধ করতে ব্যর্থ হন। কারণ তিনি হস্তক্ষেপ করলে কোম্পানীর গোমস্তা, মুৎসুদ্দি ও অন্যান্য কর্মচারী তার বিরুদ্ধে কোম্পানীর কাছে আপত্তি উত্থাপণ করে। ইংরেজ অত্যাচারে জর্জরিত জনসাধারণ প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। এবং এই বিদ্রোহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ বণিকরা বরিশালের নদী পথে ঢাকা-কলিকাতা যাতায়াত করত। বিদ্রোহীরা বণিকদের বানিজ্য তরী আক্রমণ করে নদীতে ডুবিয়ে দেয়। এবং কয়েকজন বণিক ও গোমস্তাকে হত্যা করে। ১৭৬৪ সালে ক্যাপ্টেন রোজ নৌকায় বাকেরগঞ্জ বন্দরে যাওয়ার সময় আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। গর্ভনর ভান্সিটার্ট রোজের হত্যাকারীদের দমন করার জন্য মুর্শিদাবাদের নবাবকে অনুরোধ জানায় কিন্তু সে অনুরোধ বৃথা হয়। কারণ নবাব অবগত ছিলেন তাদের নির্যাতন ও অত্যাচার সম্পর্কে। বাংলাদেশের মধ্যে বুজুর্গউমেদপুর জেলায় সর্ব প্রথম শোষক ইংরেজ বেনিয়া বিদ্রোহীদের হাতে খুন হয়। ময়মনসিংহের 'ফকীর আন্দোলন' চলকালীন সময় মুসলমান-হিন্দু বিদ্রোহীরা সম্মিলিত হয়ে ইংরেজ রেসিডেন্ট আক্রমণ করে। ১৭৮৮ সনে গৌরনদীর নিকট বিদ্রোহীরা ইংরেজ বেনিয়া মিঃ বার্গকে হত্যা করে। সিলেটের কালেক্টর মিঃ উইলিয়ম বরিশালের নদী পথে যাওয়া সময় বিদ্রোহীদের আক্রমণে পতিত হয়। অবশেষে নদীর তীরে উঠে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ঝালকাঠিতে ইংরেজের একজন লবণ এজেন্ট বাস করত। ইংরেজ এজেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

দেশীয় কৃষকদের বিনা অনুমতিতে লবণ উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। তারা নিষেধ উপেক্ষা করে বৈদারাপুর গ্রামে এক কৃষক পরিবার লবণ উৎপাদন করে। ফলে তার উপর নেমে আসে ইংরেজদের নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন।

এই সংবাদ শুনে কৃষকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে ইংরেজ এজেন্ট সাহেবকে আক্রমণ করে এবং লবণের তাফালে জ্বাল দিয়ে হত্যা করে।

শায়েস্তা খার বড় ছেলে বুজুর্গ উমেদ এই অঞ্চলের লুণ্ঠনকারী মগ-পর্তুগীজ দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করেন। ফলে তার নাম অনুসারে 'সরকার বাজুয়া ও চন্দ্রদ্বীপ পরগণা' থেকে বুজুর্গ উমেদপুর পরগণার সৃষ্টি হয়। পরে ইংরেজরা শাসন প্রণালীর সুবিধা ও বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য কমন্স সভার সিদ্বান্ত অনুযায়ী বুজুর্গ উমেদপুরকে জেলায় উন্নীত করা হয়। মুসলমান বীরের নাম অনুসারে এ জেলার নামকরণ হওয়ায় অধিবাসীরা সাহসী হওয়ার অনুপ্রেরণা লাভ করে।

মুসলমানদের নামানুসারে এই জেলার নাম পরিবর্তন করণের জন্য ১৭৮৬ সালে কমন্স সভার সিদ্ধান্তকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে ৩৫টি জেলাকে ৭নং রেগুলেশন এ্যাক্ট ধারার অনুবলে বাতিল করে এবং ঢাকা কালেক্টরের অধীনে আনা হয় এবং ৩৫টি জেলাকে ২৩টি জেলায় রূপ দেয়া হয়। ১৭৯৭ সালে বাকেরগঞ্জকে স্বাতন্ত্র্য জেলা ঘোষণা করা হয়। এই সময় কবির বয়স ছিল অল্প। কবির এই অল্প বয়সের সময় মৃর্জাগঞ্জ থানার সৃষ্টি হয়নি। বুজুর্গ উমেদপুর জেলার অবলুপ্তির পর ১৮১২ সালে মৃর্জাগঞ্জ থানার সৃষ্টি হয়। থানা সৃষ্টির পূর্বেই কবি তার কাব্যখানি লিখেন। তাই থানার নামের উল্লেখ নেই রূপান্তরিত জেলা বাখেরগঞ্জের নাম উল্লেখিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে নদ-নদী ও সমুদ্র উপকুলে অসংখ্য তালুক গড়ে উঠে। নবাবী আমলেই প্রচলিত নিয়মানুসারে জমিদার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত প্রধান মধ্যস্বত্বাধিকারীকে 'তালুকদার' বলা হত। এই তালুকদারেরা ইজারা দিত তালুক, আবার বড় রকমের ইজারাকে বলা হত 'ওসাত'। হাওলাদার ব্যবস্থার প্রচলন মুসলিম আমল থেকেই চলে আসছে। সুতরাং ওসাত তালুক ও হাওলার অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। যেখানে হাওলার এলাকা বড় ছিল, সেখানে 'নিম হাওলার' সৃষ্টি করা হত। কবি হাফেজদ্দীন বিভিন্ন দেশ ঘুরে এসে অল্প বয়সে কাব্যখানা লিখেন এবং আলেফ মৃধার সহায়তায় নিম হাওলার 'ওসাত নিম হাওলা' স্থায়ীভাবে ইজারা নিয়ে বসবাস করনে। এই নিম হাওলায় তার উত্তরসূরীরা বর্তমানে বসবাস করছেন।

কবির বংশধরদের মধ্যে কবি প্রতিভার কোন ছাপ নাই বলতে গেলেই চলে। কবির অধঃস্থান পাঁচ (৫) পুরুষ পর এই বংশের মধ্যে জারি, সারি ও গজল বলায় বেশ নাম ডাক ছিল। তারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়ে জারি, সারি, গজল, হামদ, নাত, কিয়াম গাইতেন।

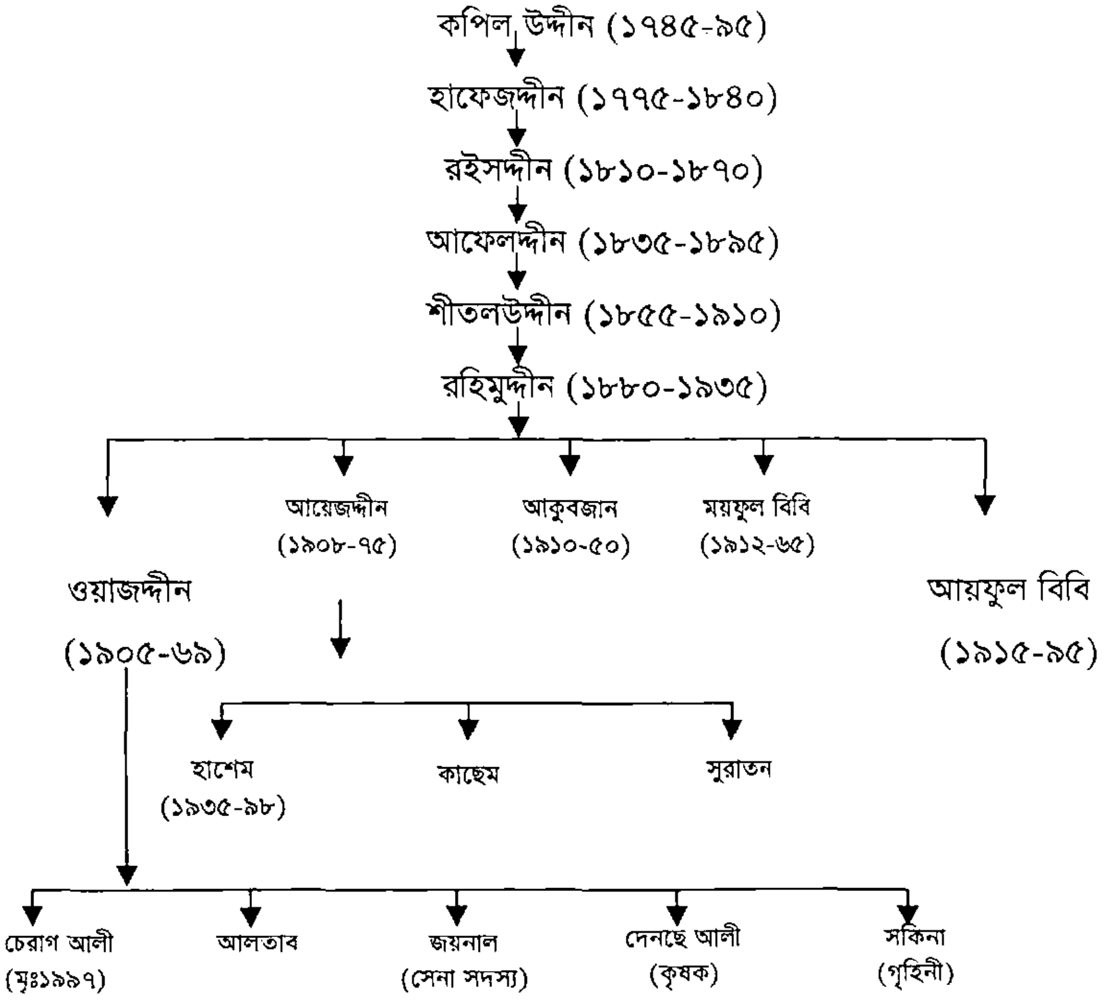

(কবি হাফেজদ্দীনের বংশাবলীর তালিকা।)

কবির ভণিতা

প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সমূহে প্রায় পরিচ্ছেদের শেষে কবি আত্মপরিচয়ের পূর্বে বিশেষণ ব্যবহার করে পরিচয় ব্যক্ত করতেন এই আড়ম্বরপূর্ণ কথারাম্ভকে 'ভণিতা' বলা হয়। কবি হাফেজদ্দীন "বসন্তের দুঃখ" কাব্যের প্রায় প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে বিভিন্ন অভিধা ব্যবহার করে নিজ পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। কবি ভণিতায় কবির নামের সাথে হীন হাফেজদ্দীন, অধীন, অধম, নেওয়াজমন্দ, হীন, হীনবুদ্ধি হাফেজদ্দীন, হাফেজআলী বলে উল্লখ করেছেন।

ভণিতা

১	২	৩	৪	৫
হাফেজদ্দীন	অধীন হাফেজদ্দীন	অধীন হাফেজ আলী	হীন বুদ্ধি হাফেজদ্দীন	হীন হাফেজদ্দীন
১৭ তম পরিচ্ছেদ	৩য়, ৫ম ও ২৮তম পরিচ্ছেদ	১৩ তম,২২তম পরিচ্ছেদ	২৭ তম পরিচ্ছেদ	২য়,১১তম,১৬তম, ২৫তম পরিচ্ছেদ।
১ বার	৩ বার	২ বার	১ বার	৪ বার

ভণিতা

৬	৭	৮	৯	১০
হীন হাফেজআলী	অধম	অধম হাফেজদ্দীন	নেওয়াজমন্দ হাফেজদ্দীন	অভিধা ও নাম নেই
৯বম, ১৯তম, ২০তম, ২৪তম পরিচ্ছেদ	১০ম পরিচ্ছেদ	৪র্থ পরিচ্ছেদ	৭ ম পরিচ্ছেদ	১ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১২তম, ১৪তম, ১৫তম, ১৮তম, ২১তম, ২৩তম, ২৬তম, ২৯তম, ৩০তম, ৩১তম, ৩২তম পরিচ্ছেদ।
৪ ড়্যার	১ বার	১ বার	১ বার	১৪ বার

Dhaka University Institutional Repository

কবি নামের পূর্বে বিভিন্ন অভিধা ব্যবহার করেছেন। নামের বেলায় পার্থক্য রয়েছে। কোথাও হাফেজদ্দীন আবার কোথা হাফেজ আলী। আসলে উভয় একই ব্যক্তির নাম। যদি হাফেজদ্দীন ও হাফেজ আলী ভিন্ন ব্যক্তি হতেন, তাহলে রচনাগত অনৈক্য থাকত কিন্তু তা নেই। সতী ময়না লোরচন্দ্রানীর রচনায় কবি দৌলৎ উজির বাহরাম খান ও কবি আলাওলকে রচনাগত পার্থক্য দিয়ে চিহ্নিত করতে পারি। কারণ লেখার রীতি ও ভাবৈশ্বর্যই উভয়কে পৃথক করেছে।

তাছাড়া যদি লেখক দুজন হতেন তবে কিছু উপকাহিনী এসে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য ধারাকে পৃথক করত। একজন কবি সব সময় নিজ মনোভূমিকে বিবেচনায় সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে থাকেন। আলাওল, কাজী দৌলত অনুসৃত মুল কাহিনী গ্রহণ করলেও রতন কালিকা ও আনন্দ বর্ম্মা একটি উপকাহিনী-এ কাব্যের অন্তর্ভূক্ত করেন। প্রচলিত রূপকথাভিত্তিক এ কাহিনীকে স্বাতন্ত্র্যতা দান করেছে এবং একই সাথে কবির মৌলিকত্বকে প্রমাণ করেছে। সুতরাং আলোচনায় বলা যায়, হাফেজ আলী ও হাফেজদ্দীন একই ব্যক্তি ছিলেন এবং কাব্যখানি একই কবির রচনা। কোন রকম ভিন্নতা সূচিত হয়নি।

কবি হাফেজদ্দীন ভণিতায় কোন প্রকার নাম ব্যবহার করেননি। সে পরিচ্ছেদগুলো নিম্নরূপ ঃ- ১ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১২তম, ১৪তম, ১৫তম, ১৮তম, ২১তম, ২৩তম, ২৬তম, ২৯তম, ৩০তম, ৩১তম, ৩২তম পরিচ্ছেদ। (মোট ১৪টি পরিচ্ছেদ)।

ভণিতায় হীন হাফেজদ্দীন অভিধা ব্যবহার করেছেন

১. হীন হাফেজদ্দীন কহে দরগায় আল্লার।
হেন দসা দুনিয়াতে নাহি ঘটে কার ॥
পয়ার ছাড়িয়া দিনু ত্রিপদি লিখিয়া।
বসন্তের দুঃখ যাহা কহি বিবরিয়া ॥ (২য় পরিচ্ছেদ)

২ .ইষ্ট মিত্র নাহি কেহ নিলয়ের সঙ্গিনি।
হেন কেহু নাহি আর নিভায় অগনি ॥
কহে হীন হাফেজদ্দীন ভাবিয়া খোদায়।
মকছুদ হাছেল কর ওহে দয়াময় ॥ (১৬ পরিচ্ছেদ)

৩ .রাজায় করুণা ভাবে পুত্রের কারণ।
কহে হীন হাফেজদ্দীন দেবীর বচন ॥ (২৫ পরিচ্ছেদ)

৪ .হীন হাফেজদ্দীন কহে ভাবিকর তার।
পুরা করি দেহ মোরে প্রভু করতার ॥ (১১ পরিচ্ছেদ)

Dhaka University Institutional Repository

ভণিতায় হীন বুদ্ধি হাফেজদ্দীন অভিধা ব্যবহার করেছেন।

মালিনী শুনিয়া পাইল ক্ষান্তের তাপ।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহি বুড়ার বিলাফ ॥
হীন বুদ্ধি হাফিজদ্দীন কহে সভার পায়।
শুনিয়া বুড়ার জারি বিকল হৃদয় ॥ (২৭তম পরিচ্ছেদ)

ভণিতায় হীন হাফেজ আলী অভিধা ব্যবহার করেছেন।

১. কন্যারে তীক্ষ্ণ সুলে সেই ভাল সুনা।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহি দেবীর করুণা ॥
হীন হাফেজ আলী কহে করিয়া বিণয়।
হেন দশা প্রভু যেন না করে কাহায় ॥ (৯ পরিচ্ছেদ)

২. ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সব বসে সভা মাজ।
পাঁচালি প্রবন্ধে করি কুমারীর সাজ ॥
হীন হাফেজ আলী কহে জোনাবে সভার।
কহিব কন্যার বাণী সভার গোচরে ॥ (১৯ তম পরিচ্ছেদ)

৩. প্রভুর বচন শুনি কান্দে কন্যা পুনি ২
এত দুঃখ পাই কি কারণ।
হীন হাফেজ আলী বলে এস্ক যার আছে দেলে
তার মন সদা উচাটন ॥ (২০ তম পরিচ্ছেদ)

৪. হীন হাফেজ আলী কহে ভাবি করতার।
শুন এবে বসন্তের পিতার সমাচার ॥ (২৪ তম পরিচ্ছেদ)

ভণিতায় অধম হাফেজদ্দীন অভিধা ব্যবহার করেছেন।

হেট সির উচা করি শিরে হস্ত দিয়া।
কান্দিতে লাগিল কুমার ঈশ্বর ভাবিয়া ॥
অধম হাফেজদ্দীন কহে না কান্দিও আর।
ক্ষেণেক বিলম্বে সুখ হইবে কুমার ॥ (৪র্থ পরিচ্ছেদ)

ভণিতায় নেওয়াজমন্দ হাফেজদ্দীন অভিধা ব্যবহার করেছেন।

আর কিছু কহি এবে শুন গুণিজন।
অপরাধ ক্ষেমি মোর লইবে বচন ॥
নেওয়াজমন্দ হাফেজদ্দীন কহে খাকছার।
বসন্তের দুঃখ সম বিন্দ্রিতে আমার ॥ (৭ তম পরিচ্ছেদ)

Dhaka University Institutional Repository

ভণিতায় হাফেজদ্দীন অভিধা ব্যবহার করেছেন।

আর কেহ ভাব দুঃখ নিকটে হইল দুঃখ
কর্ম্ম দোষে পতি হইল ভিন।
বিরহের অভাগিনী কামবাণে হানে পুনি
দুঃখ ভাবি কহে হাফেজদ্দীন। (১৭ তম পরিচ্ছেদ)

ভণিতায় অধীন হাফেজদ্দীন অভিধা ব্যবহার করেছেন।

১. পলাইলাম পিতার ঠাঁই নির্ব্বন্দ এরান নাই
বিচার করিবে নরপতি।
অধীন হাফেজদ্দীন কয় প্রভুয়ার সুখী হয়
দুঃখ খণ্ডে প্রতিমিতে ॥ (৩য় পরিচ্ছেদ)

২. এই যে রহিল দুক্ষ না দেখিলাম ভাইর মুখ
এ জনমে না হইল দরশন।
অধীন হাফেজদ্দীন বলে দুক্ষ আছে যার দেলে
তার সুখ না হয় কখন ॥ (৫ম পরিচ্ছেদ)

৩. সর্ব্ব দুঃখ পাসরিয়া প্রভুনাম ভজ গিয়া
অধিন হাফেজদ্দীন বলে। (২৮ তম পরিচ্ছেদ)

ভণিতায় অধীন হাফেজ আলী অভিধা ব্যবহার করেছেন।

১. এই বর মাঙ্গি আমি অলক্ষিতে ছাড় তুমি
তোমাজন পাব স্বর্গ পুরি।
অধীন হাফেজ আলী কহে বিলাপ না প্রাণে সহে
মনের মানস পুরা ও করতার ॥ (১৩ তম পরিচ্ছেদ)

২. নিবারণ করে সবে করিয়া মিনতি।
অধীন হাফেজ আলী কহে দুঃখের ভারতি ॥ (২২ তম পরিচ্ছেদ)

ভণিতার শুধু মাত্র অভিধা ব্যবহার করেছেন।

অধীন লাচার কহে প্রভু যার সখা হয়
তার মন সদা হরসিত ॥
পুত্র কন্যা ধনজন নাহি যার ত্রিভুবন
তার মন রহে দুঃখিত ॥ (১০ম পরিচ্ছেদ)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ কাহিনী , উৎস ও চরিত্র

কাহিনী ও উৎস

প্রচলিত বাংলার লোকসাহিত্যে শীত-বসন্ত এর কাহিনীই কবি হাফেজদ্দীন রচিত "বসন্তের দুঃখ" কাব্য কাহিনীর উৎস।

ভীম রাজ্যের রাজা প্রতাপ ভীম ও রাণীর ঈশ্বরী দেবী দুই সন্তান শীত ও বসন্তকে নিয়ে সুখেই ছিলেন। তাদের কোন অভাব অভিযোগ নেই। ঘাতক ব্যাধিই কাল হয়ে রাজা প্রতাপ ভীমের সংসারে প্রবেশ করে। মারা যাবার পূর্বে রাণী রাজাকে অনুরোধ করে যান, যেন সে দ্বিতীয় বিয়ে না করে। রাণী তার দুই সন্তান শীত ও বসন্তকে দাইয়ের হাতে লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়ে স্বর্গবাসী হন।

দিন যায়, মাস যায়,বছর চলে যায়। রাজা বিয়ে আর করেন না। সব সময় তার মধ্যে ভাবান্তর, মনের মধ্যে কোন শান্তি নেই। রাজমন্ত্রী ও তার পরিষদবর্গ রাজার চিন্তায় ব্যাকুল। আমাত্যবর্গ শলা-পরামর্শ করে তাঁকে বিয়ের জন্য অনুরোধ করেন। রাজা বিয়ে করেন। শীত ও বসন্তকে দাইয়ের কাছে লালন পালনের দায়িত্ব দেয়। যাতে তাদের কোন অমঙ্গল না হয়।

শীত ও বসন্ত কখনো মনের ভুলেও রাজার চৌহিদ্দীতে প্রবেশ করে না। তারা সব সময় দাইয়ের সাথে সাথে থাকে। অবসর সময় কবুতর নিয়ে খেলা করে। শীত ও বসন্ত বেঁচে থাকায় সৎমার মনের মধ্যে কোন শান্তি নেই। কেমন করে পথের কাঁটা সরানো যায় সেই চিন্তায় তার দিন কাটে। যেভাবেই হক পথের কাঁটা সরাতেই হবে। ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে। কিন্তু কোন পথ বা সুযোগ পাচ্ছে না। সত্যি সত্যি একদিন যে সুযোগ এলো। শীত ও বসন্ত দুই ভাই কবুতর নিয়ে খেলা করে। একদিন তাদের খেলার কবুতর কোথায় উড়ে গেল, তার কোন খোঁজ খবর নেই। খুঁজতে খুঁজতে তারা হয়রাণ। শেষে সন্ধান পেল রাণী তার কক্ষে কবুতর আটকিয়ে রেখেছে। শীত ও বসন্ত রাজার বাড়ীতে ঢুকে জোর করে কবুতর নিয়ে আসে। রাণী তো সুযোগ হাত ছাড়া করতে রাজী নয়। রাণী ইনিয়ে বিনিয়ে রাজার কাছে শীত ও বসন্তের নামে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলে। রাজা তো অগ্নিশর্মা। এত বড় অপরাধ, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এ অপরাধের কোন মার্জনা নেই।

জল্লাদকে ডেকে আনা হল এবং মৃত্যুদণ্ডের আদেশ জারি করা হয়। রাজাজ্ঞা পালনীয়। জল্লাদ তাদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়। জল্লাদ ছোট বেলা থেকে শীত- বসন্তকে আদর করত। তাই তাদের প্রতি অপরিসীম মায়া। বধ্যভূমিতে নিয়ে তাদেরকে হত্যা না করে দুটি তরতাজা ঘোড়া ও নতুন জামা কাপড় পড়িয়ে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যেতে বলে। জল্লাদ বনের পশু হত্যা করে তার রক্ত ও রাজকুমারদ্বয়ের জামা কাপড় রাজা ও রাণীকে দেখায়। এবারে রাণীর মনে শান্তি আসে। তার পথের কাঁটা সরানো হয়েছে। আর কোন চিন্তা নেই। রাজকুমারেরা ভাগ্যান্বেষণে

Dhaka University Institutional Repository

যেতে বাধ্য হয়। চোখ যেদিকে যায়, সেদিকে চলতে থাকে। যেতে যেতে এক গহীন জঙ্গলে প্রবেশ করে।

জঙ্গল-বন, পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে এক অচীন দেশের জঙ্গলে বিশ্রাম নেয়। শীত বড় আর বসন্ত ছোট। পানির পিপসায় বসন্ত কাতর হয়ে পড়ে। ছোট ভাইয়ের জন্য শীত পানির খোঁজে যায়। কিন্তু কোথাও পানি নেই। শেষে ছোট ভাইকে একটি বড় গাছের নিকট বসিয়ে রেখে পায়ে হেটে নদীরে তীরে পানি তুলতে যায়।

ঐ দেশটির নাম জকুম দেশ। জকুম রাজ্যের রাজা ছিল রায় কবি চন্দ্রপতি। তার কোন ছেলে মেয়ে নেই। নিঃসন্তান রাজা বড়ই দুঃখিত। একদিন রাজা স্বর্গবাসী হন। রাজার সন্তান না থাকায় উত্তরাধিকারী মনোনয়ন নিয়ে সংকট দেখা দেয়। সংকটের কোন সমাধান হয় না। সংকট নিরসনের ভার দেয়া হয় রাজহাতীর উপর। অমাত্যবর্গের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাজহাতী ছেড়ে দেয়া হয়। রাজহাতী সমস্ত দেশ ঘুরে রাজা হওয়ার উপযোগী কোন লোক না পেয়ে, গহীন জঙ্গলে প্রবেশ করে, জঙ্গলে নদীতে শীত পানি উঠাতেছিল। এমনি সময় রাজহাতী তার কপালে 'রাজতিলক' দেখে শীতকে উঠিয়ে নিয়ে রাজদরবারে আসে। শীত তো অবাক, সে কিছুই বুঝতে পারেনি।

হাতী শীতকে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দেয়। দেশের অমাত্যবর্গ, সৈন্যবাহিনী ও প্রজাসাধারণ শীতকে রাজারূপে বরণ করে। রাজতখ্তে বসেই শীত প্রথমে দেশের শান্তি রক্ষার্থে, রাজ্যের সর্বত্র কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা করে। হুকুম পেয়ে প্রহরীরা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তারা সতর্কভাবে প্রহরায় থাকে।

প্রহরীরা জঙ্গলে ঢুকে দেখতে পায় একটি বালক দুটি ঘোড়া হাতে নিয়ে একটি বৃক্ষের নিচে দাড়িয়ে আছে। ঐ দেশের নগরপাল কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় ঘুরতে ঘুরতে গহীন জঙ্গলের বৃক্ষের কাছে এসে উপস্থিত হয়। বৃক্ষের দিকে নজর দিতেই কোতোয়াল দেখতে পায় চন্দ্রোজ্জ্বল একটি বালক দুটি ঘোড়ার রশি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নগরপাল এই অবস্থা দেখে "চোর চোর" বলে হেঁকে উঠে। তার সাথের সৈন্যরা নিজেদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘিরে ফেলে। বালক বুঝল অশেষ যাতনা দিয়ে তার ভাইকে তারাই নিয়ে গেছে। এবারে এসেছে যুদ্ধ করে তাকে মেরে ঘোড়া দুটি নিয়ে যাবে। ভয় পেয়ে রাজকুমার সানুনয় ও বিনয় বচনে জানতে চাইল, তারা কোথা থেকে এবং কেন এসেছে ?

নগরপাল হেঁকে বলে 'তুই ঘোড়া চোর'। নৃপতির আজ্ঞায় ধরে নিতে এসেছি। এ কথা শুনে শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার হল এবং বলে ঃ-

বিদেশী দুঃখীত আমি ভাই হারাইয়া।
উদ্দিস না পাই কোথায় গেল পালাইয়া ॥

Dhaka University Institutional Repository

মিছা পরিবাদ দেহ কোন দোষ পাইয়া।
নিদয়া নিষ্ঠুর বরা তুমি বজ্জাত জাত ॥

আমি বিদেশী দুঃখীত, ভাইকে হারাইয়া এখানে অবস্থান করছি। তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। তোমরা কেন মিছা দোষ দিচ্ছ। তোমরা অত্যন্ত খারাপ মানুষ। একথা শুনে নগরপাল ক্ষিপ্ত হয়ে কুমারের হাত রশি দিয়ে বেঁধে নৃপতির কাছে নিয়ে যায়।

কুমার অল্প বয়সের বিধায় বিচার না করে জেল খানায় আটক করে রাখে। কারারক্ষীর মনে দয়া হল এবং জানতে চায়, সে কেন এহেন গর্হিত কাজ করেছে? চেহারা সুরত দেখে মনে হয় না সে চোর। রাজার সাথে তার চেহারার মিল রয়েছে। কারারক্ষীর কথা শুনে কুমার বলে।

এতেক শুনিয়া বলে রাজার নন্দন।
আমা হেন অভাগিয়া নাহি ত্রিভুবন ॥
আমার কথপ কিছু প্রত্যেক হবে নাই।
মিছা ২ দুঃখ জেন মোর হইল ভাই ॥

রাজকুমারের কথা মিথ্যা হবার নয়। সে যা বলবে তা সত্য বলবে। যদি শুনে তবে তার কাছে দুঃখের কথা বলবে। অহেতুক জঞ্জালে দুঃখ হল।

রাজকুমারের দুঃখের কথা শুনলে সকলেই দুঃখ পাবে। রাজকুমার কারারক্ষীর কাছে দুঃখের কথা বর্ণনা করে।

আমার মনের দুক্ষ   সবলে বিদরে বুক
আছিলাম রাজার নন্দন।
মাতাহীন বিধি কৈল   তাতে পিতা বৈরী হইল
অরন্যেতে করিলাম গমন ॥

রাজকুমারের দুঃখের কথা শুনলে সকলের বুক ফেটে যাবে। শৈশবে মাতা ইশ্বরীর বিয়োগে পিতা প্রতাপ ভীম সৎমার ষড়যন্ত্রে বৈরী হয় কবুতর নিয়ে খেলা করায়। রাজা শাস্তি ঘোষণা করে এবং কোতয়ালকে আদেশ করে হত্যা করার জন্য। জল্লাদ রাজকুমার শীত ও বসন্ত কে নিয়ে গেল বধ্য ভূমিতে। রাজকুমারদ্বয়ের প্রতি জল্লাদের দয়া হয়। সে হত্যা না করে তাদের কে দুইটি তেজস্বী ঘোড়া ও নতুন জামা কাপড় পড়িয়ে দূরদেশে যেতে বলে। এভাবে চলতে চলতে এই গহীন অরণ্যের বৃক্ষের নীচে অবস্থান নেয়। পথে চলতে চলতে পানির পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে বসন্ত। বড় শীত, সে বসন্তকে রেখে পানি আনতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। এভাবে দিন যায়, রাত গিয়ে প্রভাতের আলো আকাশে ফুটে উঠে। তৃষ্ণায় ও ভাইয়ের শোকে অধীর হয়ে পড়ে। ঘোড়া দুটির রশি ধরে গাছের নীচে বসে অপেক্ষায় আছে। সেই অবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

কোতয়াল তার সৈন্যসহ চোর অপবাদে তাকে বেঁধে নিয়ে আসে। আসলে সে চোর নয়। কপালে যদি দুঃখ লেখা থাকে তা থেকে পরিত্রান নেই।

এভাবে কারারক্ষীর কাছে বসন্ত আপন পরিচয় বর্ণনা করে। ভীম দেশের রাজা প্রতাপ ভীম ও রাণী ঈশ্বরী দেবী তাদের পিতা মাতা। কর্ম্মে যদি দোষ থাকে তবে দুঃখ পেতেই হবে। শীত ও বসন্ত দুই ভাই। শৈশবে মাতৃহারা হারা হয়ে দাই কর্তৃক লালিত পালিত হয়। পিতা ভীম রাজা অমাত্যদের পরামর্শে দ্বিতীয় বিয়ে করে এবং এখান থেকেই শুরু হয়, তাদের দুঃখের পালা। সেই সৎমার চক্রান্তে পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তৃষ্ণার্ত হয়েই ভাই হারা হয়েছে এবং চোর অপবাদে এখানে বেঁধে নিয়ে আসে। রাজপুত্র হয়েও তাকে অনেক দুঃখ পেতে হল। মাতৃহীন বালক বলে 'আমাকে দয়া করে প্রাণে বাঁচাও' এই নিবেদন করে কারারক্ষীর প্রতি।

কারাক্ষীরগণ বসন্তের দুঃখের কাহিনী শুনে তাদের মনে দয়ার সঞ্চয় হয়। এবং তাদের রাজ্যের নাম ও রাজার পরিচয় দেয়। এই রাজ্যের নাম "জকুম রাজ্য"। রাজা ছিল রায় কবিচন্দ্র পতি। কিছুদিন হল রাজা পরলোকে চলে গেছে। রাজার কোন ছেলে মেয়ে না থাকায় রাজ সিংহাসন খালি পড়ে আছে। রাজসিংহাসন শূণ্য রাজ্য প্রায় অচল। এই সময় অমাত্যবর্গের পরামর্শে রাজা নির্বাচন করার দায়িত্ব দেওয়া হয় "গজদন্ত" নামক রাজহাতীকে। রাজহাতী বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে 'রাজতিলক' দেখে এক বালকে পানি তোলা অবস্থায় শুর দিয়ে পেচিয়ে ধরে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। সেই এখন এই রাজ্যের রাজা নাম তার শীত। দেখতে প্রায় তোমার মত। মনে মনে বসন্ত ভাবে তবে সেই হবে তার ভাই শীত। তার সম্মুখে নিলে সে তাকে চিনবে। এভাবে চিন্তা করে কারারক্ষীকে বলে তাকে রাজার কাছে নিয়ে যাবার জন্য। কারারক্ষী তাকে কথা দিয়েছে, সুযোগ পেলেই অনুমতি নিয়ে রাজার কাছে উপস্থিত করবে। কিন্তু মানুস যা ভাবে তা হয় না। ঐ দেশেই গঙ্গাধর সাধু নামে এক ধুরন্ধর সওদাগর ছিল। সওদাগরগিরি করে সে অনেক টাকা পয়সা করছে। টাকা পয়সা খরচ করে একখানা বিশাল চমৎকার নৌকা নির্ম্মান করায়। নৌকা নির্ম্মান হয়ে গেলে পানিতে নামাতে পারছে না। নৌকা নামাবার জন্য অনেক কোশেশ করে ও ব্যর্থ হয়। অনেক মানত দান খয়রাত করল কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। নীদ্রিতাবস্থায় সাধু স্বপ্ন দেখে কোন একজন তাকে উপদেশ দিচ্ছে।

স্বপন দেখেন সাধু কহে একজন।
সুনহারে সওদাগর দুঃখ কেনে মন ॥
এক নরবলি দান দেহ ডিঙ্গা পরে।
তবেত জলেতে ডিঙ্গা নামিবে সভার ॥

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গাধর সাধু স্বপ্ন দেখে তো চমকে গেল। কি দেখল সে কোথায় পাবে সে বলি দেয়ার মানুষ ? অনেক জল্পনা কল্পনা করে অবশেষে রাজার কাছে বলি দেয়ার মানুষের জন্য যায়। রাজাকে সম্মানী দিয়ে তার আবেদন পেশ করে।

এক নরবলি দান দেহ নৌকা পরে।
তবেত নামিবে নৌকা জলের মাঝারে ॥

রাজা সম্মানী পেয়ে গঙ্গাধর সাধুর আবেদন ও স্বপ্নের কথা শুনে তাকে নিরাশ করেননি। কারারক্ষীকে রাজা আদেশ দেয়।

অশ্ব চুরি যেইজন করিল আসিয়া।
সেই চোরে দেহ আনি সাধুর লাগিয়া ॥

রাজাজ্ঞা পেয়ে দারীপাল গেল কারাগারে। কুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে।

নির্ব্বন্দ আষ্টে পৃষ্টে তোমার মরণ নির্শ্চয়।
চেষ্টাইত দুঃখ দসা খণ্ডান না যায় ॥

কপালে দুঃখ লেখা থাকলে তা খণ্ডান যায় না। শত চেষ্টা করেও তাকে অতিক্রম করা যায় না। কারারক্ষী সকল বৃত্তান্ত কুমারকে বলে। কুমার পরিণতির কথা শুনে কান্নাকাটি করে। রাজাজ্ঞা অবশ্যই পালনীয়। কুমারের জন্য দয়া ছিল কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। হাতে পায়ে বেঁধে গঙ্গাধর সাধুকে দিয়ে দেয়।

হরিষ বদনে তবে সাধু আজ্ঞা করে।
পূজার সামিগ্রি শ্রীর্ঘ্র আনহ হুজুরে ॥
ধূপ দিপ নানা সাজে পূজা আরম্ভিল।
স্নান করাই শিশু পূজাস্থানে নিল ॥
সুগন্ধি চন্দন চুয়া অঙ্গেতে মাখিয়া।
মুন্ড কাটিবারে লইয়া যায় বান্ধিয়া ॥

রাজকুমার অসহায় তার কিছুই করার নেই। হাত পা রসি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। অসহায় অবস্থায় স্রষ্টার কাছে নিবেদন করে মুক্তি পাওয়ার জন্য। পূজার জায়গায় বলি দেয়ার জন্য কুমারকে নেয়া হল। কুমার চারিদিকে অন্ধকার দেখে। এই সময় তার মনে পরে এক ঘটনা। পূর্বকালে কোন এক রাজা এক জলাধার খনন করায়। কিন্তু সেই জলাধারে জল উঠে না। তখন কৃপা ঠাকুর কর্তৃক আদিষ্ট হল-কোন এক ব্রাহ্মণ ছেলেকে রাজা নিজ হাতে বলি দিলে পানি উঠবে। কোথায় পাবে ব্রাহ্মণ ছেলে। চারিদিকে ডাক ঢোল পিটিয়ে দেয়া হল ব্রাহ্মণ ছেলের জন্য। সেই দেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করত। তার একটি ছেলে সন্তান ছিল। কিন্তু সে ছিল

Dhaka University Institutional Repository

খুব গরীব। তাই একমাত্র ছেলেটিকে রাজার কাছে টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করে। যখন বলি দেয়ার জন্য খড়গ উত্তোলন করে, তখন কৃপা ঠাকুরের আশীর্বাদে জলাধারটি পানিতে ভরে যায়। রাজকুমারের প্রতি কৃপা ঠাকুরের দয়া হয় এবং অচেতন অবস্থায় রাজকুমারকে সান্ত্বনার সুরে বলে ।

না কান্দ ২ তুমি রাজার কুমার।
সদয় হইবে প্রভু উপরে তোমার ॥

এবং কৃপা ঠাকুর আরো বলে দেয় ।

জিজ্ঞাসা করিয়া লও সাধু সওদাগরে।
জলেতে নামিলে নৌকা ছারিবা আমারে ॥

রাজকুমার কৃপা ঠাকুরের আদেশ মত গঙ্গাধর সাধুকে সব কথা বলে। সাধু বলে নৌকা নামলে পরে, তোমার কোন প্রয়োজন নাই। সাধুর কথামত আশ্বস্ত হয়ে রাজকুমার ভাল করে কোমর বেঁধে প্রভুর নাম নিয়ে নৌকায় ধাক্কা দেয়। সেই সময় দৈত্য এসে কুমারের দেহে ভর করে শক্তি বৃদ্ধি করে। ধরা মাত্রই নৌকা বিজলীর মত দ্রুত পানিতে নেমে যায়। সকলে আনন্দিত হয়ে জোবার ধ্বনি দিল। কিন্তু গঙ্গাধর সাধুর মনে কুবুদ্ধি হয়। সে কুমারকে মুক্তি না দিয়ে জেলে ভরে রাখে। কারণ তাকে দিয়ে ভবিষ্যতে অনেক কাজ হবে।

দূরদেশে বানিজ্য পথে কোথাও যদি নৌকা চড়ায় আটকে যায়। তখন তাকে দিয়ে নৌকা নামানো যাবে। কুমারকে মুক্তি দিল না। কিছুদিন পরে গঙ্গাধর সাধু তার নৌকা বহর সাঁজিয়ে বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রে ভাসে। এভাবে একাধিকক্রমে তিন বছরের মাথায় সাধুর নৌকা জঙ্গি শহরের রাজা কিশ্বর নরপতির রাজ্যে পৌঁছে। এবং সেখানে বহুত বেচাকেনা করে। সে দেশে সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে। পান করার জন্য রয়েছে জায়গায় জায়গায় শীতল পানির জলাধার। সে দেশের মেয়েরা ইন্দ্রশশির মত সুন্দরী। দাস দাসীরাও তদ্রুপ। তারা সুবর্ণের কলসে পানি তোলে। সর্বত্রই ফুলের সৌরভ বয়ে যায়। গঙ্গাধর সাধু সব ঘুরে ফিরে দেখে। হঠাৎ করে কৌতুহল বশে রাজবাড়ীর সামনে যায়। রাজবাড়ীর সৌন্দর্য দেখে আশ্চর্য হয়। আগন্তককে দেখে দারোয়ান জানতে চায় সে কেন এসেছে এবং কোথায় যাবে ও কি চায় ? গঙ্গাধর সাধু রাজায় সাথে দেখা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। সময়ান্তে রাজার সাথে দেখা করার সুযোগ আসে। রাজার কাছে সাধু তার মনোভাব ব্যক্ত করে। রাজা তার কথায় তুষ্ট হয়ে সাত লালমানিক্য উপহার দেয়। লালমানিক্য অতি মূল্যবান ধাতু। এক মানিকের মূল্য বহু টাকা। কিন্তু সাধু তো মানিক চেনে না। তাই সে মানিক নিয়ে নৌকায় আসে। রাজকুমার বসন্ত মানিক চেনে। রাজকুমার মানিক সম্পর্কে সাধুকে সতর্ক করে দেয়। যদি আরাকান (কেরিয়া) রাজা জানতে পারে মানিক্যের কথা। তাহলে সৈন্য সামন্ত নিয়ে সাধুকে হত্যা করে সব মানিক ও ধন-সম্পদ

Dhaka University Institutional Repository

লুট করে নিয়ে যাবে। বন্দীশালা থেকে রাজ কুমারকে আনা হয়-ভাল মানিক্য ও অন্ধ মানিক্য সাধুকে বেছে দেয়ার জন্য। অন্ধ মানিক মূল্যহীন তার কোন বাজার মূল্য নেই। অন্ধ মানিক নিয়ে সাধু কি করবে ? সাধু রাজাকে তিন অন্ধ মানিক ফিরত দিতে যায়।

সাত মানিক্য মহারাজা প্রসাদ আজ্ঞা হইল।
তিন মানিক্য রাজা তাথে অন্ধ কেনে দিল ॥

রাজা শুনে তো আগুন। সাধুকে বন্ধি করা হল। কেমন করে সে লাল মানিক্য অন্ধ চিনল। সাধু তো মানিক চিনে না। তাই সে সত্য কথা বলে তার নৌকায় একজন বন্দী আছে। সে অন্ধ লাল মানিক্য বেছে দিয়েছে। রাজার হুকুমে সুপালা পাঠিয়ে তাকে আনা হয়। কিশ্বর রাজা কুমারকে দেখেই অনুমান করে, সে সাধারণ ঘরের সন্তান নয়।

জকুম রাজার একটি সুন্দরী কন্যা আছে। নাম তার কাঞ্চনমালা। কাঞ্চানমালা পণ করেছে যে লাল মানিক্য চিনবে, কেবল মাত্র তাকেই স্বামী হিসাবে বরণ করবে। কন্যার ইচ্ছানুসারে ও রাজার সম্মতিতে শুভক্ষণ, শুভলগ্নে, কাঞ্চনমালা ও রাজকুমার বসন্তের বিয়ে হয়ে গেল। কন্যা সাঁজানো হল, জামাইকে বরণ করা হয়। এবার বাসরের পালা। বাসর ঘর সাঁজানো হয়। বাসর ঘরে জামাইকে নেয়া হল। কিন্তু তার মুখে কোন হাসি, চঞ্চলতা, উদ্দাম নেই। কাঞ্চমনমালা রাজকুমারের বিরসের কারণ জানতে পারে। কি করে রাজকুমার বৈরী পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়েছে, তার ধারাবাহিক বর্ণনা করে কাঞ্চনমালার কাছে। কিছুদিন সুখে থাকার পরে ভাইর কথা মনে পড়ায় ব্যাকুল হয়। কিভাবে ভাইর তালাশে যাবে, তার উপায় খুঁজতে থাকে। মহারাজ কিশ্বর নরপতির কাছে রাজকুমার বসন্তের অভিপ্রায় উপস্থাপন করা হলে তিনি বলেন।

নৌকা পথে যাইতে এখন মনে যুক্ত হয়।
দক্ষিণ পবন এবে খরতর বয় ॥
রাজা বলে শুন কন্যা বলি যে তোমার।
হিমান্তের সময় আরোহণ দিবা নৌকায় ॥

সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গের কথা ভেবে রাজা কিশ্বর বিধিনিষেধ আরোপ করলেন। কারণ এই সময় গেলে আপঘাত নিশ্চিত। কিন্তু রাজকুমারের মন খারাপ এবং বিরস বদনে গঙ্গাঘাটে যেয়ে বসে যাওয়ার উপায় খোঁজতে থাকে। একদিন সুযোগ এসে যায়। দক্ষিন পাটন থেকে গঙ্গাধার সাধু যুবরাজকে দেখে প্রমাদ গুণতে থাকে এবং কাছে এসেই উচ্চস্বরে ভাই ভাই বলে কাঁদতে থাকে। যুবরাজকে বলে সে এখন নিজ দেশে যাবে। যুবরাজ ভাই শীতের তালাশে জকুম দেশে যেতে চায়। সুযোগ মিললে আর অপেক্ষা নয়। রাজবাড়ী গিয়ে শ্বশুর শাশুড়ীর কাছে বিদায় নিতে গেলে কাঞ্চনমালাও গো ধরেছে সে স্বামীর সাথে যাবে। রাজা ও রাণী রীতিমত

Dhaka University Institutional Repository

তাজ্জব বনে যায়। তারপরও জামাতার কথার উপর কথা চলে না। কাঞ্চানমালা বিদায় নিতে গেল তখন সন্তানহারা বেদনা যেন সকলের বেদনা হয়ে দেখা দেয়।

গগনের চান্দ লুকাই উঠে পুনর্ব্বার।
আমার চান্দ গেলে ফের না আসিবে আর ॥
এ চন্দ্র হরিয়া মোর নিল কোন জন।
দারুণ রাহুতে আসি করিল গ্রহণ ॥

রাজা ও রাণী বেদনায় কাতর। তাদের বেদনায় আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই আহত। যুবরাজ ও কাঞ্চনমালা যখন বিদায় নিয়ে নৌকার উদ্দেশ্যে বের হয়। পথে চলতে কুমঙ্গল দেখে।

পন্থেতে যাইতে কুমার কুমঙ্গল দেখয়।
মনে ২ ভাবে কুমার না জানি কি হয় ॥
দক্ষিণে শৃগাল বামে সর্প যে দেখিল।
গাভীর বাছুর দেখে দুগ্ধ ছাড়ি দিল ॥

কুমঙ্গল দেখে রাজকুমারের মন উচাটন হয় এবং অন্তরালেই এক কালো মেঘের ঘনাঘটা দেখতে পায়। তবুও সব কিছু উপেক্ষা করে নৌকায় আরোহণ করে। নৌকা চলার পথে সাধু ছল করে কাঞ্চানমালার রূপ দেখে উন্মাদ হয়। তার মনে কুবুদ্ধি হয়, কি করে রাজকন্যাকে পাওয়া যায়।

নানা মতে ভাবি সাধু করিলেন্ত সার।
হস্তে গলে বান্দি ফেলি সমুদ্র মাঝার ॥
তবে একেশ্বরি কন্যা কি করিতে পারে।
লক্ষ্য না দেখিয়া তবে যাবে মোর ঘরে ॥

সাধু তার লোকজন নিয়ে যুবরাজকে ধরে রশি দিয়ে হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে। যুবরাজ ও কাঞ্চনমালার শত অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করে সমুদ্রে ফেলে দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে উপায় হিসাবে একটা বালিশ রাজকন্যা সমুদ্রে ফেলে দেয়। যুবরাজ নিক্ষিপ্ত বালিশ ধরে সমুদ্রের মাঝার ভাসে। কাঞ্চনমালা যুবরাজকে বাঁচানোর জন্য গঙ্গাদেবীর কাছে প্রার্থনা করে।

উর্ম্মি পরে তল যায় গগন পায় হাতে।
হেটেতে লাগিলে পরে বাসুকির মতে ॥

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সমুদ্রে ভাসতে থাকে। এদিকে নৌকার মধ্যে গঙ্গাধর সাধু কাঞ্চানমালাকে একাকী পেয়ে তাকে বিয়ে করার জন্য বিভিন্ন ভাবে প্রলোভন দেখাতে থাকে। রাজকন্যা তার হাত থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন উপায় খুঁজতে থাকে।

অবশেষে কাঞ্চনমালা ছয় মাসের সময় বেঁধে দেয় সাধুকে। সমুদ্রে গঙ্গী দেবী যুবরাজের সহায় হয়। অচেতন অবস্থায় সমুদ্রে ভাসতে থাকে। সাধু কাঞ্চনমালাকে নিয়ে নিজ দেশে চলে আসে। ঘাটে এসে পাল্কীতে (সুপালা) করে রাজকন্যাকে নিজ ঘরে নিয়ে আসে। কাঞ্চনমালার কথা মত তাকে আলাদা ঘর দেয়া হয়। রাজকন্যা সেখানেই থাকে এবং নিজে রেধে খায়। কুমার বট পাতার মত ভাসতে ভাসতে গঙ্গীদেবীর কৃপায় ৷

উত্তরে হিমালা নদী দক্ষিনে ক্ষির নদী।
পঞ্চমাস কুমার ভাসে নিরবধি ॥
হেনকালে কৃপা হইল কৃপার বাখান।
এখন যাইবে কুমার কুমারির স্থান ॥
জকুম নদীর কুলে এক বৃন্দাবন।
পাষান বান্দিত ঘাট অধিক নির্ম্মান ॥
সেই ঘাটে যাইয়া কুমার ঠেকিল।
বন্ধি হইতে সেই ঘাটে ঈশ্বর আনিল ॥

কুমার গঙ্গীদেবীর কৃপায় ভাসতে ভাসতে জকুম নদীর তীরে বৃন্দাবনের ঘাটে এসে পাষানের ঘাটে ঠেকে। বৃন্দাবনের বাগানে দুই-তিন বছর কোন ফুল ফুটেনি। ভ্রমর কোন গান করে নাই। কুমার বসন্ত যেই বৃন্দাবনের ঘাটে আসে, সাথে সাথে ঐ বাগানের সমস্ত গাছ ফুলে ফুলে পল্লবিত হয়ে উঠে এবং ভ্রমরের গুঞ্জনে বাগান মুখরিত হয়। মালিনী বাগানে এসে একেবারে হতবাক্‌ হয়।

মালিনীর সাথে রয়েছে সখিরা। মালিনী তার সখীদের সহ পাষাণের ঘাটে গেলে দেখতে পায় হাত পা বাঁধা অবস্থায় রাজকুমারকে। মালিনী ও সখিরা তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দেয়। কুমার চেতনা ফিরে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখে মালিনী ও তার সখিদের। সে নিজ পরিচয় দেয় এবং তাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করে। মালিনী ছিল নিঃসন্তান। তাই সে যুবরাজকে বোনের ছেলে রূপে গ্রহণ করে, তার শূণ্য হৃদয়ে পূর্ণতার পরিতৃপ্তি বোধ করে। এবং কুমার তাকে ধর্ম্মমা হিসাবে সম্বোধন করে।

রাজকুমার মালিনীর গৃহে আশ্রয় পায় এবং পুত্র স্নেহে লালিত-পালিত হয়। কিছু দিন যেতে না যেতেই সে ঐ রাজ্যের ও রাজার নাম জেনে নেয় এবং আরো জেনে নেয় যে মালিনী ঐ

Dhaka University Institutional Repository

রাজ্যের বিশিষ্ট সওদাগরের অধীনে চাকুরী করে। তার কাজ হলো রোজ ফুলের মালা রাজকন্যাকে দিয়ে আসা। মালিনী কাকে রোজ ফুলের মালা যোগান দেয় রাজকুমার তা জেনে নেয়। যুবরাজ রাজকন্যার চিন্তায় অস্থির। মালিনীর মাধ্যমে তার অবস্থান ও প্রকৃতি জানতে পায়। মালিনীর মাধ্যমেই রাজকুমার, রাজকন্যাকে অভিহিত করে তার অবস্থিতি। কাঞ্চনমালা গঙ্গাধর সাধুকে ছয় মাসের শর্ত দিয়েছে। তার পাঁচ মাস চলে যায়। সে চিন্তিত হয়ে পড়ে, কিভাবে সাধুকে নিবৃত্ত করা যায়। সাধু রোজ রোজ অস্থির হয়ে জ্বালাতন করে।

একদিকে রাজকুমারের নগরে উপস্থিতি অন্য দিকে সাধুর উৎপাত তাকে ক্রমান্বয়ে অস্থির করে তোলে। রাজকুমারীর মন আকর্ষণের জন্য সাধু বিভিন্ন আকৃতির ফুলের মালা তৈরি করার জন্য মালিনীকে আদেশ দেয়। কিন্তু মালিনী তা বানাতে অক্ষম। যদি মালিনী ব্যর্থ হয় তবে তাকে গর্দান দিতে হবে। এক সময় বিনা সুঁতার মালা গাঁথার আদেশ পায় এবং মালিনী দূর্চিন্তাগ্রস্ত। এমতাবস্থায় রাজকুমার তাকে সাহায্য করে। তখন -

১. কুমার কহিল শুন মাতা গো মালিনী।
বিনে সুঁতের মালা আমি গাঁথিবারে জানি ॥

২. হরিষে মালিনী পুষ্প সাক্ষাতে আনিল।
বিনে সুঁতে মালা কুমার গাঁথিতে লাগিল ॥

রাজকুমার মালিনীর মাধ্যমে রাজকন্যাকে চিঠি পাঠায় এবং তার অবস্থানের কথা বর্ণনা করে। মালিনী উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে। রাজকন্যা রাজকুমারের পূর্ণাঙ্গ সংবাদ পেয়ে আস্বস্ত হয়। তখন তার মনের অবস্থা ৷

জলদ গর্জন শুনি মুক্কের উল্লাস।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডি কন্যা আনন্দ বিশেষ ॥

নতুন মেঘের ডাকে ময়ূর যেমন উল্লাসে মেতে উঠে এবং নতুন পানি পেয়ে ব্যাঙ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। এই আনন্দের মধ্যেই উপ্ত হয়ে উঠে প্রতিশোধের পালা। এদিকে ছয় মাস যায় যায় পালা। হঠাৎ বুদ্ধি করে কাঞ্চনমালা সাধুকে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করতে বলে এবং দেশের রাজা ও অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিকে নিমন্ত্রন করার জন্য বলে দেয়। কারণ সে বিয়ের আসরেই বিয়ের মন্ত্র পাঠ করবে। যথারীতি নিমন্ত্রন ও বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন হয়। সভায় কন্যাকে নেওয়া জন্য এক মনোরম পাল্কী (সুপালা) তৈরি হয়। যথারিতি পাল্কী (সুপালা) তৈরি ও মনি মুক্তা দিয়া সাঁজানো হয়। তার মধ্যেই একটি গোপন কুঠুরি তৈরি করা হয়। সে গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে রাজকুমার সভায় যাবে। বিয়ের সমস্ত আয়োজন শেষ। রাজকন্যাকে পাওয়ার জন্য গঙ্গাধর সাধুর অবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

তুল্য মাংসে কুকুর যেন হয় অগ্রপান।

সেই মত হইয়াছে সাধুর পরাণ ॥

বিয়ের তারিখে নিমন্ত্রিত মেহমান সবাই এসেছে বাকি শুধু রাজকন্যা। পাল্কীতে (সুপালায়) করে রাজকন্যাকে সভায় আনা হয়। সেই সাথে গোপন কুঠুরিতে লুকিয়ে রাজকুমার আসে। দেশের রাজা এসেছে এবারে বিয়ের মন্ত্র পড়ার পালা। মন্ত্র পড়ার পূর্বেই দেশে রাজার প্রতি রাজকন্যা কিছু বলার জন্য আবেদন করেন। রাজা তাকে কথা বলার অধিকার দেয়। অধিকার পেয়েই রাজকন্যা প্রতাপ ভীমের কার্যকলাপ, রাণী ঈশ্বরীর মৃত্যু এবং দ্বিতীয় রাণীর নিষ্ঠুরতা ও পরবর্তী পর্যায়ে তাদের ভাগ্য বিপর্যয় এবং গঙ্গাধর সাধুর নিষ্ঠুরতা ও বেহায়াপানার আনুপার্বিক বর্ণনা শুনে রাজা অস্থির হয়ে পড়েন। রাজা সুস্থ্য হয়ে সৈন্যগণকে আদেশ দেয় সাধুকে বন্দি করার জন্য। এই সময় রাজকুমার গোপন কুঠুরী থেকে বের হয়ে নিজের উপস্থিতি প্রকাশ করে। দুই ভাইয়ের মিলন হয় এবং সে মিলন এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। পাল্কীতে (সুপলায়) বসে রাজকন্যা সে দৃশ্য উপভোগ করে। রাজগৃহে কাঞ্চনমালা নীত হয় কিন্তু তার সতীত্ব নিয়ে রাজকুমারের মনে সন্দেহের দানা বেঁধে উঠে। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য রাজকন্যাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে। রাজকন্যাও সে পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়।

কোটি ২ প্রণাম আমি করি সব ঠাঁই।

বিদায় দেও এবে আমি পরলোকে যাই ॥

তবে কন্যা প্রভু পদে দণ্ডবৎ হইয়া।

অনল কুণ্ডের মধ্যে পরে ঝাপ দিয়া ॥

শত শত মন কাঠ দিয়ে অগ্নিকুণ্ড সাঁজিয়ে আগুন ধরানো হয়। সেই জ্বলন্ত অগ্নির মধ্যে কাঞ্চনমালা বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে থাকে, অগ্নি তার জন্য শীতল হয়, কারণ সে সতী। বসন্ত ও শীতের অস্থিরতা দেখে রাজকন্যা প্রমাদ গুণতে থাকে। শত শত মন কাঠ পুরে গেলেও রাজকন্যার কিছুই হল না। অগ্নিকুণ্ড থেকে রাজকন্যা বেড়িয়ে আসে, অগ্নিপরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হয়। উপস্থিত সকলেই তার জয় গান গেতে থাকে এবং অনন্তকাল এ জয়গাঁথা মানব সমাজে প্রচারিত হবে।

অগ্নিপরীক্ষাকে কেন্দ্র করে রাজকুমার ও রাজকন্যার মধ্যে মান-অভিমানের পালা শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত রাজকুমার কেন এ পরীক্ষা দিয়েছে তার কৈফিয়াত তাকে দিতে হয়েছে। রাজকুমার রাজকন্যাকে বলে-

শুন প্রিয়া শাস্ত্র মত কহি যে তোমারে।

পাপ পূণ্য বিচার হয় সংসার মাঝারে ॥

ভাল কাজে ভাল হয় মন্দ হয় ছার।

Dhaka University Institutional Repository

এথাতে করিলে ভাল তথাতে নিস্তার ॥
সুজনের মন্দ হেথা খণ্ডে দিনে ২।
দুর্জ্জনের কথা সব হয় একস্থানে ॥
তোমার পরীক্ষা আমি দিলাম এ কারণ।
ইঙ্গিত করিত মোরে যত রাজাগণ ॥

লোকের অপবাদ থেকে এড়ানোর জন্য অগ্নিপরীক্ষা করা হয়েছে। সুতরাং এখন আর রাজকুমারকে সমাজে মাথা হেঁট করে চলতে হবে না।

ভীমরাজার হুকুমে যখন জল্লাদ শীত বসন্তের রক্ত এনে রাজাকে দেখিয়ে প্রমাণ করে হত্যা করা হয়েছে। তখন থেকে রাজা তাদের কথা ভুলে গেছে। একদিন রাজা প্রতাপ ভীম রাজসভায় বসে আছেন। তখন দুটি বালক আসে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্যে। ওরা দুই ভাই, বড় ভাইটি অকারণে ছোটটিকে মেরেছে। তাদেরকে দেখেই রাজার মনে শীত ও বসন্তের কথা মনে পড়ে। রাজা পুত্র হত্যার জন্য দাইকে দায়ী করে। তখন দাই রাজাকে উত্তর দেয়।

এবে দুশী কর রাজা কিসের কারণ।
পূর্ব্ব বার্ত্তা রাজা তোমার নাহিক স্মরণ ॥
আনিলা বিবাহ করি রাজার নন্দিনী।
দুই পুত্র বৈরী হইল তোমার ঘরনি ॥

দাই আসল কথা রাজাকে বলে দেয়। নতুন রাণী শ্লীলতাহানির অপবাদ দেয়। রাজা তা বিশ্বাস করেই তাদেরকে হত্যার আদেশ দেয়। সুতরাং রাজা নিজেই অবিচারী। নিজের দোষ নিজে বুঁজতে পেরে রাজা তখন বিলাপ করে।

এদিকে ঘটে গেল অন্যরূপ, রাজকুমার বসন্ত ঘুমে প্রতাপ ভীমকে অস্থির ও বিহবল অবস্থায় দেখে। পিতার এই অবস্থা স্বপ্ন দেখে। পরদিন যুবরাজ এক হাজার নৌ জাহাজ ও এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে পিতৃরাজ্যে গমন করে। আক্রমণকারীদেরকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। এবং বন্দীশালা থেকে রাজাকে মুক্ত করে। তখন পিতা পুত্রের মধ্যে মিলন হয়।

এতেক শুনিয়া রাজা তুলি লইল কোলে।
লক্ষ ২ চুম্ব দিল বদন কমলে ॥
গলে ধরি পুত্র মোর চাপি দেও কোল।
চিরকালের দুঃখ মোর খণ্ডক সকল ॥

বসন্তের মাধ্যমে শীত জকুমরাজ্যের রাজা হয়েছে তা জানতে পারে। ছোটকালে পালিত দাইমার সাথে মিলন হয়, রাজ্যের অন্যান্য লোকদের সাথে পরিচয় হয়। ভীম রাজা তার

Dhaka University Institutional Repository

পুত্র বধুকে বরণ করে। পুত্র ও পুত্র বধুর আগমণে দ্বিতীয় রাণী খুশী হইতে পারেনি। কারণ রাজপুত্রের মনে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হতে পারে, সে আশংকা দ্বিতীয় রাণী উদ্বিগ্ন ছিলেন। বৃদ্ধ রাজা তার ভুল ও দ্বিতীয় রাণীর চক্রান্ত বুঝতে পেরে বিচারের জন্য বদ্ধ পরিকর হন। রাজা রাজ কুমারকে ডেকে বলে ।

পুত্রকে ডাকিয়া কহে তোমা শত মাতা
কাটিয়া ফেলিয়া দিব এই দুষ্ট সুতা ॥
না জানি কি আমার করে আরবার।
না রাখিব হেন জন পৃথিবীর মাজার ॥

রাণীও বুঝতে পারে অন্যায় করলে তার থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। দুর্দিন একদিন দূর হবেই, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

২. প্রাচীনকালের অজ্ঞাত কবির রচিত 'শীত-বসন্ত' এর কাহিনী রেভাঃ লাল বিহারী দে মৈমনসিংহ থেকে সংগ্রহ করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে Folk Tales of Bengal –লণ্ডন থেকে প্রকাশ করেন।

কাহিনী

এক রাজার সুয়োরাণী ও দুয়োরাণী নামে দুই রাণী ছিল। সুয়োরাণীর তিন ছেলে একেবারে ছিপছিপে পাতলা, দেখতে অনেকটা পাটকাঠীর মতন। দুয়োরাণীর দুই ছেলে যেন সাক্ষাত কার্তিক। সুয়োরানী তাদেরকে আদৌ সহ্য করতে পারেন না। দুয়োরাণীকে বিতাড়নের চেষ্টা করে সফল হয়নি। একদিন গোছলের ছলে দুয়োরাণীর মাথায় একটি যাদুর বড়ি টিপিয়া দেলেন। দুয়োরাণী সাথে সাথে টিয়া পাখি হয়ে উঁড়ে যায়। সুয়োরাণী প্রচার করে দুয়োরাণী গোছলের সময় জলে ডুবে মারা গেছে। সুয়োরাণীর কথা রাজাসহ সকলেই বিশ্বাস করলেন।

শীত ও বসন্তকে সুয়োরাণী একদম সহ্য করতে পারে না। একদিন তাদের নামে রাজার কাছে নালিশ আনেল। তাঁরা তাকে অপমান করেছে। রাজা অপরাধের জন্য প্রানদণ্ড দেন। জল্লাদ দুই রাজকুমারকে নিয়ে গেলেন এক গহীন জঙ্গলে। তাদেরকে হত্যা না করে একটি শিয়াল ও একটি কুকুর মেরে রক্ত এনে দেখিয়ে বিশ্বাস অর্জন করেন।

জল্লাদ তাদেরকে গাছের বাকল পড়িয়ে পালাতে সাহায্য করে। তারা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ফিরে তৃষ্ণায় কাতর হয়। বসন্তকে এক গাছের তলায় বসিয়ে রেখে পানির তালাশে যায়। চলার পথে দেখে পায় একটি শ্বেত রাজহাতী তার দিকে ছুটে আসছে। হাতীটি শুড় দিয়ে পেচিয়ে ধরে হাওদায়ে বসিয়ে সোজা রাজদরবারের দিকে চলছে। রাজপরিষদবর্গ তাকে রাজপদে বরণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

এদিকে বসন্ত তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পথের দিক চেয়ে বসে আছে। ঠিক সেই সময় এক সন্ন্যাসী এসে অসহায় বসন্তকে আশ্রমে নিয়ে যান। বসন্ত এখন আশ্রম পালিত। দুয়োরাণী টিয়া পাখি হয়ে উঁড়তে উঁড়তে এক রাজকুমারীর হাতে ধরা পড়ে।

সুয়োরাণীর পাপে রাজ্য ছারখার হয়ে যায়। রাজা চলে যায় বনবাসে। সুয়োরাণী তার ছিপ ছিপে পাতলা ছেলেদের নিয়ে পথে বসে। যার কাছে যায় সেই দুর দুর করে তাড়িয়ে দেয়। একদিন ঘুরতে ঘুরতে রাণী সমুদ্রের পারে আসে। হঠাৎ করে সাত সমুদ্রের ঢেউ এসে রাণীর তিন ছেলেকে নিয়ে যায়। রাণী দুঃখে পাষাণে মাথা কুটে আত্মহত্যা করে।

সেই দেশের রাজকুমারীর নাম রূপবতী। তার পিতা স্বয়ংবরা সভার আয়োজন করেন। অনেক দেশের অনেক রাজপুত্ররা আসে। তখন রাজকন্যা টিয়া পাখিকে প্রশ্ন করে-কাকে সে স্বামী রূপে বরণ করবে ? টিয়া পাখি তাকে বলে দেয় সমুদ্রপারে এক হাতির কাছে গজমোতি আছে। যে গজমোতি এনে দিতে পারবে-সেই তার স্বামী হবে। স্বয়ংবরা সভায় রূপবতী গজমোতি এনে দেয়ার কথা ঘোষণা দেয়। সে আরো বলে দেয় যারা এনে দিতে বিফল হবে, তাদেরকে নফর হিসাবে বাস করতে হবে। অনেক রাজপুত্রদের নফর হতে হয়েছে।

শীত ছিল বড় রাজা। তিনি রূপবতীর ঘোষণার কথা শুনে-তাকে বন্দী করে রাজবাড়ীতে রাখে। বসন্ত সন্ন্যাসীর আশ্রমে বসে একদিন শুনতে পায় শুক ও সারির কথোপকথন। কিভাবে হাতির কাছ থেকে গজমোতি আনতে হবে, তার আনুপার্বিক বর্ণনা। রাজকুমার সন্ন্যাসীর ত্রিশুল নিয়ে যায় ক্ষীরসাগরে। সেখানে দুধবরণ হাতী জলক্রীড়ায় মেতেছিল। ত্রিশুল ছোঁয়ারবার সাথে সাথে ক্ষীরসাগর শুকিয়ে যায় আর দুধবরণ হাতীটি সোনার পদ্মে পরিণতি পায়। ঐ সোনার পদ্মের মধ্যেই ছিল গজমোতি। বসন্ত গজমোতি নিয়ে সমুদ্রের চরের বালির উপর দিয়ে আসার সময় শুনতে পায়, কারা যেন বলছে 'আমরা তোমার ভাই, আমরা মাছ হয়ে গিয়েছি, সাথে করে নিয়ে যাও। 'বসন্ত মাটি খুঁড়ে তিনটি সোনালী রঙের মাছ পেয়ে সাথে নিয়ে আসে। ঐ সোনালী মাছ তিনটি ছিল সুয়োরাণীর তিন ছেলে।

একদিন রাজা শীত গভীর জঙ্গলে শিকারে যায়। সেখানে একটি গাছের নীচে আশ্রয় নিলে পুরাণো কথা মনে পড়ে। ভাই বসন্তের কথা মনে হওয়ায় দুঃখে কাতর হয়ে পড়ে। রাজধানীতে ফিরে এসে খানাদানা ত্যাগ করে সাত দিন সাত রাত এক কামরায় বসে থাকে।

ঠিক এই সময় বসন্ত গজমোতি ও সোনালী রঙের তিনটি মাছ নিয়ে রাজার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রার্থনা করে। উপহার স্বরূপ রাজাকে তিনটি সোনালী রঙের মাছ পাঠায়। রাজা মাছগুলিকে দাসীর হাতে প্রদান করে।

Folk tales of Bengal by Rev. Lal Behari Dev. page-89 to 103.

Dhaka University Institutional Repository

দাসী যখন মাছ কুটতে যায়, তখন মাছগুলো মানুষের ন্যায় কথা বলে এবং-রাজা তাদের ভাই বলে পরিচয় দেয়। দাসী সাথে সাথে রাজার কাছে সংবাদ পৌঁছায়। রাজা উপঢৌকন প্রদানকারীকে খুঁজে দেখে সে তারই ভাই বসন্ত। তারা মাছ তিনটিকে ছুঁতেই তারা মানুষের রূপ ধারণ করে এবং পূর্বাপার সকল সংবাদ অবগত হয়।

শীত বসন্ত ও তিন ভাইয়ের মিলনে তাদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার আসে। পিতামাতার দুর্ভাগ্যের জন্য দুঃখবোধ করে। গজমোতি পেয়ে রাজকন্যা বসন্তের গলার বরমাল্য প্রদান করে। রূপবতী টিয়ার উপদেশে কৃতজ্ঞতায় হলুদ ও দুধ দিয়ে টিয়াকে নিজ হাতে গোছল করাণোর সময় যাদুর বরিটি খুলে পড়ে যায়। সাথে সাথে টিয়া পাখিটি এক সুন্দর নারীতে রূপ লাভ করে। রাজকন্যা তো হতবাক। রূপান্তরিত রাণী রাজকন্যাকে প্রবোধ দেয় সে রাজকুমার বসন্তের গর্ভধারিণী। তার কোন ভয় নেই। তারপর মাতা ও পুত্রদের মধ্যে মিলন হয়। বনবাসী রাজা তাদের সংবাদ শুনে স্বরাজ্যে ফিরে এসে সুখে দিন কাটান।

৩. বাংলার প্রাচীন যুগের অজ্ঞাত কবির রচিত "শীত-বসন্ত" কাব্যের কাহিনী, টাঙ্গাইল মহাকুমার দীঘাপাইত গ্রামের কথক পিসীমা কর্তৃক বর্ণিত কাহিনী সংগ্রহ করেন শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'ঠাকুরমার ঝুলিতে' কলিকাতা থেকে প্রকাশ করেন।

কাহিনী

এক রাজার সুয়োরাণী ও দুয়োরাণী নামে দুইজন রাণী ছিল। সুয়োরাণী পান থেকে চুন খসলেই রোজ রোজ আলাদা হয়। এভাবে দুঃখেই দুয়োরাণীর দিন কাটে। সুয়োরাণীর কোন ছেলে পেলে হয়না। দুয়োরাণী দুই ছেলে শীত ও বসন্তকে নিয়ে বেশ আনন্দেই আছে। কিন্তু এই সুখ সুয়োরাণীর সহ্য হয় না।

একদিন সুয়োরাণী ও দুয়োরাণী একত্রে নদীতে গোছল করতে যায়। গোছলের সময় সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর মাথা পরিস্কার করার জন্য ক্ষার খৈলের ছুতায় এক ঔষধের বড়ী টিপে দেয়। ফলে দুয়োরাণী সোনার টিয়ে হয়ে টিটি করতে করতে অন্য রাজ্যে উঁড়ে যায়। এদিকে সুয়োরাণী রটিয়ে দেয় দুয়োরাণী নদীতে ডুবে মারা গেছে। রাজাও বিশ্বাস করলেন তার কথা।

দুয়োরাণী সোনার টিয়া হয়ে ঐ দেশের রাজকন্যার পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়। এদিকে দিন যায়, মাস যায়, বছর গড়িয়ে সুয়োরাণীর তাল পাতার সেপাইর মত তিন ছেলে হয়। সতীনের ছেলেদের মোটেই সহ্য করতে পারে না। রাণী সতীনের ছেলেদের ক্ষতি করার জন্য তে-পথের ধূলা ছিটায়, তিন কোনে কুটা জ্বালায়, বাসি উনুনের ছাই ভাঙ্গা কুলায় করে পানিতে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। তারপর তাল পাতার সেপাইর মত তিন ছেলেকে নিয়ে হাঁড়ি

Dhaka University Institutional Repository

প্যাতিল, বাসন কোষণ ভেঙ্গে শীত-বসন্তের নামে নালিশ দেয় রাজার কাছে। সুয়োরাণীকে গালমন্দ করার দায়ে শীত-বসন্তকে হত্যার আদেশ দেয় রাজা।

জল্লাদ যথারীতি তাদেরকে নিয়ে বনে চলে যায় এবং গাছের বাকল পড়িয়ে অন্য দিকে যেতে বলে। জল্লাদ দুইটা শিয়াল কুকুর হত্যা করে রক্ত নিয়ে রাণীকে দেখায়। রাণী সেই রক্ত দিয়ে গোছল করে খিলখিল করে হাসে। তার আপদ দূর হয়েছে ভেবে।

সুয়োরাণীর পাপে রাজ্যে অশান্তি আসে। রাজা বনবাসী হন। সুয়োরাণী তার তিন ছেলে নিয়ে ভিক্ষা করে। যার দুয়ারে যায় সেই তাড়িয়ে দেয়। একদিন রাণী তিন ছেলেকে নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে যায়। ছেলেরা পানি খেতে গেলে-সমুদ্রের ঢেউ তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সুয়োরাণী দুঃখে পাথরে মাথা কুটে আত্মহত্যা করে।

বসন্ত ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যু দশায় উপনীত হয়। এমন সময় এক সন্ন্যাসী তাকে আশ্রমে নিয়ে যায়। সেই আশ্রমে শুক ও শারি বাস করে। তারা একদিন বলাবলি করছে কিভাবে ক্ষীর সাগরে গিয়ে গজমোতি আনতে হবে। বসন্ত তাদের কাছ থেকে সব শুনে সন্ন্যাসীর ঐন্দ্রজালিক ত্রিশুল নিয়ে ক্ষীর সাগরে দুধবরণ হাতীর কাছে যায় গজমোতি আনতে। ত্রিশুল নিয়ে দুধবরণ হাতির পিঠে লাফিয়ে পড়ার সাথে সাথে হাতীটি গজমোতিতে পরিণত হয়।

শীত রাজা হয়ে বসন্তের কথা একদম ভুলে গেছে। একদিন শিকারে গিয়ে তিনি সেই বৃক্ষতলায় বিশ্রাম নেয়া অবস্থায় রাজকুমার বসন্তের কথা মনে পড়ে। ভাইয়ের জন্য তার দুঃখ বাড়ে। রাজধানীতে ফিরে গিয়ে এক কামরার দরজা বন্ধ করে সাত দিন সাত রাত আহারাদি না করে কাঁটায়।

এদিকে বসন্ত গজমোতি ও সোনালী তিন মাছ নিয়ে রাজদরবারে হাজির হয়ে রাজার সাক্ষাত প্রার্থনা করে। বসন্ত রাজাকে মাছ তিনটি উপহার পাঠায়। রাজা মাছ কাটতে দাসীর হাতে দেয়। দাসী যখন মাছ কুটতে যায় সেই সময় মাছ কয়টি মানুষের মত কথা বলে উঠে। এবং পরিচয় প্রদান করে-তারা রাজার ভাই। দাসী রীতিমত আশ্চর্য হয়ে রাজাকে খবর দেয়। রাজা মাছ উপহারকারীর সন্ধানে গিয়ে পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারে। মাছগুলো ছুঁইতেই তারা মনুষ্যরূপ পায়। তাদের কাছেই শুনতে পায় সুয়োরাণী দুঃখে মরে গেছে। আর রাজা দেশান্তরী হয়েছেন।

রাজকন্যার সাজা হয় না। টিয়ে পাখি তাকে সিঁথি পাটি, আলতা কাজল, সোনার নুপুর, ময়ূর পেখম শাড়ি, শতেক নহর হীরার হার, নাকে ফুল, কানে দুল, সিঁথির মানিক এনে সাজতে বলে। আর বাকী থাকে গজমোতি।

শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার-ঠাকুরঝুলি, পৃষ্ঠা-৮৫-১১০।

Dhaka University Institutional Repository

গজমোতি পেয়ে রাজকন্যা টিয়া পাখির সাথে কথা বলে-বসন্তের গলায় বরমাল্য পড়িয়ে দেয়। টিয়ার প্রতি প্রসন্ন হয়ে রাজকন্যা কাঁচা হলুদ বাটা ও কপিলা গাইয়ের দুধ দিয়ে টিয়া পাখিকে গোছল করার সময়-তার মাথায় এঁটে থাকা বরি দুটি পতিত হয়ে এক দিব্যনারী মূর্তি ধারণ করে। রাজকন্যা হতবাক, তখন টিয়া পাখি নিজ পরিচয় প্রদান করে। শীত, বসন্ত, বৈমাত্রের ভাইয়েরা তাদের মাকে প্রণাম করে। রাজা সংবাদ শুনে ফিরে আসেন। রাজা-রাণী ও রূপবতী এবং ভাইয়েরা মিলে মিশে বাস করে।

৪. শ্রীযুত গোলাম কাদির Folk tales of Bengal থেকে "শীত-বসন্তের" কাহিনী নিয়ে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'শীত ও বসন্ত' নামে একটি পুথি রচনা করেন। এই পুথিটি আফাজ উদ্দীন আহাম্মদ কলিকাতা বটতলা থেকে প্রকাশ করেন। ড.মু. শহীদুল্লাহ ১৯২৩ -১৯২৫ সালে বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রাচীন যুগ) নামক গ্রন্থে উক্ত কাহিনী প্রকাশ করেন।

কাহিনী

এক ছিল রাজা। তার সুয়োরাণী ও দুয়োরাণী নামে দুই রাণী ছিল। সুয়োরাণীর তিন ছেলে একেবারে ছিপছিপে পাতলা, দেখতে অনেকটা পাটকাঠীর মতন। দুয়োরাণীর দুই ছেলে যেন সাক্ষাত কার্তিক। সুয়োরাণী তাদেরকে আদৌ সহ্য করতে পারে না। দুয়োরাণীকে বিতাড়নের চেষ্টা করে সফল হয়নি। একদিন গোছলের ছলে দুয়োরাণীর মাথায় একটি যাদুর বড়ি টিপে দেয়। দুয়োরাণী অমনি টিয়া পাখি হয়ে উড়ে যায়। সুয়োরাণী প্রচার করে দুয়োরাণী গোছলের সময় জলে ডুবে মারা গেছে। সুয়োরাণীর কথা রাজাসহ সকলেই বিশ্বাস করলেন।

শীত ও বসন্তকে সুয়োরাণী একদম সহ্য করতে পারে না। একদিন তাদের নামে রাজার কাছে রাণী নালিশ করে। তাঁরা তাকে অপমান করেছে। রাজা অপরাধের দণ্ড দিলেন প্রানদণ্ড। জল্লাদ দুই রাজকুমারকে নিয়ে যায় এক গহীন জঙ্গলে। তাদেরকে হত্যা না করে একটি শিয়াল ও একটি কুকুর মেরে রক্ত এনে দেখিয়ে বিশ্বাস অর্জন করলেন।

জল্লাদ তাদেরকে গাছের বাকল পড়িয়ে পালাতে সাহায্য করে। তারা জঙ্গলের মধ্যে এক গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। বসন্ত পানির তৃষ্ণায় অস্থির। শীত পানি আনার জন্য জঙ্গলের সরোবরে যায়।

ঐ দেশের নিঃসন্তান রাজা পরলোক গমন করেন। রাজা ছাড়া রাজ্য অচল। রাজ্যের লোকজন রাজহাতীর পিঠে পাটসিংহাসন উঠিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেয়। শর্ত থাকে যার কপালে 'রাজটিকা' দেখবে তাকেই রাজা বলে নির্বাচন করে নিয়ে আসবে। রাজহাতী কারো কপালে রাজটিকা দেখতে না পেয়ে জঙ্গলের সরোবরের কাছে আসে। শীতের কপালে 'রাজটিকা' দেখে

Dhaka University Institutional Repository

হাতী শুড় দিয়ে পেচিয়ে ধরে নিয়ে আসে। শীত তো কিছুই বুঝতে পারছে না, ভয়ে অস্থির। ছোট ভাই বসন্তকে নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু বনে কেউ কারো ডাক শুনে না। হাতী তাকে নিয়ে রাজ সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। রাজ্যের লোক এসে রাজারূপে তাকে বরণ করে।

এদিকে শীত কেঁদে কেঁদে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় মৃত প্রায়। জঙ্গলের ঐ পথ দিয়ে এক মুনি পথ চলতে গিয়ে দেখেন-মৃত-প্রায় এক রাজকুমার ঘুমিয়ে আছে। মুনি তাকে আশ্রমে স্থান দেয়।

শীত রাজার রাজ্য সেবায় দিন চলে যায়। বসন্তের কথা একেবারেই মনে নাই। মুনির আশ্রয় বসন্ত ফল মুল খেয়ে ভালই আছে। মুনির সেবা ও কাঠ কুটা কুড়িয়ে তার দিন চলে।

সুয়োরাণীর পাপে রাজা, রাজ্য, রাজপাট হারিয়ে বনবাসে যান। দুঃখে রাণীর দিন কেটে যায়। ঘুরতে ঘুরতে রাণী তিন ছেলে সমুদ্র পারে যায়। ঢেউ চোখের পলকে তিন ছেলেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সুয়োরাণী পাথরে মাথা কুটে মারা যায়।

রাজকন্যা রূপবতীর স্বয়ংবরা সভার আয়োজন হয়। অনেক রাজপুত্র এসভায় যোগদান করে। সোনার টিয়ার কাথামত রাজকন্যা সাজে। তবুও যেন তার সাজা হয় না। কিছু বাকী থাকে। সোনার টিয়া বলে দেয় কি কি বাকী থাকে ? বাকী থাকে গজমোতি। গজমোতি না হলে রাজকন্যা স্বয়ংবরা সভায় যাবে না। যথারীতি ঘোষণা করা হয় গজমোতি এনে দেয়ার জন্য। আর যারা এনে না দিতে পারবে তাদেরকে চাকর হতে হবে।

রাজকন্যার এই খামখেয়ালী পনের কথা শীত রাজার কানে যায়। শীত রাজা খুবই শক্তিশালী। সে তার রাজ্য আক্রমণ করে রাজকন্যাকে বন্দী করে নিয়ে আসে।

মুনির কুড়ে ঘরের কোনায় এক শুক আর এক সারী বাস করে। একদিন শুক সারীকে শুনিয়ে বলে ধবল পাহাড়ের পাদদেশে ক্ষীর সাগরে গজামোতি হাতী খেলা করে। সন্ন্যাসীর ত্রিশুল নিয়ে গেলে সে গজমোতি আনতে পারবে। বসন্ত মুনির পায়ে প্রণাম করে ত্রিশুল চেয়ে নিয়ে গজমোতি আনতে রওয়ানা হয়। বসন্ত দুধমুকুট পাহাড়ের চুড়ায় উঠে দেখে-দুধবরণ হাতী গজমোতি মাথায় নিয়ে দুধ সাগরে খেলা করছে। তখন বসন্ত ত্রিশুল হাতে নিয়ে ধবল পাহাড়ে চূড়া থেকে লাফ দিয়ে হাতীর পিঠে পড়ে। হাতীর পিঠে পড়ার সাথে সাথেই ক্ষীর সাগর শুকিয়ে যায় ; পদ্মেরবন লুকিয়ে গেল, দুধ বরণ হাতী এক সোনার পদ্মে রূপ পায়। বসন্ত সোনার পদ্ম তুলে বুকে নেয়, আর গজামোতি তুলে মাথায় রেখে রওয়ানা হয়। পথে ক্ষীর সাগরের বালুর চড়ে-কে যেন বলে আমাদের নিয়ে যাও।

বসন্ত মাটি খুঁড়তেই দেখতে পায় তিনটি সোনার মাছ। শীত হরিণ শীকারে গিয়ে বসন্তের কথা মনে পড়ে এবং বসন্ত বসন্ত বলে অস্থির হয়ে পড়ে। এদিকে বসন্ত গজমোতি নিয়ে যায় রাজকন্যার কাছে।

সেই দেশে গিয়ে শুনতে পায়-শীত রাজা তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। বসন্ত শীত রাজার দেশে যায়। শীত রাজা সাত দিন পর্যন্ত খানা -দানা বন্দ করে শুয়ে থাকে।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে গোলাম কাদির বিরচিত পুথি-'শীত-বসন্ত'

Dhaka University Institutional Repository

বসন্ত শীতরাজাকে সোনার মাছ তিনটি উপহার দেয়। দাসী যখন মাছ কুটতে যায়, তখন মাছ মানুষের মত কথা বলে। এখবর রাজার কাছে যায়। রাজা মাছ দেখতে আসে এবং মাছ কে দিয়েছে, তাকে খুঁজে পায়। অতঃপর দুভাইয়ের মিলন হয়, সোনার মাছ মানুষ্য রুপ লাভ করে। শীত ও বসন্ত সুয়োরাণীর ও তার বাবার খবর অবগত হয়।

রাজকন্যা সোনার টিয়ার সাথে কথা বলতে যায়। সোনার টিয়া এবারে বলে-'যাদু আমার এলো, কন্যা, গজমোতি নিয়া। সোনার টিয়া এবারে রাজকন্যাকে কাচাঁ হলুদ বেটে, তাকে গোছল করাতে বলে। দাসীরা যথারীতি সব কিছু সাঁজিয়ে দেয়, রাজকন্যা তাকে গোছল করাণোর সময় তার হাতের ঘষায় মাথার ঔষুধ বড়িটি খসে পড়ে যায়। বড়িটি খসে যাওয়ার সাথে সাথে সোনার টিয়া মানুষের রূপ লাভ করে। রাজকন্যা তো অবাক। সোনার টিয়া তখন-তার আসল পরিচয় ব্যক্ত করে। অতঃপর তাদের মিল হয়। বনবাস থেকে রাজাও এলো। সকলে সুখে দিন কাটাতে থাকে।

৫. উনিশ শতকের মধ্যভাগে মহাদেব প্রসাদ সিংহ হিন্দী ভাষায় 'শীত-বসন্ত' কাহিনী রচনা করেন। ড. মু. শহীদুল্লাহ ১৯২৩-১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সালকিয়া, হাওড়া থেকে উক্ত কাহিনী সংগ্রহ করেন এবং বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রাচীন যুগ) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন।

কাহিনী

মনিপুরে মহেশ্বর সিংহ রাজার রাণীর নাম ছিল প্রভাবতী। তার দুই সন্তান শীত ও বসন্ত। প্রভাবতী কিছু দিন পর মারা যায়। রাজা কিছুতেই দ্বিতীয় বিয়ে করবেন না। শেষে মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজা বিয়ে করেন এক গরীবের মেয়েকে।

নতুন রাণী শীত-বসন্তকে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু মুখে কিছু বলতেও পারছে না। সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। শীত বসত রাজবাড়ীর অঙ্গনে গেঁদ (Ball) নিয়ে খেলছিল। ঐ সময় রাণী বারান্দায় গোছল করে। হঠাৎ গেঁদ এসে রাণীর বুকে আঘাত হানে। তখন রাণী কোন কিছুই বলেনি। সে সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী নয়। খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে শয্যায় পড়ে থাকে। রাজার নিকট রাণী শীত বসন্তের নামে খারাপ ব্যবহারের নালিশ আনে। তার বাঁচার একমাত্র পথ শীত-বসন্তকে মেরে তাদের কলিজা তার ছাতিতে লাগাইলে বেঁচে যাবে নাচেৎ সে মরে যাবে। রাজা রাণীকে শান্তনা দিয়ে দরবারে এসে জল্লাদকে হুকুম দেয় শীত বসন্তকে মেরে তাদের কলিজা এনে দিতে। শীত-বসন্তের এক আশ্চর্য গুণ ছিল তারা যখন হাসত, তখন মুখ দিয়ে মানিক, আর যখন কাঁদত তখন চোখ দিয়ে মোতি ঝড়ত।

জল্লাদ শীত বসন্তকে জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে তাদেরকে হত্যা না করে একটি শিয়াল মেরে তার কলিজা এনে রাজাকে দেয়। রাজা সেই কালিজা রাণীকে দিলে বুকের ব্যাথা দূর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

একদিন রাজা বৈঠক খানায় শুয়েছিলেন। হঠাৎ তার মনে শীত-বসন্তের কথা মনে পড়ে। রাণীর চক্রান্তে পড়ে সোনার যাদুকে হারাতে হয়েছে। দুঃখে দানাপানি ছেড়ে চুপচাপ এক কামরায় পড়ে থাকেন। পুত্রশোকে অবশেষে অন্ধ হন।

শীত- বসন্ত বনের মধ্যে ঘুরে কোন পথ খুঁজে না পেয়ে রাতে একটি গাছের তলায় পাতা বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। শীত ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে ; বসন্তের চোখে ঘুম নাই। সেই গাছে এক জোড়া ময়না-ময়নী বাস করত। ময়না-ময়নীর কথাবার্তা বসন্ত শুনতে পায়। ময়নী বলছে-এখন এমন শুভ মুহূর্ত যাচ্ছে যদি কেউ তার মাংস কাঁচা খায়, তবে সে রাজা হবে। আর কেউ যদি ময়নার মাংস কাঁচা খায়, তবে সে কিছুদিন পড়ে রাজা হবে।

তাদের কথাবার্তা শুনে বসন্ত উঠে বসে এবং পাখী দুটিকে মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। তাদের মাংস না খেয়ে মরা পাখী দুটিকে রুমালে বেঁধে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে শীত, বসন্ত, ঘুম থেকে উঠিয়ে দেয়। বসন্ত শীতকে পাখীর মাংস খেতে বলে। কিন্তু শীত কাঁচা মাংস না খেয়ে কাটার আগুনে পুড়ে খায়। এমন সময় এক শিয়াল উপস্থিত হয়ে বলে-তোমাদের ভাগ্য ফিরেছিল কিন্তু তোমরা নিজেরাই খারাপ করলে। যদি কাঁচা মাংস খেতে, তবে তোমাদের দুঃখ দূর হত। একেতো শুভক্ষণ চলে গিয়েছে তার উপর কাঁটার আগুনে পুড়িয়েছ। সুতরাং তোমাদের ভাগ্যেও কাঁটা বিধছে।

তারপর তারা সেখান থেকে চলে যায়। তিন দিন চলে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তারা কাতর হয়ে পড়ে। পথ চলার আর ক্ষমতা নেই। অতঃপর তারা শহরের সন্ধান করে, শীত সেই শহরে ভিক্ষা করতে যায়। যা পাবে তা লাকড়ি দিয়ে পুড়িয়ে রেঁধে খাবে। বসন্ত যায় কাঠ কুড়াতে আর শীত যায় ভিক্ষা করতে।

সেই নগরের রাজকন্যার স্বয়ংবরা সভা চলছিল। নিয়ম অনুযায়ী একটি হাতীকে জয়মালা দিয়ে দেয়া হয়। সে যার গলায় জায়মালা পড়াবে-সেই রাজার জামাই হবে। শীত স্বয়ংবরা সভা হতে দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতেছিল। কিন্তু হাতী জয়মালা শীতের গলায় পড়িয়ে দেয়। তখন রাজা শীতকে গোছল করিয়ে জামা কাপড় পড়িয়ে রাজকন্যার সাথে বিয়ে দেন। রাজকুমারীর নাম ছিল রূপবতী।

এদিকে বসন্ত কাঠ কুড়িয়ে ভাইয়ের জন্য পথ চেয়ে বসে আছে কিন্তু তার কোন পাত্তা নেই। তখন সে সন্ধানে চলে। ঐ বাগানে এক কাঠকুড়ানী পাতা কুড়াতেছিল, সে তাকে দয়া করে নিজ বাড়ীতে নিয়ে চাকর করে রাখে।

রূপবতীর স্বয়ংবরা সভায় রাজা মাধুকর এসেছিলেন। শীতের সাথে রাজকন্যার বিয়ে হওয়ায় তিনি নাখোশ হন। রাজকন্যাকে হাত করার জন্য রাজা মাধুকর এক কুটনীকে নিয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

করে। কুটনী বিষ প্রয়োগে শীতকে হত্যা করে। গঙ্গার তীরে তাকে দাহ করা হয়। শ্রাদ্ধের দিন রাজকুমারী গঙ্গাস্নান করতে যান। কুটনী বুড়ি তাকে বিশ্রামের জন্য যাদুরখাটে একটু বসতে বলে। রাজকন্যার বসার সাথে সাথেই খাটটি আকাশে উড়ে। তখন রূপবন্তী বুঝতে পারে এই কুটনী তার স্বামীকে হত্যা করেছে। রাজকন্যা উড়ন্ত খাট থেকে লাফ দিয়ে দরিয়ায় পড়ে। স্রোতের টানে ভাটির দিকে ভেসে যায়।

এক সওদাগরের নৌকা দরিয়ার চড়ে আটকে যায়। কিছুতেই জাহাজ নড়ছে না। তখন সওদাগর মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় নরবলি দিলেই নৌকা পুনরায় চলবে। সে নরবলি দেয়ার জন্য একজন মানুষ খুঁজতে খুঁজতে কাঠকুড়ানীর বাড়ীতে উপস্থিত হয়। কাঠকুড়ানী লাখ টাকার বিনিময় বসন্তকে তার হাতে হস্তান্তর করে। কিন্তু বলি দেয়ার প্রয়োজন হল না। বসন্ত নৌকা ছুঁইতেই চলা আরম্ভ করে। সওদাগর তাকে ছেড়ে দেয়।

বসন্ত গঙ্গার ধারে ভাইয়ের খোঁজে বের হয়। কিন্তু কিছুদুর গিয়ে দেখে নদীর ধারে এক সুন্দরী নারী বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। তার হাতের আংটিতে শীতের নাম লেখা আছে। হুঁশ হলে তার মুখে শীতের মৃত্যুর খবর শুনে দুঃখ পেয়ে কাঁদতে থাকে। রাজকন্যার দুঃখ নতুন করে জেগে উঠে। সে অতিদুঃখে মারা যায়। বসন্ত অসহ্য শোকে এক গাছের উপর উঠে আত্মহত্যার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ঐ সময় এক বুড়ি তাকে খবরদারী করে। কারণ আত্মহত্যা মহাপাপ। বুড়ি তাকে তার সাথে যেতে বলে। শীতের কাছেই পৌঁছে দিবে এবং সে পুনরায় বেঁচে উঠবে।

বুড়ী বসন্তকে শীতের চিতার নিকট এনে বলে-একটি তলোয়ার দিয়ে, তার কড়ের আঙ্গুল কেটে রক্ত চিতাভস্মের উপর দিলে, শীত বেঁচে উঠবে। তার নাম ভবিষ্যৎ বলে অর্ন্তধান হয়ে যায়। সেই চিতার মধ্য থেকে শীত উঠে দাঁড়ায়। তখন দুই ভাই একখান তলোয়ার নিয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করে।

তারা চলতে চলতে সন্ধ্যা বেলা গহীন অরণ্যে চন্দন গাছের নীচে কাপড় বিছিয়ে শুইয়ে পড়ে। সেই গাছের উপর এক হাঁস ও হাঁসী থাকত। তারা খাবারের সন্ধানে বের হলে-সাপ এসে তাদের বাচ্চা খেয়ে যায়। একদিন গহীন রাতে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে দুভাইয়ের ঘুম ভাঙ্গে। তখন শীত তলোয়ার দিয়ে সাপকে দু'টুকরা করে কেটে ফেলে।

হাঁস হাঁসী ফিরে এসে তাদের বাচ্চা জীবিত দেখে বড়ই আনন্দিত হয়। তারা শীত ও বসন্তের খাবার বন হতে সংগ্রহ করে দেয়। হাঁস ও হাঁসী তাদেরকে একটি বাচ্চা দিয়ে দেয়। সাথে থাকলে অনেক বিপদ থেকে বাঁচতে পারবে। কিছুদূর গিয়েই তাদের সামনে এক সমুদ্র পড়ে। হাঁসের বাচ্চা পিঠে করে তাদের সমুদ্র পার করে দেয়। সেই সমুদ্রের ধারে হাঁসের বাচ্চা

Dhaka University Institutional Repository

তাদের জন্য একটি কুঁড়ের ঘর তৈরী করে। শীত-বসন্ত ও হাঁসের বাচ্চা মনের আনন্দে সেই কুঁড়েঘরে বাস করে।

নিকটে ছিল চক্রপুর নামে একটি শহর। দুই ভাই সেই শহরে গিয়ে জিনিসপত্র ক্রয় করে। তারা যখন হাসে তখন মানিক আর যখন কাঁদে তখন মুক্তা ঝড়ে। তাদের কোন টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় না। তারা মানিক দিয়ে নিজেদের জিনিসপত্র ক্রয় করে।

চক্রপুরের রাজা ছিলেন চক্রদত্ত, রাণী চক্রবর্তী আর রাজকুমারী ফুলবন্তী। ফুলবন্তীর ওজন ছিল এক ফুলের সমান। একদিন ফুলবন্তী আর শীতের মধ্যে চার চোখের মিলন হয়। এবং উভয়ের মধ্যে আসক্তি বেড়ে যায়। তারপর হাঁসের বাচ্চার পিঠে চড়ে শীত প্রত্যেক রাত্রে জানালা দিয়ে ফুলবন্তীর মহলে রাত কাটায়। এদিকে ফুলবন্তীর ওজন রোজ রোজ বেড়ে চলেছে। তখন রাজা ও রাণীর মনে সন্দেহ বাড়ে। তারা পাহারা বসায় চোর ধরার জন্য। এবং যে ধরে দিতে পারবে, তাকে রাজ্যের অর্ধেক দেয়া হবে-এই পুরুস্কার ঘোষণা করে।

রাজকন্যার মহলে রাতদিন কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু চোরের সাথে কারোর দেখা হয় না। একদিন ফুলবন্তীর মহলে এসে পাশা খেলতে খেলতে উভয় ঘুমিয়ে পড়ে। হাঁসের বাঁচ্চা জানালার কাছে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে। সেখানে হতে উড়ে একটি কদম গাছে গিয়ে লুকিয়ে থাকে।

অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে হাঁসের বাচ্চা না দেখে হতবুদ্ধি হয়। কি করবে ভাবছে এবং দু'জনে পরামর্শ করে। এক দাসী ঘরের মধ্যে তাদের কথাবার্তা শুনে রাণীকে খবর দেয়। চারদিক হতে পাহারাওয়ালা এসে মহল ঘিরে ফেলে। শীতকে পাকড়াও করে রাজার নিকট নিয়ে যায়। হাঁসের বাচ্চা সব কিছু দেখে বসন্তকে খবর দেয়।

এদিকে রাজা শীতের গর্দান কাটার জন্য জল্লাদকে হুকুম দেন। জল্লাদ শীতের হাত, পা, বাঁধতে থাকে। ইতিমধ্যে ফুলবন্তী হাতে তলোয়ার নিয়ে রাজসভায় হাজির হয়ে শীতকে উদ্ধার করে।

যথারীতি বসন্ত এবং হাঁসকে সভায় এনে শীতের সাথে ফুলবন্তীর বিয়ে দেয় এবং মন্ত্রীর কন্যার সাথে বসন্তের বিয়ে দেয়া হয়। রাজা শীতকে নিজের রাজ্য দিয়ে দেয়। শীত-বসন্ত পরম আনন্দে রাজ্য ভোগ করে।

এদিকে শীত বসন্তের পিতা মহেশ্বর সিংহ অন্ধ হয়ে মহাদুঃখে দিন অতিবাহিত করে। শীত-বসন্তের বিমাতা নিঃসন্তান। সে অনুতপ্ত রাতদিন কেঁদে কেঁদে কাটায়। কাঁদতে কাঁদতে সে পাগলিনী হয়।

মহাদেব প্রসাদ সিংহ বিরচিত 'শীত-বসন্ত' সালকিয়া, হাওড়া।

Dhaka University Institutional Repository

হাঁস একদিন শীত-বসন্তকে তাদের পিতার দুঃখের অবস্থার কথা জানায়। তারা শ্বশুরের আদেশ পেয়ে রথে চড়ে দেশে রওয়ানা হয়। দেশে গিয়ে বাবা মাকে প্রণাম করে। শীত বসন্তের ব্যবহারে মহেশ্বর সিংহ খুশী হয়ে রাজ্য বসন্তকে দান করে। বসন্ত মানিপুরের রাজ্য ও শীত চক্রপুরের রাজ্য রাজত্ব করে এবং সুখে তাদের দিন কাঁটতে থাকে।

৬. ঢাকা জেলার খন্দকার রিয়াজ উদ্দীন আহাম্মদ ১৯৮৮ সালে 'শীত-বসন্ত' নামে কাহিনী গদ্যাকারে প্রকাশ করেন। উক্ত কাহিনী মোঃ হাবিবুর রহমান খান ২০০২ সালে আগষ্ট মাসে ঢাকা থেকে সংগ্রহ করেন।

কাহিনী

এক দেশের এক রাজার সুয়োরাণী ও দুয়োরাণী নামে দুই রাণী ছিল। পান থেকে চুন খসলেই তাদের মধ্যে গালাগালি হত। ঘর দোরের সকল কাজ দুয়োরাণীকে করতে হত। চোখের জলে তার বুক ভাসে। শীত বসন্ত নামে তার সন্তান আছে।

সৎমা তাদের সহ্য করতে পারে না। একদিন সুয়োরাণী ও দুয়োরাণী নদীর ঘাটে গোছল করতে যায়। গোছল করার সময় সুয়োরাণী তার মাথায় একটা তাবিজ গুজে দেয়। অমনি টিয়ে হয়ে টি টি করে উড়ে যায়।

সুয়োরাণী মহলে ফিরে এসে প্রচার করে দুয়োরাণী নদীতে ডুবে মারা গেছে। সুয়োরাণীর কান্না শুনে রাজা দরবার থেকে ছুটে আসেন এবং সব শুনে তিনিও বিশ্বাস করেন। রাজা অতি কষ্টে তার কান্না থামান।

দিন যায়, শীত- বসন্তের দুঃখ বাড়তে থাকে। ওদিকে দুয়োরাণী টিয়ে হয়ে এক শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়। শিকারী টিয়াটি রাজার কাছে বিক্রয় করে। রাজা সোনার পিঞ্জরে আটকিয়ে রাখেন। এদিকে সুয়োরাণীর গর্ভে তিন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তারা হ্যাংলা ও ছিপছিপে। শীত বসন্তের জন্য সুয়োরাণী অনেক তুক তাক করে কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

একদিন সুয়োরাণী তাদের ভীষণ গালমন্দ করে। তারা ভীত হয়ে মহল থেকে বের হয়ে যায়। সুয়োরাণী রাজার কাছে তাদের নামে নালিশ করে। রাজা তাদের হত্যার আদেশ দেয়। জল্লাদ শীত -বসন্তকে বেঁধে নিয়ে নির্জন বনে চলে যায়।

জল্লাদ তাদের জামা কাপড় খুলে নিয়ে গাছের ছাল বাকল পড়িয়ে অন্য দেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। তারা যেতে যেতে এক গাছের ছায়ায় আশ্রয় নেয়। বসন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হয়। শীত বনের মধ্যে পানির তালাশে যায়। ঐ সময় সেই দেশের নিঃসন্তান রাজা মৃত্যুবরণ করেন। রাজা ছাড়া রাজ্য অচল। রাজা নির্বাচনের জন্য রাজার লোকজন হাতী ছেড়ে দেয়। যার কপালে 'রাজটিকা' আছে, তাকেই উঠিয়ে নিয়ে আসবে। রাজ্যময় ঘুরে ফিরে কারো কপালে রাজটিকা না

Dhaka University Institutional Repository

দেখে বনের মধ্যে গমন করে। বনের মধ্যে এক সরোবরে শীত পানি উঠাতেছিল। হাতী তার কপালে রাজটিকা দেখে শুড় দিয়ে পেচিয়ে ধরে রাজদবারে নিয়ে আসে। দেশের জনসাধারণ রাজারূপে তাকে বরণ করে। রাজা হয়ে শীত -বসন্তের কথা একদম ভুলে যায়।

এদিকে বসন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়ে। ঐ পথ দিয়ে এক মুনি সরোবরের দিকে যাচ্ছিলেন। বসন্তকে তার আশ্রমে নিয়ে আসেন এবং পুত্রবৎ স্নেহে লালন পালন করতে থাকেন। বসন্ত ফল মুল খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং মুনীর পূজার ফুল তুলে দেয়।

সুয়োরাণীর পাপে তাদের রাজ্য ছারখার হয়ে গোলো। রাজ্য হারিয়ে রাজা হলেন বনবাসী। সুয়োরাণী তার তিন ছেলেকে নিয়ে পথে বের হয়। এক সময় তারা লোকালয় ছেড়ে সমুদ্রের পারে আসে। সাত সাগরের ঢেউ এসে তিন ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যায়। সুয়োরাণী চিৎকার করে পাথরের সাথে মাথা কুটে কুটে মারা যায়।

ওদিকে সোনার বরণ টিয়ে আর রাজকন্যার মধ্যে স্বায়ংবরা সভা নিয়ে আলোচনা হয়। গজমোতি আনা হয়নি। গজমোতি না হলেই নয়। রাজকন্যার কথামত রাজপুত্ররা চলল সমুদ্রতীরে গজমোতি আনতে।

যে গজমোতি আনতে পারবে-তার সাথেই রাজকন্যা বিয়ে বসবে। আর যারা ব্যর্থ হবে- তাদের চাকররূপে থাকতে হবে। শীত এ সকল সংবাদ শুনে রাজকন্যাকে বন্দী করে নিয়ে আসে।

মুনির আশ্রমের কাছে এক বিরাট গাছে শুক ও শারি বাস করত। তারা বলাবলি করছে- বসন্ত রাজা হবে। সাদা পাহাড়ের নীচে ক্ষীর সাগরে সাদা হাতী খেলা করছে। সেই সাদা হাতীর মাথায় রয়েছে গজমোতি ও মনি। আর সেই দুধের পানিতে ফুটে রয়েছে হাজার হাজার সোনার ফুল। বসন্ত সব কিছু শুনে মুনির কাছ থেকে ত্রিশুল ও অনুমতি নিয়ে ভাল ভাল পোশাক পড়ে ক্ষীর সাগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বারো বছর বারো দিনে ধবল পাহাড়ের নিকট আসে।

ধবল পাহাড়ের নীচে দেখতে পায় অজস্র সোনার কমল ফুটে আছে। তাতে একটি দুধ বরণ এক হাতী খেলা করছে। তার মাথায় রয়েছে গজমোতি ও মনি। বসন্তের চাই গজমোতি ও সোনার পদ্মফুল। রাজপুত্র বসন্ত ক্ষীর পাহাড় হতে লাফ দিয়ে হাতীর পিঠে পড়ে। সোনারপদ্ম রাজপুত্রের পরিচয় জেনে নেয়। অতঃপর গজমোতি ও সোনার পদ্মফুল নিয়ে আসার পথে বালির মধ্যে থেকে কে যেন বলছে আমাদের নিয়ে যাও ?

এদিকে শিকার করতে এসে শীত রাজার মনে পড়ে বসন্তের কথা এবং তার ক্লেশ বৃদ্ধি পায়। সৈন্য সামন্তরা তাকে রাজধানীতে নিয়ে আসে।

খন্দকার রিয়াজ উদ্দীন আহাম্মদ-শীত-বসন্ত, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

রাজকুমার বসন্ত এসে জানতে পারে রাজকন্যা বন্দী শীত রাজার কারাগারে। গজমোতি ও সোনারপদ্ম নিয়ে ছুটে সেই দেশে। সেই দেশে গিয়ে রাজার খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে, রাজা তার হারানো ভাইর শোকে পাগল। সাত রাত সাত দিন ধরে দরজা খুলছে না। বসন্ত তাকে তিনটি সোনার মাছ উপহার পাঠায়। রাজা মাছ তিনটি দাসীর কাছে দেয়। দাসী কুটবার জন্য নিলে মাছেরা অমনি কথা বলে। দাসী আশ্চর্য হল এবং এ সংবাদ রাজাকে দেয়। রাজা তো মাছ সরবরাহকারীর খুঁজে হয়রান। অতঃপর তাদের ভাইয়ের মধ্যে মিলন হয়।

রূপবতীর দুঃখে দিন কাটে। টিয়েও চুপচাপ কোন কথা বলে না। টিয়ে রাজকন্যাকে গজমোতি ও সোনার পদ্মফুল আনার সংবাদ প্রদান করে। রাজকন্যা তো মহাখুশী, কপিলা গরুর দুধ ও বাটা হলুদ দিয়ে গোছল করানোর সময় দুয়োরাণীর মাথায় গোঁজা ত্যাবিজটি পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে টিয়েটি এক মানবীর আকার ধারণ করে। দুয়োরাণী খুব রূপময়ী ছিল। তার রূপে ঘর ঘর জ্বলজ্বল করছে দেখে রাজকন্যা অবাক। দুয়োরাণী রাজকন্যার কাছে পরিচয় দেয় এবং সে গজমোতি ও সোনারপদ্ম নিয়ে যে আসছে সে তারই পুত্র বসন্ত। বসন্তের সাথে রূপবতীর বিয়ে হয়। সকল সংবাদ অবগত হয়ে রাজা বনবাস থেকে ফিরে আসেন। সুখেই তাদের দিন কাটছে।

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় শীত ঘোড়া নিয়ে বের হয়। ছদ্মবেশী রাজাকে কেউ চিনতে পারেনি। জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে রাজা ঘোড়া ছুটাতে পারছে না। হঠাৎ এক চিৎকার শুনে ধীর ধীরে সেই দিকে যায় এবং দেখতে পায় কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তি এক মহিলাকে জীবন্ত কবর দেয়ার জন্য টানা হেঁচড়া করছে। রাজা এগিয়ে যায়, তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। তারপর আহত মেয়েটিকে ঘোড়ার পিঠে করে নিয়ে চিকিৎসা করা হয়। পরিচয় পায় সেও এক রাজকন্যা। তারই মামা হেমন্ত তার পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে। রাজকন্যার নাম বর্ষা। অতঃপর হেমন্তের রাজ্য দখল করে, তাকে বন্দী করে। তার শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। পাগলা হাতীর পায়ের নীচে ফেলে তাকে হত্যা করা হবে। রাজকন্যা বর্ষা অনুরোধে তাকে মুক্ত করা হয় এবং রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়। বর্ষা ও শীতের বিয়ে হয় মহাধুমধামের সাথে। তাদের আনন্দে দিন কাটে।

৭. পঞ্চদশ শতাব্দীতে অজ্ঞাত কবির রচিত 'তিলক-বসন্ত' নামে কাহিনী শ্রী চন্দ্রকুমার দে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মৈমনসিংহের রামচরণ বৈরাগী ও লোচন দাস নামক গায়েনের নিকট থেকে সংগ্রহ করেন। উক্ত কাহিনী ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করে।

কাহিনী

কোন এক দূরে উজানে বয়ে যাওয়া এক নদীর তীরে ভাট্যাল দেশে তিলক বসন্ত নামে রাজা ছিল। সুলা নামে তার এক রাণী আছে। তাদের হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, লোক

Dhaka University Institutional Repository

লস্করের অভাব নেই। এবং রাজবাড়ীতে আছে উঁচু রাজমন্দির চুড়া। কিন্তু তাঁদের অহংকার হয়। তাই পরীক্ষার জন্য করমপুরুষ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে ছলনা করতে আসে। রাত দুপুরের কালে অতিথি বেশে এসে নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা বলে। সেই সময় সকলেই ঘুমে অচেতন। ডেকে কাউকে না পেয়ে করমপুরুষ অভিশাপ দিয়ে চলে যায়।

রাজার রাজ্যপাট, খাটপালং, হাতী, ঘোড়া, লোক লস্কর, পাত্র মিত্র, সোনার মন্দিরের চূড়া ভেঙ্গে যাবে। ভাণ্ডারে হবে লক্ষ্মীশূণ্য, রাজা হবে কাঙ্গাল। স্বপ্ন দেখে রাজা রাণীকে উঠিয়ে তাদের আসন্ন বিপদের কথা বলে। অল্প দিনের মধ্যে রাজা ভিক্ষারী হল। রাজা চোখে দেখে অন্ধকার। রাণীকে তার বাপের বাড়ী চলে যেতে বলেন। কিন্তু রাণী তার স্বামীকে ছেড়ে যাবে না। পতিই তার গতি। সুখে দুঃখে তার সাথে থাকবে।

নিঃস্ব, রিক্ত, কাঙ্গাল রাজা একদিন রাণীকে নিয়ে রাজ্য ছেড়ে বনবাসী হন। বনে কাঠুরিয়াদের সাথে থাকে। কাঠুরীয়ারা সকলেই রাজা রাণীকে সাহায্য সহযোগীতা করে। এভাবে তাদের চল্লিশ দিন চলে যায়।

একদিন ধার্ম্মিক রাজা চন্দন কাঠ নিয়ে কাঠুরিয়াদের সাথে দূরের এক হাটে বিক্রয় করে কাউন চাল নিয়ে আসে। তিলক রাজা তার সাথী কাঠুরীয়াদের দাওয়াত দেয়। রাণী ছত্রিশ ব্যঞ্জন তৈরী শেষে নদীতে গোছল করতে যায়।

ঐ সময় ঐ নদীর চরে এক সাধু মহাজনের চৌদ্দ ডিঙ্গা আটকে যায়। সতী নারীর স্পর্শে নৌকা চলবে। তাই সাধু সুলা রাণীর রূপ দেখে তাকে অপহরণ করে নিয়ে আসে। সতী নারী সুলার স্পর্শে নৌকা পুনরায় চলতে থাকে। কিন্তু তারা তাকে মুক্তি না দিয়ে সাথে করে নিয়ে যায়। তখন সুলা রাণী সঙ্গী সাথীদের তার দুর্ভাগ্যের কথা রাজাকে বলতে বলে। সুলা রাণীর প্রার্থনায় ধর্ম্মঠাকুর তাকে কুষ্ঠরোগীতে পরিণত করে।

রাজা তো কিছুই জানেন না। সন্ধ্যার সময় তার অতিথীদের নিয়ে এসে সুলা রাণীকে ডাকাডাকি করে। কিন্তু কেউ সারা দেয় না। অবশেষে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সকল সংবাদ অবগত হন। রাজা সুলা রাণীর খোঁজে দেশান্তরী হন।

আর এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তার ভাণ্ডে ধন দৌলাতের অভাব নেই। রাজার আছে সাত পুত্র ও এক কন্যা। আর সেই এতই সুন্দরী যে, ত্রিভুবনে তার সমান কেউ নেই। রাজকন্যার জন্য অনেক পাত্র আসে কিন্তু তাঁর পছন্দ হয় না। একদিন রাণীর বদলে কন্যা তাঁর কাছে শীতল ভিঙ্গায় করে পানি নিয়ে আসে। রাজকন্যাকে বিয়ে দেয়ার জন্য তার টনক নড়ে।

রাজার এক নয়া মালী কাজে যোগদান করে। দেখতে শুনতে অপরূপ। সেই রাজা এখন এই রাজার দরবারে কাজ করছে নয়ামালী সেঁজে। রাজা মালী বেশে কেঁদে কেঁদে কাজ করছেন। সে জানে একদিন তার দুঃখ দূর হবে। সুলা রাণীর কোন খোঁজ পেল না। রাজা তার কাছে

ড. দীনেশ চন্দ্র সেন-পূর্ববঙ্গ গীতিকা-পৃ.৩৬৭-৪০১

Dhaka University Institutional Repository

রাজন্যাকে বিয়ে দিবে সংকল্প করে। রাজার হুকুমে রাজকন্যার সাথে তার বিয়ে হয়। রাজবাড়ীতেই ভাঙ্গা ঘরে থাকে।

মালীর সুনাম রাজপুত্রদের সহ্য হয় না। তার রাজবাড়ী থেকে দেয়া অনুদান বন্দ করে দেয়। সাতভাই দরজায় সাতাটি তালা ঝুলিয়ে দেয়। মালিরাজা ও রাজকন্যা খুব বিপদে পড়ে। তাদের দেখার কেউ নেই। তখন রাজকন্যা তার অঙ্গের সকল অলংকার ভিক্ষুককে দিয়ে বিদায় করেন। এমন সময় এক ভিক্ষাগুর বামন এসে ভিক্ষা চায়। কিন্তু দেয়ার মত কিছুই নেই। এক ভিক্ষাসুর বামন তার কাছে চক্ষু চেয়ে বসে। তখন রাজা তার চক্ষু দান করে অন্ধ হন। মালী রাজার কোন রোজগার নেই। সে অন্ধ, তার পরিবর্তে রাজকন্যা রাজবাড়ী ঝাড়ু দিয়ে খুদকুড়া নিয়ে আসে। এই তাদের পাথেয়।

মালী রাজার হরিণের গোশত খেতে ইচ্ছা করে। তাই সে শব্দবেদীবাণ নিয়ে হরিণ শীকারে যায়। কিন্তু রাজা অন্ধ। জঙ্গলে হাটতে হাটতে পায়ে মানুষের মত মনে হয়। রাণী সুলা কুষ্ঠরোগী হয়ে জঙ্গলে পড়েছিল। মালী রাজার পায়ের স্পর্শে তার কুষ্ঠ দুর হয়। বারো বছর পরে তাদের দেখা হয়। সুলা রাণী তার কাছে আনুপার্বিক বর্ণনা করে।

মালী রাজা সাতটি হরিণ শিকার করে। সেই রাজার সাত ছেলে শীকারে যায় কিন্তু কিছুই পায়নি, তখন তারা মালী রাজাকে মেরে হরিণ নিতে চাইল। মালী রাজা তাদেরকে পরাজিত করে হাতের শ্রী আংটি পুড়ে কপালে ছ্যাকা দিয়ে দেয় এবং হরিণ তাদেরকে দিয়ে দেয়। তারা দেশে ফিরে রাজকন্যার কাছে শ্রী আংটি দিয়ে বলে-মালী রাজাকে জঙ্গলের বাঘে খেয়েছে।

পবনকুমারী মালি রাজার মৃত্যুর সংবাদ শুনে খুব দুঃখ পায়। পবনকুমারী রাজ্য ত্যাগ করে এক ধোপানীর আশ্রয় থাকে। আর কাজ কর্মে দিন কাটায়। মনে তার দারুণ দুঃখ। সুলারাণী ও রাজার কাপড় চোপড় পবনকুমারী ধুয়ে ধোপানী মারফত পাঠিয়ে দেয়। সুলারাণী কাপড় খুলতেই শ্রী আংটি পেয়ে রাজাকে প্রদান করে। রাজা পাল্কী পাঠিয়ে পবনকুমারীকে নিয়ে আসেন। রাজা সকল বৃত্তান্ত শুনে মালী রাজাকে অর্ধেক রাজত্ব দান করেন।

৮. সপ্তদশ শতকে অজ্ঞাত কবির রচিত 'আলাল-দুলালের' পালা ১৩৫৮ সালে শ্রী ক্ষিতিশ চন্দ্র মৌলিক মৈমনসিংহের মনসুর বয়াতির নিকট থেকে সংগ্রহ করেন এবং ১৯৭১ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশ করেন।

কাহিনী

ব্যানাচঙ্গের দেওয়ান সোনাফর ও তার স্ত্রীর আলাল দুলাল নামে দুইটি সন্তান আছে। দেওয়ানের স্ত্রী মারা যাবার পূর্বে ওয়াধা করিয়ে যায় সে যেন দ্বিতীয় বিয়ে না করে। সতীন তার সতীনের সন্তানকে কাঁটা মনে করে।

Dhaka University Institutional Repository

ঐখানে এক দীঘির পারে এক দারাক বা হিজল জাতীয় গাছে এক জোড়া কবুতর বাস করত। কবুতরী বাসায় ডিম রেখে মারা যায়। তখন কবুতরটি (পুরুষ) অতি কষ্টে ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটায়। কিন্তু একা কইতরের পক্ষে বাচ্চা লালন পালন করা সম্ভব নয়। তখন কইতর আর একটা কইতরীকে নিয়ে জোড় বাঁধে। কইতর কোথাও গেলে কইতরীকে বাসায় রেখে যায়।

একদিন কইতরীর মনে কুবুদ্ধি হয়। পথের কাঁটা তাকে সরাতে হবে। তা না হলে এরা ভবিষ্যতে দুশমন হবে। ঠোঁটে গলা ধরে আচরিয়ে হত্যা করে জঙ্গলে ফেলে দেয়। কইতরটিকে বাসায় আসতে দেখে কান্দন জুড়ে দেয় এবং রটিয়ে দেয়-এক গিরিধনী তার বাচ্চাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে নিয়ে যায়। তাই বাচ্চা হারানোর দুঃখে সে কান্না করছে। কইতর বিস্তর দুঃখ পেল। সোনাফর দেওয়ান দুধের ছাওয়ালকে কেমন করে বাঁচাবে। সন্তানদের অমঙ্গল আশঙ্কায় সে আর বিয়ে করছে না। কিন্তু সংসার, রাজ্য সব রসাতলে যাচ্ছে। উজীর নাজিরের পরামর্শে পুনরায় বিয়ে করে।

সতীন পুত্র পথের কাঁটা। পথের কাঁটা দূর করার জন্য রাণী অপেক্ষায় থাকে। সোনাফর দেওয়ানকে শত অনুরোধ-উপরোধ করে আলাল-দুলালকে কাছে এনে রাখে। বেশ খাতির যত্ন করছে। এবং, মনে মনে ফন্দি আটে। সোনাফর দেওয়ান তার হাতে আলাল-দুলালের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়ানিতে মন দিয়েছে। এদিকে বিবি সুতার ডেকে নতুন একখানা ময়ুরপঙ্খী নৌকা তৈয়ার করায়। গোপনে জল্লাদকে ডেকে নিয়ে বিশ পুড়া জমির লোভ দেখিয়ে আলাল-দুলালকে হত্যার করার আয়োজন সম্পন্ন করে।

জল্লাদ ময়ুরপঙ্খী নৌকার কাণ্ডারী হয়ে তাদেরকে নিয়ে মাঝ দরিয়ায় যায় এবং তাদেরকে হত্যা করতে তৈরী হয়। আলাল দুলালের কান্নাকাটিতে তার মন গলে যায়। ঐ সময় বারো ডিঙ্গা সাজিয়ে এক সাধু সওদাগর ধনুয়া নদীর পারে কাজলডাঙ্গার ইরাধর বেপারীর বাড়ীতে ধান কিনতে যায়। সাধু সওদাগর তার কাছে আলাল-দুলালকে ধানের বিনিময়ে বিক্রয় করে আসে। তারা সারাদিন গরু রাখে আর দুই বেলা খায়। কষ্ট ও দুঃখে আলাল পালিয়ে এক বনের গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে।

ধনুক দরিয়ার পারে বারজঙ্গলের দেওয়ান সেকান্দার পক্ষী শিকারে জঙ্গলে এসে আলালকে দেখতে পায়। আলালকে সাথে করে বাড়ী নিয়ে আসে। সে বাড়ীর সকল কাজ মন দিয়ে সম্পন্ন করে। দেওয়ান সেকান্দার তার কাজে খুব খুশী। কোন ময়না বা মজুরী নিতে রাজী নয়। চারিদিকে আলালের সুনাম ছড়িয়ে পরে। আমিনা মমিনা নামে দেওয়ান সেকান্দারের দুই কন্যা আছে। এক কন্যা তার কাছে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত করে।

শ্রী ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক-প্রাচীন পূর্ব বঙ্গ গীতিকার পৃ. ২৫৫-৩১৬.

Dhaka University Institutional Repository

সোনাফর দেওয়ান আলাল-দুলালের গৃহত্যাগের শোকে মর্মাহত। শোকে দুঃখে তার আছে শুধু অস্থিচর্ম দ্বিতীয় রাণী তার মনের মত ঘর সংসার সাঁজিয়ে নেয়। এই সময় আলাল পাঁচশত কর্মচারী আর দুই শত সৈন্য নিয়ে বান্যাচঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করে। তখন দু'দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বান্যাচঙ্গ আলাল দখল করে। আলালের যুদ্ধ বিজয়ের সংবাদ পেয়ে দেওয়ান সেকান্দার তার কন্যা বিয়ে দেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু আলাল একা বিয়ে করতে রাজী নয়। তার ভাই দুলালকে ও তার অপর কন্যার সাথে বিয়ে দেবে।

ভাই দুলালের তালাশে আলাল রওয়ানা হয়। যেতে যেতে এক বটগাছের নীচে বিশ্রাম নেয়। সেখানে সমবেত হয়ে রাখালরা, আলাল-দুলালের গান গায়। আলাল সে গান শুনে ভারী দুঃখ অনুভব করে এবং গান রচয়িতার সন্ধান জানতে পারে। এই গান রচয়িতা আর কেউ নয়- তারই অনুজ দুলাল। তারপর আলাল ও দুলালের মিলন হয়। আলাল তাকে দেওয়ান সেকান্দারের কন্যা মমিনার বিয়ের প্রস্তাব রাখে। কিন্তু দুলাল বিবাহিত, মদিনা তার স্ত্রী, সুরুজ জামাল নামে তার একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষে তাদের ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আলাল দুলালকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তালাকনামা দিতে প্ররোচিত করে। দুলাল তালাকনামা দিয়ে দেওয়ান সেকান্দরের কন্যা মমিনাকে বিয়ে করে দেওয়াগিরি করে।

এদিকে দেওয়ানা মদিনা তালাকনামা পেয়ে বিশ্বাস করতে পারছে না। অতঃপর মদিনার ছোট ভাই ও পুত্র সুরুজ জামালকে দুলালের কাছে পাঠায়। দুলাল তাদেরকে যেতে বলে, কারণ তাদের জন্য, তার সম্মান যেতে পারে। মদিনা সকল সংবাদ শুনে বিছানায় পড়ে, খানাপানি ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুবরণ করে। হিম্মৎ ফিরে পেয়ে দুলাল একদিন রওয়ানা হয়। বাড়ীতে ঢুকতেই অমঙ্গলের আলামত দেখতে পায়

'ঘরে কান্দে কালা বিলাই গোয়ালে কান্দে গাই।
সকলিত আছে আমার পরাণের দোসর নাই ॥
মানুষের গন্ধ নাই বাড়ীর ভিতরে।
কাউয়ায় করে কা-কা চালের উপরে ॥
মদিনারে ডাক্যা মিঞা উত্তর না পায়।
তাহার লাগিয়া পরে চাইর দিকে বিচরায় ॥

মদিনার মৃত্যুর সংবাদ শুনে দুলাল খুব দুঃখ পায়। সে সব কিছু ত্যাগ করে ফকির সেজে মদিনার কবর আকড়িয়ে পড়ে থেকে মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকে।

৯. ১৫১১ শকাব্দে (১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) কবি বিশ্বেশ্বর ধর 'শীত-বসন্ত' কাব্যটি রচনা করেন। লিপিকর তারাপদ দাসের অনুলিখিত 'শীত-বসন্ত' কাব্যের পাণ্ডুলিপি খানি কুমিল্লার রামমালা লাইব্রেরী থেকে মোঃ হাবিবুর রহমান খান ২০০৩ সালে সংগ্রহ করেন।

কাহিনী

অবন্তি রাজ্যের অধিপতি সুরেস মহামতি তার শৌর্য বীর্য্যে ধরণী কাঁপে, সে পরাক্রমশালী। একদিন তিনি শিকারে বের হয়ে এক সন্ন্যাসী কর্তৃক বরলাভ করেন-তারা দুই

Dhaka University Institutional Repository

জমজ পুত্র সন্তান হবে। যথারীতি শুভদিন পাঁজি পুজি মিলিয়ে শীত -বসন্ত নাম রাখে। আস্তে আস্তে তারা বড় হতে থাকে। এবং সর্ব শাস্ত্রে সর্ব অস্ত্রে শিক্ষা লাভ করে।

রাজার মনে কোন শান্তি নেই। সকল সময় মহাদেবীর চিন্তায় রোদন করতে থাকেন। রাজ্যের নানা লোক তাকে বুঝতে থাকে। শেষে এক ব্রাহ্মণ তাকে পরিণয় করতে আদেশ প্রদান করে। কাঞ্চন দেশের রাজার কন্যার সাথে তার বিয়ে হয়। রাজা দেশে ফিরে এসে তার প্রধান মন্ত্রীকে আদেশ দিল, শীত-বসন্তকে তার হেফাজতে নিয়ে যেতে। সতীন পুত্র সতীনের কাঁটা।

এদিকে শীত-বসন্ত সর্ব শাস্ত্রে সর্ব অস্ত্রে পারদর্শী হতে থাকে। তারা কখনো রাজবাড়ীতে প্রবেশ করে না। দ্বিতীয় রাণী তাদের ইতিপূর্বে দেখে নাই। তাদের রূপ ও চেহারা সুরত দেখে রাণীর মন গলে যায়। সে তাদেরকে প্রেমিক রূপে পেতে চায়। একদিন দ্বিতীয় রাণী দাসীর মারফত সংবাদ দিয়ে শীত-বসন্তকে অন্দর মহলে ডেকে আনে। রাণী তাদের কাছে প্রেম নিবেদন করে। নচেৎ সে আত্মহত্যা করবে। রাণীর প্রস্তাব শুনে শীত বসন্ত কানে হাত চেপে ধরে। যেন কিছু শুনতে পায়নি। শীত-বসন্ত তাকে অনেক নিয়মের বাণী শুনায়। কিন্তু রাণীর মনে মদনের আগুন **দাউ দাউ** করে জ্বলে উঠে।

শীত-বসন্ত সেখান থেকে চলে যাবার পর পরই রাণী মূর্ছা যায়। সখীগণ তার মাথায় শীতল পানি ঢেলে সুস্থ করে তোলে। পুনরায় মূর্ছা যায়। সংবাদ শুনে রাজা অন্তপূরীতে আসে। এবং জানতে চায়-কেউ তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে কিনা। যদি কেউ করে থাকে, তবে তাকে উচিত শিক্ষা দিবে। রাজা তার হাত ধরে উঠায়। তখন দ্বিতীয় রাণীর মধ্যে কুবুদ্ধি হয়। বিমাতা ধর্ম মাতা পুরাণে বলেছে। কিন্তু তোমার দুই পুত্র রাজপুরীতে প্রবেশ করে শ্লীলতাহানি করতে চেয়েছে। এখন আমি আর বাঁচতে চাই না। রাজা প্রবোধ দেয়-তার উচিত বিচার করবে।

রাজা তাদেরকে পদাঘাত করে এবং রাজ্য ছেড়ে যেতে বলে। অননুপায় হয়ে তারা বনবাসে চলে যায়। রাজকুমারদ্বয়ের বনবাসে যাওয়ার সংবাদ শুনে রাজা জ্ঞান হারান। সুস্থ হয়ে রাজা বার বার বিলাপ করেন। দ্বিতীয় রাণী তারে প্রবোধ দিতে আসে। রাণী রাজাকে বলে দুষ্ট গরুর চেয়ে শূণ্য আঁতাল ভাল। এই কথা শুনে রাজা তাকে রাক্ষসী ও চণ্ডালিনী বলে গালি দেয়। বনে চলতে চলতে তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বসন্ত অরণ্যের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। শীত-বসন্তকে রেখে পানি আনতে সরোবরে যায়। সেই সরোবরে বকন নগরের রাজকন্যা মুহিনী পদ্মফুল তুলতে আসে। শীতকে দেখে তার প্রেমে পড়ে। সে তাকে বিয়ে এবং ভাই বসন্তকে ত্যাগ করতে বলে। শীত ভাইকে ত্যাগ করতে পারবে না-মুহিনী কন্যাকে জানিয়ে দেয়। মুহিনী তখন দু'ভাইয়ের মধ্যে ১২ বছরের বিচ্ছেদ হবে অভিশাপ দিয়ে সেই সরোবরের জলে প্রবেশ করে। শীত বসন্তের কাছে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

তাকে ঘোড়া নিয়ে গাছের নিকট অবস্থান করতে বলে। খাবার জোগারের জন্য শীতা রাজ্যে ভিক্ষা করতে যায়। যখন শীত নগরে প্রবেশ করে, তখন লোকজন তার চেহারা দেখে বিস্মিত হয়। রাজাদরবারে তাকে নেয়া হল।

ঐ নৃপতির শুনন্দ নামে এক কন্যা আছে। তার সাথে শীতের বিয়ে হয়। বিয়ে করার পর শীত বসন্তকে ভুলে যায়। ঘোড়া নিয়ে জঙ্গলে অপেক্ষা করছে। এমন সময় আকাশে মেঘ হয়। মেঘের ডাকে ঘোড়া চঞ্চল হয়। বসন্ত ঘোড়া ধরে রাখতে পারে না। ঘোড়ার পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে ঐ দেশের ঘোড়াশালে প্রবেশ করে। তার ঘোড়া বেঁধে ফেলে। ঐ দেশের ঘোড়ার রক্ষক তাকে 'অশ্বচোর' বলে কোতায়াল চন্দ্র দর্পের হাতে বন্দী করে দিয়ে দেয়। বসন্ত কারাগারে বসে দেবী ভগবতির স্তব করে। তার স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী তার বন্দন খুলে মুক্ত করে। মুক্ত হয়ে দেবীর পায়ে প্রণাম করে।

কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে পথ চলতে চলতে এক দেশে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেই দেশে এক ব্রাহ্মণ বাস করে। বসন্ত তার আশ্রমে স্থান নেয়। ব্রাহ্মণ মিষ্ট ব্যঞ্জন দিয়ে আহারাদি সম্পন্ন করিয়ে পরিচয় জানতে চায়। তখন বসন্ত উত্তর দেয়, যে দেশে নিয়ম নিষ্ঠ বিচার নেই সে সেই দেশের রাজার সন্তান।

ব্রাহ্মণ সব কিছু শুনে চন্দ্রকেতুর রাজার রাজ্যে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। রাজকুমার বসন্ত চন্দ্রকেতুর রাজ্যের পানে পথ চলতে থাকে। যেতে যেতে এক গহীন অরণ্যে প্রবেশ করে। সেই বনে অতি ভয়ংকর পশু পাখীর বাস। ব্রহ্মপাখি নামে এক অতিকায় দিব্যজ্ঞানের অধিকারী পাখী বসন্তকে শীত রাজা পরিচয় জানিয়ে দেয় এবং চন্দ্রকেতুর রাজ্যের অবস্থান নির্ণয় করে দেয়। তার রাজ্য সাত সমুদ্রের মাঝে একটি দ্বীপে। এক সাধুর ডিঙ্গায় চন্দ্রকেতুর রাজ্যে পৌঁছে। সেই দেশের সরোবরের তীরে যায় বসন্ত। চন্দ্রকেতুর কন্যা মুহিনীর সাথে চোখাচোখি হয়। মুহিনীর মনে মদন আঘাত হানে। সে চেতনা হাড়ায়। সখীরা মাথায় শীতল জল ঢেলে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু সে প্রলাপ বকছে। মুহিনীর জন্য স্বয়ংবরা সভার আয়োজন হয়। মুহিনী মালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সময় দেবতারা বসন্তকে সভামাঝে এনে দেয়। এবং রাজকন্যা তার গলায় মালা পরিয়ে দেয়। তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। এখন সে তার ভাইর কাছে যেতে চায়। কিন্তু রাজকন্যা বসন্তের সাথে যাবে। কন্যার যাওয়ার কথা শুনে রাণী কান্নাকাটি করে। কারণ সে সন্তান হারা হবে।অবশেষে তারা সাধুর নৌকায় যাত্রা করে।

সাধু নৌকায় বসে কুমারীর রূপ দেখে কামান্ধ হয়। যেভাবেই হক কুমারকে মেরে কুমারীকে তার ঘরে নিবে। সাধুর পরামর্শে রাজকুমারকে বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দেয়। এবং তাকে

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী রূপে বরণ করার জন্য পীড়াপিড়ি করে। মুহিনী তাকে শর্ত দিয়ে এক বৎসর অপেক্ষা করতে বলে। সাধু তাকে নিয়ে নিজ পুরিতে আসে।

এদিকে রাজকুমার বসন্ত সমুদ্রে ভেসে কম্বোজ নগরের ঘাটে আসে ও মালিনী কর্তৃক মুক্ত হয়। কম্বোজ নগরের বাগানে ফুল ফোটেনি, কোকিলও ডাকেনি। কুমার আসার সাথে ফুলে ফুলে বাগান উল্লোসিত আর ভ্রমর গুঞ্জনে মুখরিত হয়। মালিনী সাধুকে রোজ ফুলের মালা দিয়ে আসে এই তার চাকুরী।

কম্বোজ নগরের রাজা শীত। মালিনীর কাছ থেকে সকল পরিচয় জানতে পারে, মালিনী সাধুর পুরীতে বন্দী রাজকন্যাকে মালা দিয়ে আসে। একদিন মালিনী রাজকুমারকে মালা গাঁথতে দেয়। রাজকুমার এক অপূর্ব মালা গেঁথে দেয়। রাজকন্যা মালা দেখে বুঝে গেল মালিনীর আলয় রাজকুমার আছে। এ রকম মালা আর কেউ গাঁথতে পারে না। রাজকুমারী নিশ্চিত যে রাজকুমার বসন্ত মালিনীর আশ্রয় আছে। মালিনীর মারফত উভয়ের যোগাযোগ হয়।

কম্বোজ নগরে প্রতি বৎসর 'বসন্ত উৎসব' পালিত হয়। দেশের গণ্য মান্য সকলেই উপস্থিত থেকে আনন্দ উপভোগ করেন। ঐ সভায় রাজা শীত আসেন। এবং তার মনে বসন্তের কথা মনে পড়ে। রাজা চৈতন্য হারায়। তখন তার মাথায় শীতল পানি ঢেলে অনেক সেবা শুশ্রুষা করে কিন্তু কিছুতেই কিছ হয় না। রাজা শুধু বিলাপ করেন বসন্ত ,বসন্ত বলে।

তখন রাজমন্ত্রীরা সর্বত্রই ঘোষণা করে দেয়, যে রাজকুমার বসন্তকে এনে দিতে যে পারবে-তাকে প্রচুর বকশিশ দেয়া হবে। ঘোষণা শুনে মালিনী হাজির হয় এবং প্রস্তাব রাখে রাজকুমার বসন্তকে রজনী প্রভাত হলেই রাজসভায় নিয়ে আসবে। যথাসময় বসন্তকে রাজসভায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাজা তার হারানো ভাইকে পেয়ে আশস্ত হয়। রাজ্যের অন্যান্য লোকজন রাজকুমারকে দেখতে আসে।

রাজকুমার বসন্ত ঘটে যাওয়া বিষয়াবলী আনুপার্বিক ব্যক্ত করে। রাজা শুনে তো আগুন। রাজাজ্ঞায় সাধু সওদাগরকে ধরে নিয়ে এসে দোষী সাব্যস্থ করে। তার সমস্ত ধন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং সাধুকে সমুদ্রে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। কাঞ্চন নগরে শীত বসন্ত বসবাস করে। শীতের ছেলের নাম রাখা হয় শিশির কুমার আর বসন্তের ছেলের নাম রাখা হয় সারদা।

রাজা সুরসেন পুত্র শোকে অন্ধ হয়ে যায়। তারা সারদা শিশিরের হাতে রাজ্য ভার দিয়ে তার পিতার দেশে গমন করে। শীত বসন্ত রথে যাত্রা করে। পথ চলতে চলতে তারা এক গিরিবনে উপস্থিত হয়। ঐ গিরিবনে বিসুরাক্ষস নামে এক ভয়ংকর রাক্ষস বাস করে। সে মানুষের গন্ধ পেয়ে তাদের খেতে আসে। তখন শীত মহাবাণ নিক্ষেপ করে বিসুরাক্ষকে হত্যা করে। বিসুরাক্ষস ছিল শাপগ্রস্থ এক মুনি। সে পুর্নজন্ম পেয়ে শীত বসন্তকে তার অন্ধ পিতার

কবি বিশ্বেশ্বর ধর বিরচিত-শীত-বসন্ত

Dhaka University Institutional Repository

সকল সংবাদ দেয় এবং সাথে সাথে অন্ধত্ব মোচনের ঔধষ দিয়ে দেয়। অতঃপর তারা দুই সহোদর দিব্যরথে অবন্তিরাজ্যে পিতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

পিতা পুত্রের মিলন হয়। এই সময় রাজা সুরসেন পরলোকে গমন করেন। রাজ্যের লোক সকলে মিলে মৃত রাজার সৎকার করে যার যার ঘরে ফিরে যায়। অতঃপর শীত-বসন্ত রাজ্য শাসনে মনোনিবেশ করে।

১০. মধ্যযুগের অজ্ঞাত কবির রচিত 'শীত ও বসন্ত' নামে কাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মানিকগঞ্জ মহাকুমা থেকে সংগ্রহ করেন। ১৯৭৩ সালে বাংলা লোকসাহিত্য নামক গ্রন্থে চতুর্থ খণ্ডে ১৩৭৩ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশ করেন।

কাহিনী

এক ধনী সওদাগরের একটি পুত্র ছিল। পুত্রটি পৃথক এক বাড়ীতে বাস করে। একদিন একটি টুনটুনি পাখির ডিম এনে তার ঘরের মধ্যে রেখে দেয়। ডিমটি ফুটে এক সুন্দরী মেয়ের জন্ম হয়। মেয়েটি গোপনে বের হয়ে ছেলেটির খাদ্য খেয়ে পুনরায় ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। ১৬ বছর এমনি করে কেটে যায়। সওদাগর পুত্রটি এর কিছুই জানে না। কিন্তু তার খাবার কম পড়ে দেখে গোপনে অনুসন্ধান করে মেয়েটির সন্ধান পায় এবং তার রূপ দেখে তাকে বিয়ে করে। তাদের দুইটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। বড়টির নাম শীত, ছোটটির নাম বসন্ত। সময়কালে শীতের বিয়ে হয়। কিছুদিন পরে স্ত্রী মৃত্যু হয় এবং সওদাগর পুত্র পুনরায় বিয়ে করে। সৎ মা বড় ছেলেদের মোটেই সহ্য করতে পারে না এবং নানা ভাবে অত্যাচার করত।

একবার একটি ছেলে অদ্ভুত একটি মাছ নিয়ে আসে এই মাছ যে খাবে তার হাসির সঙ্গে মানিক এবং অশ্রুবিন্দুর সাথে মুক্তা ঝরবে। সওদাগর অনেক মূল্য দিয়ে উক্ত মাছ ক্রয় করে এবং স্ত্রীকে রান্না করতে বলে। শীতের স্ত্রী মাছের গুণ গুণিয়া নিজের স্বামী এবং দেবরকে ভক্ষণ করায়-এবং কিছু গহনা পত্র নিয়ে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। তারা এক গভীর অরণ্যে একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। শীত জল আনতে দূরে এক সরোবরে যায়। তার ললাটে 'রাজটিকা' দেখে সেই রাজ্যের রাজহস্তী তাকে পিঠে করে নিয়ে এবং দেশবাসী তাকে সিংহাসনে মনোনয়ন করে।

প্রতি রাত্রে সেখানকার রাজার মৃত্যু হয়। পরদিন আবার নতুন রাজার অভিষেক হয়। এর কারণ কেউ জানতে পারত না। শীত সারাদিন রাজত্ব করে রাত্রে রাণীর ঘরে আসে কিন্তু ঘুমায়নি। রাণী ঘুমিয়ে পড়ে। শীত জাগ্রত থেকে দেখতে পায় রাণীর বাম নাকের মধ্য হতে একটি সরু সুতা বের হয়ে আস্তে আস্তে তা মোটা হয়ে একটি ভয়ংকর সাপে রূপ লাভ করে এবং সাপটি শীতকে গ্রাস করতে আসে। শীত প্রস্তুত হয়েছিল। তৎক্ষনাৎ তরবারি দিয়ে সাপটিকে খণ্ড খণ্ড করে কেঁটে ফেলে। রাণী এর কিছুই জানে না। বরং রাণী স্বস্তিতে নিদ্রা যায়। সকালে

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, লোকসাহিত্য চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭৫-৩৭৬

Dhaka University Institutional Repository

শীতকে জীবিত দেখে রাজ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তারা শীতকেই স্থায়ী রাজা রূপে বরণ করে। আশ্চর্য্য এই যে, গভীর অরণ্যে স্ত্রী, পুত্র ও ভাইকে ত্যাগ করে আসার কথা তার একবারও মনে হয়নি।

এদিকে শীতকে ফিরতে না দেখে বসন্ত নদীর পাড়ে বসে কাঁদতে থাকে। এমন সময় এক বণিক নৌকায় যেতেছিল। সে নিকটে এসে দেখতে পায় বসন্তের চোখের জলে মুক্তা ঝরতেছে। সংগে সংগে তাকে জোর করে নৌকায় তুলে নিয়ে আসে। বসন্তকে হাসাইয়া মানিক এবং কাঁদাইয়া মুক্তা সংগ্রহ করে বণিক প্রচুর ধন সঞ্চয় করে। কিন্তু বসন্তের অবস্থা মৃত্যুদশায় উপনীত হয়।

স্বামী ও দেবরকে না দেখে মৃত প্রায় স্ত্রীটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই অবসরে সেই রাজ্যের কোতয়াল ছেলেটিকে চুরি করে নিয়ে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে অসহায় স্ত্রী নদীতে আত্মহত্যা করতে যায়। সেই সময় এক দয়ালু ব্রাহ্মণ তাকে তার নিজ গৃহে আশ্রয় দেয়।

কিছু কাল পরে কোতয়ালের চুরি করে আনা ছেলেটি হৃষ্ট পুষ্ট এক দূর্দান্ত যুবকে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণের বাড়ীর পাশেই তার বাস ছিল। ব্রাহ্মণের পালিত কন্যাকে দেখে যুবক মোহিত ও বিয়ে করতে চায়। তাতে ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয়। যুবকটি ভীষণ প্রকৃতির ছিল। সে মেয়েটিকে চুরি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। একদিন সে মেয়েটিকে চুরি করার জন্য ঘরের চালে উঠে। ঠিক সেই সময় দুইটি বাছুর কথা বলতেছিল। একটি বাছুর বলল এই কোটালপুত্র তার আপন মাতাকে বিবাহ করতে চাচ্ছে। এই কথা শুনে কোটালপুত্র চমকিত হল। বাছুরটি তার সঙ্গীকে শীত-বসন্তের কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করে। তা শুনে সেই যুবক তৎক্ষনাৎ রাজার কাছে গিয়ে নিজেকে রাজপুত্র বলে পরিচয় দেয় এবং সকল ঘটনা বিবৃত করে। শীত সকল কথা স্মরণ করে তারপর স্ত্রীকে আনালেন। বসন্তকে খুঁজে বের করে। আর বণিককে জীবন্ত কবর দেন। তারপর সুখে স্ত্রী, পুত্র, ভাইকে নিয়ে রাজত্ব করতে থাকেন।

১১. মধ্যযুগের অজ্ঞাত কবির রচিত 'শীত ও বসন্ত' কাহিনী। পটুয়াখালীর জেলার খেপুপাড়া নিবাসী কথক দারিকনাথ কবিরাজ কর্তৃক বর্ণিত কাহিনী মোঃ হাবিবুর রহমান খান ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সংগ্রহ করেন।

কাহিনী

চাঁদের সহরের রাজা অজয় ও রাণী মহামায়া শীত-বসন্ত নামে দুই সন্তান জন্ম দেয়। দিনে দিনে তারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে কুমির, হাঙ্গর ও ডাঙ্গার বাঘের সাথে যুদ্ধ করে। নদীর মকর তাদের দুভাইকে ভয় পায়। বাঘ, ভাল্লুক মনের ভুলেও তাদের সামনে পরে না। তারা সব সময় ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। একদিন রাজা অজয় রাণী মহামায়াকে ঘরে রেখে হরিণ শীকারে যায়। রাজা অজয় ২টি হরিণ শীকার করে। মকরের সাথে রাজকুমারদের আগুনশার নদীর মোহমায় লড়তে নামে। তাদের মধ্যে হয় ভীষণ লড়াই। লড়াইতে মকর আহত হয়ে গঙ্গায় পালায়ন করে। সমুদ্রের দিকে যেতে পারছে না। সমুদ্রের মুখ আগলে রেখেছে শীত-বসন্ত।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের অত্যাচারে নদীর ও ডাঙ্গার জন্তু জানোয়ারা অস্থির। ডাঙ্গার পশুরা তাদের রাজার কাছে শীত-বসন্তের নামে শাস্তি দেয়ার জন্য অনুরোধ করে। নচেৎ তারা অন্য বনে চলে যাবে। বনের পশু বড় শিয়াল শাস্তি দেয়ার জন্য ফন্দি আটে। রাজা অজয় বনে শীকার করতে এলে-বড় শিয়াল শাস্তি দেয়ার জন্য চাঁদের সহরে আসে। রাজপুত্রদের না পেয়ে বড় শিয়াল রাণী মহামায়াকে হত্যা করে।

এদিকে রাজা দুটি হরিণ শীকার করে চাঁদের সহরে ফিরে আসে। রাজবাড়ীতে কোন সাড়া-শব্দ নেই। সবই যেন ঘুমন্তপুরী। রাজার হতাশা বাড়ে। রাজদুয়ারে এসেই দেখতে পায় রক্ত ও বড় শিয়ালের পায়ের দাগ। রাজার বুঝতে বাকী নেই, কি হয়েছে ও ঘরে ঢুকেই রাজা দেখতে পায়, রাণী মৃত্যুদেহ অর্ধেক পড়ে আছে ; বাকী অর্ধেক বড় শিয়াল খেয়ে গেছে। রাজা মনে মনে খুব আঘাত পায়। বড় শিয়ালকে হত্যা করা চাই। রাজা এই সংকল্প করে। এদিকে শীত বসন্ত ঘরে ফিরেনি। রাজা দুঃচিন্তায় আক্রান্ত। একদিকে প্রেয়সীর মৃত্যু অন্য দিকে ছেলেদের অনুপুস্থিতির জন্য দুঃখ, রাজা দরবার ডেকে সৈন্যদের আদেশ দেয় বড়শিয়ালকে ধরে আনতে।

রাণীর অকাল মৃত্যুতে রাজা খুবই ব্যথা পায়। শীত-বসন্ত ফিরে এসে সব শুনে, খুব দুঃখ পায়। তারা মকরকে ধরার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। মকরই তাদের জন্মধাত্রীকে হত্যা করেছে। আসলে মকর ছিল অভিশাপগ্রস্থ এক মুনি। দিবক মুনির আশ্রমে একদিন মহাদেব ভিক্ষার ছলে এসে তার পূজার অর্ঘ্য চেয়ে বসে। দিবক মুনি তাকে তাড়িয়ে দেয়। তখন ভিক্ষুক বেশী মহাদেব তাকে মকর হয়ে যাওয়ার শাপ দেয়। দিবক মুনী রোজ নদীতে গোছল করে। নিত্যদিনের মত সেদিন গোছল করতে গিয়ে মকরে পরিণত হয়। দিবক মুনির দেবী ছিলেন গঙ্গীদেবী। গঙ্গীদেবী সমুদ্রে বাস করে না। সে গঙ্গা যমুনা মেঘনার ত্রিমোহনায় বাস করে। মকররূপী দিবক মুনী ত্রিবেনীর উদ্দেশ্যে গঙ্গায় ছুটে আসে।

গঙ্গীদেবী ও মহামায়ার সাথে ছিল মিতালী। তারা একে অপরকে না দেখে থাকতে পারে না। গঙ্গীদেবী সেদিন স্তবে ছিলেন, মহামায়ার হত হওয়ার সংবাদ পায়নি।

এদিকে বড় শিয়াল অজয় রাজার সৈন্যদের তাড়া খেয়ে জঙ্গল ছেড়ে পাহাড়ে আসে। পাহাড়ে সৈন্যদের তীর বৃষ্টিতে টিকতে না পেরে গঙ্গী দেবীর স্মরণাপন্ন হয়। গঙ্গীদেবী বড় শিয়ালকে আশ্রয় দেয়।

সৈন্যরা বড় শিয়ালকে না পেয়ে রাজধানীতে ফিরে যায় এবং রাজাকে সকল সংবাদ অবহিত করে। রাজা তো রেগে মেগে একেবারে আগুন। যে ভাবেই হক বড় শিয়ালকে ধরে নিয়ে আসতে হবে। রাজা তার ধনুবাণ, অগ্নিবাণ ও বৃষ্টিবাণ নিয়ে তৈরী হয়।

এদিকে মকরকে ধরার জন্য শীত ও বসন্ত ত্রিবেনীতে গমন করে। মকরকে ধরতে হবে এবং তারা মাতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নিবে। মকর গঙ্গীদেবীর আশ্রয়লাভ করে।

শীত ও বসন্ত এবং রাজা অজয় তার সেনা সামন্ত নিয়ে গঙ্গীদেবীর আস্তানা ঘিরে ফেলে। শীত-বসন্ত বড় শিয়ালের লেজ কেটে ফেলে। পিতা পুত্রের আক্রমণে গঙ্গাদেবী ভয় পায়। মহামায়াকে বাঁচিয়ে দিতে হবে তা না হলে উপায় নেই। গঙ্গীদেবী ধ্যান করলেন কিন্তু কোন কুল কিনারা পেলেন না। কারণ বড় শিয়াল রাণীর অর্ধেক দেহ খেয়ে ফেলছে। দেবতার সভায় মন্ত্রনা বসে কিন্তু মহামায়াকে পুনরায় জীবিত করা যাবে না। তখন দেবী বড় শিয়ালকে একখানা যাদুর

Dhaka University Institutional Repository

শাড়ী পড়তে দেয় ও অহল্যা নামক মোদক পান করায়। বড় শিয়াল সাথে সাথে মহামায়ার রূপ ধারণ করে।

গঙ্গীদেবী ও অজয় রাজার সাথে সন্ধি হয়। যদি সে মহামায়াকে জীবিতাবস্থায় ফেরত পায় তবে সে তার সেনা-সামন্ত নিয়ে চাঁদের শহর ফিরে যাবে এবং মকর অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভ করে।

চুক্তি মোতাবেক দেবী মহামায়াকে রাজার হাতে দিয়ে দেয়। রাজা রাণীকে পেয়ে রাজকুমার ও সেনা সামন্ত নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। রাণীর রান্না বান্না পূর্বের মত তৃপ্তিদায়ক নয়। রাজাও কিছু বলেন না-কারণ এতবড় একটা বিপদ বয়ে গেছে তার উপর। শীত-বসন্তকে কাছে ডাকে না। রাণী যখন একাকী থাকে তখন সে শিয়ালের মত 'হুককা হুয়া' ডাকে। একদিন রাজা বলে সে এমন করছে কেন-রাণী উত্তর দেয়-সে গান করছে।

রাণীরূপী বড় শিয়াল মনে মনে থাকে, লেজ কাটার শাস্তি শীত-বসন্তকে পেতেই হবে। রাজকুমারদ্বয় যেমনি ছিল বিভিন্ন অস্ত্রে পরদর্শী, তেমনি ছিল বলশালী।

একদিন শীত ও বসন্ত নিরবে বসে আছে। তাদের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। রাজ সৈন্যরাও কেউ ছিল না। রাজা রাজকার্যে দরবারে ছিল। রাণী মোদক পান করে তার স্বরূপে ফিরে গিয়ে রাজকুমারদ্বয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রাজকুমারদ্বয় শিয়াল দেখে ভীত হয়। শীত আক্রান্ত তখন বসন্ত বড় শিয়ালকে আক্রমণ করে। অনেকক্ষণ শীত ও বসন্তের সাথে বড় শিয়ালের লড়াই চলে। দাসী দেখে রাজাকে সংবাদ দেয়। রাজা সেনা সামন্ত নিয়ে ঘিরে ফেলে। বসন্ত ছিল খুব শক্তিশালী। সে বড়শিয়ালের জিহবা টেনে ছিড়ে ফেলে। শীত বড় শিয়ালের চক্ষু-উপরে ফেলে। বড় শিয়াল পরাস্ত হয়।

রাজা ছুটে এসে খাণ্ডা দিয়ে আঘাত করতেই বড় শিয়াল রাণীর যে যে অংশ খেয়েছিল-তা বমি করে ফেলে। বড় শিয়াল অককা পায়। রাণীর মৃতদেহ নিয়ে শশ্মানে সৎকার করে ঘরে ফিরে।

বড় শিয়ালের চামড়া তোলে একটা বড় ঢোল বানানো হয়। ক্ষোভে রাজপুত্ররা লাঠি দিয়ে ঢোলে আঘাত করে। তখন বড় শিয়ালরূপী ঢোল মহামায়া, মহামায়া বলে চিৎকার করে। আজীবন বড় শিয়ালকে এই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এবারে তারা গঙ্গীদেবীকে ধরে নিয়ে আসে। মকর সকল কথা ফাঁস করে দেয়। বিচারে দেবীর শাস্তি হয়-রাজা তার নাক ও চুল কেটে দেয়, মাথায় ঘোল ঢেলে রাজ্যময় ঘুরিয়ে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেয়। এই ঘটনার পর থেকে প্রতি বছর অভিশাপ স্বরূপ গঙ্গীদেবীর বিগ্রহ নদীতে বিসর্জন দেওয়ার রীতি চালু হয়। রাজা অজয় শীত বসন্তকে নিয়ে রাজবাড়ীতে ফিরে এসে রাজত্ব করতে থাকেন।

মোঃ হাবিবুর রহমান খান সংগৃহীত-শীত-বসন্ত

Dhaka University Institutional Repository

রেভা ঃ লাল বিহারী দে কর্তৃক সংগৃহীত 'শীত-বসন্ত' কাহিনীর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ

ক) এক রাজার সুয়োরাণী ও দুয়োরাণী নামে দুই রাণী ছিল।

খ) সুয়োরাণীর পাটকাঠীর মত ছিপছিপে তিন ছেলে আর দুয়োরাণীর কার্তিকের মত দুই ছেলে।

গ) সুয়ো-দুয়োরাণীকে সহ্য করতে পারে না। একদিন গোছলের ছলে সুয়োরাণীর মাথায় একটি 'যাদুর বড়ি' টিপে দিলে টিয়ে পাখী হয়ে উড়ে যায়। সুয়োরাণী প্রচার করে সে জলে ডুবে মারা গেছে।

ঘ) সুয়োরাণী সতীনের ছেলে শীত-বসন্তকে সহ্য করতে পারে না। তাই তাদের নামে তাকে অপমান করেছে বলে রাজার কাছে নালিশ করে। রাজা অপরাধের শাস্তি দেয় প্রাণদণ্ড।

ঙ) জল্লাদ তাদের হত্যা না করে একটি শিয়াল ও একটি কুকুর হত্যা করে তার রক্ত এনে শীত-বসন্তের রক্ত বলে রাজা ও রাণীকে দেখায়।

চ) জল্লাদ গাছের বাকল পড়িয়ে তাদেরকে পালাতে সাহায্য করে।

ছ) পথ চলতে গিয়ে বসন্ত পিপাসিত হলে, শীত তার জন্য সরোবরে পানি আনতে যায়। তখন একটি শ্বেত হস্তী তাকে ধরে নিয়ে সিংহাসনে বসায়। রাজ্যের সকলেই তাকে রাজা রূপে বরণ করে।

জ) বসন্ত বনে অসহায় অবস্থায় এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে আশ্রয় লাভ করে।

ঝ) সুয়োরাণীর পাপে রাজ্য ছারখার হয়ে যায়। রাজা হন বনবাসী, সুয়োরাণী তিন ছেলে নিয়ে পথে বসে। একদিন তারা ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের পারে গেলে, সাত সমুদ্রের ঢেউ এসে সুয়োরাণীর তিন ছেলেকে নিয়ে যায়। সুয়োরাণী দুঃখে পাথরে মাথা কুটে মারা যায়।

ঞ) সেই রাজ্যে রাজকন্যার স্বয়ংবরা সভা চলছে। রাজকন্যা অনেক সাঁজে তবুও যেন তার সাঁজা হয় না। টিয়ে পাখি তখন তাকে গজমোতির কথা বলে। রাজকন্যা সভায় ঘোষণা করে, যে গজমোতি আনতে পারবে সেই তার স্বামী হবে। যারা ব্যর্থ হবে, তারা দাস হয়ে থাকবে।

ট) সন্ন্যাসীর আশ্রমের পাশে শুক ও সারির বাস। তারা একদিন বলাবলি করছে কোথা থেকে এবং কিভাবে ক্ষীর সাগরে গিয়ে দুধবরণ হাতীর কাছ থেকে গজমোতি আনতে হবে।

ঠ) বসন্ত একদিন সন্ন্যাসীর ঐন্দ্রজালিক ত্রিশুল নিয়ে গজমোতি নিয়ে আসে।

ড) শীত রাজা রাজকন্যা রূপবতীর অন্যায় দাবীকে বরদাস্ত করতে না পেরে তাকে বন্দী করে।

ঢ) বসন্ত গজমোতি নিয়ে আসার সময় মাটি খুড়ে তিনটি সোনালী রঙের মাছ নিয়ে আসে। ঐ মাছ তিনটি ছিল সুয়োরাণীর তিন ছেলে।

ণ) শীত রাজা হরিণ শীকারে গিয়ে বসন্তের কথা মনে করে তার দুঃখবোধ প্রবল হয় এবং আহারাদি ত্যাগ করে সাত দিন ঘরের দরজায় খিল দিয়ে থাকে।

ত) রূপবতীকে পাবার জন্য বসন্ত গজমোতি নিয়ে এসে জানতে পারে, সে শীত রাজার বন্দী, বসন্ত সোনালী মাছ তিনটিকে রাজাকে উপহার পাঠায়। রাজা মাছ কয়টিকে দাসীর কাছে কুটতে পাঠায়। দাসী যখন মাছ কুটবে তখন মাছগুলো মানুষের মত কথা বলে উঠে।

থ) শীত রাজা মাছ সরবরাহকারীকে খুঁজে পায়। অতঃপর শীত ও বসন্তের মধ্যে মিলন হয়। শীত-বসন্ত মাছ কয়টিকে ছুঁইতে তারা মানুষের রূপ লাভ করে এবং পিতা-মাতা ও রাজ্যের সংবাদ বর্ণনা করে।

দ) রূপবতী গজমোতির নিয়ে আসার সংবাদ টিয়ের মুখে শুনে কৃতজ্ঞতায় কালো গরুর দুধ ও হলুদ দিয়ে। টিয়েকে গোছল করানোর সময় তার হাতের ঘষায় 'যাদুর বড়ি' খুলে পড়ে যায়। তখন টিয়ে পাখী এক দিব্য নারী মূর্তি ধারণ করে এবং গজমোতি আনয়নকারী বসন্ত তারাই সন্তান বলে পরিচয় দেয়।

ধ) রূপবতী বসন্তের গলায় বরমালা দিয়ে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। অতঃপর মাতা, পুত্র-বধুর মিলন হয়। রাজা সংবাদ শুনে বনবাস থেকে ফিরে আসেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রেভাঃ লাল বিহারী দে সংগৃহীত 'শীত-বসন্ত' কাহিনীর সাথে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'ঠাকুরমার ঝুলির' শীত-বসন্ত কাহিনীর বৈসাদৃশ্য নিম্নরূপ

ক) সুয়োরাণী ও দুয়োরাণীর মধ্যে পান থেকে চুন খসলেই রোজ রোজ আলাদা হয়। সুয়োরাণীর এখন পর্যন্ত কোন সন্তানাদি হয়নি। সুয়োরাণীর নাদুষ-নুদুষ দুই ছেলে। সতীনের সন্তানকে তার আদৌ সহ্য হয় না।

খ) একদিন গোছল করাবার সময় মাথা পরীস্কারের জন্য ক্ষার-খৈলের ছুতায় দুয়োরাণী মাথায় সুয়োরাণী এক 'ঔষধের বড়ি' টিপে দেয়। সাথে সাথে দুয়োরাণী সোনার টিয়ে হয়ে অন্য রাজ্যে উড়ে যায়। সোনার টিয়ে সেই দেশের রাজকন্যার সোনার পিঞ্জরে বন্দী হয়।

গ) দিন,মাস,অনেক বছর গড়িয়ে সুয়োরাণীর তালপাতার মত লিকলিকে তিন সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সুয়োরাণী শীত ও বসন্তকে 'যাদুটোনা' করে। তেপথের ধুলা ছিটায়, তিন কোনার উনুনে কুটা জ্বালিয়ে বাসী ছাই ভাঙ্গা কুলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের কিছুই হল না। তাই একদিন রাণী হাড়ি পাতিল, বাসন-কোষণ ভেঙ্গে শীত-বসন্তের নামে রাজার কাছে অভিযোগ দায়ের করে, তারা তাকে গালমন্দ করেছে।

ঘ) রাজা বিচারে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়। জল্লাদ তাদের হত্যা না করে গাছের বাকল পড়িয়ে অন্যদিকে যেতে বলে এবং দুইটা শিয়াল কুকুর হত্যা করে রক্ত এনে রাণীকে দেয়, রাণী সেই রক্ত দিয়া স্নান করে খিল খিল করে হেসে সেই তিন ছেলেকে নিয়ে খেতে বসে।

ঙ) পানি তোলা অবস্থায় একটি শ্বেতহস্থী শীতের কপালে 'রাজটিকা' দেখে ধরে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

চ) বসন্ত এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে থাকে। বনের পাখীরা রাতে সেই আশ্রমে সন্ন্যাসীর উপদেশ ও শাস্ত্রের বাণী শুনতে আসে।

ছ) রাজকন্যার সাঁজনে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন তার হিসেব টিয়ে পাখি দেয়-সিঁথি পাঠি, আলতা কাজল, সোনার নুপুর, ময়ুরপেখম শাড়ী, শতেক নহর হীরার হার, নাকে ফুল, কানে দুল, সিঁথির মানিক, তারপর বাকী থাকে গজমোতি।

জ) মুনির ত্রিশূল, শিমুল গাছের কাপড়-চোপড় আর রাজমুকুট নিয়ে বার বছর তের দিনে 'দুধ মুকুটে' ধবল পাহাড়ে যায়। সেখানে পদ্মফুলের মধ্যে দুধবরণ হাতী দুধের জল ছিটিয়ে খেলা করছে। বসন্ত লাফ দিয়ে হাতীর পিঠে পড়ার সাথে সাথে ক্ষীর সাগর শুকিয়ে যায়, পদ্মের বন লুকিয়ে পড়ে, দুধ বরণ হাতী এক পদ্ম ফুলে পরিণত হয়।

ঝ) রাজকন্যা কপিলা গরুর দুধ ও কাঁচা হলুদ দিয়ে টিয়েকে গোছল করাণোর সময় ঔষধের বড়ি খুলে পড়ে যায় এবং সাথে সাথে চারিদিক আলো করে দুয়োরাণীতে পরিণত হলেন।

শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংগৃহীত ১৯০২ সালে ঠাকুরমার ঝুলিতে প্রকাশিত শীত-বসন্তে কাহিনীর সাথে গোলাম কাদিরের শীত-বসন্তের কাহিনী বৈসাদৃশ্য নিম্নরূপ

ক) রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসন খালি। রাজা নিঃসন্তান থাকার রাজা নির্বাচন করতে পারছে না। রাজহাতীর পিঠে পাটসিংহাসন উঠিয়ে দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। শর্ত থাকে যার কপালে 'রাজটিকা' দেখবে, তাকে রাজারূপে মনোনয়ন করবে।

খ) বসন্ত এক মুনীর আশ্রমে আশ্রয়লাভ করে।

গ) হলুদ দিয়ে টিয়া পাখীকে রাজকন্যা গোছল করায়।

রেভাঃ লাল বিহারী দে, শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, গোলাম কাদিরের শীত-বসন্তের কাহিনীর সাথে উনিশ শতকের মধ্যভাগে রচিত মহাদেব প্রসাদ সিংহের শীত বসন্তের কাহিনীর বৈসাদৃশ্য নিম্নরূপ

ক) মনিপুরের রাজা মহেশ্বর সিংহের রাণী ছিলেন প্রভাবতী। তাদেরই সন্তান শীত-বসন্ত। কিছু দিন পরে রাণী শীত-বসন্তকে রেখে মারা যায় এবং রাজাকে পুনঃ বিয়ে করতে নিষেধ করে যান। মন্ত্রীদের পরামর্শে রাজা এক গরীবের মেয়েকে বিয়ে করেন।

খ) শীত-বসন্ত গেঁদে (Ball) নিয়ে খেলতেছিল, বারান্দায় গোছলরত অবস্থায় রাণীর বুকে আঘাত হানে। রাণী তাদের বিরুদ্ধে রাজার কাছে খারাপ ব্যবহারের অভিযোগ আনে এবং দাবী করে তাদের হত্যা করে কলিজা এনে তার ছাতিতে লাগালে সে ভাল হয়ে যাবে নচেৎ সে বাঁচবে না। জল্লাদ তাদের হত্যা না করে একটি শিয়াল মেরে তার কলিজা এনে রাণীকে দিলে রাণীর রোগ ভাল হয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ) শীত-বসন্ত আশ্চর্য গুণ ছিল তারা যখন হাসে ও কাঁদে তখন তাদের মুখ ও চোখ দিয়ে মানিক মুক্তা ঝড়ে।

ঘ) রাজা পুত্র শোকে অন্ধ হয়ে যায়।

ঙ) বনে এক জোড়া ময়না-ময়নীর মুখে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের কথা বসন্ত শুনতে পায়।

চ) একটি শিয়াল শীতকে উপদেশ ও ভাগ্যে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার কথা বলে।

ছ) বসন্ত যায় লাকরি কুড়াতে, শীত যায় ভিক্ষা করতে এবং হাতি তাকে স্বয়ংবরা সভায় জয়মালা পরিয়ে দেয়।

জ) বসন্ত পাতা কুড়াতে গেলে এক কাঠকুরাণী তাকে চাকর করে রাখে এবং এক সওদাগরের কাছে নরবলির জন্য এক লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে, কিন্তু বসন্ত নৌকা ছুঁইতেই পানিতে নেমে যায়। নরবলির প্রয়োজন হয়নি, সে মুক্তি পায়।

ঝ) রাজা মাধুকরের ষড়যন্ত্র। কুটনী বুড়ী কর্তৃক দুধে বিষ প্রয়োগে শীতকে হত্যা এবং যাদুর খাটে রাজকন্যা রূপবতীকে হরণ করে নেয়ার সময় লাফ দিয়া দরিয়ায় পড়ে ভাসতে ভাসতে এক চরে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকে। রাজকুমার বসন্ত ভাইয়ের খোঁজে সেই চরে গিয়ে রূপবতীর হাতের আংটিতে শীতের নাম অংকিত দেখতে পায়। রাজকন্যা ও বসন্তের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হয়। দুঃখে রাজকন্যা মৃত্যুবরণ তরে, রাজকুমার আত্মহত্যা করার জন্য একটি গাছে উঠে। তখন এক বুড়ী তাকে আত্মহত্যা করতে নিষেধ করে। বুড়ীর পরামর্শে তলোয়ার দিয়ে হাতের আঙ্গুল কেটে তার রক্ত শীতের চিতাভস্মের উপরে দিলে শীত জীবিত হয়ে উঠে।

ঞ) শীত-বসন্ত চলতে চলতে গহীন বনে এক গাছের নীচে ঘুমিয়ে পড়ে। ঐ গাছে এক জোড়া হাঁস-হাঁসী বাস করে। হাঁস-হাঁসী বাসা থেকে খাদ্যের সন্ধানে গেলে-সাপ এসে তাদের বাচ্চা খেয়ে যায়। শীত-বসন্ত ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠে বসে এবং তলোয়ার দিয়ে সাপকে কেটে দু'ভাগ করে। বাচ্চা জীবিত পেয়ে হাঁস-হাঁসী দারুণ খুশী এবং তাদেরকে একটা বাচ্চা দিয়ে দেয়।

শীত-বসন্ত হাঁসের বাচ্চার পিঠে চড়ে সমুদ্র পাড় হয়ে চক্রপুর রাজ্যে যায়। হাঁসের বাচ্চা তাদের জন্য একটা কুড়ে ঘর তৈরী করে। তিনজনে আনন্দে দিন কাটায়।ঐ দেশের রাজকন্যা ফুলবন্তীর সাথে শীতের প্রণয় হয়। ফুলবন্তীর ওজন এক ফুলের সমান। হাঁসের বাচ্চার পিঠে চড়ে রোজ ফুলবন্তীর মহলে রাত কাটায়। রোজ রোজ রাজকন্যার ওজন বেরে যায়। তা রাজা ও রাণীর চোখে পড়ে। একদিক শীত ধরা পড়ে।

বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড হয়। রাজকন্যা ফুলবন্তী তলোয়ার নিয়ে তাকে উদ্ধার করে। অতঃপর ফুলবন্তীর সাথে শীতের এবাং মন্ত্রী কন্যার সাথে বসন্তের বিয়ে হয়। হাঁসের বাচ্চার মুখে তাদের পিতার অন্ধ হওয়ার সংবাদ শুনে সেখানে যায়। তার পিতার অন্ধত্ব মোচন হয়, রাণী তার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতকার্যের জন্য অনুতপ্ত, অতঃপর দুই ভাই মনিপুরের ও চক্রপুরের রাজ্য শাসন করে সুখে দিন কাটায়।

উপরোক্ত চারটি কাহিনীর সাথে খন্দকার রিয়াজউদ্দীন আহম্মদের শীত-বসন্ত কাহিনীর বৈসাদৃশ্য

(ক) খন্দকার রিয়াজদ্দীন আহেম্মদের 'শীত-বসন্ত' কাহিনীর সাথে শ্রী দক্ষীণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলির শীত-বসন্ত কাহিনীর সাথে হুবহু মিল রয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু এখানে-একটা উপ-কাহিনী যুক্ত হয়েছে।

(খ) শীত রাজা একটি সন্ধ্যায় ঘোড়ায় চড়ে প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য বহুদূরে চলে যায়। রাজা পথ হারিয়ে এক গহীন জঙ্গলে প্রবেশ করে। সেই জঙ্গলে চারজন সশস্ত্র ব্যক্তি একটা মেয়েকে জীবন্ত কবর দেয়ার জন্য টানা হ্যাচড়া করছে। শীত রাজা দেখতে পেয়ে অগ্রসর হলে, সশস্ত্র ব্যক্তিরা ভয়ে পলায়ণ করে। সে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলে। তারপর তার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে, শীত রাজা হেমন্তের রাজ্য আক্রমণ করে অধিকার করে। বিচারে রাজা হত্যার দায়ে হেমন্তের মৃত্যুদণ্ড হয়। অবশেষে রাজকন্যা বর্ষা তাকে মাফ করে দেয়। শীত রাজার সাথে রাজকন্যা বর্ষার বিয়ে হয়।

উপরে উল্লেখিত পাঁচটি কাহিনীর সাথে শ্রী চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত 'তিলক বসন্তের' বৈসাদৃশ্য নিম্নরূপ

ক. কোন এক নদীর তীরে ভ্যাটাল দেশে রাজা তিলক বসন্ত ও রাণী সুলা বাস করতেন। তাদের কোন কিছুরই অভাব ছিল না। এ নিয়ে তাদের অহংকারের অভাব নেই। করমপুরুষ পরীক্ষার ছলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেজে অভিশাপ দিয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যে তারা ভিক্ষুক হয় এবং বনবাসে কাঠুরীয়াদের সাথে থাকে। রাজা কাঠ বিক্রয় করে দিন অহিবাহিত করে।

খ. একদিন রাজা তিলক বসন্ত তার কাঠুরিয়া বন্ধুদের দাওয়াত দেয়। রাণী কাউন চালের ভাত ও ছত্রিশ ব্যঞ্জন তৈরী শেষে নদীতে গোছলে যায়। ঐ সময় এক সাধু সওদাগর কর্তৃক অপহৃত হন। রাজা সকল সংবাদ শুনে ঐ স্থান ত্যাগ করে রাণীর খোঁজে বের হয়। রাণীর আরাধনায় করমপুরুষ তাকে কুষ্ঠরোগীতে পরিণত করে। সাধু তাকে এক বনের পাশে ত্যাগ করে চলে যায়।

গ. রাজা রাণীর খোঁজে অন্য এক রাজ্যে চলে যায়। এবং সেখানকার রাজার অধীনে মালীর চাকুরী গ্রহণ করে। ঐ দেশের সবাই তাকে মালিরাজা নামে ডাকে।

ঘ. রাজকন্যা পবনকুমারীর সাথে মালি রাজার বিয়ে হয়। রাজকুমারেরা তাকে আদৌ সহ্য করতে পারে না। তারা দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়। মালি রাজা ও পবনকুমারীর খুব কষ্টে দিন চলে। একদিন এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চায়, পবনকুমারী তার সমস্ত অলংকার দিয়ে দেয়। পুনরায় আর

Dhaka University Institutional Repository

এক ভিক্ষাসুর বামন এসে ভিক্ষা চায়। কিন্তু তাদের দেয়ার কিছুই নেই। তখন সে রাজার কাছে চক্ষু ভিক্ষা চায়। রাজা কাটারী দিয়ে তা তুলে দিয়ে অন্ধ হন।

ঙ. অন্ধ মালিরাজার হরিণের গোস্ত খেতে ইচ্ছা হয়। শব্দভেদীবাণ নিয়ে শীকার যায়। রাজা সাতটি হরিণ শীকার করে। সাত রাজা কুমার শীকারে গিয়ে কিছু পায়নি। তারা রাজাকে হত্যা করে হরিণ নিতে চায়। যুদ্ধে তারা পরাস্ত হলে-হাতের আংটি গরম করে তাদের কপালে ছ্যাকা দিয়ে ছেড়ে দেয়। তারা দেশে ফিরে পবনকুমারীকে হাতের আংটি দেখিয়ে বলে, মালি রাজাকে বনের বাঘে খেয়েছে। মনের দুঃখে পবনকুমারী দেশ ত্যাগ করে এক ধোপানীয় আশ্রয়ে থাকে।

চ. অন্ধ রাজার পায়ের স্পর্শে সতী সুলা কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হয়ে স্বামীকে নিয়ে ঘর বাঁধে। তাদের কাপড় চোপড় ধোপানী কেঁচে দিত। রাজার কাপড়-চোপড় পবনকুমারী ঠিক পেয়ে তার আংটি গুজে দেয়। সুলা রাণী তার আংটি পেয়ে রাজাকে দেয়। রাজা পাল্কী পাঠিয়ে পবনকুমারীকে সেই বাড়ী থেকে আনিয়ে একত্রে বসবাস করেন। রাজা মালি রাজার সকল বৃত্তান্ত শুনে রাজ্যের অর্ধেক রাজত্ব দান করেন।

উপরে বর্ণিত ছড়াটি 'শীত-বসন্তের কাহিনীর সাথে মৈমসিংহ থেকে সংগৃহীত ক্ষীতিষ চন্দ্র মৌলিকের আলাল-দুলাল বা দেওয়ানা মদিনার পার্থক্য

ক. ব্যানাচঙ্গের দেওয়ান ও তার স্ত্রীর আলাল-দুলাল নামে দুটি সন্তান আছে। মারা যাবার পূর্বে বলে যায় যেন সে পুনরায় বিয়ে না করে। উজীর নাজীরের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত দেওয়ান বিয়ে করে।

খ. ঐখানে এক দীঘির পারে দারাক গাছে এক জোড়া কইতর বাস করত। কইতরী বাসায় দুটি ডিম রেখে মারা যায়। কইতর বহু কষ্ট করে ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটায়। কিন্তু একা কইতরের পক্ষে বাচ্চা লালন-পালন করা সম্ভব নয় ভেবে, সে আর এক কইতরীকে নিয়ে জোড় বাঁধে। কিন্তু কইতরী তার সতীনের সন্তানদের সহ্য করতে পারে না।

গ. একদিন কইতর খাবারের সন্ধানে গেলে-কইতরী গলায় ধরে আচরিয়ে বাচ্চা দুটোকে মেরে জঙ্গলে ফেলে দেয়। কইতরকে ফিরতে দেখে কইতরী কান্না আরম্ভ করে। এক গিরিধনী তার হত্যা করে নিয়ে গেছে তা প্রকাশ করে। কইতর খুব দুঃখ পেল।

ঘ. দেওয়ানের স্ত্রী অনেক বলে কয়ে আলাল-দুলালকে বাড়ীতে এনে আদর যত্ন করে। একদিন সে একখানা ময়ূরপঙ্খী নৌকা তৈয়ার করে। জল্লাদের সাথে গোপনে ২০ পুরা জমির বিনিময় আলাল দুলালকে হত্যার পরিকল্পনা করে। জল্লাদ ময়ূরপঙ্খী নৌকায় আলাল-দুলালকে নিয়ে মাঝ দরিয়ায় হত্যা করার জন্য যায়। তাদের কান্নাকাটিতে জল্লাদ এক ধানের ব্যাপারীর কাছে বিক্রয় করে। ধানের ব্যাপারী কাজলডাঙ্গার ইরাদর ব্যাপারীর কাছে আলাল-দুলালকে ধানের বিনিময়ে বিক্রী করে। তারা দু'বেলা পেট পুড়ে খায় এবং গরু রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. কষ্টে আলাল একদিন পালিয়ে যায় বনে। সেই বনে বার জঙ্গলের দেওয়ান সেকান্দার পাখী শীকার করতে এসে আলালকে পেয়ে বাড়ী নিয়ে আসে। তার বাড়ীতে আলাল বিনা বেতনে কাজ করে। চারিদিকে তার সুনাম ছরিয়ে পরে। আলাল একদিন পাঁচশত কর্মচারী ও দুইশত সৈন্য নিয়ে ব্যানাচঙ্গ দখল করে। দেওয়ান সেকান্দার খুব খুশী হয়ে মেয়ে আমিনাকে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব রাখে। তার দুই মেয়ে আমিনা ও সখিনা। আলাল তার ভাই দুলালকে খোঁজতে যায়।

চ. দুলাল বিবাহিত, মদিনা তার স্ত্রী ও সুরুজ জামাল নামে এক সন্তান আছে। আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে আলাল-দুলালকে দিয়ে মদিনাকে তালাক দেয়ায়। তালাক পেয়ে মদিনা তার ছেলে ও ভাইকে পাঠায় কাজলভাঙ্গার দুলালের কাছে। সুস্থ মানসিক অবস্থায় দুলাল ফিরে আসে এবং মদিনাকে না পেয়ে কবর আকড়িয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে।

উপরে উল্লেখিত কাহিনী সমূহের সাথে ১৫১১ শকাব্দে (১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) কবি বিশ্বেশর ধরের রচিত 'শীত-বসন্ত' কাব্যের কাহিনীর বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ

ক. অবন্তিরাজ্যের রাজা সুরসেন ও রাণী মহাদেবী। একদিন রাজা শীকার করতে গিয়ে সন্ন্যাসী কর্তৃক বরলাভ করেন তার দুটি জমজ সন্তান হবে। রাণী মহাদেবী কিছুদিন পর মারা যান।

খ. রাজার সময় ও দিন কাটছে না। রাজা শেষে এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কাঞ্চন নগরের রাজকন্যাকে বিয়ে করেন।

গ. শীত-বসন্তের বয়স বার বছর হয়। তারা সকল বিদ্যা ও সকল অস্ত্রে শিক্ষালাভ করে। একদিন তারা রাজার পিছনে পিছনে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করে। রাণী ইতিপূর্বে তাদেরকে দেখেনি। শীত-বসন্তের চেহারা-সুরত দেখে রাণী প্রেম নিবেদন করে। শীত-বসন্ত রাণীর আবেদনকে প্রত্যাখান করে।

ঘ. রাণী প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাজার কাছে শীত-বসন্তের নামে তার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানীর অভিযোগ দায়ের করে। রাজা তাদেরকে পদাঘাত করে এবং বনবাসে যেতে বলে। রাজকুমারদ্বয় বনবাসে চলে যায়। রাজা তাদের বনবাসের সংবাদ শুনে অন্ধ হয়ে যায়।

ঙ. বনে পথ চলতে চলতে তারা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। শীত বড় সে বসন্তের জন্য পানি আনতে সরোবরের কাছে যায়। সেই সরোবরে রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা মুহিনী পদ্মফুল তুলতে আসে। সে শীতকে দেখে মুগ্ধ হয় ও প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু মুহিনী ব্যর্থ হয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বার বছরের বিচ্ছেদের অভিশাপ দেয়।

চ. শীত ও বসন্ত ক্ষুধার্ত। বসন্ত ঘোড়া নিয়ে দাড়িয়ে থাকে আর শীত পার্শ্ববর্তী খীজা নগরে ভিক্ষা করতে যায়। নগরে প্রবেশ করার সাথে সাথে রাজা তাকে লোক পাঠিয়ে রাজবাড়ীতে নিয়ে যায়। রাজকন্যা শুনন্দার সাথে বিয়ে হয়। শীত,বসন্তের কথা একদম ভুলে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ছ. বসন্ত ঘোড়া নিয়ে গহীন বনে অপেক্ষায় আছে। সেই সময় আকাশে মেঘ হয় এবং মেঘে মেঘে ঘর্ষণ হয়। সেই ঘর্ষণ (গর্জন) শুনে ঘোড়া চঞ্চল হয়। বসন্ত ঘোড়া ধরে রাখতে পারে না। ঘোড়া ছুটে সেই দেশের রাজার আস্তাবলে প্রবেশ করে। বসন্ত সেখানে গেলে তাকে 'ঘোড়া চোর' অপবাদে বন্দী করে। বন্দী হয়ে রাজকুমার বসন্ত দেবী ভগবতীর স্মরণাপন্ন হলে, সে কারাগার থেকে মুক্ত পায়।

জ. বসন্ত পথ চলতে চলতে এক ব্রাহ্মণের অতিথ্য গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ তাকে চন্দ্রকেতুর রাজ্যে যাওয়ার জন্য উপদেশ দেয়।

ঝ. বসন্ত পথ চলতে চলতে এক নগরীর অরণ্যে উপস্থিত হয়। সেই বনে দিব্যজ্ঞানের অধিকারী এক ব্রহ্মপাখী চন্দ্রকেতুর রাজ্যের খবর বলে। বসন্ত ব্রহ্মপাখীর কথামত এক সাধুর সওদাগরের সাথে চন্দ্রকেতুর রাজ্যে উপস্থিত হয়।

ঞ. চন্দ্রকেতুর রাজা মুহিনী কন্যার সাথে তার বিয়ে হয়। বিয়ে শেষে বসন্ত তার ভাই শীতের কাছে যাওয়ার জন্য সাধুর সাথে গমন করে। সাধু রাজকন্যার রূপে মোহিত। তাকে পাবার জন্য রাজকুমার বসন্তকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে রাজকন্যাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসে।

ট. রাজকুমার ভেসে কম্বোজ নগরে এসে মালিনী কর্তৃক মুক্ত হয়। মালিনীর কাজ ছিল রোজ সকালে ফুলের মালা সাধুর আলয় বন্দী রাজকন্যাকে দিয়ে আসা। ফুলের মালা গাঁথায় মাধ্যমে মুহিনী বুঝে নেয় রাজপুত্র এসেছে এবং তাদের মধ্যে মালিনীর মারফত যোগাযোগ হয়।

ঠ. সেই দেশে 'বসন্ত উৎসব' হয়। দেশের গন্যমান্য সকলেই সেই মেলায় অংশ গ্রহণ করে। রাজা শীত সেখানে যায় এবং ভাই বসন্তের কথা মনে পড়ে। সেখানে ঘোষণা করা হয়, সে তার ভাই বসন্তকে এসে দিতে পারবে তাকে পুরুস্কৃত করা হবে। মালিনী ঘোষণা শুনে উপস্থিত হয়ে ওয়াধা করে আগামী দিন ভোরে রাজকুমার বসন্তকে হাজির করবে।

ড. শীত-বসন্তের মধ্যে মিলন হয়। ইতি পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনা বর্ণনা করে। রাজা সাধুকে বন্দী করে। বিচারে তাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শীত-বসন্তের দুই সন্তান হয় শারদ-শিশির নামে।

ঢ. শীত-বসন্ত শারদ শিশিরের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে অবন্তি রাজ্যে গমন করে। গিরিবনে এক বিসুরাক্ষস তাদের আক্রমণে করে। শীত মহাবাণ নিক্ষেপ করে বিসুরাক্ষসকে হত্যা করে। কিন্তু বিসুরাক্ষস ছিল এক অভিশাপগ্রস্ত মুনি। সে অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের পিতার অন্ধত্বের ঔষধ তৈরী করে দেয়। রাজা সুরসেনের অন্ধত্ব দুর হয়। কিছুদিন পরে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। রাজার মৃতদেহ সৎকার করে শীত-বসন্ত পরমসুখে রাজত্ব করে।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বোল্লোখিত কাহিনীগুলোর সাথে ড. আশুতোষ ভট্টচার্যের সংগৃহীত মধ্যযুগের অজ্ঞাত কবির রচিত 'শীত-বসন্ত' কাহিনীর বৈসাদৃশ্য নিম্নরূপ

ক. এক সওদাগরের একটি পুত্র ছিল। সে পৃথক বাড়ীতে বাস করত।

খ. একদিন এক টুনটুনি তার ঘরে এক ডিম রেখে যায়। ঐ ডিম ফুটে এক সুন্দরী মেয়ের জন্ম হয়। মেয়েটি গোপনে ঘর থেকে বের হয়ে ছেলেটির খাবার খেয়ে যেত। এভাবে বারো বছর চলে যায়।

গ. খাদ্যে সংকট পড়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মেয়েটির খোঁজ পায়। তার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে ছেলেটি তাকে বিয়ে করে। কিছুদিন পরে তাদের শীত-বসন্ত নামে দুটি সন্তান হয় এবং মেয়েটি মারা যায়।

ঘ. সওদাগর পুত্রটি পুনরায় বিয়ে করে। সৎমা শীত-বসন্তের প্রতি খুব অত্যাচার করে।

ঙ. একবার একটি ছেলে অদ্ভুত মাছ নিয়ে আসে। এই মাছ যে খাবে তার হাসি ও অশ্রুবিন্দুর সাথে মানিক ও মুক্তা ঝরবে। শীতের স্ত্রী মাছের গুণ গুণে বের করে নিজের স্বামী ও দেবরকে ভক্ষণ করিয়ে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী ছেড়ে বনে আশ্রয় নেয়।

চ. বনে শীতের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পথ চলতে গিয়ে তারা পিপাসায় কাতর হলে শীত পানি সংগ্রহে যায়। রাজহাতী তার কপালে 'রাজটিকা' দেখে ধরে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। ঐ রাজ্যের নিয়ম ছিল প্রতি রাতে রাজার মৃত্যু হয়। পরদিন আবার নতুন রাজার অভিষেক অনুষ্ঠান হত। রাতে রাণী ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু শীত ঘুমায়নি। গভীর রাতে শীত দেখতে পায় রাণীর নাক দিয়ে চিকন সুতা বের হয়ে ক্রমান্বয়ে তা মোটা হয়ে সাপে পরিণত হয়। শীত তলোয়ার দিয়ে সেই সাপ কেটে কুটে মেরে ফেলে। পরদিন লোকজন শীতরাজাকে জীবিত দেখে আনন্দিত হয়।

ছ. বসন্ত ভাইয়ের খোঁজে নদীর পারে গিয়ে কাঁদতে থাকে। সেই সময় এক সওদাগর দেখতে পায় বসন্তের অশ্রুবিন্দুর সাথে মুক্তা ঝরে, তখন সওদাগর তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। বসন্তকে কাঁদাইয়া হাসাইয়া সওদাগর প্রভূত ধন সঞ্চয় করে। কিন্তু বসন্তের অবস্থা মৃতপ্রায়।

জ. স্বামী ও দেবর কে হারিয়ে মৃত প্রায় স্ত্রীটি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে। ঐ দেশের কোতোয়াল স্ত্রীটির পুত্রটিকে চুরি করে নিয়ে আসে। স্ত্রীটিকে এক ব্রাহ্মণ নিজ কন্যারূপে স্থান দেয়। কোতোয়ালের পুত্রটি খুবই দুর্দান্ত হয়ে উঠে এবং ব্রাহ্মণের পালিত কন্যাকে উত্ত্যক্ত করে। ব্রাহ্মণ কোতয়ালকে তার পুত্রসহ তাড়িয়ে দেয়।

ঝ. পুত্রটি খুবই ভীষণ দুষ্ট প্রকৃতির। সে মেয়েটিকে চুরি করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। একদিন সে মেয়েটিকে চুরি করার জন্য ঘরের চালে উঠে। তখন দুটি বাছুর বলাবলি করছে। ঐ ছেলেটি তার আপন মাতাকে বিয়ে করতে চায় এবং শীত-বসন্তের কথা আদ্যপান্ত ব্যক্ত করে। ছেলেটি

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বোল্লেখিত কাহিনীগুলোর সাথে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের সংগৃহীত মধ্যযুগের অজ্ঞাত কবির রচিত 'শীত-বসন্ত' কাহিনীর বৈসাদৃশ্য নিম্নরূপ

ক. এক সওদাগরের একটি পুত্র ছিল। সে পৃথক বাড়ীতে বাস করত।

খ. একদিন এক টুনটুনি তার ঘরে এক ডিম রেখে যায়। ঐ ডিম ফুটে এক সুন্দরী মেয়ের জন্ম হয়। মেয়েটি গোপনে ঘর থেকে বের হয়ে ছেলেটির খাবার খেয়ে যেত। এভাবে বারো বছর চলে যায়।

গ. খাদ্যে সংকট পড়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মেয়েটির খোঁজ পায়। তার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে ছেলেটি তাকে বিয়ে করে। কিছুদিন পরে তাদের শীত-বসন্ত নামে দুটি সন্তান হয় এবং মেয়েটি মারা যায়।

ঘ. সওদাগর পুত্রটি পুনরায় বিয়ে করে। সৎমা শীত-বসন্তের প্রতি খুব অত্যাচার করে।

ঙ. একবার একটি ছেলে অদ্ভুত মাছ নিয়ে আসে। এই মাছ যে খাবে তার হাসি ও অশ্রুবিন্দুর সাথে মানিক ও মুক্তা ঝরবে। শীতের স্ত্রী মাছের গুণ গুণে বের করে নিজের স্বামী ও দেবরকে ভক্ষণ করিয়ে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ী ছেড়ে বনে আশ্রয় নেয়।

চ. বনে শীতের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পথ চলতে গিয়ে তারা পিপাসায় কাতর হলে শীত পানি সংগ্রহে যায়। রাজহাতী তার কপালে 'রাজটিকা' দেখে ধরে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। ঐ রাজ্যের নিয়ম ছিল প্রতি রাতে রাজার মৃত্যু হয়। পরদিন আবার নতুন রাজার অভিষেক অনুষ্ঠান হত। রাতে রাণী ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু শীত ঘুমায়নি। গভীর রাতে শীত দেখতে পায় রাণীর নাক দিয়ে চিকন সুতা বের হয়ে ক্রমান্বয়ে তা মোটা হয়ে সাপে পরিণত হয়। শীত তলোয়ার দিয়ে সেই সাপ কেটে কুটে মেরে ফেলে। পরদিন লোকজন শীতরাজাকে জীবিত দেখে আনন্দিত হয়।

ছ. বসন্ত ভাইয়ের খোঁজে নদীর পারে গিয়ে কাঁদতে থাকে। সেই সময় এক সওদাগর দেখতে পায় বসন্তের অশ্রুবিন্দুর সাথে মুক্তা ঝরে, তখন সওদাগর তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। বসন্তকে কাঁদাইয়া হাসাইয়া সওদাগর প্রভূত ধন সঞ্চয় করে। কিন্তু বসন্তের অবস্থা মৃতপ্রায়।

জ. স্বামী ও দেবর কে হারিয়ে মৃত প্রায় স্ত্রীটি কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে। ঐ দেশের কোতোয়াল স্ত্রীটির পুত্রটিকে চুরি করে নিয়ে আসে। স্ত্রীটিকে এক ব্রাহ্মণ নিজ কন্যারূপে স্থান দেয়। কোতোয়ালের পুত্রটি খুবই দুর্দান্ত হয়ে উঠে এবং ব্রাহ্মণের পালিত কন্যাকে উত্যক্ত করে। ব্রাহ্মণ কোতয়ালকে তার পুত্রসহ তাড়িয়ে দেয়।

ঝ. পুত্রটি খুবই ভীষণ দুষ্ট প্রকৃতির। সে মেয়েটিকে চুরি করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। একদিন সে মেয়েটিকে চুরি করার জন্য ঘরের চালে উঠে। তখন দুটি বাছুর বলাবলি করছে। ঐ ছেলেটি তার আপন মাতাকে বিয়ে করতে চায় এবং শীত-বসন্তের কথা আদ্যপান্ত ব্যক্ত করে। ছেলেটি

Dhaka University Institutional Repository

চালা থেকে নেতে দ্রুত রাজার কাছে গিয়ে নিজেকে 'রাজপুত্র' বলে পরিচয় দেয়। ছেলেটার কথা শুনে তার পূর্বের কথা মনে পড়ে। স্ত্রী ও বসন্তকে খুঁজে বের করে এবং সওদাগরকে তার অপরাধের জন্য জীবন্ত কবর দেয়। রাজা তার স্ত্রী, পুত্র ও ভাইকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করে।

উপরে বর্ণিত কাহিনীর সাথে খেপুপাড়া নিবাসী কথক দারিকনাথ কবিরাজের 'শীত ও বসন্তে'র কাহিনীর বৈসাদৃশ্য নিম্নরূপ

ক. চাঁদের দেশের রাজা অজয় ও রাণী মহামায়া এবং শীত-বসন্ত তাদের সন্তান। শীত-বসন্ত রোজ রোজ বৃদ্ধি পেয়ে ডাঙ্গার বাঘ ও জলের কুমীর হাঙ্গরের সাথে যুদ্ধ করে। তাদের ভয়ে বাঘ, ভাল্লুক এদিকে পথ মারায় না। বনের পশুরা তাদের বিরুদ্ধে বনের রাজা ও বড় শিয়ালের কাছে নালিশ দায়ের করে।

খ. একদিন শীত-বসন্ত আগুনশার মোহনায় মকরের সাথে যুদ্ধ করতে যায়। রাজা অজয় যায়- হরিণ শীকারে। এদিকে বড় শিয়াল শীত-বসন্তকে শাস্তি দিতে আসে। ঘরে তাদেরকে না পেয়ে রাণী মহামায়াকে হত্যা করে এবং তার অর্ধেক দেহ্ ভক্ষণ করে যায়।

গ. রাজা অজয় দুটি হরিণ শীকার করে নিয়ে এসে রাণীর অপঘাত দেখে খুবই দুঃখ পায়। রাজা বড় শিয়ালকে শাস্তি দেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞা করে। শীত-বসন্ত মকরকে আহত করে ফিরে রাণীর মৃত্যুর খবর শুনে প্রচণ্ড আঘাত পায়। তারা মকরকে দায়ী করে তাকে হত্যা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

ঘ. মকর ছিল একজন মুনী, মহাদেব কর্তৃক অভিশাপগ্রস্ত হয়।

ঙ. রাজা তার সৈন্য সামন্তকে পাঠিয়ে দেয় বড় শিয়ালকে ধরে আনতে। অবস্থা বেগতিক দেখে বড় শিয়াল গঙ্গীদেবীর কাছে আশ্রয় নেয়। মকর সেও গঙ্গীদেবীর আশ্রয় পায়।

চ. রাজা অজয় ও শীত-বসন্ত সমস্ত সেনা-সামন্ত নিয়ে গঙ্গীদেবীর আস্তানা ঘিরে ফেলে। শীত-বসন্ত বড় শিয়ালের লেজ কেঁটে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে গঙ্গীদেবী একখানা 'যাদুর শাড়ী পড়িয়ে রাণীরূপী বড় শিয়াল'কে রাজার কাছে হস্তান্তর করে।

ছ. রাজমহলে গিয়ে রাণী শিয়ালের মত হুক্কা-হুয়া করে ডাকে।

জ. এদিকে রাণীরূপী বড় শিয়াল লেজ কাঁটার প্রতিশোধ নিতে শীত-বসন্তের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বসন্ত বড় শিয়ালের জীহবা ছিরে ফেলে। রাজা খাণ্ডা দিয়ে আঘাত করে বড় শিয়ালকে হত্যা করে, রাণীর যে অংশটুকু ভক্ষণ করেছিল তা বমি করে ফেলে দেয়।

ঝ. যথারীতি রাণীর মৃত্যুদেহের সৎকার করা হয়।

ঞ. মকর অভিশাপ থেকে মুক্ত হয় এবং দেবীর ঘটনা ফাঁস করে দেয়। রাজা অজয় ও শীত- বসন্ত গঙ্গীবেদীকে ধরে এনে নাক, কান, চুল কেটে মাথায় ঘোল ঢেলে রাজ্যময় ঘুরিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। সেই থেকে শুরু হয় প্রতিবছর গঙ্গীদেবীর মূর্তি নদীতে বিসর্জন দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ট. শীত-বসন্ত বড় শিয়ালের চামড়া খুলে বড় একটা ঢোল বানায় এবং শীত-বসন্ত ও অন্যান্য সকলে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে ঢোলরূপী বড়শিয়াল 'মহামায়া-মহামায়া' বলে চিৎকার করতে থাকে। পৃথিবী লয় না হওয়া পর্যন্ত বড় শিয়ালের এ শাস্তি ভোগ করবে।

১১. উপরে বর্ণিত দশটি কাহিনীর সাথে হাফেজদ্দীন বিরচিত 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যের কাহিনী পার্থক্য নিম্নরূপ

ক. ভীম রাজ্যের রাজা প্রতাপ ভীম ও রাণী ঈশ্বরী দেবী সুখেই ছিলেন। ঘাতক ব্যধি কাল হয়ে, তার সংসারে প্রবেশ করে। রাণী দুই সন্তান রেখে মারা যান। মারা যাবার পূর্বে বলে যান সে যেন দ্বিতীয় বিয়ে না করে।

খ. রাজ্য অমাত্যবর্গের পরামর্শে পুনরায় বিয়ে করেন। রাজা শীত-বসন্তকে দাইয়ের বাড়ীতে লালন-পালনে দায়িত্ব দিয়ে দেয়।

গ. রাণীর মনে শান্তি নেই। সতীন পুতেরা জীবিত আছে। সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

ঘ. শীত-বসন্ত অবসর সময় কবুতর নিয়ে খেলা করত। একদিন রাণী তাদের খেলার কবুতর বেঁধে রাখে। শীত-বসন্ত রাজবাড়ীতে প্রবেশ করে জোর করে ধরে নিয়ে আসে।

ঙ. রাণী রাজার নিকট শীত-বসন্তের নামে শ্লীলতাহানীর অভিযোগ তোলে।

চ. রাজা শাস্তি দেয় মৃত্যুদণ্ড, জল্লাদ তাদের হত্যা না করে দুটি বনের পশু হত্যা করে তার রক্ত এনে রাণীকে দেখায়। রাণী শান্তি খুঁজে পায়।

ছ. জল্লাদ দুটি তেজী ঘোড়া ও নতুন জামা কাপড় পড়িয়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে সাহায্য করে।

জ. পথ শ্রান্তিতে তারা দুর্বল ও তৃষ্ণার্ত্ত হয়। শীত-বসন্তের জন্য পানি আনতে নদীর তীরে যায়। ঐ সময় একটি গজমতী হাতী এসে শীতের কপালে 'রাজতিলক' দেখে ধরে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়।

ঝ. শীত রাজা হয়ে বসন্তকে একদম ভুলে যায়।

ঞ. জকুম দেশের প্রহরীরা বনের মধ্যে বসন্তকে 'অশ্বচোর' বলে কারারুদ্ধ করে।

ট. সেই দেশে গঙ্গাধর নামে এক সওদাগর ছিল। সে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে একখানা ডিঙ্গা তৈয়ার করায়। কিন্তু সে ডিঙ্গা পানিতে নামাতে পারছে না। নরবলি দিলেই তা পানিতে ভাসবে। নরবলি দেয়ার জন্য সাধু ভেট নিয়ে রাজার কাছে যায়। রাজা আদেশ দেয়-অশ্বচোরকে সাধুকে দিতে। সাধু বসন্তকে হাতে পায়ে শক্ত করে বেঁধে নরলির জন্য পূজামণ্ডবে নিয়ে যায়। তখন কৃপা ঠাকুর বসন্তকে অভয় প্রদান করে। কিন্তু সাধুর প্রতি শর্ত থাকে নৌকা পানিতে নামলে রাজকুমার বসন্তকে মুক্তি দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঠ. সাধু তাকে মুক্তি না দিয়ে জেল খানায় রাখে-আগাম বিপদে কাজে লাগবে বলে। সাধু তার বানিজ্য বহর নিয়ে কিশ্বর নরপতির রাজ্যে যায়।

ড. সাধু কিশ্বর নরপতির কাছ থেকে সাত লাল মানিক্য প্রসাদ গ্রহণ করে। সাত মানিক্যের মধ্যে তিন মানিক অন্ধ। অন্ধ মানিক রাজার কাছে সাধু ফেরত দিতে গিয়ে বন্দী হয়। রাজকুমার বসন্ত কে রাজদরবারে নেয়া হয়। একং সে অন্ধ মানিক্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

ঢ. কিশ্বর নরপতির কাঞ্চনমালা নামে এক রাজকন্যা আছে। সে পণ করেছে যে লাল মানিক্য চিনবে তার সাথেই বিয়ে হবে।

ণ. রাজকুমার বসন্তের সাথে রাজকন্যার বিয়ে হয়। রাজকুমারের মনে ভাই শীতের কথা মনে পড়ে এবং সেখানে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়। কাঞ্চনমালাকে নিয়ে সাধুর নৌকায় যাত্রা শুরু করে। যাত্রার পথে অনেক অমঙ্গল দেখতে পায়।

ত. গঙ্গাধর সাধু রাজকন্যাকে দেখে উন্মাদ হয়ে রাজকুমারকে বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, কাঞ্চনমালাকে তার পুরিতে নিয়ে আসে। কাঞ্চনমালা কৌশল করে শর্ত আরোপ করে সাধুকে দুরে সরিয়ে রাখে।

থ. রাজকুমার সমুদ্রের উত্তাল-পাতাল তরঙ্গের সাথে ভেসে বৃন্দাবনের ঘাটে আসে। অনেক দিন পর্যন্ত বৃন্দাবনের বাগানে ফুল ফোটে না। রাজকুমার আসার সাথে সাথে বাগানে ফুল ফোটে ও ভ্রমরের গুঞ্জনে বাগান মুখরিত হয়ে উঠে। মালিনী বৃন্দাবনের ঘাটে রাজকুমারকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

দ. মালিনী রোজ রাজকন্যাকে সাধুরপুরীতে গিয়ে ফুলের মালা দিয়ে আসে। একদিন রাজকুমার বিনেসুতার মালা গেঁথে তার মধ্যে একখানা চিঠি দিয়ে দেয়। মালিনীর মারফত উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ হয়।

ধ. রাজকন্যা সাধুকে বিয়ের দিন-তারিখ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রিক আনয়নের জন্যে বলে। এবং রাজকন্যা সভায় গিয়ে বিয়ের মন্ত্র পড়বে। তাকে সভায় আনার জন্য একটি সুপালা (পাল্কী) তৈরী করা হয়। সুপালার ভিতরে একটি গুপ্ত কোঠা রাখা হয়। তাতে আরোহণ করে রাজকুমার গুপ্তভাবে সভায় যায়।

ন. যথারীতি রাজকন্যা সভায় নীত হয়। দেশের রাজা সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রাজকন্যা সভাপতির অনুমতি নিয়ে আনুপার্বিক সকল কথা বলে। সাধুকে বন্দী করা হয়। রাজকুমার আত্মপ্রকাশ করে। বিচারে সাধুকে সমুদ্রে ডুবিয়ে হত্যা এবং তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। দুই ভাইয়ের মধ্যে মিলন হয়।

প. রাজকুমার বসন্ত রাজকন্যার সতীত্বে সন্দেহ পোষণ করে। এবং অগ্নিপরীক্ষায় রাজকন্যা উত্তীর্ণ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ফ. রাজকুমার বসন্ত তার পিতা প্রতাপ ভীমকে স্বপ্ন দেখে, ইতিমধ্যে তার রাজ্য অন্য রাজারা দখল করে নেয়। রাজকুমার এক লক্ষ সৈন্য ও দশ হাজার নৌ-জাহাজ নিয়ে আক্রমণকারীদের পরাস্ত করে পিতৃরাজ্য দখল এবং কারারুদ্ধ পিতাকে মুক্ত করে। অতঃপর পিতা-পুত্রের মিলন হয়।

ব. রাজা আনুষ্ঠনিকতার সাথে রাজকন্যা কাঞ্চনমালাকে পুত্রবধুরূপে বরণ করে।

ভ. রাজা রাণীর বিচারের আয়োজন করে। কারণ যদি সে পুনরায় কোন ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু রাজকন্যার হস্তক্ষেপে তাকে মাফ করে দেয়া হয়।

আলোচনা

এই ১১টি কাহিনীর মধ্যে বাংলাদেশে ১০টি প্রচলিত আছে। বাংলার বাইরে হিন্দি ভাষায় একটি প্রচলিত আছে। মুসলিম ও হিন্দু সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাওয়া যায়।

লোকসাহিত্য যুগ পরম্পরায় মুখে মুখে চলে আসছে। এর কোন লিখিত রূপ নেই। মানুষের স্মৃতি এর প্রধান বাহন। ফলে যুগ অতিক্রমকালে কিছু কিছু ছাপ অলক্ষিতে প্রবেশ করে নিজ স্থান করে নেয়। যুগের এই ছাপটিই তার ধর্ম। বাংলার লোকসাহিত্যের সকল শাখায় এ সত্য প্রযোজ্য। রূপকথাগুলি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই মুখে মুখে চলে আসছে। কিন্তু এতটা যুগ অতিক্রম করার পরও তার স্বাতন্ত্র্যতা হারায়নি। কাহিনীগুলো শত পরিবর্তনের মধ্যে বেঁচে থাকে। একই কাহিনী একাধিক কাহিনীর স্রষ্টার স্ব-পরিকল্পিত আদর্শে বেড়ে উঠেছে। তবে লোককাহিনীর ঐতি হ্য জীবন্ত ও প্রবহমান থাকে। ফলে অনেক বিচিত্র ও ভিন্নধর্মী কাহিনী একত্রে পরিবেশিত হয়ে যুগে যুগে বিচিত্র কলেবরের কাহিনীর জন্ম দেয়। এ দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতীয় মানবগোষ্ঠীর আগমন হয়েছে। এবং নতুন পুরাতনের মিলমিশ হয়ে এক সংকর জাতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যের দিকে তাকালে এ সত্য অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ কাহিনীর উপাদান সমূহের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করলে বিশেষ বিশেষ যুগকে চিহ্নিত করা যায়, "শীত ও বসন্ত" এর চারটি রূপ নিয়ে 'ড. মু. শহীদুল্লাহ বলেছেন-'শীত বসন্তের কাহিনী হইতে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, মূল উপকথাটি বাঙ্গালার প্রাচীন যুগের হয়তো তাহার ও পূর্বের। (ড. মু. শহীদুল্লাহ-বাংলাদেশ সাহিত্যের কথা প্রথম খণ্ড পৃ. ১২২) "শীত ও বসন্ত"র কাহিনী পেয়েছেন চারটি,

(ক) রেভা ঃ লাল বিহারী দে সংগৃহীত **Folk Tales of Bengal** 'শীত-বসন্ত'।

(খ) শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংগৃহীত-ঠাকুরমার ঝুলিতে 'শীত-বসন্ত'।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) মহাদেব প্রসাদ সিংহ বিরচিত 'শীত-বসন্ত'।

(ঘ) শ্রীযুত গোলাম কাদির রচিত 'শীত বসন্ত'।

আরো **কয়েকটির** সন্ধান পাওয়া যায়

(ঙ) বিশ্বেশ্বর ধর রচিত 'শীত বসন্ত' ।

(চ) খন্দকার রিয়াজ উদ্দিন আহম্মদ বিরচিত 'শীত বসন্ত' ।

(ছ) মুনসুর বয়াতির 'আলাল-দুলাল বা দেওয়ানা মদিনা'।

(জ) শ্রী চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহীত- 'তিলক বসন্ত'।

(ঝ) ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের সংগৃহীত-'শীত-বসন্ত'।

(ঞ) দারিকনাথ কবিরাজের-'শীত-বসন্ত'।

(ট) হাফেজদ্দীন রচিত-'বসন্তের দুঃখ'

আমি ১১টি কাহিনীগুলোর পারস্পারিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য তুলে ধরেছি। রেভা ঃ লাল বিহারী দেবের সংগৃহীত 'শীত-বসন্ত' প্রাপ্ত কাহিনীগুলোর মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংগৃহীত 'শীত-বসন্ত', লাল বিহারী দেবের সংগৃহীত কাহিনীর পরে। এখানে আধুনিকতার ছাপ পড়েছে-রাজকন্যার ব্যবহৃত অলংকার, কপিলা গাভীর দুধ, ও কাঁচা হলুদ এই তিনটি অংশ পরবর্তীকালের। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার কাহিনী বর্ণনায় প্রাচীনরূপ রক্ষা করেছেন। ফলে দক্ষিনারঞ্জন মিত্রের পাঠটি Oikotype. রেভা ঃ লাল বিহারী দেবের কাহিনীটিকে Archetype বলা যায়। বিশ্বেশ্বর ধরের 'শীত-বসন্ত' পাণ্ডুলিপিটি Post Antequem.

কবি হাফেজদ্দীন বিরচিত 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যটিকে Terminus Antequem. কারণ এখানে বিশেষ বিশেষ যুগ চিহ্নিত করে তার পূর্ববর্তী বলে ধারণা করা যায়।

গোলাম কাদিরের 'শীত-বসন্ত' কাহিনীতে রাজার দুই রাণীর কথা আসেনি। রাণী প্রভাবতীর মৃত্যুর পরে পুনরায় সে বিয়ে করেছে এক গরীবের মেয়েকে। শুক-সারির পরিবর্তে এসেছে-ময়না-ময়নীর কথা, উপদেশ দিতে এসেছে এক শিয়াল, রাজকন্যার পরিবর্তে জয়মালা পড়িয়েছে রাজহাতী, নরবলির জন্য রাজকুমার বিক্রীত হয়েছে এক সওদাগরের কাছে এক লক্ষ টাকায়, রাজা মাধুকর ও কুটনী বুড়ীর ষড়যন্ত্র, হাঁস-হাঁসী কাহিনী এবং চক্রপুরের রাজকন্যা ফুলবন্তীর বিয়ে গোলাম কাদিরের কাহিনীকে পূর্ববর্তী কাহিনী থেকে আলাদা করছে। লাল বিহারী দে ও দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের সংগ্রহ দুটির কাহিনী প্রাক্ মুসলিম যুগের।

Dhaka University Institutional Repository

খন্দকার রিয়াজদ্দীন আহম্মেদের কাহিনী শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সংগৃহীত কাহিনীর সাথে হুবহু এক। 'ঔষধের বড়ির' পরিবর্তে এসেছে 'তাবিজ' কিন্তু রাজকন্যা বর্ষা ও হেমন্ত রাজার উপ-কাহিনী যুক্ত হয়ে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

শ্রী চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত কাহিনীতে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা তিলক বসন্ত রাণী সুলা ও পবনকুমারীর কাহিনী বিশেষ করে মালীরাজাকে বনে হত্যা করে হরিণ নেয়ার পরিকল্পনাকারীরা যুদ্ধে পরাস্ত হয় তখন মালীরাজা আংটি পুড়ে কপালে ছ্যাক দিয়ে ছেড়ে দেয়- ইত্যাদি কাহিনীটিকে রসালো ও নতুনত্ব দান করেছে। একই সাথে লোককাহিনীর 'মটিফে' স্থান পেয়েছে।

শ্রী ক্ষিতীষচন্দ্র মৌলিক সংগৃহীত আলাল-দুলাল/দেওয়ানা মদিনার কাহিনীতে দারাক গাছে কইতরীর গল্প, রাণীর সাথে জল্লাদের শলাপরামর্শ, ধানের বিনিময়ে আলাল-দুলালকে বিক্রী করা, আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে মদিনাকে তালাক দেয়া-ইত্যাদি কাহিনী, পালাটিকে পাঠকবর্গের কাছে আকর্ষণীয় করেছে।

১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দের কবি বিশ্বেশ্বর ধরের শীত-বসন্তে'র কাহিনীতে চৈতন্য পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণের দোর্দদণ্ড প্রতাপের কথা বর্ণিত হয়েছে। স্রষ্টার পর যেন ব্রাহ্মণদের বাক্য বেদ বাক্যরূপে পালনীয়, সতীনের ছেলে শীত-বসন্তের প্রতি আসক্তি, ব্রহ্মপাখী পথের দিশারী, সাধু সওদাগরের কামন্মোত্ততা ও বসন্ত উৎসব, গিরিবনে অভিশাপগ্রস্ত বিসুরাক্ষস, মুনী কর্তৃক ঔষধ প্রদান, মৃত রাজার সৎকার ইত্যাদি-ব্রাহ্মণদের অধিপাত্যবাদকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ড. আশুতোষ ভট্টচার্যের সংগৃহীত 'শীত-বসন্ত' কাহিনীতে পাখীর ডিম থেকে একটি মেয়ের জন্মের কথা, অদ্ভূত মাছের কাহিনী, শীত রাজার রাণীর নাক থেকে সূতা নাক বের হওয়া, সূতানাগ হত্যা, কোতোয়ালের সন্তান চুরি, কোতোয়াল পুত্র তার নিজ মাতাকে বিয়ে করতে চাওয়া, দুইটি বাছুরের কথোপকথন ইত্যাদি কাহিনীকে বিশেষত্ব দিয়েছে।

দারিকনাথ কবিরাজ্যের 'শীত-বসন্ত' কাহিনীতে অরণ্য সংস্কৃতির পরিচয় পাই। রাজা ও রাজপুত্রদের অত্যাচার অরণ্যের পশু ও জলের প্রাণীকুল সন্ত্রস্ত, বড় শিয়াল কর্তৃক রাণী হত, গঙ্গীদেবী যাদুরশাড়ী পড়িয়ে বড় শিয়ালকে রমণীতে রূপান্তর, মকররূপী দিবক মুনীর সত্যভাষণ, ছলনাময়ী গঙ্গীদেবীর বিচার, বড় শিয়ালের চামড়া দিয়ে ঢোল বানানো এবং সেই ঢোলের কান্না মহামায়া মহামায়া ইত্যাদি কাহিনীকে চিত্তাকর্ষক করেছে। কিন্তু এই কাহিনীগুলি সবই পরবর্তীকালের।

কবি হাফেজদ্দীন বিরচিত 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যের কাহিনী রাজা প্রতাপ ভীমের ঈশ্বরী রাণীর মৃত্যুর পর পুনঃ বিয়ে, সেই রাণীর নিষ্ঠুরতা ও অপমান, গালমন্দের পরিবর্তে শ্রীলতাহানীর অভিযোগ, কুকুর ও শিয়ালের পরিবর্তে বন্য পশু হত্যা, গাছের ছাল বাকলের পরিবর্তে নতুন

Dhaka University Institutional Repository

জামা কাপড় ও তেজী ঘোড়া দেয়া, কবুতর নিয়ে খেলা করা, গঙ্গাধর সাধু কর্তৃক নরবলির দেয়ার প্রস্তুতি, কৃপা ঠাকুরের কৃপা, সাধুর লালমানিক্য লাভ, রাজকুমারীর স্বয়ংবরা সভা রাজকন্যা সাধু কর্তৃক হরণ, রাজকন্যার চাতুরীতে সাধুর বিচার, সতীত্ব পরীক্ষায় রাজকন্যার উত্তরণ, রাজকুমারের পিতৃরাজ্য উদ্ধার। পিতা-পুত্রের মিলন, রাজা কর্তৃক পুত্রবধু বরণ ইত্যাদি কাহিনীকে অন্যান্য কাহিনী থেকে আলাদা ও বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

কাহিনী গুলোর মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও সকল কাহিনীর মূল যে একই কাহিনী তাতে কোন সন্দেহ নেই। কবি হাফেজদ্দীনের "বসন্তের দুঃখ" কাব্যখানির উৎস মধ্যযুগের রূপকথা জাতীয় লোককাহিনী। কিন্তু কখন, কিভাবে উৎপত্তি হয়েছে তা দিনক্ষণ মিলিয়ে বলা সম্ভব নয়। তবে একথা ঠিক "Higher Cirticism" পদ্বতিতে তৎকালীন প্রচলিত সমাজে রীতি নীতি, ব্যবহৃত সরঞ্জমাদি ও সাংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা করে নির্ণয় করা সম্ভব। লোকসাহিত্য যুগের পর যুগ মুখে মুখে চলে আসছে। শত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার রঙ ও রূপের কোন পরিবর্তন হয় না। অথচ এর কোন লিখিত রূপ নেই।স্মৃতি মানুষের প্রধান বাহন। ফলে যুগ যুগ অতিক্রম কালে তার কিছু কিছু ছাপ বা বৈশিষ্ট্য অলক্ষিতে প্রবেশ করে স্থান দখলে নেয়। যুগের এই ছাপটি তার ধর্ম। বাংলার লোকসাহিত্যে সকল ক্ষেত্রে এ সত্য প্রযোজ্য। রূপকথাগুলি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে মুখে মুখে চলে এসেও তার স্বাতন্ত্র্যতা হারায়নি। বরং একেকটা কাহিনীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে আরেকটি কাহিনী থেকে আলাদা করেছে। এই বৈশিষ্ট্য গুলোই একক। এই এককতাই তার স্বাধীন সত্তা। যে কোন লোককাহিনীর খণ্ড খণ্ড অংশ গুলোই তার মৌলিকত্বকে বহন করে। এগুলো শত পরিবর্তনের মধ্যে টিকে থাকে-এসম্পর্কে Stith Thompson বলেন "It May indeed happen to be told with another tale. But the fat that it may appear alone attests its independence." (Stith Tompson-The Folk tale-page No.61).

যে কোন কাহিনীর স্বাধীন সত্ত্বা কখনই বিলীন হয় না। এই সত্ত্বাগুলো আকাশের তারার ন্যায় জ্বল জ্বল করে তার স্বকীয়তা ঘোষণা করে। এর আলো কখনও নিঃশ্বেষ হয় না। বরং যুগের পর যুগ তার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়। কাহিনীর স্বাধীন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. ওয়াকিল আহমদ বলেন- "হয়তো কাহিনী লোক মুখে অন্য কাহিনীর সাথে মিশে যেতে পারে কিন্তু যদি দেখা যায় কাহিনী আলাদা ভাবেও বেঁচে আছে, তবে তার স্বাধীন সত্ত্বার প্রমাণ পাওয়া যায়।" (ড. ওয়াকিল আহমদ-লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ পৃ. ৪১, ১৯৯৯ বাঙলা একাডেমী, ঢাকা)।

কাহিনীগুলো শত পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও বেঁচে থাকে। এসম্পর্কে ড. মযহারুল ইসলাম বলেন-"তবে এসব কাহিনীর কেন্দ্রীয় ঘটনা যুগ যুগান্তর পেরিয়ে নানা ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যে বেঁচে থাকে।" (ড. মযহারুল ইসলাম-পূর্বপাকিস্তানী লোক কাহিনী পৃ. ১৫২, ১৯৬৯, রাজশাহী)।

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে বলা যায়, লোকসাহিত্যে কাহিনীগুলো ভিন্ন ভিন্ন রূপ পেতে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতা ও বৈশিষ্ট্যকে হারায় না। একই কাহিনী একাধিক কাহিনীর স্রষ্টার স্ব-পরিকল্পিত আদর্শে গড়ে উঠে। তবে লোককাহিনীর ঐতিহ্য জীবন্ত ও প্রবাহমান থাকে। অনেক কিছু বিচিত্র ও ভিন্নধর্মী কাহিনী একত্রে পরিবেশিত হয়ে যুগে যুগে বিচিত্র কলেবরের কাহিনীর জন্ম দেয়।

এ দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতীয় মানব গোষ্ঠীর আগমন হয়েছে এবং নতুন পুরাণের মিলেমিশ হয়ে এক সংকর জাতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্ম দিয়েছে। 'বসন্তের দুঃখ' কাব্য বিশ্লেষণ করলে এসত্য অনুধাবন করা যায়। অর্থাৎ কাহিনীর উপাদান সমূহের বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণ করলে বিশেষ বিশেষ যুগ মানসকে চিহ্নিত করা যায়।

রূপকথাগুলি সেই প্রাচীন কাল থেকে মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। এবং এসেছে নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে প্রাচীনত্বের অনেক চিহ্ন লোপ পেয়েছে তবুও এমন কিছু উপাদান আছে, যা কালের প্রবাহের মধ্যে স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকে। এ সম্পর্কে ড. মু. শহীদুল্লাহ "শীত ও বসন্ত" এর চারটি কাহিনী নিয়ে বলেছেন-"আমরা তিনটি বাঙ্গালা দেশে ও একটি হিন্দুস্তানে প্রচলিত এই শীত বসন্তের কাহিনী হইতে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, মূল উপকথাটি বাঙ্গালার প্রাচীন যুগের হয়তো তাহার পূর্বের। চেষ্টা করিলে তাহার আদিম রূপের কিছুটা উদ্ধার করা অসম্ভব নহে"। (ড. মু. শহীদুল্লাহ বাঙলা সাহিত্যের কথা, ১ম খণ্ড প্রাচীন যুগ পৃ. ১২২-২০০১)। ড. মু. শহীদুল্লাহ সাহেব পেয়েছিলেন মাত্র চারটি। 'শীত বসন্ত'র আরো সাতটি কাহিনী পেয়েছি। আর 'বসন্তের দুঃখ' এর পাণ্ডুলিপি পেয়েছি মাত্র একটি এবং অমুদ্রিত। তাই দুয়ের পদভাগ নির্ণয় করেছি

(ক) 'শীত বসন্ত' - পূর্ব খণ্ড।

(খ) 'বসন্তের দুঃখ' - উত্তর খণ্ড।

'শীত বসন্তের' কাহিনী যদি বাংলার প্রাচীন যুগের কিংবা তার পূর্বের যুগের হয়ে থাকে। তাহলে বলা যায়, পূর্ব খণ্ডের পরপরই উত্তর খণ্ড রচিত হয়েছে।

রেভা ঃ লালবিহারী দের সংগৃহীত কাহিনী প্রাচীন বলে মনে করি। শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কাহিনীটি বিবর্তীত হয়েছে। 'যাদুর' বড়ির স্থলে হয়েছে 'ঔষধের বড়ি' ,কালো গাইয়ের দুধের স্থলে হয়েছে 'কপিলা গাভীর' দুধ, রাজকন্যার অলংকার সামগ্রী সবই আধুনিক। কিন্তু তার কাহিনী প্রাচীন কাহিনীর পরবর্তী সংস্করণ।

রেভা ঃ লালবিহারী দে ও শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংগৃহীত কাহিনী প্রাক্ মুসলিম যুগের বলে অনুমান করা যায়। গোলাম কাদির, খন্দকার রিয়াজ-উদ্দীন আহম্মদের শীত-বসন্তের কাহিনী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সাথে প্রায়-মিলে যায়। ঔষধের বড়ির স্থলে তাবিজ ও হেমন্ত বর্ষার উপ-কাহিনী যুক্ত হয়ে কাহিনীকে স্বাতন্ত্র্য করেছে এবং এই কাহিনী মুসলিম যুগের

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মহাদেব প্রসাদ সিংহের 'শীত-বসন্ত' কাহিনীতে উপ-কাহীন যুক্ত হয়েছে। এবং রাজার সুয়ো এবং দুয়োরাণী নামে কোন রাণী ছিল না। রাণী প্রভাবতীর মৃত্যুর পর রাজা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। এখানেই কবির শিল্পী কুশলতা ও ভিন্ন ধর্মীতার পরিচয় পাই।

১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বেশ্বর ধর বিরচিত 'শীত-বসন্ত' কাব্যটি লিখিত প্রমাণ। এই কাব্যে আমরা ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদের পরিচয় পাই। ব্রাহ্মণের হুকুম স্বয়ং ঈশ্বরের হুকুমরূপে প্রতিপালিত হয়েছে। এখানেই তার স্বাতন্ত্র্যতা। অর্থাৎ এই কাব্যকে **Post antiquem** বলতে পারি।

'তিলক বসন্ত' করমপুরুষ দেবতাদের প্রতিরূপে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের জয়গানে মুখরিত। এখানে হিন্দু ধর্মের জাগরণের গান ছাড়া মানবিক আবেদন প্রায় শূণ্যের কোঠায়।

মুনসুর বয়াতির আলাল-দুলালের পালাটি শুধুমাত্র নামেই ভিন্নতা সূচিত হয়েছে। এই অংশটি শীত-বসন্তের কাহিনীর সাথে মিল রয়েছে। কেবল মাত্র মদিনার অংশটি পরবর্তী কালের যোজনা এবং এখানে আভিজাত্যের চেয়ে মানবিক আবেদন মুখ্য হয়ে উঠেছে। আলাল-দুলালের কাহিনীতে দারাক গাছে কইতরীর নিষ্ঠুরতা ও দেওয়ানের দ্বিতীয় স্ত্রীর নিষ্ঠুরতা সমধর্মী। শীত-বসন্তের কাহিনীর দ্বিতীয় রাণীর নিষ্ঠুরতা নবায়ন মাত্র এবং অজ্ঞাতনামা মুসলমান কর্তৃক রচিত হয়েছে বলে মানবীয় উপাদান মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। সুতরাং এটি **Post antiquem** এর অন্তর্ভূক্ত।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের সংগৃহীত 'শীত-বসন্ত' কাহিনীতে অস্বাভাবিক উপায়ে-পাখীর ডিম ফুটে মানুষের জন্ম, ঘুমন্ত রাণীর নাকে প্রতিরাত্রে সাপের আবির্ভাব, বসন্তের হাসিতে ও অশ্রুতে মানিক-মুক্তা ঝরা, পশুর কথোপকথন ইত্যাদি রূপকথাকে স্মরণ করে দেয় এবং কাহিনীটি অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতায় রূপ পেয়েছে।

দারিকনাথ কবিরাজের 'শীত-বসন্ত' কাহিনীটিতে অরণ্যচারী আদিম মানুষের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি। দেবীর ছলনায় তার শাস্তি-মানুষের মূল্যবোধকে জাগ্রত করেছে। সুতরাং এই কাহিনীটি মুসলিম আমলে রচিত। এটিও **Post antiquem** এর অন্তর্ভূক্ত।

রেভা ঃ লালবিহারীদের সংগ্রহিত কাহিনীতে প্রাচীনরূপ যতটা রক্ষিত হয়েছে, শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের সংগৃহীত কাহিনীতে প্রাচীন রূপ কিছুটা পরবর্তীত হয়েছে। সুতরাং দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কাহিনীকে **Oikotype** বলতে পারি। কারণ কাহিনী যুগে যুগে পরিবর্তীত হয়। লাল বিহারীদে সংগৃহীত কাহিনীটিকে **Archetype** বলতে পারি। কবি হাফেজদ্দীনের কাহিনীটিতে আদিমরূপ কিছুটা রক্ষিত হয়েছে। এটি পরবর্তী সময়ের লেখা এবং মোগল আমলের পূবর্তীকালে রচিত হয়েছে। সুতরাং এটিকে **Terminus antiquem** এর অন্তর্ভূক্ত।

উপরোক্ত ১০টি কাহিনীর সাথে কবি হাফেজদ্দীন রচিত 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যের সাথে কাহিনীগত ঐক্যের মিল রয়েছে। বারমাসী, তঙ্কার ব্যবহার, কেরিয়া রাজার লুন্ঠনবৃত্তি, হার্ম্মাদের অত্যাচার, নরবলি প্রথা, আদি রসের প্রয়োগ, প্রাচীন ও মধ্যযুগের যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রসত্র, লৌকিক,

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথ্য ও উপকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে পারি এর উৎসকাল প্রাচীন যুগের লোককাহিনীতে প্রচলিত উপাখ্যান 'শীত-বসন্ত'। সার্বিক আলোচনায় বলা যায় উপরোক্ত ১১টি কাহিনীর পূর্বরূপ 'শীত-বসন্ত' তাতে কোন সন্দেহ নেই।

লৌকিক উপাদান

বারমাসী

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বারমাসী একটি লৌকিক উপাদান হিসাবে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বারমাসীর যে কখন উৎপত্তি হয়েছে তা নির্দ্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে প্রাগৈতিহাসিক কালের লোকমানসেই এর জন্ম। বারমাসী বলতে আমরা বুঝি বাংলা বারোমাসের গান বা ছয়ঋতুর গান। যার সাথে সমন্বিত হয়েছে-বিরহী নারীর মনোবেদনা। ঋতুভেদে যেমন মানুষের চিত্তচাঞ্চল্য দেখা যায়। তেমনি বিরহী নারীর প্রেমিক বা স্বামীর জন্য রয়েছে এক এক রকম অভিব্যক্তি। তাই বারমাসী বলতেই বিরহী নারীর মনবেদনাকেই বুঝি। বাংলা সাহিত্যে বারমাসী এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে ,প্রাচীনকাল থেকেই। বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। এখানে ছয়টি ঋতুকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। পৃথিবীর আর কোথাও ছয় ঋতুকে অনুভব করা যায় না। তাই অন্যান্য সাহিত্যে আটমাসী, দশমাসী, ছয়মাসী, চারমাসীর প্রচলন দেখা যায়। বিশেষ করে মধ্যযুগের অনুবাদ সাহিত্যে এ সত্য প্রত্যক্ষ। ভৌগোলিক ও পরিবেশের কারণেই এর তারতম্য ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের গভীরে এর মূল প্রোথিত। এ জন্য একে উপলব্ধি করতে হয়। একে বিচ্ছিন্ন করার কোন উপায় নেই। বারমাসী আমাদের চলমান লোকজীবনের প্রতিচ্ছবি। বিশিষ্ট লোককলাবিদ ড. ওয়াকিল আহমদ 'বারমাসীকে সাহিত্যের উপাদান বলে চিহ্নিত করেছেন।" (ওয়াকিল আহমদ-বাংলা লোক সংস্কৃতি পৃ.-২৮)। কারণ বারমাসী তৎকালীন সুখী দুঃখী মানুষের জীবনেরই প্রতিধ্বনি।

মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। এই প্রকাশের মধ্যে খুঁজে পায় শান্তনা। ঋতুর পরিবর্তনে মানুষের মনে আসে নানা পরিবর্তন। এই পরিবর্তন অন্তরে বাইরে, রীতিতে-নীতিতে, প্রকৃতিতে, সুখ-দুঃখে, অনুভূতিতে রূপ পায়। সাংস্কৃতি মানুষের পরিচয়ের বাহন। যুগ যুগ ধরে বহন করে বেড়ায়। কখনো রূপ দেয় কবিতায়, কখনো গানে। সুরই মানুষকে বিচলিত করে, চঞ্চল করে। বারোমাসীর সুর মানুষের মানসলোকে কম্পনের সৃষ্টি করে এবং মানুষকে অভিভুত করে। তাই বারোমাসীর গানগুলো একপ্রকার উৎকৃষ্ট গান। এ প্রসঙ্গে ড. মু. শহীদুল্লাহ বলেন - "লোক সাহিত্যে বারমাসী গীতিগুলি এক অপূর্ব সৃষ্টি। মঙ্গলকাব্য ও ময়মনসিংহ গীতিকায় বিরহ

Dhaka University Institutional Repository

কাতর নায়িকার বারমাসী বর্ণনায় আমরা এক অপূর্ব ভাব সম্পদ ও সাহিত্য রসের উৎস দেখিতে পাই” (ড. মু. শহীদুল্লাহ-বাংলা সাহিত্যের কথা দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ৩৪৬)।

বারোমাসীর সুর-ছন্দ এক অপূর্ব আমেজের সৃষ্টি করে। বারোমাসী হল সভ্যতার নীরব সাক্ষী। মানব সভ্যতার আদিপর্ব থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে। বারমাসী প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। যার মাধ্যমে আমরা অন্ততঃপক্ষে একটা বিশেষ যুগকে চিহ্নিত করতে পারি। কবি হাফেজদ্দীন তার কাব্যে বারমাসী বর্ণনা করছেন-লোকসাহিত্য অবলম্বনে।

অতএব তার কাব্যের কাহিনী যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকসাহিত্যে প্রচলিত ও জনপ্রিয় ছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যসমূহ তার কাব্যে অনুপস্থিত। কবির রচিত “বসন্তের দুঃখ”র কাহিনী যে মাসে শুরু হয়েছে সেই মাস থেকেই কাব্যটি রচনায় হাত দেন এবং চৈত্র মাসে রচনা শেষ করেন।

বারোমাসী রচনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিগণের বিশিষ্ট কোন নিয়ম-নীতি-রীতি ছিল না। সকল কবিগণ এক এক কাহিনী এক এক মাস ধরে রচনা করেন। এজন্য বিভিন্ন মাসের নামে বাংলার নববর্ষ শুরু হতে পারে না। যদি কেউ বিভিন্ন নামে বাংলার নববর্ষ শুরু করতে চান তা পণ্ডশ্রম মাত্র। বছরে নিৰ্দ্দিষ্ট একটি মাস ধরেই বাংলা নববর্ষের যাত্রা হয়েছে। অতএব বিভিন্ন মাস ধরে বাংলা নববর্ষের সূচনার কোন অবকাশ নেই। সুতরাং বারোমাসীর নামে বাংলা নববর্ষ নিয়ে টানা হেচড়ার কোন মানে হয় না। এ প্রসঙ্গে ড. দীনেশ সেন লিখেছেন-“গ্রাম্য কবিতা মুসলামানেরাই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুরা গত ৩/৪ শত বছর যাবৎ শাস্ত্রের অনুবাদ করিয়া সংস্কৃতের আনুগত্য করিতেছেন। তাহারা পল্লীর এই শ্রেষ্ট কবিত্বসম্পদের প্রতি পরম উপেক্ষা দেখাইয়া আত্মবঞ্চনা করিতেছেন মাত্র। “(ড. দীনেশ সেন ২৩-১১-১৯২৫ ইং তারিখে আশরাফ হোসেনকে লেখা পত্র।) বারমাসী সম্পর্কে ড. মু. শহীদুল্লাহ বলেন-“বারমাসীগুলির আর এক বৈশিষ্ট্য যে ইহার বর্ণনা সকল ক্ষেত্রে অগ্রহায়ণ বা বৈশাখ মাস হইতেই আরম্ভ হয় নাই। “(ড. মু. শহীদুল্লাহ-বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড পৃ. ৩৪৯)।

বারমাসীর সর্বপ্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় বাংলার কৃষিভিত্তিক সমাজে খনার বচনে। বিদূষীখনা কৃষিভিত্তিক কৃষক সমাজের জন্য বারোমাসী আরম্ভ করেছেন-পৌষ মাস দিয়ে। খনা বলে

১. পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া।
প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া ॥
২. পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল।
যদ্দিন কুয়া তদ্দিন জল ॥

Dhaka University Institutional Repository

খনা বারমাসী শেষ করেছেন অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস দিয়ে

যদি বর্ষে আগণে রাজা যায় মাগণে।
যদি বর্ষে পৌষে করি হয় তুষে ॥

কৃষিনির্ভর সমাজ থেকে বারমাসীর উদ্ভব হয়েছে প্রাচীন কাল থেকে।এ সঙ্গীত একান্তই আপন। সৃষ্টির লগ্ন থেকেই মানুষ তার সুখ-দুঃখ, সহজ-সরল ভাষায় প্রকাশ করেছে। এই প্রকাশ হয়েছে গানের মাধ্যমেই। গানের মাধ্যমেই মানব মনের সহজ ও সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। সুতরাং গানের মানুষ অখণ্ড ও সমগ্র। বারোমাসী ভাবে, ভাষায় ও সুরে ছন্দে সার্থক। বারোমাসী বারোমাসের পরিবর্তনশীল মানব মানবীর একান্ত মনের আনন্দ ধারায় বাধা-বিপত্তিতে ঋতুর পরিবর্তনে কি ধরণের পরিবর্তন ও প্রক্রিয়ার জন্ম হয়-তারই ধারাবাহিক বর্ণনা। যা মানব মনকে ভাবিয়ে তোলে। বারমাসের ভোগসম্ভার নায়ক-নায়িকার কাছে উপস্থিত হয় কিন্তু নায়কের অবস্থান্তরই নায়িকাকে ব্যথাতুর করে, ভাবিয়ে তোলে। তখন তার অভাবই প্রতিধ্বনিত হয়। তাই বারমাসিয়া প্রধানত বিরহের বর্ণনার গান।

নায়ক বসন্ত গঙ্গাধর সাধু কর্তৃক সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়ে ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছে। এদিকে নায়িকা কাঞ্চনমালা তার অভাবে কাতর। ঋতু পরিবর্তনে বিরহাকাতুর নায়িকা কাঞ্চনমালার মানসিক অবস্থা প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে কবি বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা করুণ ও হৃদয়স্পর্শী। নারী হৃদয়ের আবেগের কথা কবি বৈশাখ মাস থেকে প্রকাশ করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৈশাখ মাসেতে সখি ফুল নানা রাসি।
মত্ত হইয়া মধু খায় ভেমরায় বসি ॥
ভেমরা গুন ২ করি ফুলের মধু খায়।
আমার ফুলের মধু অকারণে যায় ॥
ভেমরার রীতি দেখি দগ্‌ধে পরাণ।
আমার ফুলের মধু কে করিবে পান ॥

বৈশাখ মাসে গাছে গাছে থাকে ফুল ও ফলের সমারোহ। ফুলগুলি মধুতে থাকে ভরপুর। এই সময় প্রাণপ্রিয় ভ্রমর তা ভোগ করে তৃপ্তি পায়। অথচ এই সময় নায়ক বসন্তের অভাবে কাঞ্চনমালার যৌবন অকারণে ঝরে যায়। ফুটন্ত ফুল ও ফল দেখে পাগল ভ্রমরার অবস্থা দেখে নায়িকার বিরহের দিনগুলিকে শঙ্কিত করছে।

লোকগীতি মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ ভাবেই মানুষের মনকে নাড়া দেয় এবং তা ভাব ও ভাষায় অনবদ্য হয়ে উঠে। লোকগীতি ও বারমাসী সমন্বিত অন্বয়ের মত, শিক্ষিত,

Dhaka University Institutional Repository

অশিক্ষিত সকল মানুষের প্রাণের কথা রুপ পায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। প্রকৃতি বা নিসর্গ বৈশাখে গাছে গাছে ফুল-ফলের বিচিত্রতায় পৃথিবীকে অন্য এক নতুন ভুবন সৃষ্টি করে। ভ্রমর তাতে যুক্ত হয়ে ফুল থেকে ফলের জন্ম দেয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল বড়ই মধুর। যদি বসন্ত কাছে থাকত তাকে নিয়ে জ্যৈষ্ঠের পাকা আম মনের সুখে পেরে খাওয়াত। কিন্তু আজ সে কোথায় আছে, তার খোঁজ নেই ? কাঞ্চনমালা শঠ গঙ্গাধর সাধুর দেউরীতে বন্দী রয়েছে। তার চিত্তদাহন ও বাসনা জ্যৈষ্ঠ মাসের মিষ্ট আমের ভক্ষণের রূপকে প্রকাশ পেয়েছে। তা যে কোন মানুষের নিভৃত কোনকে নাড়া না দিয়ে পারে না। কবির ভাষায়

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে পাকা আম সব লোকে খায়।
আমার গাছের আম কে খাইবে হায় ॥
পতিকে লইয়া সবে তুষ্ট হইয়া যায়।
আমার গাছের আম গাছেতে সুখায় ॥
বড় সাদ ছিল মনে পতিকে খাওয়াইব।
পতি বিনা কারে আমি নিচরিয়া দিব।

বারমাসী গান কিছুটা স্থুল প্রকৃতির। ঋতুভেদে পরিবর্তিত হয় মানব মনের সুখ-দুঃখ। নায়ক নায়িকার বিরহ ও মিলন জনিত চিন্তাই থাকে প্রধান। এ চেতনা শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মানুষের এক। কাঞ্চনমালা আষাঢ়ের মেঘ দেখে আকুল হয়েছে সম্ভোগের নেশায়। সুতরাং সম্ভোগের আকুলতা ও কামন্মোত্ততা, বর্ষার মেঘ জাগিয়ে তোলে অবিমিশ্র দৈহিক ভোগের ইচ্ছা। নায়ক-নায়িকা গলাগলি ধরে বৃষ্টির টই-টুম্বুর শব্দে শুনার কল্পনায় অধীর হয়ে থাকে। কবি বলেন

আষাঢ় মাসেতে সখি গো ঘোন বরিসন।
ঘনঘন মেঘ ডাকে বিজলী গর্জ্জন ॥
একা গলে সুইয়া থাকি কাঁপি থরে ২।
কার গলা ধরি আমি পতি নাই ঘরে ॥
যার ঘরে পতি আছে ধরে জড়াইয়া।
কতরঙ্গ করে বুকে বুক লাগাইয়া ॥
আমি অভাগিনী পতি রহিল কোথায়।
জড়াইয়া ধরি আমি কাহার গলায় ॥

নায়িকা কাঞ্চনমালার দেহ মনে বসন্তেরই জন্য কেবল মাত্র কামোদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তাই দেখা যায় নায়িকার সম্ভোগের বা শৃঙ্গারের চেতনাই প্রধান। শ্রাবণের নবমেঘের চঞ্চলতায় সাগরে তরঙ্গের উত্তলতা, জোয়ারের প্রবল গতি, শ্রাবণের কালো মেঘের গর্জন, ময়ুরের নাচ, ভেকের

Dhaka University Institutional Repository

ডাকে কাঞ্চনমালা চঞ্চল হয়ে উঠে। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যময়তার প্রকাশে স্বামীর সাহচার্য ও সান্নিধ্য কামনা করে। কিন্তু নিষ্ঠুর সঙ্গাধর সাধুর অন্তঃপুরীতে বন্দী জীবন ও সাধুর অন্যায় দাবী অগ্রাহ্য করে, বসন্তের মিলনাঙ্কাখায় মগ্ন। তাই কবি বলেন

শ্রাবণ মাসেতে সখীগো উথলে সাগর।
নালা ডোবা ভরি গেল জলে জোয়ারের ॥
নবজল পাইয়া সব মাতাল ভেকের দল।
আনন্দে অধীর হইয়া করে কতুহল ॥
আমার জৈবন জোয়ার বহে অনুক্ষণ।
পতি বিনে সে জোয়ার নহে নিবারণ ॥
যৌবনের নদী মোর জোয়ারের জলে।
দেখ ওগো সখী দেখ উথলিয়া উঠে ॥

বারমাসীর গান বিরহের গানের একটি বিশিষ্ট রীতি। নিত্য পরিবর্তনশীল প্রাকৃতির পট পরিবর্তনে নারীর বিরহের একটি সুক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ প্রকাশ পেয়েছে। লোককবিগণ মনোবিশ্লেষণের উপর জোর দিয়ে থাকেন। প্রকৃতির বৈচিত্র শোভা-অবিমিশ্র দৈহিক মিলনের কামনা-বাসনা সৃষ্টি বা অনুভুতি জাগিয়া তোলে। ভরা ভাদ্র মাসে পরিপূর্ণ সরোবর দেখে নায়িকা মনে মনে মিলনাকাঙ্খার স্বপ্নে বিভোর। বিচিত্র নিসর্গের বিচিত্রতায় বিরহিনীর বিশিষ্ট মানস মূর্তি আমাদের মনকে আকর্ষণ না করে পারে না। তাই কবি যখন বলেন

ভাদ্র মাসেতে সখীগো পানি সরোবর।
আনন্দে চালায় নৌকা সাধু সওদাগর ॥
যৌবন নদীতে মোর কেবা দিবে পারি।
পতি নাই কে হইবে জৈবন বেপারী ॥
যৌবনের তরী মোর ভাসিয়া চলিল।
হাল ধরি দাড় তায় কে বাহিবে বল ॥

কবির বর্ণনায় আমরা আত্মহারা না হয়ে পারি না। এ ভরা ভাদ্রর মাসে তার মানস সরোবর একান্তভাবে প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য উম্মুখ। অথচ আজ এ সময় সে কাছে নাই। পতি ছাড়া স্ত্রীর জীবন তো অচল। সুতরাং আজ ভরা ভাদ্র মাসেতে তার সময়কাল অকারণে চলে যাচ্ছে।

নারী জীবনে পতি ছাড়া, তার মানসিক অবস্থা কখনও প্রাকৃতিক, কখন ও সাংসারিক পটভুমিকায় করুণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কাঞ্চনমালার বিরহ বেদনার কথা প্রকৃতির সাথে

Dhaka University Institutional Repository

মিলিয়ে কবি বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। তার বারমাসীতে কামন্যোত্ততা ও নারীর উদ্দাম মুখ্য হয়ে উঠেছে। কবির ভাষায়

আশ্বিন মাসেতে সখী গো বরিষার শেষ।
পতি বিনে এ জৈবন বড়ই ক্লেশ ॥
আমি অভাগিনী হইনু নিম্মুল মতন।
ফুলে না বসিল অলি থাকিতে যৌবন ॥
যৌবন বহিয়া গেল কপালের দোষে।
তবু না আইল পতি বরিষার শেষে ॥

হেমন্তে নারীর বাসনার রূপগুলি বারমাসীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। নারীর আকাঙ্খা প্রকৃতির সাথে যেন লীন হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির কোন দুঃখ নেই। সেখানে সবকিছু নিয়মেই সম্পন্ন হয়। নারীর বেলায় তার পতি অথবা প্রেমিক ব্যতিরেকে তার মনোবাঞ্ছা পূরণ হবার নয়। তাই হেমন্তে কার্তিক মাসের বৈশিষ্ট্য অবলম্বনে কাঞ্চনমালার বেদনা সঙ্গীতে প্রকাশ করছে । কবির ভাষায়

কার্ত্তিক মাসেতে সখীগো হয় গজমতি।
ধান্যাদি শস্য সব হয় গর্ভবতি ॥
ভাগ্যফলে কেহ্ ধান্য কেহ্ পায় মতি।
আমি অভাগীর হইল কুলের অখ্যাতি ॥
মিছামিছি কলঙ্কিনী হইনু জগতে।
না পরিল এক বিন্দু মোর উদরেতে ॥

তার দুঃখকে প্রকৃতি ও কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত কৃষি দ্রব্যাদির মাধ্যমে তার দাহকে প্রকাশ করেছে। কার্তিকে বনের রাজা হাতীর মাথায় হয় গজমতি। সে অত্যন্ত মূল্যবান এবং এই সময় ধানের গাছে শীষ হয়। সময়টা অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু স্বামীর অভাবে কাঞ্চনমালার কোন আকাঙ্খা পুরণ হচ্ছে না।

হেমন্তের শেষমাস অগ্রহায়ণ মাস। এই মাসে বাঙলার কৃষকদের ঘরে ঘরে আনন্দের ফোয়ারা বয়ে চলে। গ্রামের প্রত্যেক কৃষকই তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে ঘটা করে নবান্নের উৎসব পালন করে। এ উৎসবে প্রতিবেশীরাও শরীক হয়। কিন্তু এই আনন্দের মাসে কাঞ্চনমালার সব কিছু থেকেও স্বামী বিহনে উপেক্ষিত থাকতে হয়েছে। কাঞ্চনমালার সকল আনন্দ নিরানন্দে রূপ পেয়েছে। কবি তার ভাষায় বর্ণনা করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

আগন মাসেতে সখি গো বড়ই উল্লাসে।
পতি সঙ্গে নবান্ন খায় বহু অভিলাসে ॥
পতি সঙ্গে রস রঙ্গে করয় ভোজন।
মুই অভাগীর তনু অনলে দাহন ॥
লোকের কৌতুক দেখি মরি হায় ২।
এমন সময় পতি রহিলা কোথায় ॥

হেমন্তকালের রাত চাঁদের আলো আঁধারিতে উজ্জ্বল থাকে। চন্দ্র শীতল হয় বটে, কিন্তু কাঞ্চনমালার হৃদয় বিরহদগ্ধ। এই সময়ে পতি নিয়ে নবান্নের উৎসবে মুখর থাকে। কিন্তু পতি বিনে নায়িকার রঙ্গ রস সব বিষের মত মনে হয়। অন্যান্য মানুষের মিলন দেখে দুঃখে তার দিন যাচ্ছে। বন্দী জীবনে কারো কাছে মনের কথা বলার মত কেউ নেই। হেমন্তে যে কিঞ্চিৎ শীত মানুষকে মধুর ঘুমের নেশার পরশ ভুলিয়ে দেয়। হেমন্তের বিদায় বেলায় এই শীত তীব্রাকার ধারণ করে। পৌষে দূরন্ত শীত কোন বাঁধা মানে না। এমন সময় প্রিয় কেন আসে না। কাঁপুনী দিয়ে শীত আসে, শয্যায় একাকী রাত কাটাতে হয়। প্রিয় কোথায়-তার কোন সংবাদ নেই ? শীতে অচেতন হতে হয়, প্রাণে নেই চেতনা। শীতের সময় স্বামী স্ত্রী একত্রে শুয়ে থাকে। তাই তার বেদনা দুঃখ ও যতনা কবির অনুভুতিতে নারা দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

পৌষ মাসেতে সখী গো হেমন্তের জোর।
শীতে অঙ্গ থর ২ অধিক কাতর ॥
কি করিব হায় পতি নাই ঘরে।
কেমনে সুইব আমি কার গলা ধরে ॥
নারি পুরুষেরে থাকে গলাগলি করি।
পতি নাহি ঘরে আমি কার গলা ধরি ॥

দারুন হিম শীতের বনের উত্তপ্ত বাঘ থর থর করে কাঁপতে থাকে। অথচ এই হিম শীতে একাকে রাত সহ্য করতে হয়। উত্তরা শীতল বায়ু শরীর মন অবশ করে যাচ্ছে। থর থর করে সমস্ত গা কাঁপছে। সব কিছু এলেও সে এল না। হায় দুঃখ, দারুণ শীত আমার সুখকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তাই নায়িকার ব্যাথায় ব্যথিত হয়ে কবি বর্ণনা করেন

মাঘ মাসেতে সখী গো বাঘ কাঁপে বনে।
একাকী কেমনে রব পতির বিহনে ॥
থর ২ কাঁপে অঙ্গ শীতের জালায়।
এমন সময় পতি রহিলা কোথায় ॥

Dhaka University Institutional Repository

যার পতি ঘরে আছে শীত নাহি অঙ্গে।
অভাগিনী শীতে মরি পতি নাহি সঙ্গে ॥

শীত বিদায়, ফাল্গুন এলো বসন্তের আগুন নিয়ে। এই সময় প্রকৃতি অপূর্ব সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। তার সাথে সাথে ধরণী হেসে উঠে, ফাল্গুনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। গাছে গাছে ফুলের সমারোহ। কোকিল মনের সুখে ডালে ডালে নেচে নেচে তার প্রিয়াকে ডেকে বেড়ায় মিলন মাধুর্যে।

ফুলে ফুলে ভ্রমর উড়ে ফুলের সঞ্চিত মধু পান করে তৃপ্তি বোধ করে। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্যে তাল মিলিয়ে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে। ঝিঁঝিঁ পোকা সুর দিয়ে পৃথিবীতে সুরের লহড়ীতে অংশভাগী হয়। অথচ এই সময় বসন্তের অভাবে কাঞ্চনমালাকে বিরস বদনে কালক্ষেপণ করতে হয়। আর তার আশার জল নিত্য শীতল হয়। বসন্তে বাতাসে কোন ঢেউ খেলে না। এমন হওয়ার কথা নয়। তার দিনগুলি বেদনার বেদনায় কেটে যায়। তার রঙীন ও সুন্দর বসন্ত ঝরাপাতার মত নির্মমভাবে ঝরে যায়। তার বসন্তোৎসব নিরব বেদনার সাক্ষী।

ফাল্গুনে বসন্ত বাও কুহুরে কুকিলে।
নারির যৌবন জলে বিচ্ছেদ অনলে ॥
যার পতি ঘরে আছে নিভায় অনল।
অভাগীর পতি নাই কেবা দিবে জল ॥
যৌবন কালেতে পতি ঘরেতে থাকিলে।
নিভাইয়া দিত অগ্নি প্রেম জল ঢেলে ॥

ফাল্গুন মাসে মুকুল ও কড়ি নিয়ে তা ফুলে ফলে সজ্জিত হয়ে ধরণীকে সুন্দর ও মধুময় করে চৈত্রের আগমন ঘটে। নায়ক বসন্তের অভাব বিরহীনি কাঞ্চনমালাকে তিলে তিলে দগ্ধ করছে। সকল গাছে গাছে মুকুলগুলি তার পূর্ণতা নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে ভ্রমরকে গ্রহনের জন্য আহবান করছে। প্রস্ফুটিত ফুলের মধু পান করে ভ্রমর আত্মহারা হয়ে যায়। পঞ্চম সুরে গাছের আগডালে আড়ালে বসে কোকিল মনের সুখে গান গেয়ে নায়িকাকে চঞ্চল করে তোলে। ভ্রমরের মধুপানের দৃশ্য দেখে কাঞ্চনমালা দুঃখের সাগরে ভেসে যাচ্ছে যেন। তার দুঃখ ধূপের অঙ্গারের মত তার চিত্তকে দাহন করে চলেছে। কবির ভাষায় কাঞ্চানমালার দুঃখ সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

চৈত্র মাসেতে বড় ধূপের তারণ।
ছটফট করে অঙ্গ না সহে দাহন ॥
যার পতি ঘরে আছে শীতল সে নারী।

Dhaka University Institutional Repository

মোর পতি কোথা রইল আহা মরি ২ ॥
ধুপের যে তাপ তায় জৈবনের জালা।
পতি বিনে কান্দি ২ সুখাইল গলা ॥

বাংলা সাহিত্যে বারমাসীর মধ্যে যৌন আবেদনের ব্যর্থতার আকাঙখা প্রকাশ পেয়েছে। প্রেমের সাথে দেহগত মিলনের আকাঙ্খা জড়িত। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার বলেন-"সব রকমের প্রেমের মুলে আছে দেহ বা কামনা, যাকে সর্বাধিক গুরুত্ব না দিলেও অগ্রাহ্য করা যায় না। কামকে অগ্রাহ্য করা হয়নি বলেই কাব্যগুলিতে মানবীয় আবেদন অত্যন্ত বেশী।" (মমতাজুর রহমান তরফদার-বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দী পটভূমি পৃ. ২৯৮ প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৭১)।

নারীর বিরহ বেদনার বর্ণনাই মানুষের মনকে আকর্ষণ করাণো যায়। এ প্রসঙ্গে ড. মু. শহীদুল্লাহ বলেন-"যে কোনও ঘটনা যাহা গণমানসের কোন আলোড়ন আনিতে পারে তাহাই বারোমাসীর উপজীব্য" (ড. মু. শহীদুল্লাহ-বাংলা সাহিত্যের কথা, মধ্যযুগ পৃ.৩৪৯)। বারমাসীতে নারীর সংবেদনশীল বিরহের বর্ণনাই মূখ্য স্থান পেয়েছে। দৈহিক কামনার বৈশিষ্ট্যগুলি কবি হাফেজদ্দীন সুন্দর নিখুঁত ও নৈপুন্যের সাথে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতির ঋতুভেদে সাজসজ্জা বৈশাখের ভ্রমরের ফুলের মধু গ্রহণের দৃশ্য, জ্যৈষ্ঠে পাকা আমের স্বাদ, আষাঢ়ের ঘন মেঘের ঘনঘটা ও মেঘের ডাক, শ্রাবণের নদী ও সাগরের উন্মোত্ততা, আশ্বিনে আলো আঁধারি চাঁদের স্বরূপে প্রকাশ। কার্তিকে গজমতি, ধ্যান্যাদির গর্ভ, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্নের ঘটা, পৌষে হুল ফোটানো শীত, শীতে স্বামীর পরশে স্ত্রীর উত্তাপ, মাঘে কাঁপে বাঘের গা-এই সময় স্বামীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা, ফাল্গুনে বসন্তের আগুন, পাগল করা কোকিলের কুহু রব, ফুলে ফুলে সঞ্চিত মধু, চৈত্রে ধুপের তাড়ন ইত্যাদি সব বাঙ্গালীর নিত্যদিনের পরিচিত এবং মানব মনকে নাড়া না দিয়ে পারে না। কবি হাফেজদ্দীন তার ভাব পরিমণ্ডল থেকে এ সব উদাহরণ টেনেছেন। সুতরাং বর্ণনা ক্লাসিক। এতে কোন অস্পষ্টতা নেই। সরাসরি বাস্তব বর্ণনাই মুখ্য স্থান পেয়েছে। বারমাসীতে কাঞ্চনমালার কামাবেগ তীব্রাকার ধারণ করেছে। সুতরাং বারমাসীর বর্ণনায় ব্যবহৃত উপাদান মধ্যযুগের তাতে কোন সন্দেহ নেই। যৌনাঙ্কাখা মধ্যযুগের বারমাসীর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য চরিত্রের মানবীয়তা ও স্বাভাবিকতা বৃদ্ধি করেছে।

বাংলা সাহিত্যে বারমাসীর উৎপত্তি হয়েছে কৃষিভিত্তিক সমাজে থেকে, প্রাচীনকাল থেকে অশিক্ষিত ও নিরক্ষর সমাজে প্রাচীন বারমীগুলি রচিত হয়েছে। মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে লোক সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লোকসাহিত্যে বারমাসীর রূপ রীতি মূলতঃ লোক সঙ্গীতেরই অংশ। "বসন্তের দুঃখ" কাব্যের কাঞ্চনমালার বারসামী এ নিয়মের অনুবর্তী।

Dhaka University Institutional Repository

আরাকান (কেরিয়া) রাজার লুষ্ঠনবৃত্তি

আরাকান (কেরিয়া) রাজার লুষ্ঠনবৃত্তি সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি একটি বিশেষ যুগকে চিহ্নিত করে।

মূলে ছিল "আরাকান রাজায় সুনি সৈন্য পাঠাইয়া" কিন্তু লিপিকরের হাতে তা পরিবর্তীত হয়েছে। হয়তো অসাবধানতা বা মুল লেখার অস্পস্টতার জন্য হয়েছে "কেরিয়া রাজায় সুনি সন্য পাঠাইয়া"।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলাদেশের আশে পাশে কেরিয়া রাজার রাজ্য বলতে, কোন রাজ্য ছিল না।ইতিহাসের পাতায় তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং আরাকান রাজ্য ছিল তার অস্তিত্ত্ব বিভিন্ন কাব্যে পাওয়া যায় এবং এক সময় আরাকান রাজের উদারতায় মুসলমান অমাত্যগণের আদেশে অনুদিত হয় মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলি।

আধুনিক মিয়ানমারের পূর্ব নাম ছিল বার্মা। বার্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক সময় আরাকান একটি স্বাধীন রাষ্টে পরিণত হয়। আরাকানীরা রোসাংকে রাক্ষসভূমি বলে অভিহিত করত। রোমাং নাম সম্পর্কে ড. মু. এনামুল হক বলেন-"রখইং তংগী সংস্কৃত রঙ-তঙ্গ বা রাক্ষসদের উচ্চ-মঞ্চ কথার অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। 'রক্ষ' শব্দ বাংলায় 'রকুখ' রূপে উচ্চারিত হয়। বাংলা উচ্চারণে এই ভঙ্গী প্রাকৃত ভাবাপন্ন। বাংলা টং, বা টংগী, সংস্কৃত 'তুঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। 'টং' শব্দ অনাথ হওয়া ও বিচিত্র নহে। আরাকানী ইং বা 'ঈ' প্রত্যয় যোগ। রখইং তইংগী, সংস্কৃত, রক্ষতুঙ্গ, হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করার পক্ষে ভাষাতাত্ত্বিক যুক্তি আছে। এই 'রখইং' শব্দের ইংরেজী অপভ্রংশ আরাকান।" (ড. মু. এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য. ২য় সংস্করন ১৯৬৫ পৃ. ২৩১)।

আরাকানী জনপদ প্রাচীন । ৭৮৮-৮১০ খৃ. আরাকানরাজ মহৎচন্দ্র বা মহতৈং চন্দয়-এর কালে আরব বণিকরা বসবাস করত। এই আরব বণিকদের মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকায় ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হতে থাকে। রোসাং রাজগণ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই মুসলিম প্রভাবকে বরণ করে নেয়। এবং ১৪৩৪ খৃ. থেকে ১৬৪৫ খৃ. পর্যন্ত রোসাং রাজগণ তাদের মূদ্রায় 'কলিমা শাহ', 'সিকান্দার শাহ', 'সলীম শাহ', 'হুসৈন শাহ'-প্রভৃতি উপাধি স্বীয় নামের সাথে ব্যবহার করতেন। পরবর্তীতে মুঘল পাঠান আমলে এই সম্ভাবের ফাটল ধরে।

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর আক্রমণের পূর্বে এদেশীর রাজন্য বর্গের সাথে রোসাং রাজ্যের ভাল সম্পর্ক ছিল না, ছিল বৈরী ভাব। এদেশীয় সাধারণ মানুষের সাথে রাজা প্রজার সম্পর্ক ছিল অবনতিমূলক। মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ বিলুপ্ত হয়ে এক জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়। এ প্রসঙ্গে জনাব আজাহার ইসলাম বলেন-"মুসলিম শাসকগণের রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রদায়গত ভেদরেখা অনেকটা বিলুপ্ত হয়ে এক অখণ্ড বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, হিন্দু-মুসলমানের দুই সংস্কৃতি ও ভাবধারার মিলনে এক অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতি গড়ে উঠবার অবকাশ পায়। "(আজাহার ইসলাম-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি, পৃ. ৪, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২ বাংলা একাডেমী, ঢাকা)"। বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের শুরুতেই বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এর পূর্বে ছিল না বরং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী স্ব-ধর্মীদের উপর জাজপুর, উড়িষ্যা ও মালদহবাসী, বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনী "নিরঞ্জনের রুস্মা"য় বর্ণিত হয়েছে। এবং অনেককে পুঁজি পাট্টা নিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। মুসলমানদের আগমনের সাথে সাথে তারা ব্রাহ্মণদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. এনামুল হক বলেন –"১২০৩ খ্রী. তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেনকে লখ্নৌতী হইতে বিতাড়িত করিয়া বাংলায় সংস্কৃত চর্চার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়া, বাঙলা চর্চার পথ উন্মুক্ত করে"। (ড. মু. এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ. ১৩, দ্বিতীয় মুদ্রন-১৯৬৫, ঢাকা)। এভাবে বাংলা চর্চার পথ একাধিক ক্রমে ২৩৮ বছর উন্মুক্ত থাকে। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের উত্থান পতন হয়েছে। ২৩৮ বছর পরে বাংলাদেশ দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অব্যাহত আফগান-পাঠান আক্রমণে অনেক বাঙ্গালী আরাকানে আশ্রয় নেয়। গৌড়ের সুলতানদের সাথে তাদের ভাল সম্পর্ক ছিল এবং গৌড়ের দরবার দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। এভাবেই আরাকানের রাজসভায় রাজা ও রাজসভাসদগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের কাব্যের চর্চা চলতে থাকে।

দাউদ খান কররাণীর পরাজয় ও নিহত হওয়ায় বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও নিষ্কন্টক ছিল না। ঈশা খান, কুৎলু লোহানী, ওসমান খান প্রভৃতি পাঠান সর্দার মোঘলদিগকে খণ্ড যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। এভাবে তাদের সাথে যুদ্ধে দশ বছর চলে যায়।

বাংলার বারো ভূঁইয়াদের আক্রমণে মোঘলরা উৎকণ্ঠিত ছিল। তাদের দমন করতে বেশ সময় লাগে। মোঘল সেনাপতি মানসিংহ বাংলার রাজধানী রাজমহলে স্থাপন করেন। পাঠানদের সাথে মোঘলদের দশ বছর যুদ্ধ চলাকালে মগ দস্যুরা বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ করে জনপদে বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি করে।

আফগান ও মোঘল রাজশক্তির যুদ্ধ বিগ্রহে বাংলার শান্তি নষ্ট হয়। পাঠান রাজত্বকালে মগদের আক্রমণে সাধারণ জীবন অচল হয়ে পড়ে। মগদের শায়েস্তা করার জন্য ১৬১২ খ্রী. ঢাকা 'জাহাঙ্গীর নগর' নামে মোঘলদের রাজধানীতে পরিণত হয়। ওসমান খাঁ বিদ্রোহী নেতা ইসলাম খাঁকে পরাজিত ও হত্যা করে-মোঘল বিরোধীতার অবসান ঘটায়। ইসলাম খাঁর মৃত্যুতে তার কনিষ্ট ভ্রাতা মুঙ্গের হতে এসে বাংলার সুবেদারী গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ইসলাম খাঁর মত

Dhaka University Institutional Repository

বিচক্ষণ ছিলেন না। ফলে মোঘল সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে মগদুস্যরা আবার বেপরোয়া হয়ে নিরহী জনপদে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। আরাকানী মগ ও পর্তুগীজ বোম্বেটেদের মিলিত আক্রমণে ১৬১৪-১৫ খ্রীঃ ভুলুয়ার পরিস্থিতি মারাত্মাক আকার ধারণ করে। ভুলুয়ার লুণ্ঠনবৃত্তিকে কেন্দ্র করে মগ ও পর্তুগীজদের মধ্যে মন কষাকষি আরম্ভ হয়। এই সময় মুঘলবাহিনী অর্তকিতে আক্রমণ করে মগ ও পর্তুগীজদের পর্যুদস্ত করে। তারা চট্টগ্রামে পলায়ণ করে। ১৬১৮ খ্রীঃ ইব্রাহীম খাঁ যুদ্ধ পরিচালনায় করে ত্রিপুরা ও আরাকান অধিকার করে। ইব্রাহীম খাঁ অত্যন্ত বিচক্ষণ মোঘল সেনাপতি ছিলেন। এই সময় সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাদার মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দেয়। সেনাপতি ইব্রাহীম খাঁ ১৬২৪ খ্রীঃ যুদ্ধে শাহজাদার হস্তে প্রাণ হারায়। পিতা-পুত্রের দ্বন্ধ যখন চরমাকার ধারণ করে, তখন এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে আরকানরাজ বাংলায় পুনারায় লুট তরাজ আরম্ভ করে। ১৬২৭ খ্রীঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হলে শাহজাহান সিংহাসন লাভ করেন এবং কাসিম খাঁকে বাংলার সুবেদার করে পাঠান। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আরাকানীদের সাথে মোঘলদের দীর্ঘ শক্রতা আরম্ভ হয়।

১৬৫৮ হতে ১৬৫৯ খ্রীঃ শাহজাহানের অসুস্থতায় সিংহাসন নিয়ে পুত্রদের মধ্যে গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে আরাকানী মগরা পুনরায় লুট তরাজ করে জনপদকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলে। ১৬৬০ খ্রীঃ ঔরঙ্গজেবের শাসনামলে মীর জুমলা বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন এবং বিশৃঙ্খলা কমাতে সক্ষম হন। মীর জুমলা অত্যন্ত বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১৬৬৩ খ্রীঃ মৃত্যুবরণ করেন এবং বাংলার সুবেদারী গ্রহণ করেন-শায়েস্তা খাঁন। সুবেদারী পদ গ্রহণ করেই মগ দস্যুদের দমন করার জন্য বাংলার রাজধানী রাজমহল হতে ঢাকায় স্থানাতন্তরিত করেন। শায়েস্তা খাঁ মগ দস্যুদের দমন করার জন্য মোঘল বাহিনীতে নৌ-বাহিনী গঠন করে। ৮৫ বছর শায়েস্তা খান বয়সের ভারে নুব্জ্য, ফলে বাংলার বিভিন্ন স্থানে মগ জলদস্যুরা লুট তরাজ চালাতে থাকে। বাংলার অবস্থা চরমাকার ধারণ করে। তখন শায়েস্তা খার আদেশে তার বড় ছেলে বুজুর্গ উমেদ খান ১৬৬৫ খ্রীঃ ২৪ শে ডিসেম্বর মাসে মগজলদস্যুদের দমন করতে পাঠায়। বুজুর্গ উমেদ খান ৬,৫০০ চৌকষ পদাতিক সৈন্য এবং ২৮৮টি ছোট বড় নৌ-জাহাজ নিয়ে মগজলদস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই যুদ্ধে জলদস্যুরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং কিছু সংখ্যক চট্রগ্রামের দিকে পলায়ণ করে। বুজুর্গ উমেদ খান তাদেরকে চট্রগ্রাম থেকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করে। মগজলদস্যুরা আর কখনো বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় লুঠ তরাজ করতে সাহসী হয়নি।

আরাকানের রাজার লুণ্ঠনবৃত্তি থেকে জানা যায় তৎকালীন সময়ের বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবনতিময় অবস্থা। সুতরাং কাব্যটির উপাদান মধ্যযুগের। কবি সুন্দরভাবে আরাকানী দস্যুদের লুণ্ঠনবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ভাল মানিক্য আনিয়াছ সাধু সওদাগর।
মানিক্য লইয়া দেশে চলহ সত্তর ॥
কেরিয়া রাজায় সুনি সন্য পাঠাইয়া।
মানিক্য লইবে সাধু তোমাকে মারিয়া ॥
বহুধন ভাণ্ডি সাধু আনিছ সত্তর।
তৈরিত গমন কর আপনার ঘর ॥

হার্ম্মাদ

পর্তুগীজ হার্ম্মাদদের দস্যুবৃত্তি, হত্যাযজ্ঞ মোঘল আমলের সামাজিক ও অস্থিরতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। হার্ম্মাদদের লুষ্ঠন কাজে দেশীয় কিছু চ্যালা চামুণ্ডারা জড়িত ছিল। কবি হাফেজদ্দীন সেই হার্ম্মাদদের সহায়তা যারা করত তাদের একজনের পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রী জবেদ আলি মৃধা, সাং-ঝাটিবুনিয়া।
উপরেতে জার নাম লিখা আছে ভাই।
বড় দুষ্ট লোক সেই জানিবে সাবই ॥
তার পিতা আরসেদালী মৃধা ছিল।
সে বড় দুষ্ট হার্ম্মাদ দুনিয়াতে ছিল ॥

১৮০১ খৃঃ আরসেদালী মৃধা জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০৫ খৃঃ মৃত্যুবরণ করেন। এক সময় হার্মাদদের উৎপাত খুবই ভয়ংকর ছিল। তারা লুষ্ঠন, খুন, ডাকাতি চুরি করত এবং তাদের অত্যাচারে সকল মানুষ উৎকণ্ঠিত ছিল। ছোট ছোট শিশুদের বর্গী ও হার্মাদের কবিতা শুনাত ফলে তারা ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। বাংলার ইতিহাসে তারা এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা করে গেছে। বাংলার সাধারণ মানুষের উপর যারা বা যে অত্যাচার, নির্যাতন ও দস্যুবৃত্তি করত। সাধারণত তারাই হার্ম্মাদনামে আখ্যায়িত হয়েছে। সেই সমস্ত অত্যাচারী মানুষ, সাধারণ মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধা কোনটাই পেত না। আরসেদালী মৃধা ছিল সেই ধরণের অত্যাচারী। মানুষের দ্রব্যাদি জোর করে নিয়ে যেত। তার কৃতকর্মই আজ তাকে এক কলঙ্কিত ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। তারই সন্তান শ্রী জবেদ আলী মৃধার নামে পরদ্রব্য জোর করে নেয়ার গুঞ্জন শোনা যায়।

সাহিত্য হচ্ছে কালের নিরব সাক্ষী ও প্রমাণ। কালের গতিতে কাউকে তোয়াক্কা না করেই আপন গতিতে প্রচার করে যায় কৃতকার্যরত ব্যক্তিদের কৃতকর্মের কার্যাবলী। তাই সাহিত্যকে বলা হয় কালের দর্পণ।

Dhaka University Institutional Repository

পর্তুগীজ জলদস্যুরা 'হার্ম্মাদ' নামে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা করেছে। পৃথিবী যতদিন আছে, তারা ততদিন কলঙ্কিত আখ্যায় আখ্যায়িত থাকবে। তাদের নিগ্রহ ও অত্যাচারের কাহিনী শিশুমনে ভীতির সঞ্চার করেছিল। ফলে হার্ম্মাদ বর্গীদের কথা বললেই শিশুরা ভয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। হার্ম্মাদ সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক সাহেব বলেন-"তাহারা হার্ম্মাদ নামে কুখ্যাত হইয়া এদেশে চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবে। (ড. মু. এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ. ১৩৪, ঢাকা)।

এই হার্ম্মাদ জলদস্যুরা ইউরোপ থেকে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ আলাউদ্দীন হুসেন শাহের শাসনামলে বাংলায় আসে। মতান্তরে ড. মু. শহীদুল্লাহর মতে - "পর্তুগীজরা ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে আসে। (ড. মু. শহীদুল্লাহ-বাঙলা সাহিত্যের কথা পৃ. ১৩৭, মধ্যযুগ) এই বছরে দোম জোয়াও দ্যা সিলভেইরা **(Dom-da-silveira)** নামক এক পতুর্গীজ নাবিক চট্টগ্রাম বন্দরে আসেন। তিনি আলাউদ্দীন হুসেন সাহেবের কাছে যান, তিনি কোন মর্যাদা না পেয়ে তৎকালীন আরাকানে চলে আসেন। আরাকান চট্টগ্রামের পূর্ব নাম ছিল। আরাকান নদীমাতৃক ও ঘন বনবেষ্টিত এবং পাহাড়ে ঘেরা ছিল। এখানে পৃথিবীর বলতে গেলে সকল অঞ্চলের লোক ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থ রোজগার, চাকুরী, সম্মান, প্রতিপত্তির জন্য আসেন। এমনকি আরাকানী সেনা বিভাগে চাকুরী সকল দেশের মানুষের জন্য উম্মুক্ত ছিল। এখানে পৃথিবীর বহু দেশের বহু লোক আসে। কবি আলাওল বহিরাগতদের তালিকা বর্ণনা করেছেন, কবিতায় ত্রিপদী ছন্দে

নানা দেশী নানা লোক, শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ,
আইসন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবী মিশরী শামী, তুরকী হাবশী রুপী,
খোরাসানী উজ্বেগী সকল ॥
লাহরী মুলতানী হিন্দী কাশ্মীরী দক্ষিণা সিন্ধী,
কামরুপী আর বঙ্গ দেশী।
ভূপালী কুদাংসরী কান্নাই মল আবারী
আচি কোচী কর্নাটকবাসী ॥
বহু সৈদ শেখজাদা মোগল পাঠান যোদ্ধা
রাজপুত হিন্দু নানা জাতি।
আভাঙ্গ বরমা শাম ত্রিপুরা কুকির নাম
কতেক কহিমু জাতি ভাতি ॥
আরমানী ওলন্দাজ দিনেমার ইঙ্গরাজ

Dhaka University Institutional Repository

কান্টিলান আর ফরাসিম।

হিসপানী আলমানী চোলদার নাসরানী

নানা জাতি আর পতুর্গীস ॥

(সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত - পদ্মাবতী ভূমিকা পৃ. ৮৬, ১৯৬৮)।

কবি আলাওলের বর্ণনায় দেখা যায়-ইউরোপ এশিয়ার অধিকাংশ দেশের লোকজন বিভিন্ন প্রয়োজনে আরাকানে এসে বসতি স্থাপন করে। **Fernas Mendez Pinto – The voyages and adventures of Ferdinand mendez pinto translated by H. cogan, Gentlman with introduction by A. vambery London-1891.** বইটিতে আরাকানী সৈন্যদের তালিকায় রয়েছে- **"Portugals, Grecians, Venetins, Turks, Janizaries, Jews, Armeniaens, Tartars, Mogores, Abyssins, Raizbutos, Nobins, coracones, persians, Toparaes, Gizares, Tanucos, Malabares, Jaos, Achenis, Moems, Siams, Lussous of the islands, Borueo, chacones, Arracons, Pridin, Papuaas, Selebres, Mindancas, Pagus, Bramaas and Many others whose names I know not."**

গৌড়ের সুলতান মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে ১৫৩৩-১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এক পর্তুগীজ প্রতিনিধিদল গৌড়ে আসে। কিন্তু সুলতান তাদের কোন মূল্যায়ণ করেননি। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল চন্দ্রদ্বীপের বাকলারাজ পরমানন্দ রায়ের সাথে পতুর্গীজদের বানিজ্য সূত্র স্থাপিত হয়। মোঘলরা যখন যুদ্ধ বিগ্রহ ও অর্ন্তকলহে জড়িয়ে পড়ে ; তখন বাংলার স্বাধীন রাজারা সুযোগ মতো স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং পর্তুগীজদের সহায়তায় হঠাৎ আক্রমণ করে মোঘলদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। তাছাড়া এই উপমহাদেশের পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলের রাজাদের নীতি ছিল মাছের শাসনের মত। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খেয়ে ফেলে। তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজার রাজ্য দখল করে নিয়ে, রাজাকে হত্যা করত। মোঘলরা এ সুযোগ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। স্বাধীন রাজারা তখন বর্হিশক্তির সহায়তায় মোগলদের অধিকারভূক্ত এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করে অধিকারে নেওয়ার ত্রুটি করেনি।

মধ্যযুগের কবি বংশীদাসের পদ্ম-পূরাণে ফিরিঙ্গীদের উল্লেখ আছে। পদ্ম-পুরাণের রচনাকাল ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। বংশীদাস কিশোরগঞ্জ জেলার পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পদ্ম-পুরাণে লিখেছেন

মগ ফিরিঙ্গ যত বন্দুকে করিতে হত

একেবারে দশবিশ ফুটে।

কামান বন্দুক ভরি ছারিতেছে ঘড়ি ঘড়ি

যার শব্দে হস্তী ঘোড়া ছোটে ॥

Dhaka University Institutional Repository

কাৎরাভু মৈমনসিংহের পূর্ব-নাম, এখানে ফিরিঙ্গিদের যাতায়াত ছিল। তারা বাঙলার ছোট ছোট রাজাদের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগীতা পেত। ফিরিঙ্গরা রাজাদের সাহায্য সহযোগীতা পেয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে। ফিরিঙ্গিদের সম্পর্কে বলেন-ড. মু. এনামুল হক-"সপ্তদশ শতাব্দীতে বাকলা (বাকেরগঞ্জ), সন্দিকন (যশোর), শ্রীপুর (ঢাকা), ভুলুয়া (নোয়াখালী), কাৎরাভু (মৈমনসিংহ) প্রভৃতি অঞ্চলের ভূঞাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পর্তুগীজেরা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অধিকন্তু তমলুক, হিজলী, হুগলী, **(Porto Requeno)** ঢাকা, সন্দ্বীপ, চট্রগ্রাম **(Portogrande)** প্রভৃতি বন্দরে বানিজ্য ব্যাপদেশে পর্তুগীজের বসতি স্থাপিত হয়। এই ভাবেই বঙ্গে পর্তুগীজরা ছড়িয়ে পড়ে"। (ড. মু. এনামুল হক-মুসলিম বাঙলা সাহিত্য পৃ. ১৩৪)।

পর্তুগীজরা বঙ্গোপসাগর হতে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে হিজলী নদী হয়ে সরস্বতী নদী পথে সপ্তগ্রাম পর্যন্ত ব্যবসা বানিজ্য করত। ব্যবসা বানিজ্যের সাথে নিরীহ জনপদে চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, হত্যাযজ্ঞ নিয়মিত পেশায় পরিণত করে। পর্তুগীজদের অর্থনৈতিক কাজ সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন -"ষোড়শ শতাব্দীতে জলপথে ও স্থলপথে যেমন অব্যাহত গতিতে পর্তুগীজ বানিজ্য চলিতেছিল, তেমনি জলদস্যুতাও তাহদের প্রায় প্রত্যাহিক কর্মে পরিণত হইয়াছিল"। পর্তুগীজদের চুরি , ডাকাতি সম্পর্কে ড. মু. শহীদুল্লাহ বলেন-"সম্ভবতঃ ১৫৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা সপ্তগ্রামের কাছে বাণ্ডেল ও হুগলী নগরে **Golin** নামে একটি উপনিবেশ দূর্গ প্রতিষ্ঠিত করে। বানিজ্যের সঙ্গে তাহারা ডাকাতিও করিত।" (ড. মু. শহীদুল্লাহ-বাঙলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড মধ্যযুগ পৃ. ১৩৬)।

হুগলী ও ব্যাণ্ডেলে পর্তুগীজরা রোমান ক্যাথলিক গীর্জা তৈরী করে উপাসনা করতে থাকে এবং খ্রীষ্টান করার জন্য হিন্দু সমাজে তাদের যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের সাথে এদেশীয় ব্যবসায়ীরা কুলিয়ে উঠতে পারেনি। নানাদিক থেকে তারা পিছিয়ে থাকে। পর্তুগীজরা এতই দুর্দান্ত হতে থাকে তারা মোগল সুবাদার ও সম্রাটকে তোয়াক্কা করত না। উপরন্ত পর্তুগীজরা-মগজলদস্যুদের সাথে মিলিত হয়ে ডাকাতি, লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞ চালাত। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মোগল সম্রাট শাহজাহান সুবেদার কাসিমখাঁকে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠান। সুবেদার কাসিমখাঁনের হাতে পর্তুগীজরা পর্যুদস্ত হয়।

মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল (১৫৯৪-১৬০৬) কাব্যে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিদের সম্পর্কে লিখেছেন।

ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহয়া যায় হার্মাদের ডরে ॥

পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীরা পশ্চিমবঙ্গে উৎপাত, চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, অপহরণ করত। বাংলাদেশে তার মাত্রা ছিল আরো ভয়াবহ। হত্যা, চুরি, নদীপথে ডাকাতি, লুণ্ঠন ছিল নিত্য

Dhaka University Institutional Repository

নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রখ্যাত কবি আলাওল 'পদ্মাবতী' কাব্যে বর্ণনা দিয়েছেন। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে কবি আলাওল পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন। কবি তার আত্মপরিচয় দিয়েছেন-

মুলুক ফাতেহাবাদ গৌড়েত প্রধান।
তথাত জালালপুর পূণ্যবন্ত স্থান ॥
বহু গুনবন্ত বৈসে খলিফা ওলমা।
কথেক কহিমু সেই দেশের মহিমা ॥
মজলিস কুতুব তাহাতে অধিপতি।
মুই হীন দীন তান অমাত্য সন্ততি ॥
কার্যগতি যাইত পন্থে বিধির গঠন।
হার্ম্মদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরসন ॥
বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত।
রনক্ষতে ভোগযোগে আইলুং এথাত ॥
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলুং রাজ আসোয়ার ॥

কবির আত্মবিবরণে জানা যায় গঙ্গার নিম্মাঞ্চলের সমভূমি ফাতেহাবাদ পরগণার অধিপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য ছিলেন কবির পিতা। কর্ম উপলক্ষে কবি তার পিতার সাথে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে তারা পর্তুগীজ হার্ম্মাদ কর্তৃক আক্রান্ত হন। যুদ্ধে কবির পিতা নিহত হন এবং কবি আহতাবস্থায় অতিকষ্ঠে আরাকানে পৌঁছেন। সেখানে তিনি "রাজ আসোয়ার" বা অশ্বারোহী সৈন্যদলে যোগদান করেন। পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি গঞ্জলেসের জন্য কবি উচ্চপদ পাননি। আরাকানরাজ সলীমশাহ পর্তুগীজ গঞ্জলেসকে নৌ-সেনাপতি নিয়োগ করেন। সলীমশাহের রাজত্ব কাল ছিল ১৫৯৩-১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। কবি আলাওল এই সময় আহত হয়ে আরাকানে আসেন। তখন তিনি ছাত্র ছিলেন। (সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত-পদ্মাবতী, ভূমিকা পৃ. ৬৭)।

সম্রাট আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করেই বাঙলার বিশৃঙ্খলা দূর করণের নিমিত্তে মীর জুমলাকে বাংলায় পাঠান। তিনি যথাসাধ্য বাংলার বিশৃঙ্খলা ও মোঘলদের চিরশত্রুদের দমনে অনেকটা সমর্থ্য হয়েছিলেন। কিন্তু সহসা তার মৃত্যুতে আওরঙ্গজেব লৌহমানব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার করে পাঠান। তিনি আভ্যন্তরীণ গোলযোগের চিরশত্রু মগদের দমন করতে সক্ষম হন। তার সময় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ছিল খুবই কম। ১ টাকায় ৮ মন চাল পাওয়া যেত। মানুষের মধ্যে সুখ-শান্তি ফিরে আসে। এইভাবে তিনি ২২ বছর বাংলার সুবেদারীর দায়িত্ব পালন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

শায়েস্তা খানের চার ছেলের মধ্যে ১ম ছেলে বুজুর্গ উমেদখান পিতার মতই যোগ্য সেনানায়ক ছিলেন। ২য় ছেলে জাফর খান, ৩য় ছেলে আবু নাসের, ৪র্থ ছেলে ইরাদাত খান-মোঘলদের রাজকার্যে যোগদান করেন। বুজুর্গ উমেদ খান রাজকার্য ও বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে তাঁর পিতা শায়েস্তা খানকে সাহায্য করতেন। শায়েস্তা খান ৮৫ বছরের বৃদ্ধ। বয়সের ভারে নুজ্য, ফলে বাংলার ভিবিন্নস্থানে গোলযোগ ও অশান্তি পূর্বের মত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বাঙলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে লুঠ তরাজ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ইত্যপ্রকার কার্যকলাপে দেশের জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা চরমাকার ধারণ করে। শায়েস্তাখান মগজলদস্যুদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে পারলেও পর্তুগীজদের সম্পূর্ণরূপে দমন করতে পারেননি। পর্তুগীজ হার্ম্মাদরা নৌপথে সুন্দরবনের দিকে পলায়ণ করে।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর পরই মোগল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হতে থাকে। এই সময় ধুরন্ধর ইংরেজ বণিক ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলাদেশে ধীর ও মন্থর গতিতে বাণিজ্য ও শক্তির আধিপত্যের দিকে নজর দিয়ে বাহুবল বৃদ্ধি করে। সম্রাটদের নেকনজরে ইংরেজরা কালিকট, সুতানটী,গোবিন্দপুরের জলাজঙ্গল পরিষ্কার করে বানিজ্যের নামে স্থায়ী আসন করে নেয়। মূলত ১৬১৫ খ্রীঃ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম ভারতবর্ষে হুগলীতে বানিজ্য কুঠী স্থাপন করে। টোডরমল, সুজা, মীরজুমলার নৈতিকতার ফলে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। ফলে বিদেশী বণিকদের আনাগোণায় কলিকাতা, চন্দননগর, হুগলী চুচুড়া বানিজ্য ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এই সময় ইংরেজ বণিক ও পর্তুগীজ বণিকের আধিপাত্য বিস্তার পেতে থাকে। পর্তুগীজরা হার্ম্মাদ নামে কুখ্যাত হয়ে পড়ে। ক্ষমতাশীন শাসকবর্গ ও ইংরেজরা মিলে মিশে কুখ্যাত হার্ম্মাদ নামক পর্তুগীজদের দেশ থেকে বিতাড়ন করতে সমর্থ হয়। ইংরেজরা এবারে একচেটিয়া বানিজ্য অধিকার পেয়ে যায়, স্বাধীন নবাবদের কিছু উচ্চাভিলাসী কর্মচারী ও উচ্চপদস্ত ব্যক্তিবর্গের সহায়তা ইংরেজরা পেতে থাকে। মীরজাফর আলী খাঁন, ঘসেটি বেগম, রাজভল্লব, রায়দুর্ল্লভের সহায়তায় ১৭৫৭ সালের রণাঙ্গনে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যায়। ইংরেজরা কুট-কৌশলী আর হার্ম্মাদ পর্তুগীজরা ছিল লুণ্ঠনকারী। ফলে গোয়াড় গোবিন্দরা কৌশলী ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয় বাংলাদেশ থেকে চিরবিদায় নেয় এবং ইংরেজ বেনিয়ারা বানিজ্যের পসরা মেলে দেশটাকে গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলে।

পর্তুগীজ হার্ম্মাদরা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ থেকে বিতাড়িত হয়। মগরা ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এদের অত্যাচার, নিগ্রহ ও নির্যাতন এতই ব্যাপক ছিল যে, পরবর্তী কয়েক শতকে তাদের দুরন্তপনার উপাধি বেঁচেছিল। এদেশের যে সময় মানুষ সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করেছে তারাই সেই উপাধিতে ভূষিত হত। সাধারণ অত্যাচারীকেও

Dhaka University Institutional Repository

হার্মাদ নামে অভিহিত করা হত। আরসাদ আলী মৃধা জমিদারের খাজনা উঠাতে গিয়ে সাধারণ মানুষের উপর অমানুষিক নির্যাতন করেছে এবং অন্যায়, অবৈধ ও জোর জবরদস্তিতায় প্রচুর সম্পদ কুক্ষিগত করে। ফলে তার অত্যাচারের ভয়াবহতা হার্মাদ অভিধায় কলঙ্কিত হয়ে আছে। মগ, হার্মাদের দস্যুপানা মধ্যযুগের শেষ ভাগ হতে শুরু করে আধুনিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত ছিল। এ হার্মাদ অভিধায় স্থানীয় নির্যাতনকারীকে বুঝায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় কাহিনীটি শুরু হয়েছিল অনেক পূর্বে কিন্তু কালের পরিবর্তনে, প্রত্যেক কালের কিছু কিছু ছাপ কাহিনীতে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। অতএব "বসন্তের দুঃখ" কাহিনী লোকসাহিত্যে প্রচলিত ছিল।

তঙ্কা বা টাকার প্রচলন

তঙ্কা ফারসী তনখাহ তুলনীয় সংস্কৃত টঙ্কা , বা. টাকা। সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল আমলের বাংলা সাহিত্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলায় মোঘল শাসন স্থায়িত্ব ছিল প্রায় একশত আশিবছর। এই সময় মোঘলদের বৈশিষ্ট্যগুলি বাংলার সাহিত্যাঙ্গণে প্রবেশের সুযোগ পায়। মোঘল আমলের পূর্বে এই দেশে তঙ্কার প্রচলন ছিল না। মোঘলরাই সিক্কার ব্যবহার শুরু করেন। ১৫৯৪ খ্রীঃ থেকে ১৬০৬ খ্রীঃ মধ্যে কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য লিখেন। তখন বাংলার সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই অরাজকতাপূর্ণ। তিনি দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা শুধু রাঢ়েরই নয়; সমগ্র বাংলার অধিকৃত মোঘলদের শাষিত এলাকার গরীব, দুঃখী, কৃষক ও সাধারণ সমাজের একটি বাস্তব চিত্র। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু উপাখ্যান তঙ্কার ব্যবহার আমরা দেখতে পাই।

উজির হৈল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইল অরি।
কোনে কোনে দিয়া দেড়া পনের কাঠায় বুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি ॥
সরকার হৈল কাল খিল ভূমি লেখে নাল
বিনি উপকারে লিখয়ে ধূতি।
পোতদার হৈল যম তঙ্কায় আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় তঙ্কায় প্রতি ॥

কবি কঙ্কন মুকুন্দরামের লেখায় তঙ্কার ব্যবহারের প্রমাণ পাই। শায়েস্তার খাঁর সুবেদারীর সময় বাংলার তঙ্কার ব্যবহার ছিল। এ সম্পর্কে ড. অসীতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেন "যিনি প্রাপ্য বেতন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া ও ঔরংজেবের শ্যেনচক্ষুকে ফাঁকি দিয়া এক কোটি বিরাশি লক্ষ তনখা হজম করিতে পারিয়াছিলেন-------। ১৬৯৮ খ্রী. বিদ্রোহী নেতা রহিমখাঁর শিরচ্ছেদ করা হইল। ফলে অন্যান্য বিদ্রোহীরা পালাইয়া গেল। কেহ বা তনখার বিনিময়ে মুঘলবাহিনীর লবণ গ্রহণ করিল।" (ড. অসীতকুমার বন্দোপাধ্যায়-বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ৩য়

Dhaka University Institutional Repository

খন্ড, পৃ. ২৭ ও ২৯)। মোঘল আমলে টাকার পরিবর্তে তঙ্কার ব্যবহার ছিল। কবি হাফেজদ্দীন সপ্তম অধ্যায় তঙ্কা সম্পর্কে লিখেন

নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া পাত্র মিত্রগণ।
মানিক্য আনিয়া দিল সাধু বিদ্যামান ॥
মানিক্যেতে সওদাগর বহুতঙ্কা দিল।
নৃপতি প্রণাম করি নৌকায় চলিল ॥
সুভক্ষণে আসিলাম বানিজ্য করিতে।
বহুমূল্য নিরাঞ্জন ধন দিল তাতে ॥

পলাশীর যুদ্ধের পরাজয়ের পর এদেশে তঙ্কার কোন ব্যবহার ছিল না। তঙ্কা ব্যবহার মোঘল আমলের। এ থেকে প্রমাণীত হয় যে, কাব্যটির কাহিনী মোঘল আমলেও প্রচলিত ছিল এবং মোঘল আমলের একটি বৈশিষ্ট্য কাব্যাঙ্গনে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

নরবলি প্রথা

লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রাচীন শাখা রূপকথা। রূপকথাকে জার্মানীরা **Marchen** বলে অভিহিত করে। ইংরেজরা বলে **Fairytale,** ফরাসীরা **conte populaire** বলতে চান এবং বাংলায় 'রূপকথা' বলে পরিচিত পেয়েছে। রূপকথা বাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। লোকসাহিত্যের মধ্যে যতগুলো শাখা রয়েছে তার মধ্যে 'রূপকথা' সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। রূপকথা'র মধ্যে 'নরবলি প্রথা' প্রাগৈতিহাসিক কালের এক বর্বর আদিম সমাজের প্রচলিত প্রথা।

বর্তমান যুগে 'নরবলি প্রথার' কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে হিন্দু সমাজে কিংবদন্তীর মত প্রচলিত আছে, কোন এক সময় হিন্দু সমাজে দেবতাকে খুশী করার জন্য, দেবতার সামনে কাপালিক-সম্প্রাদায়ের পুরোহিতরা 'নরবলি' দিত। বাংলার লোকগল্প, লোককাহিনী, কাহিনীকাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে 'নরবলি প্রথার' প্রচলন ছিল তার উদাহরণ পাওয়া যায়। এমন কি ইতিহাসের দিকে তাকালে এ সত্যতার প্রমাণ মিলে। সম্রাট আলাউদ্দীনের (১৪৯৩-১৫১৯) রাজত্বকালে তার একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ত্রিপুরার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ধৃত হন। এই সেনাপতি নাম মমারক খাঁ (মোবারক খাঁ)। তাকে ত্রিপুরায় অন্তর্গত উপদয়পুরের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন কালীমন্দিরে বলি দেয়া হয়েছিল। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন 'তাঁহার অন্যতম সেনাপতি মমারক খাঁকে ত্রিপুরেশ্বর যুদ্ধে পরাস্থ করিয়া উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন কালীমন্দিরে বলি দিয়াছিলেন'। (ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ, ২য় খণ্ড. পৃ. ৬৬৩)।

কাপালিকদের নরবলি প্রথার প্রচলন বাংলাদেশসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছিল। নরবলি প্রথা কাপালিক ধর্মের প্রমাণ বহন করে। রাক্ষস খোকস দ্বারা মানুষের মাংস ভক্ষণ প্রাচীন আদিম

Dhaka University Institutional Repository

বা বর্বর যুগের পরিচয়। বাংলাদেশেও নরবলি প্রথার প্রচলন ছিল কিন্তু সমুদ্রের তীরবর্তী হওয়ায় মুসলমানদের আগমনের ফলে এ অঞ্চল থেকে এ প্রথার বিলোপ হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এই পৈচাশিক প্রথার প্রচলন ছিল। যা পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় স্থান পেয়েছে। রূপকথার সমাজ একটি মিশ্র সমাজ। নরবলি প্রথা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বর্বরতার পরিচয় তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

ব্রাহ্মণদের দোর্দণ্ড প্রতাপে জনসাধারণ বোকা বনে যেত। তারা যা বলত তাই জন সাধারণকে পালন করতে হত। এই ব্রাহ্মণরা দেবতা হিসাবে স্থানীয়ভাবে পূজিত হয়। এই দেবতাদের আদেশ মানে স্বয়ং ঈশ্বরের আদেশ রূপে জ্ঞান করত। যুগ মানসের পরিবর্তনে ব্রাহ্মণরা দেবতা বনে যায়। তারাই সাধারণ মানুষকে পূজা-পার্বণ বা নতুন কিছু করার আদেশ করত। সাধারণত তারা তাদের কথাই জনসাধারণের কাছে স্বপ্নে দেবতা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছে বলেই প্রচার করে। নরবলি প্রথার ব্যাপকতা ছিল। শুধু দেবতার সন্তুষ্টীই নয়। যে কোন বৃহৎকাজে নরবলি দেয়া হত। পূর্বকালের হিন্দু জমিদার ও সামান্তদের ঘর বাড়ির মধ্যে অন্ধকুপে নরবলি দেওয়া হত। পরিত্যাক্ত জমিদার বাড়ীর গুপ্তপথের অন্ধকুপই তার প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। কবি হাফেজদ্দীন 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যে নরবলির আদেশ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন

স্বপনে দেখেন সাধু কহে একজন।
সুনহারে সওদাগর দুঃখ কেনে মন ॥
এক নরবলি দান দেহ ডিঙ্গা পরে।
তবেত জলেত ডিঙ্গা নামিবে সত্তরে ॥

লোকসাহিত্যে বিভিন্ন সমাজের রসোপকরণ এসে মিশ্রিত হয়েছে-তার পরিচয় প্রকাশ করে। গঙ্গাধর সাধু বানিজ্য উপলক্ষে অনেক টাকা পয়সা খরচ করে এক বৃহৎ নৌকা নির্মান করান। নির্মান শেষে নৌকা পানিতে নামানো যাচ্ছে না। তখন স্বপ্নে দেবতা কর্তৃক আদিষ্ট হয় নরবলি দেয়ার জন্য। মধ্যযুগের কাহিনী কাব্য 'সতীময়না লোর-চন্দ্রানী' তে আমরা দেখতে পাই রাজার প্রিয় পাত্র প্রভাতন নামক এক সওদাগরের নৌকা অচল হয়ে পড়ে। তখন স্বপ্নাদিষ্ট হয় নরবলি দেওয়ার জন্য। নরবলি দিলে নৌকা পানিতে ভাসবে। রাজকারাগারে যোগ্য কোন অপরাধীকে না পেয়ে কিশোর আনন্দ বর্মাকে নরবলির জন্য সওদাগরের হাতে দিয়ে দেয়া হয়। তুলনীয়

১. দৈবগতি প্রভাতী মহা সাধু জানি।
মহা চিন্তা পাই সাধু শুতিলা রজনী ॥
নিশি শেষে স্বপ্ন দেখিলা সাধুবর।
কাটিলে মনুষ্য এক ডিঙ্গা অগ্রসর ॥

Dhaka University Institutional Repository

নররক্ত পূজা দিলে চলিত বুহিত।
দেববাণী স্বপনে শুনিলা আচম্বিত ॥
২. নৃপে বলিলেক সাধু আর নাহি যাও।
সাধু বলে দৈবগতি নাহি চলে নাও ॥
এ নিশি দেঁখিলু স্বপ্ন অপরাধী জন।
তুরিতে সাধুরে দিয়া তুষ্ট কর মন ॥
(আলাওল বিরচিত-সতী ময়না লোর চন্দ্রানী পৃ. ৪৬)

মধ্যযুগের অনেক কাহিনীর সাথে নরবলি প্রথার প্রচলন আছে সুতরাং নরবলি প্রথা মধ্যযুগের সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

শৃঙ্গার

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে আদিরসের প্রয়োগ দেখা যায়। তাই বলা যায় 'শৃঙ্গার' এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। যুগের প্রেক্ষাপটে শৃঙ্গার এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আদি রসে রসাসিক্ত কাহিনী গণমানসে বিশেষ আকর্ষণ ও আনন্দময় করে তুলতে পারে। রসাসিক্ত পংক্তি রচনাই কবি মনের ধর্ম। সংস্কৃত আলঙ্কারিক 'ভরত' রসকে সাহিত্যের বীজ ও ফল বলে অভিহিত করেছেন।

যথাং বীজাদ ভবেদ বৃক্ষৎ পুষ্পং ফলং তথা।
তথাং, মূলং, রসাঃ সর্বে ভেত্যো ভাবা ব্যবস্থিতা ঃ।

পাঠকগণ কাব্য পাঠ করে রসাভিষিক্তভাবে তন্ময় প্রাপ্ত হন। **Hamilton** এর ভাষায়- **"Poetry as such is to be judged simply by the quality fo imnaginative experience it gives and not by the test of moral goodness or of truth in reference to something outside ityself."** শ্রীশচন্দ্র দাস একে বলেছেন- **"Product of the poets mind".** অর্থাৎ কাব্যসৃষ্টি কবি মনের কাল্পনিক এক অনবদ্য সৃষ্টি। বিশেষ করে কাব্য পাঠ করে মানুষ সংসার জগত থেকে ক্রমে ক্রমে কল্পনার পাখায় ভর করে এবং সৌন্দর্য জগতে গিয়ে মানুষের জীবনের গভীরতম রহস্য উদঘাটনে পরিবৃত্ত হন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একে "পদ্মের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যেই তাহার অধিষ্ঠান" বলে অভিহিত করেছেন।

তাই রসের মধ্যে শৃঙ্গারই প্রথম স্থানের অধিকারী। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় কাব্যেই শৃঙ্গার বা আদি রসের প্রয়োগ রয়েছে। কবির ভাষায় –

প্রিয়ার নিষ্ঠুর শুনি সঙ্গে যাইবার।
কাম রসে মজি গেল কুমার কুমারী ॥
উড়ে ২ জড়ি তবে সেঙ্গার করিল।

Dhaka University Institutional Repository

কুমারীর মনস্তাব কুমার রাখিল ॥
দোহার পুড়িল সাদ অতি সুললিত।
কৌতুকেতে শেষ রায় নিদ্রায় ঘটিত ॥
করে ২ গলে ২ অঙ্গে ২ ধরি।
মহাসুখে নিদ্রা যায় কুমার কুমারী ॥
হেনকালে নিশি গতে হইল বেহান।
কুমার কুমারী দোহে করিলেক স্থান ॥

তুলনীয়

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাপদে বহুক্ষেত্রেই শৃঙ্গার রসের উদাহরণ দেখতে পাই। অভিসারের একটি চিত্রের বর্ণনা

দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরু জাই ॥ ধ্রু ॥
আইসনী চর্য্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইল।
কোড়ি মাঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইল ॥ ধ্রু ॥
(আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত-চর্যাগীতি পৃ. ৬৪)।

অভিসারিকা দিনের বেলায় কাকের ডাকে ভয় পায়। অথচ রাত্রি কালে অভিসার যাত্রায় কোথাও যেতে ভয় পায় না। আদি রসের এমন সুন্দর বর্ণনা অতুলনীয়।

দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ কখনো কখনো যৌনতার মাধ্যমে বেসাতি করত তার নিখুঁত চিত্র আমরা পাই

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেসী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥ ধ্রু ॥
(আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত-চর্যাগীতি পৃ. ১৫১)।

নগরের প্রান্তে ছোট একটি ঘর। প্রতিবেশী কেউ নেই। সেখানে বাস করে এক দরিদ্র পরিবার। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারনে তাদের সংসার চলে না। হাড়িতে ভাত নেই অথচ সুযোগ বুঝে লম্পট পুরুষ রোজ আসে অতিথি বেশে।

ইন্দ্রিয় ভোগের লালসার কথা চর্যাপদগুলোতে স্থান পেয়েছে। চর্যাপদগুলো রূপকার্থে ব্যবহৃত হলেও বাস্তব জীবনের কামনা বাসনার কথা বর্ণিত হয়েছে। এই পদগুলো অত্যন্ত বাস্তব ও তৎকালীন প্রচলিত সমাজের যৌন সম্ভোগের কথাই বার বার স্থান পেয়েছে। যৌন সম্ভোগের চিত্র ও যৌন প্রতীক ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যের একটি বিশেষ রীতি।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের প্রাচীন নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে আদি রস বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বাৎসায়ণের কামশাস্ত্র এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃতে আদি রসের প্রয়োগ বড়ু চণ্ডীদাস তার কাব্যে করেছেন। তিনি মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে প্রাচীন। তার কাব্যে নর-নারীর অকৃত্রিম কামনা-বাসনা বলিষ্ঠরূপ পেয়েছে এবং কবির কবিত্ব শক্তির দুর্বার পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রকাশ যেন সকল কালের সবল মানুষের বলিষ্ঠ কামনায় উদগ্র প্রকাশ। সাধারণ মানুষের প্রেমলীলাই তার কাব্যের মুখ্য উপজীব্য বিষয় ছিল।

১. দুতরে তারি বোঁ তোক না করিহ ভর।
সরস শৃঙ্গার দেহ নাত্রর ভিতর ॥
ধাঁরে ঝঁরে রাধিকার নয়নের পানী।
অধিক করুণা করে চন্দ্রাবলী রাণী।
২. এ বোল সুপিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের হরিষে।
নাঅ ডুবায়িআ রাধা কোলে করি ভাযে ॥
আলিঙ্গন পাইল কাহ্নাঞিঁ রাধার তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥

(আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত-শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন পৃ. ৫৫,৫৬)।

পদাবলী সাহিত্যে আদি রস এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পদাবলী সাহিত্যে ও আদিরসের ব্যবহারের উদাহরণ পাওয়া যায়। পদাকর্তাগণ আদিরসকে এক বিশেষ স্থান দিয়েছেন মুখ্য ও গৌন ভেদে। মুখ্য সম্ভোগ চার প্রকার

(ক) সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ

(খ) সংকীর্ন সম্ভোগ

(গ) সম্পন্ন সম্ভোগ

(ঘ) সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ।

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগের উদাহরণ কবির ভাষায়

যব দুঁহু নয়ন নয়নে ভেল ভেট।
সচকিত নয়নে বয়ন করু হেট ॥
সোঁপলু যবহি করহি কর আপি।
সাধসে ধয়ল দুঁহুক তনু কাঁপি ॥
যব দুঁহু পায়ল মদন শয়ান।
না জানিয়ে কৈছে কয়ল পাঁচবাণ ॥

Dhaka University Institutional Repository

গোবিন্দদাস কহ তুহিঁ সে সেয়ানী।
হরি করে সোপাঁলি হরিণি নয়ানী ॥
(হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়– পদাবলী পরিচয় পৃ. ১১১)

সংকীর্ন সম্ভোগ

যব হরি ধয়লহি অঞ্চল পাশ।
তৈখনে ঢর ঢর তনু পরকাশ ॥
যব পহু পরশল কঞ্চুক সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পুরল সব অঙ্গ ॥
পুরল মনোরথ মদন উদেশ।
রায় শেখর কহ পিরিত বিশেষ ॥
(হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়– পদাবলী পরিচয় পৃ. ১১২)

সম্পন্ন শৃঙ্গার আগতি ও প্রাদুর্ভাব উপায়ে সম্পন্ন হয়। সমৃদ্ধিমান শৃঙ্গার নায়ক-নায়িকা বিচ্ছেদজনিত কারণ লুপ্ত হয়ে পুনরায় মিলনকে সমৃদ্ধিমান শৃঙ্গার বলা যায়। গৌন শৃঙ্গার চার প্রকার উপায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। পদাবলী সাহিত্যে এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

মধ্যযুগের কাহিনী কাব্যে আদিরসের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীরের " ইউসুফ জুলেখা" কাব্যখানি চতুর্দশ শতাব্দীর। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন ও পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের মধ্যবর্তী। মুসলমান কবিগণের মধ্যে তিনিই প্রাচীনতম কবি। কাব্যটি সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে রচিত। কাব্যটি আল-কুরআনের "সুরা ইউসুফ" অবলম্বনে লিখিত হলেও প্রাচীন-মধ্যযুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্য-আদি রসের ব্যবহার করেছেন। হযরত ইউসুফের জন্য বিশেষ মহল নির্মান করেছেন আজিজ মেছেরের স্ত্রী জুলেখা। সেই মহলে যে বিচিত্র চিত্রাবলী সংযুক্ত করা হয়েছে তা দেখলে শৃঙ্গারের চেতনা জাগ্রত হয়।

১. চিত্রের লেখিত জথ অঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ।
শৃঙ্গার কর এ সুখে রতি রস রঙ্গ ॥
কামভাব বলে ঢাক করে আলিঙ্গন।
খেনে খেনে ক্রিয়াছলে চুম্বায় বদন ॥
(শাহ মুহাম্মদ সগীর–ইউসুফ জুলেখা পৃ. ১৯৫)

২. বাহু ছাট করে করে মনুরঙ্গ আশা।
খেনে পৃষ্ঠে খেনে দৃষ্টে খেনে রঙ্গ হাসা ॥
(শাহ মুহাম্মদ সগীর – ইউসুফ জুলেখা পৃ. ১৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সাজসজ্জা করে ঘর সাজানো হল। এরূপ সজ্জিত ঘরে প্রবেশ করে প্রথম দর্শনেই মানুষ কামাতুর হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ইউসুফকে (আঃ) সেই সজ্জিত ঘরে দাসীকে পাঠিয়ে আনা হল। এবং হযরত ইউসুফকে (আঃ) নানা ভাবে কামোতেজীত হবার জন্য ফুসলাতে থাকে। কবির বর্ণনায়

দংশিলেক নাগে মোক প্রাণ মাত্র শেষ।
বিষ আচ্ছাদিল তনু মোহিত বিশেষ ॥
তাক আশা দেঅ কালি নামাইবা বিষ।
এহি ভরসা এ প্রাণ ন রহে উদ্দিশ ॥
ব্যাধি এ পীড়িত মোর বিকল শরীর।
ঔখদ দর্শনে প্রাণ ন রহে সুস্থির ॥
এহেন নির্জন পুরী বিরল সম্ভোগ।
পরিহরি লজ্জা ভীত কর উপভোগ ॥
(শাহ মুহাম্মদ সগীর–ইউসুফ জুলেখা পৃ. ২০২)

জুলেখার প্ররোচনায় প্ররোচীত না হয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ) অটল থাকেন। কোন মতেই রাজী হয়নি। অতঃপর জুলেখা কামান্ধ ও উন্মাদ হয়। ত্রিপদী ছন্দে কবি বলেন।

কামকলা কেলি রঙ্গ রচিল ইসুফ সঙ্গ
নানা রস বিলাস বিধান।
ছলিতে ভাবের মন বলে করে আলিঙ্গন
ইসুফ স্থগিত ধীরমান ॥
জলিখা আপনা সুখে চুম্বএ ইছুফ মুখে
ইছুফ রহএ অধোমুখী।
করএ অধর পান বলে করে আলিঙ্গন
কেলি কলা রস নানা ছন্দে।
গলে গলে কন্দে কন্দ শৃঙ্গারের অনুবন্ধ
ইসুফ পড়িয়া গেল ধন্ধে ॥
ইসুফ বসন গুপ্ত জলিখা করএ মুক্ত
ইছুফে বান্ধএ পুনর্বার।
জঘমে জঘম তাড়ি উরু উরু একাকারি
সমজুক্ত নিকটে শৃঙ্গার ॥
(শাহ মুহাম্মদ সগীর–ইউসুফ জুলেখা পৃ. ২০৮-২০৯)

Dhaka University Institutional Repository

নিজাম শাহের রাজত্বকালে 'লাইলী মজনু' কাব্যখানি কবি দৌলাত উজির বাহরাম খাঁন রচনা করেন। দৌলত উজির থাকাকালীন সময়ে কবি কাব্যটি রচনা করেন। যদিও এটি একটি রূপক কাব্য। তবুও রূপকের আড়ালে মধ্যযুগের রীতি অনুযায়ী শৃঙ্গার রসের অবতাড়না হয়েছে, আশুক-মাশুকের আবরণে। কবি বলেন

১. অন্যে অন্যে দোহান হৈল পুনি।
দহিল দোহান প্রাণ প্রেমের অগুনি ॥
২. মিলন হইল পুনি হইলা বিচ্ছেদ।
দোহানের হৃদয়ে জন্মিল কামখেদ
৩. নিদয়া কান্ত কথাটি নাহি আত্র।
কাম হুতাশন দহএ দেহা ॥
৪. মনোরঙ্গে বসিলেন্ত কুমারীর পাশ।
কামাতুর হইয়া করিব পরিহাস ॥
৫. বিরহ আনল মোর হৃদয় মাঝার।
আন জন সঙ্গে তুক্ষি ভুঞ্জহ শৃঙ্গার ॥

(দৌলৎ উজির বাহরাম খা বিরচিত-লাইলী মজনু পৃ.১৪৩, ২০১, ২১৬,২২০)।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবি আলাওল একাধারে কবি ও পণ্ডিত এই দুইটি অভিধায়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ছিলেন মূলত অনুবাদক। অনুবাদের মধ্যেই তার স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। কবি বিভিন্ন ভাষায় দক্ষ ছিলেন। ফলে তার বৈদগ্ধতা আমাদেরকে মোহিত করে। তিনি একজন রোমান্টিক কবি। এই রোমান্টিকতার পথ ধরেই আদিরস তার কাব্যে স্থান দখল করে নিয়েছে। বাগ-বৈদগ্ধতায় কবি কাব্যিক রূপায়ণে শৃঙ্গার রসের ব্যবহারে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন।

রত্নময় চর্তুদোলে তুলি কন্যাবর।
আনন্দে আসিল যথা রসের বাসর।
সুখে রাত্রি বঞ্চিলা করিয়া সুখ রস।
শাহা চিত্ত অতিশয় প্রেমে হইল বশ।
যেই ইন্দ্র শশী কিবা কামদেব রতি
নতু এক কায়া দোহ শঙ্কর পার্বতী।

(আলওল বিরচিত-সিকান্দার নামা পৃ. ১৪৭)

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের কাব্য প্রধানত কাহিনীপ্রধান এবং বর্ণনা নির্ভর। ফলে কবির কাব্যের মধ্যে সমকালীন সমাজ জীবন পরিস্ফুটিত হয়েছে। সমকালীন সমাজের চিত্র চিত্রিত হয়েছে। শৃঙ্গার বা আদিরস মধ্যযুগের একটি বিশেষ দিক। সতীময়না লোরচন্দ্রানী কাব্যে সমকালীন জীবনের রূপায়ণ আমরা পাই।

ক্ষেণে বাচম দক্ষিণেত ক্ষেণে উর্ধে হেঁটে।
যেন দুই মল্লা যোদ্ধা উলটে পালটে ॥
ক্ষেণে ২ ছারি বান সবলে চাপএ।
যেন পাক্ষী ধরি নখে সাচাঁনে ছিত্তএ ॥
শয্যক্ষেত্রে জড়াজড়ি দুই কাম রণ।
দূর হৈল মধ্য হতে লজ্জার বসন ॥
করে গ্রীবা ধরিয়া ভেদিল বসগড়।
গ্রহিয়া চিবুক কুচ চুম্বএ অধর ॥
কুচ কণ্ঠ গ্রীবা ধরি কটি রসস্থলি।
চিরএ নিতম্ব উরু নিতম্ব কমলী ॥
কামমদে রৌরবে ভূঞ্জএ রতিকলা।
চিরদিন অনভ্যাসে কাতরিত বালা ॥
(আলওল বিরচিত-সতী ময়না লোরচন্দ্রানী পৃ. ১১৪)

পণ্ডীত কবি আলাওল তার পদ্মাবতী কাব্যে শৃঙ্গারের সুন্দর বর্ণনা করেছেন। শৃঙ্গারের কলাকৌশল ও আসন পদ্ধতির স্থূল বর্ণনা তার হাত থেকে বাদ পড়েনি। সেখানে কৌশল ও কাম দক্ষতাই প্রধান হয়ে উঠেছে। বিপরীত বিহারের দেহ সর্বস্ব বর্ণনা করেছেন। কবির প্রকৃতি মধ্যযুগীয় বিরুদ্ধ নয়। কারণ মধ্যযুগের প্রায় প্রত্যেক কবি আদিরসকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

রতি শাস্ত্র জ্ঞাতা দুই গুণি রতি রসে।
করএ বিবিধ কেলি অশেষ বিশেষে ॥
উড়ে উড়ে লাগাইয়া শুতিল শয়নে।
যেন পক্ষী ধরি নখে বিন্দয় শাসনে ॥
কঠিন হিয়ার দুই শ্রীফল কঠি।
গড় আলিঙ্গণে রহে কাঙ্গুরার চিন ॥
ক্ষেনেক দক্ষিণে বামে ক্ষেণে উর্ধে অধে।
দুঁহু মিলি উলটি পালটি রতি যুদ্ধে ॥

Dhaka University Institutional Repository

সঘন চুম্বএ ক্ষেণে ক্ষেণে মধুপান।
নানামতে রস কেলি কৈল সমাধান ॥
রতি রসে বিভোর হৈলা দুইজন।
দূর হৈল অঙ্গ হইতে লজ্জার বসন ॥
(আলওল বিরচিত- পদ্মবতী পৃ.৩৬২, ৫৪৬)।

কবি সৈয়দ সুলতান ১৫৮৪-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবীবংশ রচনায় হাত দেন। মুসলিম সমাজকে ইসলামী ইতিকথায় ও ঐতিহ্যে দীক্ষাদান করাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। সৈয়দ সুলতানই প্রথম ব্যক্তি যিনি নবী-রাসুলের ইতিবৃত্ত ও ইসলামের মর্মকথা বাংলা ভাষায় রচনা করেন। মুসলিম মনে ঐতিহ্য, চেতনা, আত্মপ্রত্যয়, ও স্ব-ধর্মে গৌরব জাগ্রত করাই ছিল কবির প্রত্যাশা।

হযরত আদম (আঃ) ছিলেন স্বর্গবাসী কিন্তু নিঃসঙ্গতা ও বিমর্ষতাই ছিল তার নিত্য সঙ্গী। আল্লাহতায়ালা তার দুঃখ বুঝে, তার সঙ্গী সৃষ্টি করলেন। আদমের অবচেতন জীবন স্বপ্ন সফল হল। দাম্পত্যেই মানব জীবনের পূর্ণতা। কাম ও ক্ষুধা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা স্বীকৃত হল। কামচর্চায় অসংযম এবং ক্ষুধা নিবৃত্তিতে লোভের প্রশ্রয়ই পাপ। এ অসংযম ও লোভই হচ্ছে শয়তান প্রমূর্ত ইব্লিস। তাই নিয়ম-সংযম ও রীতি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য। কিন্তু শয়তান সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে বিজয়ী হতে চেয়েছে। শয়তান রিপুকে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। তাই আমরা নবীবংশে রিপু তাড়িত অসদাচারের শৃঙ্গারের বর্ণনা পাই।

১. চ্যুতাস্কুর দেখি যেন কোকিল আকুলি
আদম হাওয়াএ তনে রহে মিলি।
আদমের মন আশা জানি নিরাকারে
আজ্ঞা কৈলা বিবি মনে রতি ভূঞ্জিবারে।
জিব্রাইল আদমক কৈলা অনুসার
আজ্ঞা কৈলা বিবি সনে ভূঞ্জিতে শৃঙ্গার।
আজ্ঞা পাই আদম হাওয়াক কোলে লৈলা
শৃঙ্গারের আশে কোলে তুলি বৈসাইলা
২. আরদিন পয়গাম্বরে সারার সহিত
কৌতুকে গোঁয়াইল নিশি বিশেষ পিরীত।
কুমার পতির মনে ভুঞ্জিয়া সুরতি
শুভক্ষণে সতী নারী হৈলা গর্ভবতী।
(আলওল বিরচিত- নবীবংশ, পৃ. ১১৩, ৪৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। মঙ্গলকাব্যের সময় সীমা চারশ বছরের কিছু বেশী। এর মধ্যে মনসা, ধর্ম, চণ্ডী ও অন্নদা মঙ্গল প্রধান। এ ধারার কাব্যগুলোর মূখ্য উদ্দেশ্য দেবী মাহাত্ব থাকলেও প্রাকান্তরে মানুষের কথাই মূখ্য হয়ে উঠেছে। মানবের কাছে দেবতার পরাজয় হয়েছে। দেবতাদের ধর্মীয় আবরণে সাধরণ মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও রাষ্ট্রীয় যাতাকলের নিস্পেষণের ছবি ফুটে উঠেছে। অন্নদামঙ্গলের শ্রেষ্ঠ ও শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর নবাবী আমলের কবি ছিলেন (১৭১৭-১৭৫৭)।

কাব্যজগত ও সামাজিক জীবন একে অপরের প্রতিচ্ছবি। যে কোন কবির কাব্যে তৎকালীন প্রচলিত সমাজের ছাপ অবশ্যই থাকবে। সামাজিক জীবন ছাড়া কাব্যিক জীবন অচল। পাঠক সমাজ কাব্যের মধ্যে তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক জীবনকে খুঁজে পান। কবি ভারতচন্দ্র রাজদরবারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই জন্য তার কাব্যে নাগরিক জীবনের জৌলষ, প্রত্যয় ও মধ্যযুগের রীতির ধারাণুযায়ী আদিরস প্রধান্য পেয়েছে।

পার্বতীর বয়স হলে শিবকেই স্বামীরূপে পেতে চায়। কিন্তু শিব ধ্যানমগ্ন থাকায় কামদেবের মাধ্যমে ধ্যানভগ্ন করা হয়। এর পরেই মদনভস্ম ও রতি দেবীর বিলাপ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। শাপগ্রস্ত হয়ে তার স্ত্রীরা মর্তে চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী নাম নিয়ে আসে। কবির ভাষায়

১. ধনমত্ত অতি লইয়া যুবতী
ও করে কামবিহার।
২.অতি মত্ত মদে নাগনে আপদে
কহে কুবেবের বেটা।
এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা ॥
এ সুখ জামিনী এ নব কামিনী
এ আমি নব যুবক।
এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক।

(ভারতচন্দ্র বিরচিত-মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানে নলকুবের শাপ পৃ. ৩৭)

ভবানন্দ বাড়ী গেলে তার দুই রাণী.সাধী. মাধীর মধ্যে স্বামী নিয়ে মতান্তর শুরু হয়। স্বামী নিজ বিবেক মত উভয় রাণীর সাথে মিলিত হয়। কবির ভাষায়

১. সোহাগে হইয়া সুখী ঘরে গেলা পদ্মমুখী

Dhaka University Institutional Repository

মজুমদার বড় ঘরে গেলা।
কোলে লয়ে বড় নারী　　করি তার মনোহরি
ক্ষণেক করিলা কামখেলা ॥
২. মদন প্রহরী ছিল　　খর শর ছাড়ি দিল
দুজনে বিন্ধিল এক ধারে।
কখয়ে না সহে ভর　　দুহে কামে জর জর
কামক্রীড়া করিলা বিস্তর ॥

(ভারতচন্দ্র বিরচিত-মানসিংহ ভবনান্দ উপাখ্যানে উভয় রাণী সম্ভোগ পৃ. ১০৩)

এতদ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় কবি হাফেজদ্দীনের 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যে মধ্যযুগের কাহিনীর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল আছে।

প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কাব্যের উৎস উপকরণ তৎকালীন সময়ের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ও যুদ্ধাস্ত্র। সমাজ, কাল ও কাব্যের উৎস নির্নয়ের ক্ষেত্রে রাজদরবার ও সৈন্যদের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ও যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। আজকের আধুনিকযুগের বাদ্যযন্ত্র ও যুদ্ধাস্ত্রের সাথে সেকালের বাদ্যযন্ত্র ও যুদ্ধাস্ত্রের অনেক পার্থক্য ছিল। আধুনিকযুগের আগ্নেয়াস্ত্র, রকেট, ক্ষেপনাস্ত্র, আনবিক বোমা, কার্পেট বোমা, নাপাম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা। আর সেকালে ছিল ধারালো খড়গ, তরবারী, তীর, ধনুক, বর্শা, গদা, মুগর, লোহার মুগুর, বেড়জাল, সুরকী, লাঠি ইত্যাদি অস্ত্র-সস্ত্র। এ যুগে বসে সে যুগের অস্ত্র-শস্ত্রের কথা তুলনা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্রযুক্তিতে মানুষ অনেক অগ্রসর হয়েছে।

প্রাচীনযুগে মানুষেরা পাথরের তৈরী অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করে আত্মরক্ষা ও পশু-পাখী শিকার করে জীবন ধারণ করে। তার পর ধীরে ধীরে উন্নত চিন্তা-ভাবনার উদ্ভব হতে থাকে। ফলে পৃথিবীতে মানুষ বৃদ্ধির সাথে সাথে নব নব চিন্তা-ভাবনার যোগ হয়। মানুষ ক্রমান্বয়ে উন্নততর অবস্থার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রাচীনযুগের অবসানে পাথরের অস্ত্র শস্ত্রের যুগের অবসান হয়ে লৌহযুগের আবির্ভাব হয়। লৌহযুগের সময়, মানুষ ধারালো অস্ত্রের তৈরী ও ব্যবহার শিখে। ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে অতি সহজে মানুষ তার শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতে পারত। যাদুঘরে রক্ষিত পাথরের অস্ত্র ও লৌহযুগের অস্ত্রের সাক্ষ্য বহন করে। সুতরাং ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্রের ইতিহাস ও তালিকা প্রস্তুত হওয়া উচিত। রাজা-বাদশার বা রাজবংশের তালিকা প্রণয়ন বা যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনাই একমাত্র ইতিহাস নয়। (আব্দুল খালেক মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে

Dhaka University Institutional Repository

লোক উপাদান পৃ.১)। অতীত জীবনের ব্যবহৃত প্রত্যেক পদার্থই জাতির শিল্প সাহিত্যের পরিচিতি তুলে ধরে।

পর্তুগীজ জলদস্যুদের মাধ্যমে এদেশের রাজন্যবর্গ বন্দুকের ব্যবহার শিখে। পর্তুগীজরা বন্দুক ও কার্তুজের ব্যবসা নিয়ে এদেশে আসেন। এবং সুযোগ পেলেই নৌপথে ও জনপদে চুরি, ডাকাতি হত্যা এবং লুটতরাজ করত। মোঘল আমলেই কামানের ব্যবহার শুরু হয়। তবে সে কামানে কোন গোলা ব্যবহৃত হত না। ঐ কামান দিয়ে শত্রুপক্ষের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হত। শের শাহের কামান, ঈশাখাঁর কামান, মীর জুমলার কামান-আজ কালের সাক্ষী হয়ে আছে। মোঘলদের স্থপতি বাবুর পানিপথের যুদ্ধে সর্বপ্রথম পাথর ছোড়া কামান ব্যবহার করে, ইব্রাহীম লোদীর সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে। বাবুর ইয়েমেন থেকে পাথর ছোড়া কামান আমদানী করেন। সেকালে ইয়েমেনী অস্ত্র-শস্ত্রে রাজন্যবর্গের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। দেশীয় ধারালো অস্ত্রই ছিল একমাত্র যুদ্ধাস্ত্র। এই যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে ছিল বর্শা, গদা, খড়গ, তলোয়ার, বেড়জাল, তীর-ধনুক, মুদগর, মুগর, কাটারী ইত্যাদি।

"বসন্তের দুঃখ" কাব্যের নায়ক রাজকুমার বসন্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে গিয়ে যুদ্ধে যে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

১. মার ২ করি ডিঙ্গা চালাইল ধারে।
হস্তে খর্গ লইয়া কুমার উঠিল কিনারে ॥
২. খর্গ বিদরিয়া সবে বাণ বৃষ্টি করে।
গদা ঘুরাইয়া মারে মস্তক উপরে ॥
৩. হেন কালে বিপক্ষ তুরুক নৃপবর।
অগ্নিবাণ মারিলেক কুমার উপর ॥
৪. হেনকালে কুমারের খর্গ ভঙ্গি গেল।
লম্ফ দিয়া বিপক্ষের মস্তকে পারিল ॥
হস্তেতে ধরিয়া মাথা দিলেক চাপন।
মুখের রক্ত বিপক্ষের পরিল তখন ॥

এখানে বা এই কাব্যে দেখি কুমার বসন্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধারে তার বিপক্ষের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে-তৎকালীন প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অর্থাৎ খড়গ, তীর ধনুক, তলোয়ার গদা ও মল্লযুদ্ধ। মল্লযুদ্ধ রামায়ণ মহাভারতের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। মল্লযুদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশে যুদ্ধে ব্যবহৃত একটি বিশেষ কৌশল। রাম কর্তৃক রাবণ হত্যায় অগ্নিবাণ রামায়ণ থেকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে রাজকুমার বিশেষ বীরত্ব দেখিয়েছেন। সুতরাং এখানে কবির প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের এবং তা মুঘল আগমণের পূর্বের।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীনকালে যুদ্ধে ব্যবহৃত কোন অস্ত্রের কোন প্রমাণপঞ্জী নেই বা পাওয়া যায় না। সামাজিক অবস্থা ছিল তখন খুবই অসমাঞ্জস্যপূর্ণ। রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা ছিল দুর্যোগপূর্ণ। বড় মাছ যেমন ছোট মাছ কে গ্রাস করে; তেমনি ছিল অবিচার, নির্যাতন এবং অনৈতিকতা।

সেকালের সমাজের অধিকাংশ মানুষ ছিল ভণ্ড, ধড়িবাজ ও বলবান। সাধারণ মানুষের স্বচ্ছলতা ছিল না। অন্যায়, অত্যাচার ও উৎপীড়ন মানুষের জীবনকে দূর্বিসহ করে তুলেছে। তার নিখুঁত চিত্র চর্যাগীতিকায় পাওয়া যায়

জো সো বুধী সোহি নিধুবী।
জো সো চোর সোহি সাধী ॥ ধ্রু ॥
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝই ॥ ধ্রু ॥

(আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত-চর্চাগীতিকা, চর্যা নং-৩৩, পৃষ্ঠা-১৫১)। বনের পশুর রাজা সিংহ। রাজা যেখানে অত্যাচারী, সেখানে নিরীহ প্রজার কোন কথা থাকে না। তবুও নিরীহ প্রজারূপ শিয়াল সিংহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সেকালে হিন্দু রাজ্যবর্গের সাথে প্রজারূপ বৌদ্ধদের যুদ্ধের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু রাজা প্রজার যুদ্ধে কোন ধরণের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে , তার কোন উল্লেখ নেই।

রাজা প্রজার যুদ্ধ হত প্রাচীন যুগেও। কারণ কোন মানুষই অনৈতিকতাকে সমর্থন করেনি। বরং কেউ শোষণ-নিগ্রহ করলে তার প্রতিবাদ করেছে। আর প্রতিবাদ করাই হল–মানুষের ধর্ম। বাংলার প্রাচীনযুগ ছিল নির্যাতন ও নিস্পেষণের যুগ। নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষের উপর নেমে আসত ক্ষমতাসীনদের নিগ্রহ আর নির্যাতন। অত্যাচারে জর্জড়িত সাধারণ মানুষ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। এই গোলযোগ পূর্ণ সময় তুর্কীরা ১২০১ খ্রীঃ মাত্র সতের জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখল করে। অত্যাচারিত সাধারণ মানুষ মুক্তি পায়। বাংলার রাজন্যবর্গের নিম্নশ্রেণীর উপর অত্যাচার বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ ইসলামের পতাকার তলে দাড়িয়ে শান্তি লাভ করে এবং দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এভাবেই বাংলায় ইসলাম বিস্তৃতির পরিবেশ গড়ে উঠে। হিন্দু-বৌদ্ধ মুসলমানরা নিশ্চিত শান্তিতে থাকতে পেরেছে। এই পরিবেশের বাস্তবতার ছাপ পড়েছে রামাই পণ্ডিতের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক কবিতায়। তুর্কী আমল শুরু হয় ১২০১ থেকে এবং শেষ হয় ১৩৫০ সালে। "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক কবিতাটি মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের পর রচিত হয়েছে। এই কবিতায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ও স্বধর্মীদের উপর বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে (জাজপুর উড়িষ্যা ও মালদাহ) এবং ত্রানকর্তা হিসাবে মুসলমানদের আগমণ হয়েছে।

এইরূপে দ্বিজগন করে ছিষ্টি সংহরন
ই-বড় হইল অবিচার।

Dhaka University Institutional Repository

বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইআ মর্ম
মায়াত হইল অন্ধকার ॥
ধর্ম হৈলা জবণ রূপী মাথায়েত কাল টুপি
হাতে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হএ ত্রিভুবনে লাগে ভএ
খোদাএ বলিআ এক নাম ॥
(ড. এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য, নিরঞ্জনের রুষ্মা পৃ. ১৭)।

নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধদের উপর উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে জর্জড়িত মানুষজন তুর্কী মুসলমানদের ছায়াতলে দাড়িয়ে ইসলামী মর্মতত্ত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানবতাবোধের আস্বাদ লাভ করে। মুসলমানদের অধিকারের ফলে ব্রাহ্মণদের অধিপত্যের অবসান ঘটে। এই সময় মুসলিমরা নিম্নশ্রেণীর জন্য ত্রানকর্তা হিসাবে মূল্যায়িত হন এবং অত্যাচারিত শোষকদের চিরতরে বিদায় নিতে হয়। (ড. মু. এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ. ১৪-২৪)। মুসলমানরা মাথায় কালো টুপি পড়ে, ঘোড়ায় চড়ে এবং হাতে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করেছে।

বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সাথে সাথে মুসলিম সাংস্কৃতি নিম্নশ্রেনীর হিন্দু ও বৌদ্ধেরা গ্রহণ করতে থাকে। এই সময়ে বাংলার মানুষের মধ্যে তিনটি ভাষাই চালু ছিল। মৌর্য, পাল ও গুপ্ত আমলে সংস্কৃত ভাষা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। তুর্কীদের আগমণের অনেক পূর্বেই ৬৬১ খ্রীঃ বাংলাদেশের সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকার আরবীয় বণিকদের বানিজ্যের সাথে আরবী ভাষার শব্দাবলী বাংলায় প্রবেশের অধিকার পায়। এবং ধর্মীয় কারণে আরবী ভাষা মুসলমানদের মধ্যে চালু হয়। মোঘল আমলে ফার্সিভাষা রাজভাষার মর্যাদা পায়। এবং ধর্মীয় কারণে আরবী ভাষা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ফারসী ও সংস্কৃতি ভাষা দলমত নির্বিশেষে সকল মানুষ অনুকরণ করতে থাকে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে জয়ানন্দ তার 'চৈতন্য মঙ্গল' কাব্যে হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন।

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা-পাত্র নাড়ি হাথে কামান ধরিবে ॥
মনসরি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।
ডাকাতি, চুরি, ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর ॥
(ড.মু. এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ.৪৪৯)।

Dhaka University Institutional Repository

এই সময় ব্রাহ্মণরা মুসলমানের ন্যায় দাড়ি রাখতে শুরু করে। সংস্কৃত ভাষা ছেড়ে ফারসী ভাষার চর্চা করে এবং পায়জামা মোজা পড়ে এবং এক হাতে যষ্টি ও অন্য হাতে কামান ধারণ করত। এখানে কামান অর্থে ধনুক হবে। (ড. মু. এনামুল হক-মুসলিম বাংলা সাহিত্য-পৃ.৪৪)।

পঞ্চদশ শতকের কবি জৈনুদ্দীনের 'রসুল বিজয়' কাব্যখানি গৌড়ের সুলতান য়ুসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১) রাজত্বকালে লিখিত। গল্পটির শেষের দিকে আমীরের যুদ্ধ বর্ণনাংশ নিম্নরুপ। যথা

১. দোহানে গদাযুদ্ধে কর্ণে লগে তালি।
সিংহ ব্যাঘ্র চমকিত ধাত্র কর্ণ তুলি ॥
২. শতে শতে বীরেন্দ্র ধরিয়া হায়দার।
মারেন্ত আছারি সব ভূমির উপর ॥
অতি কোপে ধরি শত করিবার দন্ত।
ভ্রমাই ক্ষেপন্ত সৈন্য মারুত অনন্ত ॥
যদি কভু সম্মুখে দেখন্ত গিরিবর।
উপাড়ি ক্ষেপন্ত বীর বিপক্ষ সৈন্যপর ॥

(ড. মু. এনামুল হক - মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ. ৬২)

এই যুদ্ধে তলোয়ার, গদা, হাতি, ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বশেষ মল্লযুদ্ধ হয়েছে। কোন আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হয় নাই।

১. প্রচণ্ড শরীর চারু মহা বলবাণ,
ধাইয়া মোচড়ে ধরি মহা ব্যাঘ্র কান।
মহা ধনুর্ব্ধর হৈল অব্যর্থ সন্ধানী,
এক সর বধে হস্তী গন্ডার পরাণি।
খড়গ বিদ্যা আদি নানা অস্ত্রে সুচরিত
উড়ানে মারনে ধিক কাক নাহি ভাত।
হয় গজ পৃষ্ঠে স্থির মৃগয়া চতুর
দৃষ্টিমাত্র পশুপক্ষী যাইতে নারে দূর।
আদি বড় সাহসিক মহাবীর্যবন্ত
বীরেন্দ্র মণ্ডল সবার মহন্ত।
২. বহুবিধ বন্দুক ধনু শর হাতে

Dhaka University Institutional Repository

কেহু অশ্বে কেহু গজে কেহ ভূমি গতে।

৩. গোলাগোলি মহাশব্দ ধনুর টঙ্কার

বীরকুল সিংহনাদে বোলে মার মার।

৪. ইয়ামনী কৃপান কক্ষে দোলে মনোহর

ধনু শর আদি অস্ত্র গুরুজ সৃফর।

৫. দিব্য খড়গ ছেল গদা কর্ম ধনুঃশর

গুরুজ সিফর আদি মুষল মুদগর।

(আলাওল বিরচিত-সিকান্দর নামা পৃ. ৪২,৫১,৫৩,৫৭)

সিকান্দর শাহার সাথে যুদ্ধে তলোয়ার, ইয়ামেনী তলোয়ার, বর্শা, তীর, বল্লম, গদা, গুরুজ, সৃফর, মুষল, মুগদর ইত্যাদি প্রাচীন অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। সিকান্দর নামায়-সর্ব প্রথম বন্দুকের ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়া ব্যবহৃত হয়েছে ভিন্দিপাল, খঞ্জর, শেল, খড়গ ইত্যাদি। পদ্মাবতী কাব্যে যুদ্ধের বর্ণনায়

সিংহলের হস্তিভয়ে নাহি মোর ভঙ্গ।

সিংহসম গুরু মোর সততহি সঙ্গ ॥

তোর সৈন্য হস্তী দেখি ক্ষুদ্র সমতুল।

গুরুর প্রতাপে তিলে গিরি করি ধূল ॥

তোর তীর গোলাগুলি কত ভেদ মর্ম।

কি করিতে পারে মোর গুরু আছে বর্ম ॥

(সৈয়দ আলাওল বিরচিত-পদ্মাবতী পৃ. ৫০৩, ১ম প্রকাশ ১৯৬৮, ঢাকা)।

ষোড়শ শতকের বিশিষ্ট কবি সৈয়দ সুলতান ১৫৮৪-৮৬ খ্রীঃ "নবী বংশ" রচনা করেন। কবির উদ্দেশ্য ছিল দেশের মুসলিম সমাজকে ইসলামী ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়া। মুসলিম সমাজ কিভাবে বিস্তার লাভ করে এবং শয়তানের প্ররোচনায় অর্ন্তদ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং এই যুদ্ধই পৃথিবীতে প্রথম যুদ্ধ রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন কবি নবীবংশে। ঐ সময় হযরত আদম (আঃ) এর উত্তরসূরীদের মধ্যে শয়তানের প্ররোচনায় এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কি কি অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে-তার বর্ণনা দিয়েছেন। কবির ভাষায়–রণসজ্জার প্রথম যুদ্ধে-হযরত শীশ নবী তার পুত্রসহ ভাই কাজিবের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

১. আর ভাই শিশের কাদির গুনবর

গদা যুদ্ধ ভাল জানে রণে অকাতর।

Dhaka University Institutional Repository

শিশের প্রধান সুত সাদেক দুর্জএ
মল্লযুদ্ধ জানে বীর সময়ে নির্ভএ।
২. আর পুত্র শিশের সাবির গুনবর
সমরে নির্ভএ বীর মহা ধর্নুধর।
আর পুত্র শিশের কাসিম তার নাম
মহা সৌম্য মূর্তি বীর রনে অনুপাম।
পুত্র সব সঙ্গে লৈয়া শিশ নবীবর
চলিলা কাজিব সনে করিতে সমর।
নিজ পুত্র ভ্রাতৃসুত লৈয়া সৈন্যগণ
সহোদর সঙ্গে লৈলা করিবারে রণন
পূর্ব-পশ্চিমে দুই হৈল সৈন্য ঠাঁই
রন হেতু চলিলেন্ত জয় বাদ্য বাই।
দুই সৈন্য মুখামুখি হৈল রনস্থল
অন্যে অন্যে যুদ্ধ হেতু রহিল পূর্বেত।
শতে শতে হস্তী ঘোড়া করি পদাতি হাজার
রাখিলা নিয়ম করি রনের মাঝার।
৩. শঙ্খ দুমদুমি শিঙ্গা ভেউল কন্নাল
খঞ্জরী ঝাঁঝরি ঢাক ঢোল করতাল।
৪. অবসর পাইয়া হুজুত ধনুর্বর
দশবাণে খিরোদের হানে কলেবর।
৫. ক্ষুরবাণ নসিবে হানিলা আরবার
হুমুজের মুণ্ড কাটি করিলা সংহার।
৬. গম্মাজ বিরথী হই শক্তি লৈল হাতে
মেলিয়া মারিলা শক্তি নসিরের সাথে।
৭.গম্মাজ বিরথী হৈয়া চাপ লৈলা হাতে
অতি কোপে মারিলন্ত নজিবের মাথে।
কাটিল নজির বীরে সেই মহাপাপ
গদা হস্তে করি বীর করে বীর দাপ।

Dhaka University Institutional Repository

৮. এ বুলিয়া বুকেত হাপিলা এক শেল
কবচেত লাগি শেল পিছলিয়া গেল।
৯. প্রতাপ আনল বাণ ঋতু জুড়িল
১০.তবে অর্ধ চন্দ্রবাণ ঋতু জুড়িল
১১. ক্রুদ্ধ হৈয়া হুমুজে করিল শরজাল
১২. অন্যে অন্যে গালাগালি হৈল বহুতর।
১৩. এড়িল মাহেন্দ্রবাণ নসির সুমতি
১৪. মুটুকির প্রহারে নসির অচেতন
১৫. চোয়াড়ের প্রহারে হারিস অচেতন
সবিরে ধরিয়া তারে করিলা নিধন।
১৬. মারিল ওকাজি বীরে অনুসক শর
১৭. দুই বলে ঠেলাঠেলি কেহ নহে উন
বেড়ি মারে অনুসের রথের উপর।
১৮. মল্ল যুদ্ধ হএ পুনি দোহান মাঝার
১৯. হস্তে খর্গ লই কেহ নারে ভ্রমিবার।
২০. এড়িল সন্মোহবাণ নসির মাজার
২১. ব্যূহ মধ্যে রহিছে যথেক বীরগণ
কেহো ইট কেহো শিলা করন্ত ক্ষেপণ।
২২. খিমা খর্গ রাখ নিয়া আপনার পাশ।

(সৈয়দ সুলতান বিরচিত নবীবংশ পঞ্চম যুদ্ধ পৃ. ২০৭, ২০৮, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৮, ২২৫, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৩,২৩৪)।

নারীবংশে পাঁচটি যুদ্ধ হয়েছে। এই যুদ্ধে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধে যে সব অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ- গদা, মল্লযুদ্ধ, ধনুর্ধর, সর, দশবাণ, সুরবাণ, শক্তিশেল, চাপ লৈলা, শেল, আনলবাণ, অর্ধচন্দ্রবাণ, শরজাল, বাক্যবাণ, মাহেন্দ্রবাণ, ,মুটুকি, চোয়ার, অনুসক শর, বেড়ি, খর্গ, নাগবাণ, গরুড়বাণ, ইট, শীলা, পোথর) খিমাখর্গ, সম্মোহবাণ, ইত্যাদি। প্রাচীন ও মধ্য যুগের প্রথম দিকের ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে, হাতী, অশ্ব,বৃশ ব্যবহার করা হত।

'ইমাম বিজয়' কাব্যের কবি দৌলৎ উজীর বাহরাম খান। নৃপতি নিজাম শাহ সুর বাহরামকে তার পিতা স্থালাভিষিক্ত করেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর (রাঃ) পুত্রদ্বয়ের একজনকে বিষপানে হত্যা ও অন্যজনকে কারবালার প্রান্তরে ফোরাত নদী অবরোধ

Dhaka University Institutional Repository

করে শোচনীয় অবস্থায় ফেলে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়, কবি তারই বর্ণনা করেছেন 'ইমাম বিজয়' কাব্যে। হযরত আলী (রাঃ) একজন যুদ্ধ বিশারদ ছিলেন। যার জন্যে আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) তাকে 'শের-এ-আলী' উপাধি দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) তার পুত্রদ্বয়কে যুদ্ধ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দেন। তারা যে সব অস্ত্রে শিক্ষা লাভ করেন-কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে কবির ভাষায়

মল্লযুদ্ধ গদাযুদ্ধ অনেক শিখাইল।
গুরুজ হারমোনি (?) ফিরাইতে লাগিল ॥
পঞ্চশর দশশর আর সপ্তশর।
একে ২ শিখিলেন্ত কৌতুক অন্তর ॥
অগ্নিবাণ বৃষ্টিবাণ শিখাইলা বহুত।
চন্দ্রবাণ, সূর্যবাণ দেখিতে অদ্ভুত ॥
সর্পবাণ খুরবাণ শিখিলা নিশ্চিত।
নেজ বাজি বাণ শিখিলেন্ত প্রতিনিত ॥
খড়গ চর্ম বিদ্যা পুনি শিখিলেন্ত অতি।
অশ্ব আরোহণ শিখিলেন্ত মহামতি ॥

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কবি তার 'ইমাম বিজয়' কাব্যখানি লিখেছেন। 'লাইলী মজনু' কাব্যের পূর্ববর্তী লেখা 'ইমাম বিজয়'। কবি বাহরাম খান নিজাম শাহ্ সুরের দৌলৎ উজীর ছিলেন। ফলে ঐ সময়ের যুদ্ধে ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রের বিবরণ দিয়েছেন। তখনও আগ্নেয়াস্ত্রের উন্নত প্রযুক্তি আবিস্কৃত হয়নি। ফলে ধারালো অস্ত্রই ছিল প্রধান অস্ত্র। পঞ্চবাণ, দশশর, সপ্তশর, অগ্নিবাণ, বৃষ্টিবাণ, চন্দ্রবাণ, খুরবাণ, নেজাবাজি, খড়গ, চর্মবিদ্যা, গুরুজ, হারমোনি এবং মল্লযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ ইত্যাদিতে হযরত আলী (রাঃ) তাদেরকে অভিজ্ঞ করে তোলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে উট, ও অশ্বের ব্যবহার ছিল। ষোড়শ শতকে মধ্যভাগ পর্যন্ত যুদ্ধেক্ষেত্রে কোন প্রকার আগ্নোয়াস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় না। 'লাইলী মজনু' কাব্যে আমরা দেখতে পাই

দুই সৈন্য উপস্থিত সময় ভুবন।
অন্যে অন্যে যুদ্ধ হৈল নহে নিবারণ ॥
অশ্ববার অনেক পদাতি বহুতর।
নানান কৌতুক রঙ্গ দেখিতে সুন্দর ॥
ধনুর্ধর রথী সব রথে আরোহণ।
খর্গ ধরে বীরগণ করহ ভুষণ ॥

Dhaka University Institutional Repository

দুই সৈন্য মহাবলন্ত যোদ্ধা অতি।
পদভরে কম্পিতে লাগিল বসুমতী ॥
(দৌলৎ উজির বাহরাম খান-লাইলী মজনু পৃ. ১১৭, ২৪৭)

মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গলের কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১৫৯৪ খ্রীঃ হতে ১৬০৬ খ্রীঃ মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যখানি লিখেন। কবি তৎকালীন অবস্থার একটি জীবন্ত চিত্র অংকন করেছেন। কলিঙ্গ দেশের এক ব্যাধ, নাম তার কালকেতু। বনের পশুপক্ষী শিকারই তার পেশা। শিকারকৃত পশু পাখির মাংস বিক্রী করে তাদের দিন চলে। অবশেষে চণ্ডীদেবীর বরে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়।

কালকেতু চণ্ডীদেবীর আদেশে জঙ্গল কেটে গুজরাট নগরের পত্তন করে। এই গুজরাট নগরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ এসে বসবাস শুরু করে। ফন্দীবাজ ভাড়ুদত্ত মন্ত্রীত্ব না পেয়ে কলিঙ্গ রাজকে গুজরাট নগর আক্রমণ করতে উৎসাহিত করে। এই যুদ্ধে কি কি ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। কবি তার বর্ণনা করেছেন

১. শত শত মত্ত হাতী লইলেন সেনাপতি
শুণ্ডে বান্ধে লোহার মুদগর।
মাহুত হাতির পৃষ্ঠে শেল টাঙ্গি লয় ভীঠে
গগন পরয়ে আড়ম্বর ॥
২. তবক বেলক আদি লয় অস্ত্র নানাবিধি
ভূষণ্ডী ডাবুশ খরধারী ॥
সাজে নৃপতির সুত বহু ভূঞা গণযুত
করবাল বরঙ্গ নিশান।
গাজন নিশানধারী বহু সেনা সঙ্গে করি
বৈরীশল্ল চলে আগুয়াণ ॥
দোসর যমের কালে কোচ সাজে কাৎরালে
রণ মাঝে আগে দেই হানা।
৩.সাজিলা যবনগণ কিরাত কোপীত মন
নানা অস্ত্রধারী আদি টাঙ্গী।
পায় উড়ে পত্রশানা রণজয় বীরবাণা
শিলী ধরি ধাইলা ফিরিঙ্গী ॥
৪. পাইক প্রধান তিন ভাই আগুদল।

Dhaka University Institutional Repository

বাণবৃষ্টি করে যেন মেঘের পড়ে জল ॥
পথে যাইতে বিভাগ করিয়া দিল ঠাঁট।
চারিদিকে বেড়িল নগর গুজরাট ॥
পূর্ব্বদ্বারে নিজোজে কোটাল ভীমরথ।
রাহুত মাহুত আর সৈন্য শত শত ॥
পশ্চিম দুয়ারে রহে সৈদ উমার গাজী।
তাহার ভিড়নে রহে ষোলশত তাজী ॥
উত্তর দুয়ারে থাকে রণাগল খান।
রণে ভঙ্গ দেয় সেনা দেখি তার বাণ ॥

৫. কোপে তনু কম্পমান বীর কাছ পরিধান
কনক টোপর শোভে শিরে।
যুদ্ধের জানিয়া মর্ম্ম পরিল অভেদ বর্ম্ম
দুই দিকে কাছে যমধরে ॥
ধরে পাইক বেড়াজাল চালে বান্ধে উরুমাল
পায়ে শোভে সোনার নুপুর।
বুঝিয়া বীরবর করিল জরজর
মুটিকি মারিল মুণ্ডে ॥
রঙ্গ ছাড়িল তুরঙ্গ পড়িল
হাতেতে রহিল ফাড়া।

(মুকুন্দরাম চক্রবতী-'কালকেতু উপাখ্যান' কলিঙ্গ রাজ্যের যুদ্ধ সজ্জা পৃ.১০৯.১১০,১১১,১১৩)

কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে তার কাব্য রচনা করেন। যে কোন কবির কাব্যে তৎকালীন সময় ও সমাজের ছাপ থাকবে এবং যুগ মানসকে চিহ্নিত করবে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিভিন্ন কবির কাব্যে ব্যবহৃত প্রাচীন ও মধ্যযুগের যুদ্ধাস্ত্রের সাথে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্রের বেশ পার্থক্য রয়েছে। কবির কাব্যে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার পাই।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের, এমনকি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্রের মধ্যে ছিল -লোহার মুদগর, মুটকী, বাণ, তবক, বেলক, ডাবুশ, খরধারী, করবাল,বরঙ্গ, টাঙ্গী, টোপর, অভেদবর্ম্ম, বেড়জাল, গদা, অগ্নিবাণ, ধনুক, সম্মোহনবাণ, ইয়েমেনী তরবারী, নেজা, বরশা, সুরকী ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কালকেতু উপাখ্যানে আমরা দেখতে পাই-বিদেশী ফিরীঙ্গী পর্তুগীজরা বানিজ্যের নিমিত্তে তারা কাতুর্জ ও বন্দুক দেশীয় রাজাদের কাছে বিক্রী করত। মোঘল ও দেশীয় সামন্ত বা রাজাদের সাথে যুদ্ধে এই বিদেশী ফিরীঙ্গীরা দেশীয় রাজাদের আগ্নেয়াস্ত্রের যোগান দিত এবং তাদের পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে লিপ্ত হত। ফিরিঙ্গীরা গোলাবারুদ সরবরাহ করে মোঘলদের রোষাণলে পতিত হয়। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের পূর্বে কামানের ব্যবহার দেখা যায়। তবে সে কামান 'তরবারী' অর্থে ব্যবহারিত হয়েছে। মোঘলরাই সর্ব প্রথম পানি-পথের যুদ্ধে পাথর ছোড়া কামান ব্যবহার করে। এই কামানে কোন গোলা-বারুদ ব্যবহার হত না। কামান দিয়ে যে গোলা নিক্ষেপ করা যায় তা পর্তুগীজরাই প্রমাণ করে। বারুদযুক্ত এই কামান দেশীয় বাদশা ও বারো ভূঁইয়াদের কাছে বিক্রী করত। ঈশাখাঁর সাথে মোঘলরা না উঠার কারণ ছিল বারুদযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র। ঈশাখাই ছিল মোঘলদের আতঙ্ক।

মঙ্গলকাব্যের শেষ ও প্রধান কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর। মধ্যযুগের চারশত বছরের অধিককাল পর্যন্ত বিভিন্ন কবিরা মঙ্গলকাব্যের উপর লিখিছেন। তাদের মধ্যে ধর্ম, মনসা, চণ্ডী ও অন্নদা মঙ্গল কাব্য বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কবি ভারতচন্দ্র অন্নদা মঙ্গলকাব্য লিখে 'রায়গুণাকর' উপাধি পেয়েছেন। মঙ্গলকাব্যগুলো দেব নির্ভর হলেও মূলতঃ এগুলোর মধ্যে তৎকালীন মানুষের দুঃখ বেদনা, শোষণ, অত্যাচার-নির্যাতন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উত্থান পতনের ছবি বিধৃত হয়েছে। অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেখতে পাই বিদেশী বেনিয়াদের হাতে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য হাত ছাড়া হতে যাচ্ছে তারই যাত্রাপালা। দেশীয় রাজন্যবর্গ ছিল অকর্মণ্য। পরিষদবর্গ স্বীয় স্বার্থে উদ্ধারে ব্যস্ত ছিল। দেশের-স্বাধীনতার সূর্য কালো মেঘের কালো থাবায় অস্তমিত হয়ে যাচ্ছে-সেদিকে তাদের কোন খেয়াল ছিল না। সেনাবাহিনীতে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। সেনাধ্যক্ষের স্বদেশ প্রেম ছিল না। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যে সব অস্ত্র শস্ত্র ছিল-তাও রক্ষণা-বেক্ষণের অভাবে ছিল অকেজো। যুদ্ধের মাঠে ও ছিল না সেনাদের সচেতনতা। পলাশীর আম্রকাননের যুদ্ধের মাঠে নবাবের গোলাবারুদ বৃষ্টিতে ভিজে অকেজো হয়ে যায়। ফলে অতি সহজেই তারা বেনিয়া ইংরেজদের হাতে পরাজিত হয়। এই বিশৃঙ্খলা জীবনের ছাপ ভারতচন্দ্রের দৃষ্টি এড়ায়নি। অতি সুন্দরভাবে তৎকালীন প্রচলিত অস্ত্র-শস্ত্রের বর্ণনা করেছেন।

১. বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
যোড়শ হলকা হাতী অযূত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥

২. ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
তাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার ॥

Dhaka University Institutional Repository

৩. চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগর।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্কার ॥
ঘোড়া উট হাজী পিঠে নাগারা নিশান।
গাড়িতে কামান চরে বাণ চন্দ্রবাণ ॥
৪. তবকী ধনুকী ঢালি রায় বেশে মাল।
দফাদার জমাদার চরে সদীয়াল ॥
৫. ধূ ধূ ধূ ধূ ধূ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্ দামামা দম্‌দম্
বন্‌বন্ ঝম্ ঝম্ ঝাঁজে ॥
৬. হূড় হূড় হূড় দূড় দূড় দূড়
তীর শনশনি পুলি ঠনঠনি
কামানের গোলা বাজে ॥
খাঁড়া বননঝন ঝাঁচে।
৭. গোলা ধম ধম গোলা ঝম ঝম
গমগম তোপ আবাজে ॥
বনন্ ঝন ঝননন ঠন্ ঠন্ ঠননন
বরিখত বরকান্দাজে।

{ভারত চন্দ্র বিরচিত-অন্নদা মঙ্গল (মানসিংহ ভবানন্দ) পৃ.৪৭, ৫০, ৫২, ৫৪, ৭৪}

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ব্যবহৃত যুদ্দাস্ত্রের সাথে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের যুদ্ধাস্ত্রের বেশ পাথর্ক্য রয়েছে। মুসলমানরা মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইয়ামেনী তরবারী ও পাথর নিক্ষেপকারী কামান নিয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে দখলে নেয়। কিন্তু তাদের সে কামানে কোন গোলা ব্যবহার করা যেত না। তখনকার সময় গোলা অবিষ্কার হয় নাই। কেবল মাত্র পাথর নিক্ষেপ করা হত।

১৫১৯ খ্রীঃ পর্তুগীজরা বাংলাদেশে আসে ব্যবসা বানিজ্য উপলক্ষে। পরবর্তীতে তারা বন্দুক ও কার্তুজ নিয়ে এসে এদেশীয় স্বাধীন নবাবদের সাথে বানিজ্যে জড়িয়ে পড়ে। এবং সুযোগ পেলেই তারা চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ করত। এ কর্মেই তারা হাম্মার্দ নামে চিহ্নিত হয়ে কলঙ্কিত অভিধায় অমর হয়ে আছে। সপ্তদশ শতকে গোলা নিক্ষেপ করা যায় এমন কামান নিয়ে আসে পর্তুগীজরা। প্রযুক্তির ও অস্ত্র ব্যবসায় তারা একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। কবি ভারতচন্দ্র তার কাব্যে তৎকালীন যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র হিসাবে তীর, ধনুক ও তলোয়ারের উল্লেখ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে তা নয়, গোলাগুলির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তৎকালীন বাঙ্গালীদের দেশীয় অস্ত্র বিদেশীদের আধুনিক প্রযুক্তির কাছে ছিল অসহায়।

বাংলার প্রাচীন যুগের, প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন পাই চর্যাপদ। এই চর্যাপদে বিধৃত আছে তৎকালীন সাধারণ মানুষের উপর নিমর্ম-নিপীড়ন ও নির্যাতনের পরিচয়। তখনকার সময় শক্তিশালী ও বলবান মানুষেরা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করত। কোন প্রকার ব্যবহৃত অস্ত্রের নাম নেই, একমাত্র কাটারী ছাড়া।

১২০১ খ্রী. মতান্তরে ১২০৩ খ্রী. ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খীলজি মাত্র আঠারোজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষে আক্রমণ করে মুসলিম রাজ্য স্থাপন করেন। ১২০১ খ্রী. পূর্বে দেশীয় রাজন্যবর্গ সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করে। তখন কেউ যদি বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করত, তবে কাটারী দিয়ে তার জিহ্‌বা কেটে দেওয়া হত। এবং শ্রবণ করলে কানে শিশা গালিয়ে দেয়া হত। লোকসাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিলে এ সত্যের পরিচয় মিলে। শ্বশুর বরাহের গগণায় ভুল হলে বিদুষী পুত্রবধু (খনা) তা সংশোধন করে দেন। লজ্জায়, ক্ষোভে, ঘৃণার ও আভিজাত্যের অহংকারে পুত্রবধুর জিহ্‌বা কাটারী দিয়ে কেটে দেয়া হয়। তাতে হয় সে বোবা। বোবা শব্দের অর্থই খনা। সবলের কাছে দুর্বল অসহায় ছিল। স্বামীর মিহির খনার এ দুর্ভাগ্যের জন্য কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। ফলে তাকে বোবা হতে হয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত খনার বচন বাঙ্গালীর ও কৃষি জীবনের সাথে অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিরাজ করছে। আজকের বৈজ্ঞানিক যুগেও খনার বচনকে উপক্ষো করা যাচ্ছে না। বরং কৃষিবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তহীনতা খনার বচন দিয়ে নিরসন করা হয়।

রামাই পণ্ডিতের নিরঞ্জনের রুষ্মায় তৎকালীন অত্যাচারিত রাজন্যবর্গের হাত থেকে জনসাধারণ মুসলমানদের আগমণে রক্ষা পেয়েছিল, তার বর্ণনা আছে এবং তৎকালীন যুদ্ধে কি কি ধরণের যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল তার নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। মুসলমানেরা কালো টুপি পড়ে, উত্তম ঘোড়ার পিঠে চেঁপে, হাতে 'ত্রিকচ কামান' নিয়ে আসে। এখানে কামান অর্থে তীর বা ধুনক বুঝানো হয়েছে।

পঞ্চাদশ শতকের কবি জৈনুদ্দীনের "রসুল বিজয়" কাব্যে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে উল্লেখ করেছে-দেশীয় ধারালো অস্ত্র। মধ্যপ্রাচ্য থেকে মুসলমানরা সাথে নিয়ে আসে ধারালো উন্নত মানের ইয়েমেনী তরবারী। এছাড়া কোন আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় না। এ অস্ত্র ছাড়া মল্লযুদ্ধ ছিল এক বিশেষ উপায়ের যুদ্ধ।

ষোড়শ শতকের কবি দৌলৎ উজির বাহরাম খান তার 'ইমাম বিজয়' কাব্যে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে উল্লেখিত যুদ্ধাস্ত্রের নাম লিখেছেন। 'পদ্মাবতী' কাব্যে কবি আলাওল মধ্যযুগের ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। তবে তার সময় বিশেষত্ব পর্তুগীজরা তাদের দেশ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এদেশের রাজন্যবর্গের কাছে বিক্রি করত। মঙ্গল সাহিত্য ধারার উল্লেখযোগ্য কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার কালকেতু উপাখ্যানে মধ্যযুগের প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্র ও পর্তুগীজদের আনা আগ্নোয়াস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। মধ্যযুগের শেষ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

তার মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানে প্রচলিত দেশীয় ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

কবি হাফেজদ্দীন রচিত "বসন্তের দুঃখ" কাব্যে পিতৃরাজ্য উদ্ধারে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ছিল সব দেশীয় ধারালো অস্ত্র। যা মধ্যযুগের প্রথম দিকের যুদ্ধে ব্যবহৃত হত। কবি ১৭৯৭ – ১৮১২ সালের মধ্যে কাব্যখানি লিখেছেন। যুগ অনুসারে তৎকালে প্রচলিত সময়ের ছাপ থাকা উচিত ছিল। তখন আধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে ইংরেজরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করে। কিন্তু ইংরেজদের ব্যবহৃত সমরাস্ত্রের কোন নাম উল্লেখ নেই। যে সমস্ত যুদ্ধাস্ত্রের নাম উল্লেখ করেছেন তা প্রাচীন ও মধ্যযুগের। অতএব বলা যায় যে কবি হাফেজদ্দীন যে কাহিনী লিখেন তা প্রাচীন বা মধ্যযুগের লোকগাঁথায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। তারই রূপ দিয়েছেন। কোন কিছু নতুনভাবে সংযোজন করেননি। ফলে নতুন কোন তথ্য তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত।

বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে নজর দিলে দেখতে পাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য তৎসময়ের ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্র। পানিপথের যুদ্ধে মোঘলরা পাথর ছোড়া কামান ব্যবহার করে। এই কামানে কোন গোলা ব্যবহার করা যেত না। পতুর্গীজরা সর্বপ্রথম কার্তুজ, বন্দুক ও গোলা নিক্ষেপকারী আগ্নেয়াস্ত্র এ দেশের রাজন্যবর্গের কাছে বিক্রয় করত। শের শাহের কামানের উপর বাংলা হরফে তার নাম ও উপাধি লেখা ছিল। ঈশা খাঁর কামানের লেখা আছে শ্রী ঈঁশাখা। (ড. মু. এনামুল হক-মুসলিম বাংলার সাহিত্য পৃ. ৩৯)। পর্তুগীজদের চেয়ে লোভী ইংরেজরা আরো উন্নতমানের গোলা বারুদ সংযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র এ দেশে নিয়ে আসে। কবি হাফেজদ্দীনের কাব্যে তার কোন উল্লেখ নেই। সার্বিক আলোচনা থেকে বলা যায় "বসন্তের দুঃখ" কাব্যের কাহিনী ও উৎসকাল প্রাচীন অথবা মধ্যযুগের। এমনকি মোঘল আমলেরও পূর্বে। কবির কাব্যে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র থেকে এ কথা বলা যায়।

চরিত্র বিচার

রাজা প্রতাপ ভীম

ভীম রাজ্যের রাজা প্রতাপ ভীমের চরিত্রে রাজকীয় সুলভ মনোভাবের কোন পরিচয় নাই বরং তাকে পাই এক অর্থব কাপুরুষ হিসাবে। তার কোন হিতাহীত জ্ঞান নেই। দেশের চালিকা শক্তি থাকে রাজা। কিন্তু দ্বিতীয় রাণী হল রাজার চালিকা শক্তি। তার নিজস্ব কোন আভিজাত্য ও সুষ্ঠ বিচার করার মানসিকতা দেখা যায় না। বরং রাণীর মনোতুষ্টি ও হুকুম পালনকারী নফর হিসাবে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। পিতার ভূমিকায় তার কোন মূল্যমান নেই। বরং প্রবৃত্তির দাস হিসাবে তার পরিচয় প্রধান হয়ে উঠেছে।

রাণী শীত ও বসন্তের নামে মিথ্যা নালিশ করে মৃত্যুদণ্ড দাবী করে। রাজা কোন বাছ বিচার না করে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। এখানে সে রাজা দশরথের মত নিষ্ক্রীয়। বরং তার চরিত্রের মধ্যে সংকীর্নতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বর্বরতা, নির্মমতা ও লাম্পট্য-অকপটে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং সে অপ্রধান চরিত্র হিসাবে বিশেষ রূপ পেয়েছে। যার কোন নৈতিকতা নাই, তার নাই

Dhaka University Institutional Repository

কোন সামাজিক স্থিতি। এখানে বাৎসল্য প্রেমের কর্পদকশূন্য চরিত্র হিসাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। রাজা হয়েও পারেনি সন্তানকে ভালবাসতে। পারেনি ডাইনির হাত থেকে রক্ষা করতে। রাজা প্রতাপ তাই একজন স্বৈরাচারীর ভূমিকায় নিজেকে তৈরী করেছে। এক অন্তঃসার শূন্য পিতা। মনে হয় পিতার ভূমিকায় নয়, কেবলমাত্র প্রয়োজনের তাগিদেই কবি রাজা হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। এর বাইরে তিনি মূল্যহীন এক কাপুরুষ।

শীত রাজা

ভীম রাজ্যের রাজা প্রতাপ ভীমের জ্যেষ্ঠ সন্তান। জকুম রাজ্যের রাজহাতী কর্তৃক সে বাছাইকৃত রাজা। তার চরিত্রে কোন **creative movement** নেই। কেবল মাত্র নিরস চরিত্র বিশেষ। এ চরিত্রের কোন **suffering** ও **doing** নেই। সে প্রয়োজনের তাগিদে অবতীর্ন হয়েছে, কাজ শেষে আবার অর্ন্তনিহিত হয়েছে। ছোট ভাই বসন্তকে সে একদম ভুলে গেছে। এখানে সে কাণ্ডজ্ঞানহীন চরিত্রের অধিকারী। বিচারের ক্ষেত্রে তার স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। রাজকন্যার দাবীর মুখে সে বিচার করতে বাধ্য হয়েছে। উপদেশ দিতে সে জানে কিন্তু উপদেশ বাস্তবায়ণ করতে জানে না। সে যেন একটা যন্ত্র, নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়েই থেমে যায়। এই তার দায়িত্ববোধ ও কর্মস্পৃহা। রাজার চরিত্র হিসাবে মর্যাদাহীন ও ভীরু একটি অচল মূর্তি বিশেষ। তাই তার চরিত্র অনুজ্জ্বল।

রাজকুমার বসন্ত

এই কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ রাজকুমার বসন্তের চরিত্র। ঘটনাধারার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িত বলেই সে নায়ক সুলভ মর্যাদা পেয়েছে। এই কাব্যের অন্যান্য চরিত্রগুলি তার কাছে নিস্প্রভ। একমাত্র গঙ্গাধর সাধু ছাড়া বাকীগুলোর ভূমিকা অল্পই। সাধু খল চরিত্রের অভিধায় ভূষিত হয়েছে। তাদের কারো চরিত্রে **Pains, Suffering** এবং **Doing** নেই। সাধুর চরিত্রে আছে কেবল মাত্র **Doing** ও **Pleasure** এর আগ্রহ। শীতের চরিত্রে আছে **Doing** ও **Administration** কিন্তু ঘটনা ধারার সাথে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িত নন। এবং **strong administration** -এর **administrator** নন। শীত রাজা মূর্তিমান এক শাসক মাত্র। এই জন্য সে অনুজ্জল চরিত্র। ঘটনাধারার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রাজকুমার বসন্ত জড়িত। এখানে তার **pains, suffering** ও পরবর্তীতে তার **Doing** আছে। তিনটি গুণে চরিত্রটির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কোন গল্প বা নাটকে নায়ক নায়িকার জীবনে সামান্য ভুলের জন্য তার **pains** ও **suffering** নেমে আসে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যই রাজকুমারের জীবনে **pains** ও **suffering** এসেছে।

ভাগ্যন্বেষণে রাজকুমারদ্বয় অরণ্যের বৃক্ষের নীচে অবস্থান নেয়। শীত পানি আনতে গেলে তাকে রাজার হাতী ধরে নিয়ে আসে। তারপর তার কোন ভূমিকা আমরা দেখতে পাই না।

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চিন্তে রাজ্য শাসন করতে থাকে। যেখানে তাকে আমরা পাই তা প্রয়োজন ক্ষেত্রেই এসেছে। এমনকি বিচারের ক্ষেত্রেও তার অনিচ্ছা ছিল প্রবল। রাজকন্যা, তাকে বিচার করতে বাধ্য করেছে। নচেৎ সে বিয়ের নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে চলে যেত। এক্ষেত্রে কাহিনী ধারায় তার অবস্থান অত্যন্ত ক্ষীণ। যা নায়ক সূলভ মর্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। বরং এক হাস্যকর আদর্শহীন ও নৈতিক দায়িত্বহীন রাজারূপে প্রতীয়মান হয়েছে। বসন্ত ভাগ্য বিড়ম্বিত নন। রাণীর রোষে পড়ে জীবনের **pains** ও **suffering** শুরু হয়। জীবন সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাজকুমার বসন্ত সাহসিকতার সাথে ঝুঁকি নিয়েছে এবং জয়ী হয়েছে। ফলে **Doing** তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাজকুমার বসন্ত দৃঢ়চিত্ততায়, দুরদর্শিতায়, বুদ্ধিমত্তায় ও ব্যক্তিত্বে, এ কাহিনীর মাধুর্য সৃষ্টিতে উজলতা পেয়েছে। পিতা প্রতাপ ভীমের রাজ্য উদ্ধারের ক্ষেত্রে তার যে ভূমিকা, দূরদর্শিতা ও বীরত্ব এবং সংকল্প আমাদেরকে মোহিত করে। পত্নীপ্রেমে সে বিজয়ী বীর। রাজার দ্বিতীয় রাণীর আচরণে সে ক্ষুব্ধ হলেও অপূর্ব ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করে মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শত্রুর মোকাবিলায় তার পরিকল্পনা এবং যুদ্ধযাত্রা যর্থাথই একজন বীরের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শ্বশুর বাড়ীতে অনুদারবৃত্তি জীবন যাপন তার সহ্যের বাইরে। যে ভাবেই হক, রাজ কন্যাকে নিয়ে তার যাত্রা এবং জীবনের **suffering** শুরু হয়। এই **suffering** তাকে লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। এটি তার চরিত্রের উত্তম দিক নির্দেশিত করে এবং তার ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে।

রাজকুমার বসন্তের চরিত্রে ছন্দময়তা স্পষ্ট। যদিও সে সহজেই সকল পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিয়েছে। রাজকুমার কোন অবস্থাতেই তার চরিত্রের আভিজাত্যতা ও মহিমা হারায়নি। কেবলমাত্র তার চরিত্রের ত্রুটি দেখা যায়। আভিজাত্যের গৌরবে স্ত্রীর সতীত্বে সন্দেহ পোষণ করা। এটি তার চরিত্রের একটি কালো অধ্যায়কে নির্দেশ করে।

এছাড়া তার চরিত্রে কোন প্রকার সংকীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতা নেই। বরং রাজকন্যার প্রতি তার একনিষ্ঠ প্রেমাকাঙ্খা তাকে গৌরবময় স্থানে অধিষ্ঠিত করেছে। রাজ্যচ্যুত ও ভাইকে হারিয়েও সে নৈরাশ্যবাদীর মত হাহাকার করেনি। বরং পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে। ফলে সে পেয়েছে সামাজিক মর্যাদা। তার চরিত্রের বলিষ্ঠতাই তাকে নায়কসুলভ মর্যাদা দান করেছে। রাজকুমার স্ত্রীর অগ্নিপরীক্ষা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। বসন্তের প্রণয়াবেগ, কৃতজ্ঞবোধ, ক্ষমাশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা তার চরিত্রের পরিচয় ব্যক্ত করেছে।

কাঞ্চনমালা

কিশ্বর নরপতির একমাত্র কন্যা কাঞ্চনমালা। আভিজাত্যের ঐশ্বর্য ও কৌলন্যের অহংকারের মধ্য দিয়ে সে বড় হয়েছে। ফলে তার চরিত্রে রয়েছে গম্ভীর অহংকার, ক্ষমা করার

Dhaka University Institutional Repository

মহৎ গুণ, সম্মান করার গৌরব, ভালবাসার অদম্য স্পৃহা, একক প্রেমের নিষ্ঠা, প্রখরতা, কৌশল, উদ্ভাবনী শক্তি ও সরলতা। এই গুণের জন্যেই কাঞ্চনমালা নায়িকা হবার অধিকার পেয়েছে।

কাঞ্চনমালা অত্যন্ত জেদী ও আভিজাত্যের অহংকারে গর্বিত। ফলে সে নিজেই স্বয়ংবরা, সভায় স্বামী নির্বাচনের যোগ্যতা ঘোষণা করে।

দিবা নিশি বসি কন্যা করয় ভকতি।
লাল মানিক্য যেই চেনে সেই মোর পতি ॥

কন্যার পণের জন্য রাজা কিশ্বর নরপতি চিন্তিত। কোথায় পাবে সে লালমানিক্য চিনে এমন রাজকুমার। দেশ বিদেশে খোঁজ খবর নিয়ে এমন বরের সন্ধান মিলেনি। কারণ লাল মানিক্য আভিজাত্যের নিদর্শন। রাজ্যশুদ্ধ সকলেই রাজকন্যার জন্য চিন্তিত। সওদাগর গঙ্গাধর সাধুর মাধ্যমেই রাজা কিশ্বর নরপতি লাল মানিক্য চিনে এমন রাজকুমারের পরিচয় পায়। রাজার উপস্থিতিতে অন্ধমানিক্য নির্বাচনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজার বিশ্বাসকে জোরালো করে। কন্যার দাবীমত যুবরাজ পেয়ে অন্দরমহলে সংবাদ দেয়া হয়। রাজার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিয়ের আয়োজন করা হয়। যথারীতি মহা ধুমধামের সাথে বিয়ে শেষ হয়। বিয়ের পরে তার হারানো ভাই শীতের জন্য মন খুবই খারাপ থাকে। রাজকন্যা দ্বিমত পোষণ করলে উভয়ের মধ্যে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

রাজকুমার যে কোন মূল্যে তার ভাইয়ের কাছে যাবেই। উজানী নগরে যাওযার একমাত্র পথ সমুদ্র। যেতে তিন বছর সময়ের প্রয়োজন। সেখানে যাওয়ার জন্য গঙ্গাঘাটে গিয়ে বসে থাকে। রাজকন্যা তার পিতা কিশ্বর নরপতির কাছে যাওয়ার কথা বললে-সে এই সময় যেতে বারণ করেন। কারণ সমুদ্র উত্তাল থাকে। রাজকুমার কোন বাঁধা-ই মানতে রাজী নয়। সে গঙ্গাঘাটে গিয়ে গঙ্গাধর সাধুর সাক্ষাৎ পায়। তার সাথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। যদি রজকন্যা যায় তো ভাল। নচেৎ তাকে রেখে সে পালিয়ে যাবে। সতী নারীর পতিই তার গতি। স্বামী ছাড়া জীবন তার অচল। তাই রাজকন্যা যেভাবেই হ'ক স্বামীর সাথে যাবে।

সিদ্ধান্তনুযায়ী তারা গঙ্গাধর সাধুর ডিঙ্গায় জকুম রাজ্যের রাজধানী উজানী নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করে। গঙ্গাধর সাধু ছিল লম্পট। পর নারীতে, তার আসক্তি বিশেষ। যাত্রার সময় রাজকন্যার রূপ দেখে লম্পট সাধু কামান্ধ হয়। কিন্তু রাজকুমার জীবিত থাকায় তা সম্ভব নয় ; জেনে নৌকার লোকজনের সাথে শলাপরামর্শ করে রাজকুমারকে হাতে পায়ে শক্ত করে বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। রাজকন্যা তাকে বাঁচাবার জন্য একটি বালিশ রাজকুমারকে লক্ষ্য করে ফেলে দেয়। রাজকন্যার নিক্ষিপ্ত বালিশ ধরে রাজকুমার সমুদ্রের পানিতে ভাসতে থাকে। এখানে রাজকন্যার উপস্থিত বুদ্ধি প্রসংশনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

লম্পট সাধু রাজকন্যা কাঞ্চনমালাকে বিভিন্ন রকমের প্রলোভন দেখাতে থাকে। যখন সে অনমনীয়, তখন তাকে রাজকুমারের মত প্রাণনাশের হুমকি দেয়। কিন্তু বাঙ্গালী রমণী একক পতিতেই তার ভক্তি ও অচল বিশ্বাস থাকে। কারণ মৌলিক প্রেমের কোন ভাগ হয় না। প্রেম মৌলিক ও অনন্ত। রাজকুমারকে হারিয়েও রাজকন্যা স্বামীর জন্য প্রেম ও তার ফিরে আসার প্রতি ছিল অচল বিশ্বাস। সতী নারীর পতির কোন দুর্গতি হতে পারে না। রাজকন্যার বিশ্বাস ছিল সতী নারীর পতিকে ফিরে আসতেই হবে। বেহুলা নৃত্য দেখিয়ে স্বর্গের দেবতাদের মনস্তুষ্টি করে চাঁদ সওদাগরের মৃত ছয় পুত্র ও ডুবে যাওয়া সম্পদ যদি ফিরে পেতে পারে, তাহলে রাজকন্যাও তার স্বামীকে ফিরে পাবে। কারণ ঈশ্বরের কৃপা আছে তাদের উপর।

গঙ্গাধর সাধুর অবস্থা মাংসালোভী কুকুরের মত হয়েছে। কোন প্রকার লোভ, লালসা নায়িকাকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি। এই দুই রাজকুমার-কুমারী তাদের বিরহকাতর জীবন ধারায় প্রেমের অমর লালিত্যে অমরত্ব পেয়ে এক আদর্শ সৃষ্টি করেছে যা অতুলনীয়। লোকসাহিত্যের মাত্র কয়েকটি গাঁথা ছাড়া আর কোথাও এমন উদাহরণ নেই। আধুনিক সাহিত্যে একদম নেই বলতে গেলে চলে।

কাঞ্চনমালার পিতা-মাতার আজন্ম লালিত পালিত স্নেহ স্বামীর প্রেমের কাছে তুচ্ছ বলে প্রমাণীত হয়েছে। পিতা-মাতার স্নেহের বন্ধন তাকে স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি। রাজকন্যা অজানা অচেনা পরিবেশে তার স্বামীর অনুগামী হতে কুণ্ঠিত হননি। চরম দুর্দিন ও অসহায় অবস্থায় স্বামীর প্রতি অবিচল আস্থা হারায়নি। বরং হিমালয়ের মত অচল ছিল তার একনিষ্ঠতা। সাত মানিক্যের অধিকারী গঙ্গাধর সাধুর প্রত্তিপত্তির মোহ ও জীবন ভীতি উপেক্ষা করে সততা ও প্রেমের মহিমায় কাঞ্চনমালা অনুস্মরণীয় ও অনুকরণীয় চরিত্রের অধিকারী।

কাঞ্চনমালার মধ্যে সাহসিকতা ও কোমলতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। তার বুদ্ধি ভিত্তিক কৌশল, সতীত্ব , মহত্ত গৌরব করার মত। রাজকুমারকে হারানোর পর লম্পট গঙ্গাধর সাধু নানা ছল ছুঁতায় তার সাথে দেখা করার সুযোগ করে নিয়েছে। কিন্তু রাজকন্যা অতি সাহসিকতার সাথে ও কৌশলে হায়েনার হাত থেকে নিজের সতীত্বকে রক্ষা করতে পেয়েছে। তারপর যখন শর্ত মোতাবেক ছয় মাস ঘনিয়ে আসে যখন সাধু উন্মাদ হয় এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। তখন রাজকন্যা অতি কৌশলে ও ধীর স্থীরভাবে বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে সাধুকে বলে

কহিতে লাগিল কন্যা অতি মিষ্ট স্বরে।
শুন সাধু মোর দুঃখ কহিজে তোমারে ॥
পিতা মাতা নাহি এথা নাহি বন্ধুগণ।
কৃপা করি কেবা মোরে করিবেক পালন ॥

Dhaka University Institutional Repository

তবে মাত্র এই কৃপা আমাকে করিবা।
ছয় মাস অবধি মোর বিলম্ব চাহিবা ॥

রাজকন্যা জোর না খাটিয়ে ও গঙ্গাধর সাধুকে না ক্ষেপিয়ে বুদ্ধির কৌশলে ছয় মাসের শর্তের কথা স্মরণে এনে দেয়। কোন অবস্থাতেই এই শর্তের কথা ভুলে গেলে চলবে না। এই সময়ের মধ্যে তার সাথে কথা বলা ও দেখা করা যাবে না। এখানে আমরা তার বুদ্ধি ভিত্তিক কৌশলের পরিচয় পাই।

দীর্ঘ পাঁচ মাস সমুদ্রের পানিতে ভেসে রাজকুমার বৃন্দাবনের পাষাণের ঘাটে আসে এবং মালিনী ও সখীগণের সাহায্যে বন্ধন মুক্ত হয়। অতঃপর মালিনীর মাধ্যমে কাঞ্চনমালার সাথে যোগাযোগ হয়। কাঞ্চনমালা-রাজকুমারের সকল সংবাদ পায় মালিনী মারফত। কিভাবে লম্পট সাধুরপুরী থেকে মুক্তি পাবে, তার পরিকল্পনা করতে থাকে। রাজকন্যা বুদ্ধির কৌশলে সাধুকে বিয়ের তারিখের দিন জানিয়ে দেয়। কোথায় এবং কাকে দাওয়াত দিতে হবে তার তালিকা তৈরী করে দেয়। সামাজিক বিয়ের জন্য যা দরকার তা তাকে সংগ্রহ করতে বলা হয়। সাধু রাজকন্যার অবাধ্য হতে পারে না। কারন রাজকন্যার মোহে সে অন্ধ। যে কোন মূল্যে তাকে পাওয়ার জন্য সে পাগল। বিয়ের আসরে গিয়ে রাজকন্যা নিজেই মন্ত্র উচ্চারণ করবে। সেজন্যে বিয়ের আসরে যাওয়ার জন্য একটি পাল্কীর (সুপালা) প্রয়োজন হবে। পাল্কী (সুপালা) তৈরির ভার দেয়া হয় মালিনীকে। মালিনী রাজকুমারকে নিয়ে পাল্কী (সুপালা) তৈরী করে এবং ভিতরে একটি গোপন কুঠুরী রাখে। বিশ্ব সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা দেখতে পাই,ওডিসাসের পরামর্শ অনুযায়ী একিয়ানরা একটি কাঠের মস্তবড় ঘোড়া তৈরী করে রেখে দেয়। এবং তারা গুজব রটনা করে এখেনা দেবীর স্মরণে এই ঘোড়াটি উৎসর্গিত করা হয়েছে। যাতে একিয়ানরা নিরাপদে বাড়ী ফিরতে পারে। কারন তারা এখন দেশে ফিরতে চায়। কিন্তু একিয়ানরা দিনে জাহাজ ছেড়ে দিয়ে গভীর রাতে পুনরায় ফিরে আসে। ট্রাজনরা কাঠের ঘোড়াটিকে নগরের মধ্যে নিয়ে যায়। ট্রাজনরা জানে না তার ভিতরে কি আছে ? ঘোড়াটির পেটের মধ্যে ছিল একিয়ান সেন্য ভর্তি এবং বাইর থেকে এমনভাবে লাগানো যে-তার ভিতরে কপাট আছে-তা বুঝার কোন উপায় নেই। রাতের অন্ধকারে একিয়ানরা ঘোড়ার পেট থেকে বেড়িয়ে এসে ট্রাজনদের হত্যা করে নগরের পতন ঘটায়। (মোবাশ্বের আলী-বিশ্বসাহিত্য পৃ. ৪৬, নভেম্বর ১৯৭৮)। ঠিক তেমনিভাবে রাজকন্যা মালিনীর মারফত জানিয়ে দেয় কিভাবে গোপন কুঠুরীতে ঢুকে রাজপুত্রকে রাজসভায় আসতে হবে এবং গঙ্গাধর সাধুর পতন ঘটিয়ে কাঞ্চনমালাকে উদ্ধার করবে। কাঞ্চনমালা যেমনি আভিজাত্যের অধিকারী তেমনি যুগপৎ প্রতাপের অধিকারী। এখানে কাঞ্চনমালা বিশ্বসাহিত্যের নায়ক ওডিসাসের বুদ্ধিমত্তার সাথে তুলনীয়। আর এ কথা মানতে হবে-লোকসাহিত্যের কাহিনীতে পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্রগুলো জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত।

Dhaka University Institutional Repository

কাঞ্চনমালা সকল প্রকার দুর্যোগ মোকাবিলায় ধীর স্থির এবং বুদ্ধি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়ে সমাধান করেছে। তাই সে জীবন্ত চরিত্র, নিয়মিত হাতের ক্রীড়ানক নয় বরং নিয়তিকে কর্ম ও বুদ্ধি দিয়ে পাশ কাটিয়ে বিজয়মালা পরিধান করেছে।

রাজকুমার সুপালার গোপন কুঠুরীতে লুকিয়ে আছে। সাধু ও তার লোকজন পাল্কী (সুপালা) মাথায় নিয়ে বিয়ের সভায় উপস্থিত হয়। রাজকুমার-কাঞ্চনমালার সাথে গোপন কুঠুরীতে অনেক বার্তা হয়। রাজকন্যার স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় আমরা পাই। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে কাঞ্চনমালা ও সখিনা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন জীবন্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলা ভার। রাজকন্যা তেজস্বী চরিত্রের অধিকারী।

কাঞ্চনমালার চরিত্রের আর একটি বিশেষ দিক তার প্রখরতা। রাজকুমার বসন্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করার পর বন্দীদশা থেকে তাঁকে উদ্ধার করে। রাজা তার ভুল ও রাণীর চক্রান্ত বুঝতে পারে। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে নির্মম রায় ঘোষণা করে। তখন কাঞ্চনমালা তাকে শ্যাশুড়ীর মর্যদা দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজনিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। কোন রকম হীনমন্যতা বা ঈর্ষাপরায়ণতা তাকে আচ্ছন্ন করেনি। সুতরাং এই প্রখরতা তার চরিত্রের উজ্জলতা বৃদ্ধি করেছে। এখানে সে শরৎচন্দ্রের গৃহদাহের নায়িকা অচলা যেমন সুরেশের মৃত্যুর পর অসহায় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সে কোথায় যাবে–মহিম এই প্রশ্ন করলে, উত্তর দিয়েছিল 'তুমি যা বলবে তাই !' (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-শরৎসাহিত্য সমগ্র, গৃহদাহ পৃ.৯৭৬)। এখানে কাঞ্চনমালার প্রখরতায়-যে কোন দূর্ঘটনা থেকে রাজপুরীকে রক্ষা করে ধীশক্তি সম্পন্ন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। শ্বাশুড়ীর প্রতি ক্ষমাশীল দৃষ্টিভঙ্গি তার চরিত্রের উজ্জ্বলতাকে বৃদ্ধি করেছে।

কাঞ্চনমালা অত্যন্ত সহজ,সরল। যখন তার স্বামী বসন্ত সতীত্বের সন্দেহে অগ্নিপরীক্ষার কথা বলে। যদি সে অগ্নিপরীক্ষা না দেয়, তবে সমাজে তাকে কলঙ্কিত হতে হবে। তখন কাঞ্চনমালা এই অন্যায় প্রস্তাবের কোন প্রতিবাদ করেনি বরং সে যে সতী তার প্রমাণের জন্য জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাপিয়ে পড়ে। সুতরাং সরলতা ও বিশ্বাসের বলিষ্ঠতা তার চরিত্রের দীপ্তিকে আরো উজ্জল করেছে। সর্বংসহার মত সকল অপবাদ সে সহ্য করে নিয়েছে। তাতে তার চরিত্রের মাহাত্ম বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজকন্যা কাঞ্চনমালা ভক্তিবাদে অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী। ভাসুর রাজা শীতকে সে সম্মান করেছে। রাজকন্যা বলে তার মধ্যে গর্বিত হওয়ার মত কোন অহংকার ছিল না। শ্বশুরকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে ভক্তি করেছে। রাজা রাণীর নিষ্ঠুরতার জন্য তার প্রতি কোন অমর্যাদা করেননি। বরং অঘটন থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সেবায়, যত্নে, আদরে, সম্মানে, আপ্যায়ণে তাকে মায়ের আসনে বসিয়ে তাকে সম্মান করার অধিকার দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধিমত্তা কাঞ্চনমালার চরিত্রের তাৎপর্যপূর্ণ গুণ। কবি তার প্রত্যুৎপন্নমত্তিত্ব কিংবা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলেছেন। কাঞ্চনমালার সক্রিয়তায় তার বুদ্ধিবৃত্তি দ্বিগুণ প্রকাশ পেয়েছে। প্রতিকূল অবস্থা থেকে বেঁচে যাওযার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছে –তাতে তার চরিত্রের ধীর, স্থীর, উজ্জলতা, প্রখরতা, সচেতনতা ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় বিধৃত হয়েছে। গঙ্গাধর সাধুর নিয়ন্ত্রন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা, রাজাকে মন্ত্র শুনাতে বাধ্য করা, স্বামীকে সকলের অগোচরে লুকিয়ে কাছে রাখা এবং সকলের সামনে হাজির করা ও সাধুর কৃতকর্মের জন্য তার বিচার চাওয়া প্রভৃতি তার আত্মসচেতনা, প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় বহন করে।

কাঞ্চনমালা আমাদের সমাজেরই বাস্তব এক জ্বলন্ত চরিত্র। কোন অতিমানবীয় গুণ তার মধ্যে নেই। তার চরিত্রের সতীত্ব রক্ষা করার কৌশল, স্বামীর প্রতি প্রণয়নিষ্ঠা, সাহসিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি, আশাবাদিতা, সক্রীয়তা, নিয়মনিষ্ঠা, ভক্তি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি একান্তই মানবীয়।

রোমান্টিক রচনায় কবি অদ্ভূত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বিজন সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ, বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, বৃন্দাবনে পাষাণে বাঁধানো ঘাট, ফুল ফুটে না এমন সময় বাগানে হঠাৎ ফুল ফোটা, ইত্যাদি অসাধারণ সার্থকতায় ফুটে উঠেছে। কাঞ্চনমালা সৌন্দর্য জগতের মধ্যমনি। সুকৌশল মাধুর্যে অনমনীয় প্রত্যয়, পারিবারিক বিধি নিষেধের মাঝে একটা শান্ত অদম্য স্বাধীনতা, আবার কোথাও কোথাও পুরুষোচিত কঠোরতা ও রমণী সুলভ কোমলতা, ধনে মনে জনে এক চিরন্তন স্ত্রী মূর্তি-এরূপ অতুলনীয় চরিত্র কল্পনা করা যায় না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তো দুরের কথা বিশ্ব সাহিত্যেও বিরল দৃষ্টান্ত।

এই কাব্যে আমরা দেখতে পাই পরিণত বয়সের কুমারীর ইচ্ছা বা স্বাধীনতার মূল্যায়ণ করা হয়েছে। এটি একটি সুশীল সমাজের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। রাজকন্যার আছে ব্যক্তিগত ভাললাগা মান্দলাগার অধিকার, আছে হৃদয়ের কামনা, বাসনা-সমাজ স্বীকৃত এই অধিকার বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। এই অনুপ্রেরণা হিন্দু মুসলমান সমাজের নিরপেক্ষতার পরিচয় বহণ করে। অর্থাৎ একটি মৌলিক মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে এসেছে। মুসলিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে মিশ্র সমাজে এই আদর্শ বিস্তার লাভ করেছে বলে আমার বিশ্বাস।

কবি হাফেজদ্দীন তার নায়িকা কাঞ্চনমালাকে প্রেমের নিষ্ঠায় পতিপরায়ণতায় ও আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠভাবে মহিমান্বিত করে তুলেছেন।

কাঞ্চনমালার মা

"বসন্তের দুঃখ" কাব্যের মা চরিত্রটি খুবই গুরুত্তপূর্ণ। পৃথিবীতে মায়ের ভূমিকা যে ভূমিকা তা অতুলনীয়। মায়ের প্রতি বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপে একটি যৌথ সামাজিক মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মায়ের বাৎসল্যবোধ কাঞ্চমালাকে কেন্দ্র করেই পল্লবিত হয়েছে। ফলে সে

Dhaka University Institutional Repository

তার আবদার রক্ষা করেছে। কাঞ্চনমালার মনোগত চাহিদা লালমানিক্য যে চিনবে, তাকেই সে স্বামী হিসাবে বরণ করে নিবে। বিয়ের পর রাজকুমার তার ভাইয়ের কাছে যাবে। পতিই নারীর গতি। সুতরাং রাজকন্যা স্বামীর সাথে যাওয়ার প্রস্তাব তার মায়ের কাছে রাখে। কাঞ্চনমালার আর কোন ভাই বোন নেই। সুতরাং সন্তান হারানো ব্যথায় রাণীর আর্তনাদ যেন সকল মায়ের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত হানে

গগনের চাঁন্দ লুকাই উঠে পুর্নবার।
আমার চাঁন্দ গেলে ফের না আসিবে আর ॥

আকাশের চাঁদ-উঠে তার সীমানা পেরিয়ে ডুবে যায়। এই ডুবন্ত চাঁদ চক্রাকারে ঘুরে ফিরে পুনরায় আকাশে শোভা পায়। কিন্তু রাণীর একমাত্র কন্যাসন্তান কাঞ্চনমালাকে এক বিদেশী রাজকুমারের কাছে বিয়ে দিয়েছে। তার সন্তান চলে গেলে সে আর কখনো বিদেশ থেকে ফিরে আসবে না। সন্তান হারানো ব্যথায় রাণী শোকাতুর। এ ব্যথা পৃথিবীর সকল মায়ের এক। রাজা রাণীর কান্নার দুঃখ অনুভব করে তাকে শান্তনা দেয়

রাজায় বলিল প্রিয়া বুদ্ধি নাই তোরে।
জিয়নে মরণে কন্যা রহিছে কার ঘরে ॥
জন্মিলে মরণ পন্থ আছয় নির্শ্চয়।
বাঁচিলে তথাপি তারে পরে লিয়ে যায় ॥

মেয়ে বড় হলে তাকে বিয়ে দিতে হয়–এটাই জগতের নিয়ম। নিয়মের অনুবর্তী হয়ে জগত নিত্য চলমান। অযথা দুঃখ করে কোন লাভ নেই। তাদের সার্থকতা এখানেই যে তাদের কন্যা অন্য দেশের রাজপুত্রের সাথে বিয়ে হয়েছে এবং সেই দেশের সামাজিক মানুষ হিসাবে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। এই তো তাঁদের সামাজিকভাবে বড় পাওনা। তারপর তারা যখন পিতা মাতার কাছে বলে জকুম রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওয়াণা হয়। তখন শাবকহারা মায়ের যে চিত্র কবি এঁকেছেন, তা সত্যিই সকলের হৃদয়ের অন্তঃস্থলকে আঘাত না করে পারে না।

পাছে ২ ধায় দেবী ছন্ন তার কেশ।
উর্দ্ধমুখি হইয়া যায় পাগলের বেশ ॥

পৃথিবীর সকল মা তার সন্তানের মঙ্গল-অমঙ্গলের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত। সন্তানের জন্য মায়ের স্নেহধারা থাকে প্রবহমান। আর সন্তান কাছে না থাকলে সেই প্রবহমান স্রোতের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং এখানে বাঙ্গালী মায়ের বাৎমল্যপ্রেম চিরজাগ্রত হয়ে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় রাণী বা সৎমা

চোখের জলে নয়-নারী চিরকাল প্রেমেই বড় হয়েছে। কিন্তু সকল নারী প্রেমের ভাগের ক্ষেত্রে বৈরী ভাব পোষণ করছে। তবুও যখন সেই মৌলিক প্রেমের ভাগ দিতে হয়, তখন সে হয় বাঘিনী। মুহূর্তে সর্পিণীর মত ছোবল দিতে কসুর করে না। জননীরূপে যিনি বরণীয়, তিনি প্রেমের ভাগের বেলায় হয়ে যায় শকুনী। স্ত্রীরূপে মর্যাদা পেয়েও সতীনের ছেলেদের প্রতি ব্যবহারে আলাদা 'মাটিফে' পরিচিতি পেয়েছে (মোটিফ এস০-এস-৪৯৯)। নারীর এ হিংস্র প্রকৃতি পৃথিবীর আদিকাল থেকেই উদ্যত ফনা মেলে আছে সতীনের ছেলে মেয়েদের প্রতি।

রাজা প্রতাপ ভীমের স্ত্রী মারা যাবার প্রাককালে বলে যায়, সে যেন দ্বিতীয় বিয়ে না করে। যদি বিয়ে করে, তবে তার সন্তান শীতওবসন্ত উপেক্ষিত হবে। কিছুদিন পরেই রাজা আমাত্যবর্গের অনুরোধে দ্বিতীয় বিয়ে করে। কিন্তু দ্বিতীয় রাণী তার সতীনের ছেলেদের মোটেই ভাল চোখে দেখেনি। সব সময় চিন্তা করতে থাকে কিভাবে তাদেরকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া যায় ? এ নিয়ে তার দুঃচিন্তার অভাব নেই। রাজা, তার দ্বিতীয় রাণীর কাছ থেকে শীত ও বসন্তকে সরিয়ে দেয়। যেন তারা রাণীর বিরক্তির উদ্রেক না করে। রাণী নানা ফন্দি খুঁজতে থাকে। কেমন করে ঘায়েল করবে শীত-বসন্তকে। তারা কখনো মনের ভুলেও রাজবাড়িতে প্রবেশ করে না।

শীত ও বসন্ত কবুতর নিয়ে রোজ খেলা করে। একদিন কবুতর উড়ে গিয়ে দ্বিতীয় রাণীর ঘরে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় রাণী তখন,তা ধরে বেঁধে রাখে। দ্বিতীয় রাণী ছলনাময়ী, সে সুযোগ খুঁজতে থাকে। একদিন সুযোগ পেয়ে তা কাজে লাগিয়ে দেয়। রাজা দরবার থেকে ফিরে এসেই দেখে রাণী আলু থালু অবস্থায় কান্নাকাটি করছে। তখন রাণী রাজার কাছে শীত ও বসন্তের নামে ইনিয়ে বিনিয়ে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তোলে। রাজা শ্লীলতাহানির অভিযোগে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়। দ্বিতীয় রাণীর এই বিমাতাসুলভ আচরণে মটিফ হয়েছে এস৹-এস ৪৯৯.৩১। সৎ মা সব সময় থাকে ঈর্ষান্বিত ও স্বার্থন্বেষী এবং আত্মকেন্দ্রিক চরিত্রের। মানুষের সৃষ্টির পর থেকে সৎমাদের অন্যায় দৌরাত্ম অদ্যাবধি পর্যন্ত চলে আসছে। এরা না পারে এমন কোন কাজ নেই। নিষ্ঠুরতায় বনের পশুকেও হার মানায়। বিমাতার চারিত্রে কোন প্রকার প্রশংসা নেই। ঈর্ষা, হিংসা, কুটিলতা, ষড়যন্ত্র এবং জিঘাংসাবৃত্তিতে চরিত্রটি কলুষিত ও ঘৃণিত।

গঙ্গাধর সাধু

গঙ্গাধর সাধু এই কাব্যের খল চরিত্র। তার চরিত্রে অর্থলিস্পা ও লাম্পট্যতাই প্রধান আকর্ষণ। ধনিক বণিকরা লম্পট হয়ে থাকে। এই লম্পটদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষের ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা। গঙ্গাধর সাধু বিত্তবান, কামুক এবং নিষ্ঠুরতার প্রতীক হিসাবে চিত্রীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বহু অর্থের বিনিময় সে এক নতুন ডিঙ্গা তৈয়ার করিয়েছে। শত চেষ্টা করেও সেই নৌকা পানিতে নামাতে পারছে না। তখন কৃপাঠাকুর তাকে স্বপ্নে নির্দেশ দিয়েছে, ডিঙ্গার উপর মানুষ বলি দিতে হবে। তাহলে নৌকা পানিতে ভাসবে। ধনিক বণিক নরবলি দেয়ার মানুষ পাবে কোথায় ? নরবলি দেয়ার মানুষের জন্য তাকে রাজার নিকট যেতে হবে। বণিক সকল কাজেই তার পসরার চিন্তা করে। পাকা শিকারীর মত কিছু উপহার নিয়ে রাজার কাছে যায় এবং তার মনের কথা বলে। রাজা উপহার সামগ্রী পেয়ে বন্দীশালায় আদেশ প্রদান করেন, অশ্বচোরকে সাধুকে দিতে। রাজাদেশ পেয়ে কোতয়াল রাজকুমারের হাতে পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে সাধুর কাছে হস্তান্তর করে। সাধু রাজকুমারকে নিয়ে আসার সময় নির্মম অত্যাচার করে।

রাজকুমারকে গোছল করিয়ে কাপড়-চোপর পরিয়ে বলির স্থানে নিয়ে যায়। এবং বলির স্থানে দীপ ধূপ জ্বালানো হয়। রাজকুমারের নির্মম পরিণতি দেখে উপস্থিত লোকজন হায় হায় করে। তাঁর প্রার্থনায় কৃপাঠাকুর সদয় হয়, নৌকা নামলে পরে তাকে ছেড়ে দেবে। সাধু বলে– "নৌকা পানিতে নামলে পড়ে তার নাাহি প্রয়োজন" রাজকুমার আশ্বস্থ হয়।

রাজকুমার নৌকা ধরা মাত্রই দ্রুতবেগে নেমে যায়। কিন্তু সাধুর মনে কুবুদ্ধি হয়। সে রাজকুমারকে মুক্তি না দিয়ে বন্দীঘরে আটকিয়ে রাখে। ভবিষ্যত বিপদে তাকে কাজে লাগবে। ধুরন্ধর সাধু ওয়াদার বরখেলাপ করে। প্রতারক বেনিয়া সাধু রাজকুমারকে মুক্তি না দিয়ে সামাজিক হীনতার পরিচয় দিয়েছে। সাধুর নরবলির ভূমিকা প্রাচীন বাংলার একটি সামাজিক আচার ও ব্যবহারকে উন্মোচন করেছে। তখনকার সময় প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিরা সাধারণ ও দুর্বল মানুষের উপর অত্যাচার এবং নিগ্রহ করতে কসুর করেনি। এটি সামন্ত প্রথার একটি কলঙ্কিত অধ্যায়কে সূচিত করে।

তারপর সাধু বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে এসে কিশ্বর নরপতির রাজ্যে এসে সাত মানিক্য রাজার কাছ থেকে উপঢৌকন গ্রহণ করে। কিন্তু সাধু নিম্মশ্রেণীর তার আভিজাত্যতা নেই। আছে কুটিলতা, লোভ-লালসা আর সন্দেহ,সংশয়। সংশয় নিরসনের জন্য সে ডিঙ্গায় এসে লালমানিক পরীক্ষা করে। কিন্তু সাধু নিতান্তই বোকা ; সে জানে না লালমানিকের পরিচয়। শুধু জানে এক মানিক সাতরাজার ধন। রাজকুমার তাকে ভালমানিক ও অন্ধমানিক পার্থক্য করে দেখায়। লোভী-সাধু, অন্ধমানিক নিয়ে কিশ্বর নরপতির কাছে যায় ফেরত দিতে। এখানে সে চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক কালকেতুর সাথে তুলনীয়। তাকে চণ্ডীদেবী সাত ঘড়া ধন দেয়। কিন্তু একার পক্ষে সব নেয়া সম্ভব নয়। দেবীকে দুই ঘড়া ধন কাঁখে করে দিয়ে আসতে অনুরোধ জানায়। দেবী তাকে সাহায্য করে। কালকেতু যায় আগে আগে, পিছনে যান দেবী। কিন্তু কালকেতুর সন্দেহ হয়, ধন নিয়ে দেবী পালিয়ে না যায়। এই কাহিনীর প্রতি দৃষ্টি দিলেই বুঝা যায় হীনজনের অর্থলিপ্সার আকাঙ্খা। ধনলিস্পার স্পৃহা গঙ্গাধর সাধুর মধ্যে প্রবল ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গাধর সাধুর ডিঙ্গায় রাজকুমার তার পরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে জকুম রাজ্যের রাজধানী উজানি নগরে যাত্রা করে। লম্পট সাধু রাজকন্যার রূপে বিমোহিত হয়ে পড়ে। রাজকন্যাকে পাওযার জন্য বিভিন্ন ফন্দী আটতে থাকে। কামান্ধ সাধু জানে রাজকুমার জীবিত থাকাবস্থায় রাজকন্যাকে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সে নিষ্ঠুর ও নিমর্মতার পথ বেছে নেয়। নৌকার আরোহীদের সাথে শলাপরামর্শ করে কুমারকে হাতে পায়ে বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। এমন নিষ্ঠুরতা মৈমনসিংহ গীতিকার দু-একটি পালায় দেখা যায়। দেওয়ান ভাবনা এই বিশেষ শ্রেণীর লম্পট, মলুয়ার দেওয়ান ও কাজী লম্পটের বাস্তব উদাহরণ।

কামোন্মত্ত গঙ্গাধর সাধু কাঞ্চনমালাকে বশে আনার জন্য বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন ও প্রতিপত্তি দেখাতে থাকে। যখন অর্থ ও প্রতিপত্তিতে কোন কাজ হয় না। তখন সাধু প্রাণনাশের হুমকি দেয়। কিন্তু তাতে রাজকন্যা বশ হয় না। বরং সে বুদ্ধী ও কৌশলের আশ্রয়ে নিয়ে সাধুকে বশে আনে। রাজকন্যাকে সাধু তার পুরীতে ভিন্ন ঘরে রাখে।

পৃথিবীতে অন্যায়কারীর অবস্থান ক্ষণস্থায়ী। যে কোন ভাবেই হক, তার পতন হবেই। কারণ অন্যায়ের সাথে সমাজ মানসের কোন সংশ্রব নেই। অন্যায়কারীর পতন অনিবার্য। তার বাঁচার আর কোন উপায় থাকে না। কাঞ্চনমালার রূপে সাধু অন্ধ হয়ে যায়। তাকে পাওয়ার জন্য সকল কথাই সাধুকে শুনতে হয়। রাজকন্যার একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের কাছে সাধুর ধন সম্পদ তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তার কাছে এর কোন মূল্যমান নেই। সাধুর নির্যাতন, অন্যায়, অবিচারে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠে। কৌশলে দেশের রাজা, অমাত্যবর্গ ও দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে তার কথা শুনতে ও গঙ্গাধর সাধুর বিচার করতে বাধ্য করে। গঙ্গাধর সাধুর ষড়যন্ত্র রাজকুমারকে হত্যার প্রচেষ্টা, রাজকন্যাকে বন্দী ও বিয়ে করতে চাওয়া ইত্যাদি অপরাধে তার শাস্তি হয় মৃত্যুদণ্ড ও রাজাদেশে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার চরিত্র কাহিনীর গতিধারাকে তরান্বিত ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কোন অবস্থাতেই পাঠক কুলকে ঘটনাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় না। তাই তার চরিত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

দাই মা

এই কাব্যে মায়ের পরিপূরক হিসাবে দাইমার চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এই চরিত্রের কার্যকলাপের মধ্যে কোন নিষ্ঠুরতা, ক্রুরতা, অমানবিকতা নেই। বরং মায়ের পরিপুরক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এরা যুগের ও কালের সাক্ষী। পৃথিবীর আদি সমাজ থেকেই এই চরিত্রের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। মা যেমন সর্বংসহা হন, ঠিক প্রায় তেমনি সেই ভূমিকায় দাইমা অবতীর্ণ হন। পালিত সন্তানের মঙ্গল কামনা ছাড়া অন্য কিছু বুঝে না। রাণী ঈশ্বরী মৃত্যুকালে রাজাকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে নিষেধ করে যায়। কারণ দ্বিতীয় স্ত্রী, কখনো প্রথম স্ত্রীর সন্তানকে ভাল চোখে দেখে না। তাই তিনি মৃত্যুশয্যায় শীতওবসন্তকে দাইয়ের হাতে দিয়ে যায়। এই চরিত্রের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপে একটি একান্নবর্তী পরিবারের সামাজিক মানসিকতা ধরা পড়ে। নায়কের বিপর্যস্ত

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ্য উন্নয়নে এরা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই চরিত্রের একনিষ্ঠ বাৎসল্য প্রেমের জয় দেখা যায়। কোন স্বৈরাচারবৃত্তির মনোভাব কোথাও ব্যক্ত হয়নি। দেহগত প্রেমের ক্ষেত্রে এরা নিরব। কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ন হন। নারী স্বাধীন বাৎসল্য প্রেমের অধিকারী। এই বাৎসল্য প্রেমের একনিষ্ঠতাই তার প্রেমের ধর্ম ও সাধনা। তাকে দাইমা স্বাধীন ভাবেই কাছে টেনে নেয়। তার উপর কেউ খবরদারী করতে পারে না। রাজা যখন দাইকে তার সন্তান সম্পর্কে জানতে চায় তখন দাইমা কি কারণে এবং কেন তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে ; তার যথার্থ রূপ তুলে ধরতে দ্বিধাবোধ করেনি। সুতরাং এখানে দাইমা হৃদয়ের গোপন কুঠরী হতে সহজাতবৃত্তির মত তার শক্তি অতুলনীয়। এই শক্তির দ্বারা তার নারী ধর্ম ও সন্তানের প্রতি বাৎসল্য প্রেম মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে। দাইয়ের ভূমিকায় রাজার ও রাণীর নিষ্ঠুরতার কাছে বাৎসল্য প্রেমের জন্য দুঃখ ও তিতিক্ষা লাভ করতে হয়েছে। পালিত সন্তানের প্রতি নারীর দুর্জয় প্রেমের শক্তি প্রমাণীত হয়েছে। সেই জন্য দাইমা চরিত্রটি অপরিমেয় শক্তির অধিকারী।

মালিনী

মালিনী আমাদের সংসার তথা সমাজ জীবনের একটি প্রতিচ্ছবি। মালিনীরা সাধরণত বিয়ের পূর্বে নায়ক নায়িকার গোপন সংবাদ আদান প্রদান করে থাকে। কখনো তারা অঘটন ঘটন পটিয়সী হিসাবে কাজ করে। কখনো তারা বিত্তবান লম্পট পুরুষের যৌন পিপাসা নিবারণের নিমিত্তে যুবতী মেয়েদের সরবরাহ করে থাকে। আবার কখনো তারা বিয়ের কথাবার্তা বলে সমাজের একটি বিশেষ স্থান করে নেয়। এ চরিত্রটি দোষেগুণে আলোচিত সমালোচিত। মানুষের জীবনের একটি বিশেষ স্থান ও সামাজিক মানুসের সাথে মালিনীরা সম্পৃক্ত থাকে। এ প্রসংগে শহীদুর রহমান বলেন–"এভাবে সেদিন মালিনী বা দূতীরা কত যে গরীব কৃষকের বধু-কুলবধু কিংবা পল্লীবালার ইজ্জত আব্রু অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই"। (মোঃ শহীদুর রহমান-ময়মনসিংহ গীতিকায় নারী চরিত্রের স্বরুপ পৃ. ৫২ জানুয়ারী ১৯৮৮ বাংলা একাডেমী, ঢাকা)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মালিনী বড়ায়ি নামে অবতীর্ন হয়েছে। বড়ায়ির কাজ দূতীপনা করা। তার দায়িত্ব রাধার রক্ষণাবেক্ষণ করা। কারণ বৃদ্ধ রাধা প্রেম সম্পর্কে সচেতন। তার কাজ সমতা রক্ষা করা। ড. নীলিমা ইব্রাহীম বড়ায়ির কাজ সম্পর্কে বলেন – "সুতরাং এসব কাজ গোপনে করতে হয়,তাতে অপরাধ নেই কিন্তু লোকে জানলেই বিপদ"। (ড. নীলিমা ইব্রাহীম–শ্রীকৃষ্ণকির্তন কাব্য পাঠের ভূমিকা পৃ. ৩৩)। বড়ায়ি বা দূতী বা মালিনী ইত্যাদি একই শ্রেণীর। ভিন্ন ভিন্ন নামে আর্বিভূত হয়েছে। এদের একটাই দায়িত্ব যুবক-যুবতীর গোপন কার্যাবলী, সমাজকে আড়াল করে সরবরাহ করা। এ কাজের জন্য তারা ভাল পারিশ্রমিক পায়। সমাজদেহের মানুষের একটি বিশেষ সময় কিছু কিছু মানুষের খুব কাজে আসে।

Dhaka University Institutional Repository

গঙ্গাধর সাধু কাঞ্চনমালার রূপে কামান্ধ হয়ে রাজকুমারকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে-তাকে হরণ করে নিজ পুরীতে নিয়ে আসে। সাধুর বিশ্বাসী মালিনীকে দায়িত্ব দিয়ে দেয়া হয়। তার দেখা শুনার সংবাদ আদান-প্রদান এবং রাজপূরীর নিয়মানুসারে ফুলের মালা সরবরাহ করা তার কাজ। এখানে মালিনীকে পাই একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে । গঙ্গাধর সাধুর সংবাদ বাহক ও বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসাবে। পরবর্তীতে ঈশ্বরের কৃপায় রাজকুমার বৃন্দাবনের ঘাটে ভেসে আসে। মালিনী তাকে মুক্ত এবং পরিচর্চায় সুস্থ করে তোলে। মৃতপ্রায় কুমার বেঁচে উঠে মালিনীকে 'মা' বলে সম্বোধন করে। ফলে সন্তানহীন মালিনীর হৃদয় সন্তান ব্যাৎসল্য প্রবল হয়ে উঠে। মালিনীর মাধ্যমেই সে রাজকন্যার তথ্যাদি পায়। রাজকন্যার পরামর্শ মত মালিনীর সহায়তায় সাধুর পূরীতে প্রবেশ করে ও রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। রাজকুমার হত্যার প্রচেষ্টা ও রাজকন্যাকে হরণের অপরাধে সাধু দণ্ডিত হয়। মালিনীর ভূমিকা গোপন সংবাদ আদান-প্রদান কারী হিসেবে। কাব্য আলোচনায় মালিনীর গুরুত্ব অবহেলার নয়।

সখী

সখীদের চরিত্র বিশেষ করে মধ্যযুগের সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। "বসন্তের দুঃখ" কাব্যে আমরা সখীদের ভূমিকা দেখতে পাই মালিনীর সাথে। জকুম রাজ্যের বৃন্দাবনের ফুলের বাগানে ফুল তোলা এবং রাজকুমারের বন্ধন মুক্ত করার ভূমিকায়। এছাড়া পাওয়া যায় রাজ অন্তঃপুরের রাজকন্যার সাথী হিসাবে। রাজকন্যার সুখ দুঃখের শ্রোতা ও আদেশ পালনকারীরূপে সখীদের মূল্যায়ণ করা হয়েছে। কিন্তু এই কাব্যে মালিনীর সাথে সখীদের ভূমিকা মূখ্য স্থান দখল করেছে।

জল্লাদ

জল্লাদ চরিত্রটি নিষ্ঠুরতার প্রতীক। লোকসাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে এটি 'মটিফের' অর্ন্তগত। কিন্তু এই কাব্যে এই চরিত্রটি মটিফ নয়। কারণ জল্লাদ রক্তে, মাংসে, স্নেহে-মায়ায় গড়া এক মানুষ। তিনি সকল মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী। নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে তার হৃদয়ে আছে বাৎসল্য প্রেমের ফল্গুধারা। রাজা প্রতাপ ভীম দ্বিতীয় রাণীর প্ররোচনায় শীত ও বসন্তকে বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যার আদেশ দেয়। রাজাজ্ঞা অবশ্যই পালনীয়। জল্লাদ শীত ও বসন্তকে দুটি তাজা ঘোড়া ও নতুন পোষাক দিয়ে অন্য দেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। রাজা ও রাণীকে বনের পশু হত্যা করে তার রক্ত ও রাজকুমারদ্বয়ের পরিধানের জামা-কাপড় দেখিয়ে বিশ্বাস অর্জন করে। জল্লাদ চরিত্রটি একান্ত নিষ্ঠুর হয়েও মানবিক হওয়ায় আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে। সুতরাং জল্লাদ চরিত্রটি উজ্জ্বলতার দাবী রাখে।

Dhaka University Institutional Repository

কোতয়াল

কোতয়াল চরিত্রটি আজ্ঞা বাহকের ভূমিকায় অঙ্কিত হয়েছে। এ চরিত্রের কোন উজ্জ্বলতা নেই বরং নিন্দনীয় হয়েছে। কোতয়াল বন্দীশালায় রাজকুমারের সকল কথা শুনে ওয়াদা করে যে ভাবেই হক 'শীত রাজার' সাথে তার দেখার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কোতয়াল তা করতে পারেনি। বরং যখন বলি দেয়ার জন্য গঙ্গাধর সাধুকে দিয়ে দেয়ার আদেশ হয়। তখন কোতয়াল ছুরি দিয়ে জোড়ে জোড়ে আঘাত করে। এখানে কোতয়ালের প্রতি আমদের ঘৃণা হয়। সুতরাং কোতয়াল আজ্ঞাবাহকের ভূমিকায় একটি অনুজ্জল চরিত্র।

রাজহস্থী

বাংলাদেশের গাঁথায় লোককাহিনীতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই চতুষ্পদজন্তু এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই জন্য বলা হয়–**A motif is a smailst element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unsual and striking about it.**
(Stith thompson-the folk tale-page-41, 1951. new york.)

এই সূত্রবদ্ধ নিয়মানুসারে হাতী চরিত্রটি 'মটিফের' অর্ন্তভূক্ত। কারণ হাতিটি বন্ধুভাবাপন্ন ও উপকারী হিসেবে মটিফ বি০-বি ৩০০.১।

যখন জকুম রাজ্যের নিঃসন্তান রাজা রায় কবিচন্দ্র পতি মারা যান। তখন সিংহাসন খালি পড়ে থাকে। সিংহাসনে বসার মত কোন উত্তরাধিকার না থাকায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। কেউ কোন সিদ্ধান্ত পৌছঁতে পারে না। অতঃপর রাজহাতীকে রাজা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। রাজহাতী বুদ্ধিভিত্তিক পরিচয়ে রাজতিলকের শর্ত দিয়ে শীতকে শুর দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। হাতী এখানে বুদ্ধিবাদীর পরিচয়ে স্বীকৃত। বুদ্ধির প্রখরতায় সচেতন মানুষ যা করতে অক্ষম, বনের চতুষ্পদপ্রাণী তা করতে সক্ষম হয়েছে। হাতী এই কাব্যে বুদ্ধিবাদী ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়ে কাহিনীর গতিধারাকে সচল করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ঃ কাব্যবিচার ও শিল্পরূপ

কাব্য বিচার

কবি হাফেজদ্দীন রচিত 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যটি কয়েকটি গুণে বিশিষ্ট-(ক) মিলনাত্মক কাব্য (খ) অলৌকিক প্রভাবমুক্ত বাস্তব জীবন ভিত্তিক (গ) অশ্লীলতামুক্ত কাব্যরস (ঘ) মানবিক গাহর্স্থ উপাখ্যান (ঙ) রচনা মৌলিক ও নাটকধর্মী সংলাপ।

কবি হাফেজদ্দীন 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যের চরিত্রগুলি অঙ্কন করতে গিয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। কোন প্রকার ধর্মীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হননি। বরং হিন্দুও মুসলমান সমাজের এক অপূর্ব মিলন আমরা প্রত্যক্ষ করি। মধ্যযুগের অনেক সাহিত্যই ধর্মীয় প্রভাবাচ্ছন্ন হওয়ায় ধর্মীয় সাহিত্য নামে আখ্যায়িত হয়েছে। এমন কি আধুনিক যুগও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত আজ পুরাণো তালিকায় পড়েছেন। ফলে কারো কারো শিল্পগুণ বিচারের মাপকাঠিতে নিম্নমুখী। কিন্তু কবি হাফেজদ্দীন অল্প বয়সে, অল্প বিদ্যা নিয়ে কাব্য কাননে অবগাহন করে উক্ত দোষকে উপেক্ষা করে এক সুমহান মর্যাদা পেয়েছেন। কোন প্রকার ধর্মবোধ দ্বারা পরিচালিত হননি। সময়ের পরিবর্তনে ভাঙ্গাগড়ার সময় বেনিয়াসুলভ ধূর্ততা তার কাব্যে স্থান পায়নি। বরং সম্পূর্ণ স্বাধীন শৌর্য বীর্যে লালিত গৌরব করার মত চরিত্র চিত্রন করতে সক্ষম হয়েছেন। তার অঙ্কিত প্রধান চরিত্র কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নোয়ায়নি। আভিজাত্য, গৌরব, স্বজাত্যবোধের প্রখরতায় তারা স্বাতন্ত্র্য দ্বীপ শিখার মত প্রজ্বলিত নক্ষত্র বিশেষ। গ্রাম্যজীবনের পটভূমিকায় অংকিত মানুষের চরিত্রগুলো সুন্দর। ভাবে, বাস্তববোধের আবহাওয়ায় তারা লালিত, রাজা, দ্বিতীয় রাণী, মা, দাই মা, মালিনী, জল্লাদ, কোতয়াল, রাজা শীত, রাজকুমার বসন্ত, রাজকন্যা কাঞ্চনমালা, হাতী, লোভী, ধুরন্ধর ও নিষ্ঠুর বণিক গঙ্গাধর সাধু নিজ নিজ শ্রেণীর পেশায় স্বকীয় ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছে। এ ছাড়াও তাদের চরিত্রে সংযম, সংবেদন, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, লাম্পট্য, নিষ্ঠুরতা, কামন্মোত্ততা, প্রণয়াকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ, ভীরুতা, সাহসিকতা, গাম্ভীর্য, ওজস্বীতা, ক্ষমাশীলতা, নির্দয়তা, সহনশীলতা, বাৎসল্যপ্রেম, খেদোক্তি, পতিভক্তি, পত্নীপ্রেম, মিলনাকাঙ্খা অপরূপ রূপে অঙ্কিত হয়েছে। এই কাব্যের কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টিতে কবি দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। কবি হাফেজদ্দীন কোন প্রকার দুষ্ট চিন্তার পক্ষপাতিত্ব মূলক অবস্থান গড়ে তোলেননি। বরং যে চরিত্র যেভাবে, যে পরিবেশে চিত্রিত হওয়া উচিত–তিনি সেই ভাবেই কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে অংকন করেছেন। কোন প্রকার হীনমন্যতা দ্বারা তিনি ও তার শিল্পবোধকে আচ্ছন্ন করেননি। চরিত্রের বাস্তাবতার নিরীখে দোষগুন ,জল্পনা কল্পনা ও ষড়যন্ত্রকে সুন্দরভাবে এবং বলিষ্ঠভাবে রূপদান করেছেন। নারীর দেহ ও রূপের লালসায় পুরুষ কামান্ধ হয়, তার বাস্তবচিত্র অংকন করেছেন। কারণ কবির সময়কালটা ছিল মুক্তির নেশার কাল।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী হঠাও ও দেশের স্বাধীনতা পুনুরুদ্ধারের বীজ কেবল দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছে। এখানে তিনি স্বাধীনচেতা ও আপোষহীন কবি। তাই হানাদারকে উৎখাত করেই রাজকুমারের ভূমিকায় বীরত্ব ও স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে মূখ্য করে তুলে ধরেছেন।

ঘটনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যের মুখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নাটকীয়তা। নাটকের সংলাপ শ্রোতাকে রসমাধূর্য গ্রহণে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কবি তার কাব্যের সাথে নাটকীয়তার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কবির সংলাপ দ্বি-মাত্রিক। নাটকে কোরাসের ভূমিকা প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কোন কোন সময় বিরক্তির উদ্রেক করে। কিন্তু দ্বি-মাত্রিক সংলাপ কোন অবস্থায়, কখনো বিরক্তি ও ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় না। এই কাব্যের ২৯তম পরিচ্ছেদে একলক্ষ সৈন্যের সাথে যুদ্ধ বিষয় কথোপকথন হয়। কিন্তু কোন অবস্থায় একের অধিক সংলাপ উচ্চারিত হয়নি। এর কারণ একক কবির রচনা-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে পরিবেশন হত। সৈয়দ আজিজুল হকের মতে-'সংলাপধর্মীতা দৃশ্যময়তার মধ্যে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোন থেকে উপস্থাপিত চিত্রময়তা সংযোগহেতু নির্মান করেছে'। (সৈয়দ আজিজুল হক–ময়মনসিংহ গীতিকা পৃ.১৬১) রচয়িতা তার নিজস্ব অনুভূতিকে ব্যক্তের জন্য, চরিত্রের ও মনোজগতের সংলাপের সাথে সামন্তরালভাবে সন্নিবেশন করেছেন। যুগপৎ সংলাপ উচ্চারণের ক্ষেত্রেও নাটকীয়তা অবলম্বন করেছেন।

পাঠকের মনোপযোগী করে কবিতা বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলে বহু সংলাপ বা কোরাসের ভূমিকা অনুপস্থিত থাকে এবং দ্বিমাত্রিক সংলাপ মূখ্য হয়ে উঠেছে। কবিতাকে বলা হয় ছবি ও গান। সুরে সুরে গান হয় ও বর্ণনায় তার চরিত্রগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলেই তা অনুধাবন করা যাবে।

অসাধারণ পরিমিতিবোধ কবির আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কবি অধিকাংশক্ষেত্রেই ও প্রয়োজনে সংকেতধর্মী সংলাপ ব্যবহার করেছেন। অতিরঞ্জিত কোন কিছুই অংকন করেননি। আখ্যানভাগের ঘটনার বিন্যাসে ইঙ্গিতকে ব্যবহার করে ঘটনার পারম্পার্য রক্ষা করেছেন। কোন অবস্থাতেই তার মান ক্ষুন্ন হয়নি।

কবির আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল অশ্লীলতাকে পরিহার করা। যদিও কবি শৃঙ্গারের বা আদিরসের বর্ণনায় কার্পণ্য করেননি। তবুও সে বর্ণনা ধোঁয়া মোছা। কোন কদর্যতা তাকে স্পর্শ করেনি। এটি একটি কবির বিশেষগুণ। যা যুগ মানস হিসাবে খ্যাত। আরো একটু পরিস্কার করে বলা যায় তা সুভাষণরীতি সম্পন্ন।

এই কাব্যে কামন্মোত্ততা বিশেষ স্থান পেয়েছে। রাজকন্যা রূপবতী, গুণবতী এবং বিবাহিতা। এই বিবাহিতা নারীর প্রতি লম্পট পুরুষের আকর্ষণের বাস্তবতার ছাপ পড়েছে। রূপবতী নারীকে পাওয়ার বাসনায় লম্পটরা যে কোন অঘটন ও বিভীষিকাময় কাজ করতে পিছপা হয় না। ঘটনাস্থল ও ঘটনার মধ্যে এই বাস্তবতার ছাপ স্পষ্ট। সমাজ ও পরিবার বৃত্তের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে সামাজিকভাবে বিয়ের পর লম্পটদের কামন্মোত্ততা প্রবলাকার ধারণ করে। কিন্তু নারীর একনিষ্ঠ ভালবাসার কাছে তা মোটেই টিকে না। রাজকুমার জীবিত থাকাবস্থায় রাজকন্যাকে পাওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয় জেনে-সাধু নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিয়ে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। সমুদ্রতীরবর্তী মানুষের সহজ যাতায়াত পথ সমুদ্র। বড় বড় ডিঙ্গা নৌকায় করে তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে বা এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করত। ফলে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারার কৌশল জানা ছিল। তাই এই কাব্যে নিষ্ঠুরতার কাজে সমুদ্রকে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘটনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে কবির দক্ষতা পরিস্ফুটিত হয়েছে বারমাসী বর্ণনায়। বারমাসী বর্ণনায় ব্যক্তিগত চরিত্রের শোক, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা প্রকাশ পেয়েছে ঋতুভেদে এবং তা নিখুঁতভাবে। তেমনি সামাজিক সত্য ও বাঙ্গালী নারীর পতিকে দেবতাজ্ঞানে সম্মান করার স্পৃহা বাস্তবরূপ পেয়েছে।

বাচনভঙ্গীর একটি নির্দ্দিষ্ট রীতি 'বসন্তের দুঃখ' কাহিনী কাব্যে দেখা যায়। প্রত্যাহিক জীবনের সংগ্রামময় ভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। বিপদে আপদে চরিত্রে আত্মনির্ভরতার ছাপ স্পষ্ট, দৈব নির্ভরতা অত্যন্ত ক্ষীণ। স্বামীর বিপদমুক্তির জন্য রাজকন্যা উর্দ্ধমুখী হয়ে প্রার্থনা করেছে। আর যদি গঙ্গাদেবী তার স্বামীকে উদ্ধার না করে, তবে তাকে বদ দোয়া দেবে। এখানে অনুকুল প্রতিকুল পরিস্থিতিকে প্রকৃতির সমগ্র উপাদানকে জীবন ও সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে রাজকুমারকে বাঁচানোর জন্য সমুদ্রে বালিশ নিক্ষেপ করে। অর্থাৎ সমুদ্রের পানিতে বালিশ ধরে ভেসে থাকতে পারবে। চরিত্রের আত্মগত অনুভুতি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হর্ষ-বিষাদের সহায় হিসাবে প্রকৃত বন্ধুর মত প্রকৃতিকে মানবচিত্তের সঙ্গে একাত্ম করে উপস্থাপন করেছে এইরূপ দৃষ্টান্ত খুব কম দেখা যায়।

মধ্যযুগের কাহিনী কাব্য সাহিত্যে **Tragedy** সৃষ্টি প্রয়াশ দেখা যায়। তবে সে ধারা বেশী নয়। এর মূখ্য কারণ ছিল সমাজ মানস। অর্থাৎ সময়ের পরিসরে রচিত সাহিত্য ছিল ধর্মনির্ভর। শিক্ষিত কবির কাব্যের চেয়ে অশিক্ষিত নিরক্ষর লোককবির রচনায় **Tragedy**-র প্রয়াস দেখা যায়। ঠিক একই নিয়মে **Comedy** সৃষ্টির স্বকীয়তাও প্রকাশ পেয়েছে। লোককবিদের রচিত সাহিত্যে **Tragedy** ও **Comedy** সৃষ্টির প্রধান কারণ জীবনমুখীতা।

কবির কাব্যের বিষয়, চিন্তানুভূতি ও প্রকাশভঙ্গি হচ্ছে এক বিশেষ আকর্ষণ। তিনি গতানুগতিকতাকে পরিহার করার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ খাঁটি বাংলা ভাষার ণ-ত্ব বিধানকে লজ্ঘণ করে স্বেচ্ছাবিহারীভাবে শব্দাবলীকে ব্যবহার করে কাব্যিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। এটি তার প্রতিভার বিশেষ দিককে নির্দেশ করে। যে লেখায় স্বাধীনতা নেই, তা নিরব ও নিরস সাহিত্য বলে পর্যবসিত হয়। আর পরাধীন সাহিত্য প্রচার সর্বস্ব হয়েই থাকে। সাধারণ মানুষের মধ্য স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত করাই ছিল কবির অভিব্যক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

কবির উপস্থাপন রীতি পুঁথি সাহিত্যের মত সুরাকারে আমাদের চমকভাঙ্গায়। এখানেই তার লিপিকুশলতা। সাধু ভাষার মধ্যে কথ্যরীতির শব্দাবলীকে প্রয়োগ করে ভাষায় **Rhythem** শ্রুতি মধুর করেছে। কবি মধ্যযুগের প্রচলিত সমিল পয়ার ছন্দের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আগন্তক ভাষার শব্দালীকে প্রয়োগ করে ভাবের দিব্যমূর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই কাব্যের স্বাতন্ত্র্যমাত্রা, ষ্টাইল, ভাব, ভাষা, অলংকার ও চরিত্র সৃষ্টির অপূর্ব ধ্বনি ব্যঞ্জনা স্বার্থকরূপ পেয়েছে।

শিল্পরূপ

কবি হাফেজদ্দীন কোন রাজার বা রাজসভার কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন গ্রামীন সভ্যতার একজন লোককবি। ফলে তার কাব্যের বিষয় লোকজীবন কেন্দ্রিক। বাংলাদেশের সাহিত্যের সমাজ মুলতঃ লোকজীবন নির্ভর। তাই সাহিত্যে সাধারণ মানুষের সামগ্রিক জীবনের কথা এসে যায়। তাদের ধর্ম-কর্ম,আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার, সংস্কৃতি, জীবন ও জীবিকা ইত্যাদির চিত্রই স্থান পেয়েছে। লোকজীবনকে বাদ দিয়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগে কোন সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। ফলে প্রত্যেক কাহিনীতেই লোকজীবন অত্যন্ত বাস্তবতার সাথে স্থান পেয়েছে। চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের শেষকবি ভারতচন্দ্র রায়ের কাব্যে লোকজীবনের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা ও তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য, লাঞ্চিত জীবনের বেদনাপূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

বাংলাদেশের লোকসমাজে দারিদ্র্যতা ছিল নিত্য সঙ্গী। তাই একটি বৃহৎ পরিবারের সদস্যরা নিত্যনৈমিত্তিক কলহ, অর্ন্তদ্বন্ধ ও হিংস্রতার উৎপাতে ছিল শঙ্কিত। সমাজের নৈতিক বাঁধন ছিল শিথিল। তাই এই কাব্যে সৎ মা তার ক্রিয়াকলাপে ও রাজহাতি রাজা নির্বাচনের জন্য মটিফ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। “বসন্তের দুঃখ” কাব্যের কবি সমসাময়িক লোকজীবনের যে ছবি এঁকেছেন তা জীবন রসিক। কাব্যপাঠক ও ঐতিহাসিকের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে জীবনের কথা আছে ; তাতে বিলাস-ব্যাসন, কামনা,বাসনা, ঐশ্বর্য দাম্ভিক ও কাপুরুষ রাজার কাহিনী, ধূর্ত বেনিয়ার অর্থলিস্পার ছবি, অপেক্ষাকৃত ধনিক বণিকের লম্পট্যতা, সন্তানহারা বাবার আর্তনাদ, পালিত দাইয়ের সন্তান বাৎসল্য,সন্তান হারানোর ব্যথায় বাবা মায়ের উৎকণ্ঠা, সন্তানহীন মাতার সন্তান প্রাপ্তিতে তার অতৃপ্ত হৃদয়ের পূর্ণতার অভিলাষ, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার স্পৃহা, স্বাধীনতার জাগ্রত চেতনা, অনুদারবৃত্তি জীবনের প্রতি অনীহা, সেকালের সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকা, শ্রম ও বিশ্রাম, কাজ ও আনন্দ, জন্ম ও বিয়ে, নরবলি প্রথা, পারিবারিক জীবন, বস্ত্র, অলংকার, বাদ্যযন্ত্র, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত তৈজসপত্র, অপরাধ,বিচার পদ্ধতি, বাঙ্গালী নারীর একনিষ্ঠ প্রেমের জয় ও সতীত্ব রক্ষায় বাঙ্গালী নারীর মনোবল, পতিপরায়ণ বধূর বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল ইত্যাদি বিষয়ের শিল্পসম্মত বিবরণ আমরা পাই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক কবিই তার সৃষ্টির মধ্যে বেঁচে থাকেন। এই সৃষ্টিই সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার কথা বলে, যা পরবর্তীতে হয়ে যায় মূল্যবান দলিল। মধ্যযুগের কাব্যগুলি ছিল কাহিনী প্রধান ও বর্ণনা নির্ভর। কিন্তু 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যটি রূপকথাশ্রয়ী ও জীবন নির্ভর। সেকারণেই বিভিন্ন অনুসঙ্গে সমাজ চিত্র স্থান পেয়েছে।

মধ্যযুগের মুসলমানদের দ্বিপালী উৎসবের রাজপুত্তুররা ছিল দ্বিগীজয়ী। তারা কোন পরাজয়কে স্বীকার করতে জানেননি। বরং দ্বিপালী উৎসবের জয়নাদে তাদের ছিল মূখ্য ভূমিকা। কিন্তু অলস, অকর্মণ্য মোঘল শাসকের শিথিল রাজদণ্ড ধরে সাত সাগরের তের নদীর ওপারের ধূর্ত বেনিয়ারা ১৭৫৭ সালে স্বাধীন নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর আলীর খানের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। রাজতক্তের অধিকারী মুসলমানরা এবারে পেল ধূলির বিছানা। ফলে তারা রিক্ত, সিক্ত, নিঃস্ব ও কাঙ্গাল হয়ে পড়ে। কাঙ্গালী মুসলমানের উপর চলে বেনিয়াদের নির্মর্ম পেষণনীতি। কবি হাফেজদ্দীন জন্মগ্রহণ করেই সামাজিক দলন নীতিকে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন এবং ১৭৫৭ সালের রাজনীতির অবণতির ছাপ তাঁর চেতনায় স্থান পায়। তাই নিঃস্ব, রিক্ত, বঞ্চিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত রাজকুমারের মনে দানা বেঁধে উঠে ক্রমিক অভূত্থানে নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পাবার দুঃসাহস।

নিত্য দারিদ্র্যের কশাঘাত ও অন্য দিকে বেনিয়াদের নির্মম দৌরাত্ম, অন্যায়, অবিচারে তরুণ সাহসী হতভাগ্য রাজকুমার রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক অধিকারের স্বপ্ন দেখতে পায়। মনে ফিরে পায় হিম্মৎ ও দুঃসাহস। এই নবজাগরণের স্পন্দন বাংলার আকাশে বাতাসে পল্লবীত হয়ে স্বাধীনতার উদ্দীপনায় রূপায়িত হতে চায়।

রাজকুমারের দুঃসাহস বাঙ্গালী যুবক কবির চিত্তে দোলা দিতে থাকে। তাই তিনি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশের হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংকল্পে ও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তার মন ছিল সজাগ ও সরাগ।

মুক্তি অভিলাষী কবি কোন দিনই পরাধীনতাকে মেনে নিতে পারেননি। সংবদেনশীল ও সজাগচিত্তে যিনি সমাজ ব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তিনি প্রথম যৌবনেই স্বাধীনতার স্পৃহায় পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেন এবং এটাই ছিল তার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মুক্তির চেতনা। এই চেতনার জন্যেই তিনি অন্যান্য কবিদের থেকে আলাদা ছিলেন। তাই তিনি একজন সচেতন শিল্পী হিসাবে আলাদা মর্যাদা পেয়েছেন।

কবিরা প্রকাশ করতে জানেন এবং পারেন। প্রকাশই তাদের মূখ্য ভূমিকা। তারা প্রকাশ করেন সমাজের কথা, মানুষের কথা। মানুষের হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসার আকাঙ্খা ও তীব্রতার কথা। মধ্যযুগের সাহিত্যে মানুষের প্রেম-ভালবাসা ও সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনার কাছে অনেক সময় দেবতারা ক্লিবলিঙ্গে পরিণতি পেয়েছে। ফলে দেবতাদের

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ে মানুষের জয়গান মূখ্য হয়ে উঠেছে। এইগুলি হচ্ছে মানুষের সুকুমার প্রবৃত্তির প্রকাশ। সুতরাং প্রকাশই কবির ধর্ম ও কর্ম। এখানে মানুষকে খুব জ্ঞানী ও বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হতে হবে-এমন কোন কথা নেই। আমরা জানি লোককাহিনী দেশান্তরী হয়ে কালের পর কালে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং প্রত্যেক কালেরই কিছু কিছু ছাপ স্মৃতিতে ধরে রেখে তার স্বাতন্ত্র্যতা ঘোষণা করে। নৃ-তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমাদের কাব্যের জগত-তা একান্ত আমাদেরই জীবন। তাই কাব্যগুলো হয়ে পড়ে জীবনাশ্রয়ী এবং লোকজীবনই মূখ্য হয়ে উঠে। দেবতা এখানে আর দেবতা থাকেনি। একেবারে মানুষের সাথে মিশে গেছে এবং মানুষের অধিকার দেবতাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

শুন গঙ্গা দেবী তুমি জল অধিকারী।
দয়া করি মোর পতি দেও উদ্ধারি ॥
নহে বদ দিব আমি তোমার উপর।
প্রিয়া বিনে বাঞ্জা নাহি এভব সংসার ॥
গঙ্গী হরিয়া নিল মোর প্রাণপতি।
স্বর্গপুরি আমি তাকে করিব দুর্গতি ॥
নহে মোর পতি যেন দুঃখ নাহি পায়।
মিনতি করিয়া গঙ্গী তোমাকে শুনাই ॥

গঙ্গাধর সাধু কর্তৃক রাজকুমার বসন্ত সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়। তখন প্রিয়ার অভাবে রাজকন্যা কাঞ্চনমালা গঙ্গাদেবীকে অনুযোগ ও দাবী করে সে যেন তার প্রিয়াকে উদ্ধার করে দেয়। নচেৎ সে তাকে বদ দোয়া দিবে এবং রটনা করবে গঙ্গীদেবী তার পতিকে হরণ করে নিয়ে গেছে। তদুপরি সে যদি তাকে ফিরিয়ে না দেয়, তবে স্বর্গপুরীতে গিয়ে দেবশালায় নৃত্য করে দেবতাদের কাছে তার সম্পর্কে নালিশ দিবে। ফলে তার অশেষ দুর্গতি বাড়বে। সুতরাং তার পতি যেন কোন দুঃখ না পায়-এই মিনতি তার। এখানে মানুষ ও দেবতার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকেনি। মধ্যযুগের কাহিনী কাব্যে দেবতা মুখ্য না হয়ে গৌণ হয়েছে। যুগকালের এটি একটি বিশেষ রীতি।

কবির লিখিত অন্য কোন পাণ্ডুলিপি অদ্যাবধি উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। একটি মাত্র লিখিত পাণ্ডুলিপি পেয়েছি তাও লিপিকর কর্তৃক লিখিত। তবুও ৪র্থ পরিচ্ছেদ ৫২ লাইনের পর ত্রিপদী ছন্দে চারটি লাইন প্রক্ষিপ্তভাবে এসেছে। এ ছাড়া বানানের ভুল ত্রুটি যুগ অনুপাতে খুবই কম। তবে অকারণে 'রেফ-ফলার' ব্যবহার হয়েছে। যদি আমরা 'রেফ-ফলার' অর্থ ধরি তবে তার যথার্থ অর্থ পাওয়া যাবে না। আর যদি আমরা 'রেফ-ফলার' অর্থ না ধরি, তবে তার যথার্থ অর্থ পাওয়া যাবে। তাহলে এ অতিরিক্ত 'রেফ-ফলাকে' আমরা কি বলব ? এই অতিরিক্ত 'রেফ-

Dhaka University Institutional Repository

ফলাকে' ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, ড. আব্দুল কাইয়ুম, ড. এনামুল হক ও ড. আহম্মদ শরীফ ক্যালিওগ্রাফি বলেছেন। কিন্তু 'ক্যালিগ্রাফি' বলতে আমরা বুঝি লেখকের বা লিপিকরের হাতের লেখা। একটি সাংকেতিক চিহ্ন 'রেফ-ফলাকে' দিয়ে হাতের লেখা বুঝায় না। তখনকার কবি লেখক ও লিপিকরেরা এই অতিরিক্ত 'রেফ-ফলাকে' Artistic Design রূপে ব্যবহার করে পংক্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। মধ্যযুগের অনেক পাণ্ডুলিপিতে এই অকারণ রেফ-ফলার ব্যবহার রয়েছে। কবি হাফেজদ্দীনের কাব্যে এই অতিরিক্ত 'রেফ-ফলার' ব্যবহার রয়েছে। এই অতিরিক্ত রেফ-ফলাকে ক্যালিওগ্রাফি না বলে Artistic Design বললে অতুক্তি হবে না। কবি তার কাব্যে 'রেফ-ফলার' অকারণ ব্যবহার করেছেন বর্জ্রাঘাত > বজ্রাঘাত ; নির্দ্ধন > নিধন ; দীর্ঘ্র > দীঘ্র ; নির্শ্চয় > নিশ্চয় ; দর্শনে > দশনে ; নৃর্প > নৃপ ইত্যাদি মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপি সাহিত্যের একটি বিশেষ রীতি। কবির এটি জীবনভিত্তিক কাহিনী কাব্যের নির্মাণ কৌশল, তার শিল্প সত্ত্বার পরিচয় বহন করে।

কবি হাফেজদ্দীন বেদ-আগম-পুরাণ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কাব্যপাঠে এ ধারণার সমাধান মিলে। রামায়ণ, মহাভারত, ভগবত, অষ্টাদশ পূরাণ, হাদীস, কুরআন, শরীয়ত, মারেফত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন ।

১. কামদেব জিনী রূপ মোর পতি ছিল।
হংসরাজ ধজ দেখি কলান্দই হইল ॥

২. কাজি মোল্লা আনিয়া যে নিকা পড়াইল।
কন্যা শির্ঘ্র রাজকুমারকে হুকুম করিল ॥

উপাখ্যান বর্ণনায় মুল কাহিনীর আয়তন অযথা বৃদ্ধি না করে সামান্য কয়েক পংক্তির মধ্যে প্রকাশ করে – তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন এবং পাঠকমনকে ভারাক্রান্ত হবার কোন সুযোগ দেননি।

১. কুমার কহিল প্রিয়া শুন চন্দ্রমুখি।
পুরাণ ভারতে আমি সর্ব্ব শাস্ত্র দেখি ॥
সীতা হেন পতিব্রতা ছিল মস্তস্থানে।
দেখিল করম ফল হরিল রাবণে ॥
২. সত্তবদ্ধ হইলা বেউলা ভাইর কারণ।
সে মতে ভাসিয়া আমি যাইতাম দেবস্থান ॥

Dhaka University Institutional Repository

৩. পূর্ব্বকালে রাজা এক পুষ্করিণী ছেদিল।
এক সপ্তা মধ্যে সেথা জল না উঠিল ॥
মনেতে ভাবিল রাজা কি হবে উপায়।
হেনকালে কৃপা হইল তুমি গুণময় ॥
এক ব্রাহ্মণের পুত্র যথা গিয়া পাও।
আপন হস্তে কাটি আনি পুষ্করিণীতে দাও ॥
সেই রাজ্যে ছিল এক দাদ্র ব্রাহ্মণ।
ধন লোভে পুত্র দিল কাটিতে রাজন ॥

এইগুলি খুব সাধারণ উপাখ্যান নয়। পৌরাণিক সর্ম্পকে খুব গভীর জ্ঞান না থাকলে এগুলির সংক্ষিপ্ত ও গুরুগম্ভীর এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শুধু এগুলিই নয় ; কাব্যে এমন আরো কতিপয় বিষয় সম্পর্কে ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন। সুতরাং আমরা ধারণা করতে পারি হিন্দুপূরাণ ও বেদ সম্পর্কে কবির গভীর জ্ঞান ছিল। শুধু হিন্দুপূরাণ-ই নয় হিন্দু শাস্ত্রাদি সম্পর্কে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধারণা ছিল।

যে দুরুহ সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে কবি এই কাব্য রচনা করেছেন। তা যেমন ছিল জটিল, তেমনি ছিল ভয়ংকর,ঐশ্বর্য বিদ্বেষ, উচ্চাকাখা, মুক্তির স্বাদ, পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গা, নর-নারীর একনিষ্ঠ প্রেম, বিলাস-ব্যাসন, প্রভুত্ব, কামান্ধ পুরুষের নিষ্ঠুরতা, ইত্যাদি জীবনকে পলে পলে দগ্ধ করে। কখনো হাসায়, কখনো কাঁদায় ইত্যাদির বেড়াজালকে ছিন্ন করে। অপূর্ব ত্যাগের মহিমায় উদ্ধুদ্ধ হয়ে, কঠিন প্রত্যয়ের সাধনার দ্বারা দেশের ও গণমানুষের মুক্তির মাধ্যমে তার স্ব-রূপে ফিরে আসাই হচ্ছে প্রতিপাদ্য বিষয়। ইন্দ্রিয়ের পূজারী রাজা, দ্বিতীয় রাণীর কু-পরামর্শে মিথ্যা রটনা বিশ্বাস করে,শীত ও বসন্তকে হত্যার আদেশ প্রদান করেন। জল্লাদের কৃপায় তারা ভাগ্যান্বেষণে বের হয়ে যায়। শীত রাজহাতী কর্তৃত নীত হয়ে জকুম রাজ্যের রাজা হয়। আর রাজকুমার বসন্ত অশ্বচোর অপবাদে বন্দী হয়ে নরবলির জন্য সাধুর হাতে হস্তান্তরিত হয়। তারপর কৃপাঠাকুরের কৃপায় নরবলির হাত থেকে রেহাই পেলেও গঙ্গাধর সাধুর শঠ্তার হাত থেকে রেহাই পাননি। বরং অনেক নির্যাতন, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় থাকে। সে রক্ষা পেয়ে অবশেষে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। তরুণের অভিপ্রায়, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মত্যাগের এবং রাজকণ্যার বুদ্ধির কৌশলের কাছে-লোভী, নিষ্ঠুর ও ধূর্ত-ধনিক লম্পট সাধুর পরাজয় হয়। এখানে বাঙ্গালী নববঁধূর একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে।

বীর, করুণ, আদি ও ভক্তি রসে পরিপূর্ণ এ কাহিনী। কবি হাফেজদ্দীন চিত্রিত করেছেন অতি নিঁপুনভাবে। শুধু কাহিনীতেই কাহিনীর শেষ নয়। কাহিনী বিস্তারের সাথে সাথে কবি সংযোজন করেছেন উপকাহিনী। মূল কাহিনীর সাথে সেগুলিকে এমন নিপুণভাবে যোগ করেছেন,

Dhaka University Institutional Repository

তাতে সাধারণ পাঠকের বিরক্তির কোন উদ্রেক করে না। অসাধারণ সৃজনী শক্তির অধিকারী না হলে এমন সুক্ষ্ম কাজ সম্পন্ন করা সহজ ব্যাপার নয়।

মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির জ্ঞান ছিল বেশ প্রখর। তিনি মূল কাহিনীর সঙ্গে এমন সব উপকাহিনী সংযোজন করেছেন, যা পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক ও গ্রহণযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। বীর, করুণ,ভক্তি রসের সাথে আদিরসের পরিবেশন করেছেন সুভাষণ রীতিতে কাহিনীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রস পরিবেশনের ধারাটি বজায় রেখেছেন। মানব প্রকৃতির বিভিন্ন দিকে কবির সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই মানবিক দিকগুলো তার কাব্যে মূখ্য স্থান পেয়েছে।

রাজকন্যা কাঞ্চনমালার রূপ বর্ণনায় কবি যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা কাব্যিক সৌরভে সুষমামণ্ডিত। রাজকন্যার রূপ বর্ণনাংশ নিম্নরূপ –

রূপে যে কাঞ্চনমালা　　　　নবরূপ যৌবন জ্বালা
　　দরশনে যে হেন　মুকুতা।
চিকন চিরন নিশি　　　　কস্তুরির গন্ধবাসি
　　অধর রত্ন হেন জ্বলে ॥
লাজ পাই নিশাপতি　　　　কলঙ্ক যে ছিল মতি
　　ইন্দ্র শশী নিলা যে নিন্দিয়া।

রাজকন্যার প্রসাধন বর্ণনার উপমা অতুলনীয়। গ্রামীন সভ্যতার কবি হলেও তিনি ছিলেন রুচিবান , রসিক এবং প্রজ্ঞাবান।

রাজকুমার সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে রাজকন্যার যে বিরহ ব্যথা তা বাংলার অতি পরিচিত। বারমাসী বহুকাল পূর্ব থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং আজও বাংলার ঘরে ঘরে তা গীত হয়ে মানব মনকে নাড়া দেয়। কাঞ্চনমালার বিরহের ও বেদনার কাহিনী বারমাস্যার ভিতর দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন। এই কাব্যের বারমাসী গানের অংশটি মৌলিক ও নির্মল এবং সহজবোধ্য ও স্বচ্ছপ্রবাহী।

বিরহিনী নববধুর এই বেদনার আবেদন শাশ্বত কালের। কবির ভাষা সহজ, সরল ও বোধগম্য। বলা যায় বৈশাখের উন্মত্ত ভ্রমরের রীতি, জ্যৈষ্ঠমাসের পাকা মিষ্টি আমের স্বাদ, নব আষাঢ়ের মেঘের সঞ্চালনে বিরহিনী নববধুর মনে মিলনের ব্যাকুলতা, শ্রাবণে কামের উন্মোত্ততা, ভাদ্র অকারণে বয়ে যায়, আশ্বিনে তার ধূসর আক্ষেপ, কার্ত্তিকে সন্তান ধারণের কামনায় প্রিয়কে কাছে পাওয়ার বাসনা, অগ্রহায়ণ মাসে অভিলাস, পৌষের শীতে পাশাপাশি থাকার অবস্থানের অভিপ্রায়, মাঘে হাড় কাঁপানো শীতে দুঃসহ একাকী বাস, ফাল্গুনে যৌবনের আগুনজ্বালা, চৈত্রের তাড়ন ইত্যাদি গ্রামবাংলার চিরন্তন প্রাকৃতিক দৃশ্য কার না হৃদয় আকর্ষণ করে এবং এই যাতনা

Dhaka University Institutional Repository

সর্বকালের, সর্ব মানুষেরই মনের কথার প্রকাশ। কবি হাফেজদ্দীন অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন বিধায় এই অতি সাধারণ এবং শাশ্বত দৃশ্য; দৃশ্যমান উপমাগুলোর মধ্য দিয়ে বিরহিনী বাঙ্গালী নববধুর একনিষ্ঠ প্রেমের মর্মবেদনার করুণ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ছবি অসাধারণ এবং এই রূপায়ণ রুচীশিল ও মার্জিত কবি মনের পরিচয় চিত্রময়তায় রূপ লাভ করেছে। শিল্পীর শব্দে আঁকা ছবি যেন সত্যিই আমরা প্রত্যক্ষ করি। এ ছবি সকলের হৃদয়ের দৃশ্যমান ছবি। ভাষার দিক দিয়ে তা সহজ, সরল, সংযত ও সংহত ভাষার নিদর্শন।

বিভিন্ন রসের পরিবেশনায় কবি অপরিসীম দক্ষতা অপূর্ব কাব্যিক মাধুর্যে প্রকাশ করেছেন। তবে যত সম্ভব তিনি সংস্কৃত শব্দকে এড়িয়ে চলেছেন। কবি সংস্কৃত ভাষা জানতেন। সেই সাথে তিনি আরবী, ফার্সী, হিন্দী, উর্দু ভাষাও জানতেন। কবি আরবী শব্দাবলীকে বেশী গ্রহণ করেছেন।

আরবী শব্দ বেশী ব্যবহার করার কারণ আরবীয়, বণিকরা পকপ্রণালী অতিক্রম করে ৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা. বানিজ্য করতেন। কখনো নিতান্ত প্রয়োজনে আবার কখনো সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে সব কিছু হাড়িয়ে উপকূলবর্তী এলাকায় আশ্রয় করেছেন এবং তখন তারা **Exogamous marriages** এ আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবন যাপন করছে। সেই সূত্র ধরেই আরবীয় শব্দাবলী বাংলার ঘরে, অন্তরে, কন্দরে প্রবেশের অধিকার পেয়ে স্থায়ী আসন দখল করে। এছাড়াও **Proselytizing religions like Mohammadanism, migration of people and trades** ইত্যাদির কারণে আরবী শব্দ বাংলার শব্দভাণ্ডারে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে সমৃদ্ধি এনেছে। ভারতে প্রথম আরবীয় বণিকরা আসেনি। এসেছে তুর্কী, মোঘল, ইরানী, ইরাকী, আফগানরা। তারা সাথে নিয়ে এসেছে ফার্সী ও উর্দু শব্দাবলী। এবং লুট করে নিয়ে গেছে বিপুল সম্পদ। ফলে ভারতের সৃষ্ট সাহিত্যের সাথে বাংলাদেশের সৃষ্ট সাহিত্যের বিশেষ প্রভেদ রয়েছে। আরো পরিষ্কার করে বলা যায় – ভারতের সৃষ্ট সাহিত্যে ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও সংস্কৃত শব্দের আধিক্য বেশী, আরবী শব্দ যে নেই তা নয় বরং তা অনুপাতে কম। বাংলাদেশের সৃষ্ট সাহিত্যে আরবী শব্দই বেশী, অন্যান্য শব্দাবলী অপেক্ষা কম। এখানেই পার্থক্যের প্রাচীর গড়ে তোলেন কবিরা।

এক্ষেত্রে কবি হাফেজদ্দীন ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তার ভাষা, সহজ, সরল, সংযত ও সংহত। বহুল বক্তব্যকে সীমিত শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে বাচনভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তা মার্জিত কবি মনেরই পরিচয় বহন করে। প্রতাপ ভীমের দ্বিতীয় রাণীর মনোভাব বুঝতে পেরে রাজকন্যা কাঞ্চনমালা বলেন।

বিরস বদন কেন দেখি গো তোমার।
কিশের লাগিয়া দুঃখ ভাব মনান্তরে ॥ (৩২ তম পরিচ্ছেদ)

Dhaka University Institutional Repository

চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চরিত্রগুলোর বক্তব্যে কবির ব্যক্তিসত্ত্বার রূপ ফুটে উঠেছে। কাহিনীর নায়ক রাজকুমার বসন্ত। কাব্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীর গতি ধারার সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িত। ফলে তার চরিত্রে **Pains, Suffering** ও **doing** এসেছে। রাজকুমারের চরিত্র মঙ্গল বা মধ্যযুগের কাহিনী কাব্যের নায়কের চরিত্রের মত দুর্বল নয়। রাজকুমার বসন্ত আত্মশক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। মহাবিপদে পাড় আত্মশক্তি হাড়াননি। লালমানিক বাছাই করার কালে রাজা কিশ্বর নরপতির সাথে কথা বলার সময় তার আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাই

কোন মানিক অন্ধ হয় দেও যে বাছিয়া।
নতুবা তোমারে আজি ফেলিব কাটিয়া ॥
এই কথা শুনিয়া সাহা হরিষ অন্তরে।
অন্ধ মানিক বাছি দিল রাজার হুজুরে ॥
মহারাজা দেখি সব আশ্চর্য্য হইল।
সামান্য বলিয়া বিশ্বাস মনে না করিল ॥
কন্যা বিবাহ দিব আমি তাহার তরেতে।
বিধির লিখন তাহা কে পারে ক্ষণ্ডাইতে ॥ (নবম পরিচ্ছেদ)

অন্ধ মানিক যদি রাজকুমার বেছে বের করে দিতে না পারে, তবে তাকে হত্যা করা হবে। রাজার এই কথা শুনে রাজকুমার আরো প্রেরণা পেয়ে অন্ধমানিক বেছে বের করে দেয় এবং রাজা তাকে সামান্য ঘরের না ভেবে নিশ্চিত হন। তার কাছে কাঞ্চনমালাকে বিয়ে দিবে বলে মনস্থির করে ফেলেন। এভাবেই তার আত্মশক্তির পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

রাজকন্যা কাঞ্চনমালার চরিত্রে কবি তার ব্যক্তিসত্ত্বা ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রখর কৌশলী হিসাবে তুলে ধরেছেন। বসন্তের প্রতি তার প্রেম একনিষ্ঠ। এ প্রেম বাঙ্গালী নববধূর আজন্ম প্রথাবদ্ধ প্রেম। এ প্রেম চিরায়ত নারীর প্রেম। এ প্রসঙ্গে আহমেদ মাওলা বলেন – 'বাঙালী নারী যাকে একবার মন দেয় আমৃত্যু তার প্রতিই সমর্পিত থাকে।' (আহমেদ মাওলা-নজরুলের কথা সাহিত্য মনোলোক ও শিল্পরূপ পৃ. ৭৯. প্রকাশকাল জুন ১৯৯৭,ঢাকা।) এই কাব্যের নায়িকা কাঞ্চনমালা চরিত্রের মাধুর্যে ও মহিমায় খাঁটি বাঙ্গালী নারী। **Beautiful, Tender and Pathetic**-এই তিনের অবলম্বনে কাঞ্চনমালা শোভা-সৌরভে দিপ্তীমান। তার প্রেম নারীকে দুর্জয় শক্তির অধিকারী করেছে। তার সে শক্তি আত্মদমন বা অসীম ধৈর্য্যের নয়। সে শক্তি তার কামনা বাসনাকে মুক্ত করে দেয়। সে প্রেম কোন বাঁধা মানেনা। কবি হাফেজদ্দীন নারীর প্রেমের সেই বলিষ্ঠ আদর্শকেই বরণ করেছেন। ধনিক বণিক লম্পটের হাত থেকে বাঁচার জন্য কাঞ্চনমালা

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়ে গঙ্গাধর সাধুকে পরাজিত ও হত্যা করে। নিজের রাজসিক প্রেমের জয় ও স্বাতন্ত্র্য ধারার পরিচয় ঘোষণা করেছে।

কাব্যের আখ্যানভাগ রচনায় সংঘাত ও দ্বন্ধের মাধ্যমে কাহিনী ও চরিত্র গুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। Classical সাহিত্যে এটিকে বলা যায় Conflict এই Conflict নাটক ও উপন্যাসের ভূমিকায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বন্দ্ব সাধারণত দুই প্রকার - অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও বর্হিদ্বন্দ্ব। কাহিনীর নায়ক নায়িকার মনের মধ্যে কোন কাজ করা বা না করার প্রশ্নে যে সংশয় দেখা যায়-তাকে বলা যায় অর্ন্তদ্বন্দ্ব। আর বাইরের জগতের যে সব বাঁধা বিপত্তি কাহিনীর নায়ক নায়িকার চলার পথে বাঁধার সৃষ্টি করে তাকে বলা যায় অর্ন্তদ্বন্দ্ব। এই দুয়ের সার্থক সমন্বয়ের উপর কাহিনীর সার্বিক উৎকর্ষ অনেকখানি নির্ভর করে।

আলোচ্য 'বসন্তের-দুঃখ' কাব্যের কাহিনীতে অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও বর্হিদ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রাজার দ্বিতীয় রাণী ও রাজকুমারদের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব, রাজা ও রাজপুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, দাই ও রাজার মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব হিংসার ও জিঘাংসার। রাজা কিশ্বর নরপতি ও রাণীর মধ্যে জামাইকে নিয়ে রয়েছে অর্ন্তদ্বন্দ্ব-বর্হিদ্বন্দ্ব। রাজকন্যা কাঞ্চনমালার সাথে ধনিক বণিকের সাথে রয়েছে শ্রেনীগতদ্বন্দ্ব। এভাবে অসংখ্যা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টির রয়েছে মনস্তাত্তিকদ্বন্দ্ব। এভাবে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টির নৈপূণ্য রয়েছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব যেন একান্তই বাস্তব। যার ফলে চরিত্রগুলো জীবন্ত রূপ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধি ও কৌশলের আশ্রয় নিয়ে গঙ্গাধর সাধুকে পরাজিত ও হত্যা করে। নিজের রাজসিক প্রেমের জয় ও স্বাতন্ত্র্য ধারার পরিচয় ঘোষণা করেছে।

কাব্যের আখ্যানভাগ রচনায় সংঘাত ও দ্বন্ধের মাধ্যমে কাহিনী ও চরিত্র গুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। Classical সাহিত্যে এটিকে বলা যায় Conflict এই Conflict নাটক ও উপন্যাসের ভূমিকায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দ্বন্দ্ব সাধারণত দুই প্রকার - অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও বর্হিদ্বন্দ্ব। কাহিনীর নায়ক নায়িকার মনের মধ্যে কোন কাজ করা বা না করার প্রশ্নে যে সংশয় দেখা যায়-তাকে বলা যায় অর্ন্তদ্বন্দ্ব। আর বাইরের জগতের যে সব বাঁধা বিপত্তি কাহিনীর নায়ক নায়িকার চলার পথে বাঁধার সৃষ্টি করে তাকে বলা যায় অর্ন্তদ্বন্দ্ব। এই দুয়ের সার্থক সমন্বয়ের উপর কাহিনীর সার্বিক উৎকর্ষ অনেকখানি নির্ভর করে।

আলোচ্য 'বসন্তের-দুঃখ' কাব্যের কাহিনীতে অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও বর্হিদ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। রাজার দ্বিতীয় রাণী ও রাজকুমারদের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব, রাজা ও রাজপুত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, দাই ও রাজার মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব হিংসার ও জিঘাংসার। রাজা কিশ্বর নরপতি ও রাণীর মধ্যে জামাইকে নিয়ে রয়েছে অর্ন্তদ্বন্দ্ব-বর্হিদ্বন্দ্ব। রাজকন্যা কাঞ্চনমালার সাথে ধনিক বণিকের সাথে রয়েছে শ্রেনীগতদ্বন্দ্ব। এভাবে অসংখ্যা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টির রয়েছে মনস্তাত্তিকদ্বন্দ্ব। এভাবে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টির নৈপূণ্য রয়েছে। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব যেন একান্তই বাস্তব। যার ফলে চরিত্রগুলো জীবন্ত রূপ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অলংকার

অলংকার নির্ণয় সাহিত্যের একটি রীতিশুদ্ধ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বহু পুরাতন হলেও তা নিত্য নুতন। খৃ. পৃ. দ্বিতীয়,তৃতীয় শতকে ভরত তার নাট্যশাস্ত্রে অলংকারের কথা বলেছেন। ষষ্ঠ শতকে দন্ডী অলংকারের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'অলংকার কাব্যের সৌন্দর্য বিধায় কর্ম'। (দ্র. কাব্যাদর্শ ২/১) অর্থাৎ অলংকার কাব্যের ভূষণ। সপ্তদশ শতকে ভামহ ও অষ্টাদশ শতকে বামন একই সংজ্ঞা দিয়েছেন-'কাব্যের সৌন্দর্য হচ্ছে অলংকার'। এই অলংকার প্রকাশ পায় ভাব, চিত্র ও রূপ কল্পনায়। বিখ্যাত পণ্ডিত R.C.Trench তার On the study of words গ্রন্থে বলেন- "ALL Language is in some sort a collection of faded metaphors." মানুষ তার ভাব, চিত্র ও রূপ কল্পনাকে প্রকাশ করতে চায় ভাষার মাধ্যমে। ভাষার এই রূপাত্মক, চিত্রাত্মক ও ভাবাত্মক অবয়ব প্রকাশ করে অলংকার। এই জন্য মনীষি ইমারসন বলেন- "*Language is Fossil Poetry*" কোন কোন মনীষী *Fossil poetry* তে সন্তুষ্ট না হয়ে আরো ব্যাপকাকারে বলতে চান-"Fossil Ethics and Fossil history" এ কথা দিবালোকের মত সত্য ভাষা, ভাবের, চিত্রের, রূপের প্রকাশ। পৃথিবীর সকল ভাষাগোষ্ঠিই একই নিয়মের অনুবর্তী। মানব মনের এটি শাশ্বত ধর্ম।

সুতরাং মানব মনের রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, বীর্যগাথা ও প্রকৃতির সত্ত্বাসমূহ দেশ কাল পাত্রভেদে সভ্যতায় ও সাংস্কৃতিতে মানুষের সঙ্গী ও সাহিত্যের বাহন হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। সুতরাং ভাবের অভিব্যক্তিতে উপমা, রূপক, অলংকার ইত্যাদির প্রয়োগ অপরিহার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে Erust cassirer বলেছেন "Man lives in a symbolic universe." তিনি তার An Essay of Man গ্রন্থে বলেছেন- "Language Myth, art and religion are parts of this universe. they are the varied threads which weave the symbolic net, The tangled web of humman experince."

Dhaka University Institutional Repository

অতএব উপমা ব্যবহার মানব মনোবৃত্তির প্রকৃতি। এই প্রকৃতির আনন্দ অনুভুতির মূলে রয়েছে অলংকারের ব্যবহার। মানব জীবনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে অসীম প্রকৃতির নতুন আলো, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ নিয়ে আসে অলংকার। সাহিত্যে অলংকার প্রয়োগের এই প্রেরণাকে বলা হয় "Plesures of imagination".

সাহিত্যে অলংকারের ব্যবহার কোন বিশেষ সভ্যতার পরিচয় নয়। সুতরাং অলংকারের ব্যবহার মানুষের চিরন্তর সহজ প্রবৃত্তি। শব্দ ও অর্থ ছাড়া সাহিত্যের আর স্বাস্ত্রত্যতা নেই। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থকে আটপৌরে না রেখে-সাঁজ সজ্জায় সাঁজিয়ে বাক্যকে রসালো ও কাব্যত্বে উন্নীত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার নামই অলংকার। অলংকার কাব্যিক সৌন্দর্য্যের আঁধার। ড. শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য বলেছেন–"অলংকার অন্নময় জীবনের জৈবিক কল্যানবোধ"। তার এ মতকে মানতে আমাদের কষ্ট হয়। কারণ মানুষ চিরকালই সৌন্দর্যের পিয়াসী। এই সৌন্দর্যবোধ যেমনি প্রকৃতির ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি কাব্যলোকেও সত্য করে নিতে হয় বলে কবির বা তার সৃষ্টিতে প্রয়োজন। এই প্রয়োজন বোধই চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেই সাহিত্যে অলংকারের প্রয়োজন অশেষ। তাই কবি বা সাহিত্যিকগণ শব্দকে অলংকারে, অনুপ্রাসে, অর্থকে ও উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ও সমাসোক্তিতে রূপ দিয়ে, অলংকারের গুরুত্ব, চারুত্ব ও মহত্ব দান করেছেন। আমরা বলতে পারি অলংকারের ব্যবহারের জন্যই কাব্য আমাদের রস গ্রহণের উপযোগীতা পায়। প্রাচীনকাল থেকেই লোকসাহিত্য, কাহিনীকাব্য ও আধুনিক সাহিত্যের প্রত্যেক লাইনে লাইনে ছড়িয়ে আছে অজস্র অলংকার।

অলংকার রূপ পেয়েছে–আকাশ, বাতাস, বন্যপ্রাণী, জলজ প্রাণী, নদ-নদী, মেঘ, বৃষ্টি, শীত, ঋতু, ফুল-ফল ইত্যাদিকে নিয়ে এবং উপমা, মালোপমা, রূপক, ঝমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি ইত্যাদিকে অলংকৃত করেছে। ইংরেজী ইমেজ এবং বাংলা বাকপ্রতিমা কথাটিও চিত্রকল্পের সমার্থক। প্রকৃত অর্থে চিত্রোপমা বলতে মূলতঃ ইমেজকে বুঝায়। ইমেজ চিত্রোপমা বটে কিন্তু এতে অলংকার পরস্পরিত থাকে। এ প্রসঙ্গে 'ক্রিস্টোফার কডওয়েল বলেছেন-"কবিতার ভাষা ইচ্ছে "Hightened Language." অর্থাৎ উচ্চকিত ভাষা অর্থাৎ অলংকারে অন্বিত। কবি স্তালিনের মতে "কবিতা Writers are the engineers of human soul." যদিও তিনি কবিতাকে সমাজ বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে বিবেচনা করেন। তবুও "Tendentious Poerty" রচনায় যে সব কবিরা পক্ষপাতী। তারাও অলংকার বর্জন করতে পারেননি। কেননা কবিতাকে সুষমামণ্ডিত ও ব্যঞ্জনা মধুর করার জন্য অলংকারের ব্যবহার বর্জন করতে পারেননি। কবিতায় ইমেজ বা চিত্রপোমাকে নিয়ে আসে অলংকার। কবি হাফেজদ্দীন তার কবিতাকে ব্যঞ্জনা মধুর করতে অলংকারের আশ্রয় নিয়েছেন। অর্থাৎ তার কবিতাকে শানিত ও বীর্যবন্ত করে তুলতে অলংকৃত করেছেন। তার কাব্যে ১১তম পরিচ্ছেদে আমরা পাই।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন

কি আশা করিয়াছ সাধু বুঝিতে না পারি।
শৃগালে খাইতে চাহে বাঘের মাংস ধরি ॥
আকাশের চন্দ্র দেখি ধরিবার আস।
ঢেউটির হাতে যেন পতঙ্গের বিনাশ ॥
দেহ ত্যাগিয়া মাংস করিও ভক্ষণ।
হেন দুষ্ট আশা সাধু কর কি কারণ ॥ (কাকু বক্রোক্তি)

দুঃসাহসী রাজকন্যা কাঞ্চনমালার এই মনোভাব কাকু বক্রোক্তি অলংকারের প্রয়োগে অত্যন্ত চমৎকার হয়ে ফুটে উঠেছে। কাঞ্চনমালার প্রকৃতি আমাদের চোখের সামনে এক আদর্শ বঙ্গনারীর ছবি দেখতে পাই। কাঞ্চনমালা ধনিক বণিক লম্পটদের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী কণ্ঠস্বর। সংগ্রাম মুখর সমাজ মানসের প্রতিভু বলে ধরে নিতে পারি।

অলংকার কাব্যের এক বিশেষ অঙ্গ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিরা এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। ড. জীবেন্দ্র সিংহ রায় কাব্যে অলংকার সম্পর্কে বলেছেন-"কাব্য বলিতে শব্দ ও অর্থের অলংকৃত প্রকাশকেই বুঝিয়া থাকি। (জীবেন্দ্র সিংহ রায়-বাঙলা অলংকার পৃ. ২ (প্রস্ত াবনা) ১৯৮২, কলিকাতা)। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, কাব্যে অলংকার প্রয়োগে সুষমামণ্ডিত হয়ে পাঠকগণের চিত্তকে আকর্ষণ করতে পারে। এটাই কাব্যের বিশেষত্ব। আবার নিরলঙ্কার বাক্য ও কাব্য হতে পারে,তাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তবে সেই বাক্যে বিশেষত্ব নাই। কবি হাফেজদ্দীন নিরলঙ্কার বাক্য প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন –

রন্ধন করিয়া আমি আপনে খাইব।
অন্য জনে কেহ মোরে দেখতে না পাইব ॥
তবে সাধু ভিন্ন করি ছিল এক পুরি।
দুঃখিত হইয়া তথা রহিল কুমারী ॥
আইসে কিনা আইসে প্রিয়া এই দুঃখ গুণি।
নয়নের জল ঝরে দিবস রজনী ॥ (নিরলঙ্কার)

১৪তম পরিচ্ছেদে নিরালঙ্কার কয়েকটি লাইনে অবরুদ্ধ বন্ধু-বান্ধবহীন পরিবেশে বন্দিনী রাজকন্যা কাঞ্চনমালার হৃদয়ের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে , তার তুলনা মেলা ভার। অলঙ্কারের বৈদগ্ধ ভঙ্গি বাক্য থেকে পৃথক করলে তার কাব্যত্ব থাকে না। যা থাকে তা নীরস তথ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। অলঙ্কারিক অভিনব গুপ্ত, আনন্দবর্ধন, তাঁরা দেখেছেন–অলংকৃত বাক্য যেমন কাব্য হয়, তেমনি অলংকৃত বাক্য কাব্য হতে পারে। কাব্যের কাব্যত্ব অলংকারের উপর নির্ভর

Dhaka University Institutional Repository

করে না। তা নির্ভর করে অন্য কিছুর উপর। এই অন্য কিছু হচ্ছে কাব্যের অঙ্গ, রস নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে অলংকারকে আশ্রয় করে। রসের প্রয়োজনানুসারে অলংকারের শ্রেণীভেদ হয়।

দুপিসূতে শত যুক্ত দিপি নাহি হয়।
তথাপি ও হীন জাতি ধর্ম্মশীল নয় ॥
ধর্ম্ম বিমর্ষিয়া জনে কোন ফল নাই।
আমার নির্ব্বন্ধে প্রিয়া আছিল এছাই ॥ (সাদৃশ্য)

এখানে 'ধূপের' সাথে 'হীন জাতি' এবং বির্মষিয়া'র সাথে 'নির্ব্বন্ধ' দুইটিই বিজাতীয় চেতনা। কিন্তু এদের মধ্যে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল-উভয়ই একই ধর্মের অধীন। সাদৃশ্যবাচক 'সম' শব্দ ও চরণটির মধ্যে রয়েছে সাদৃশ্য। একই বাক্যে এদের সাদৃশ্য বা তুলনা করা হয়েছে।

কাব্যে শব্দালংকারের গুরুত্ব অশেষ। কারণ শব্দালংকার হচ্ছে ধ্বনির অলংকার। শব্দালংকার শব্দের কোন পরিবর্তন সহ্য করে না। শব্দ পরিবর্তনের ফলে এই অলংকারের অস্বিত্ত্ব বিপন্ন হতে পারে। বিখ্যাত সমালোচক এজরা পাউণ্ড কবিতায়-**Melopeia, phanopeia, logopeia to chant, sing to speak**-এ্ই তিনটি ধর্মের কথা বলেছেন। তার মধ্যে **Phanopeia** বাক্যের মধ্যে সঙ্গীতকে রক্ষা করে। কবিতায় ও সঙ্গীতের ভূমিকা **phanopeia** ই রক্ষা করে। শব্দালঙ্কারের কাজ হচ্ছে কাব্যছন্দকে বিচিত্র ধ্বনি তরঙ্গের মধ্যে বিস্তার করে দেয়া। বাক্যের ধ্বনিগুণ বা তরঙ্গকে বাড়িয়ে দেয়া। কবি হাফেজদ্দীন তার কাব্যে এই গুণ রক্ষা করেছেন।

(১) যখন ধরিল নৌকা রাজার কুমার।
দোমে ২ আল্লাহর নাম লইল শতবার ॥
(২) থরে ২ কাঁপে নৌকা সব দেখে রঙ্গ ॥
(৩) জয় ২ হুলাহুলি দিল নারীগণ। (শব্দালংকার)

এখানে দোমে দোমে, থরে থরে, জয় জয়-বাক্যের সঙ্গীত মাধুর্যকে সুষমা দিয়ে তার চমৎকারিত্বের ধ্বনিগুনকে রক্ষা করেছে।

উপমা কথাটির সাধারণ অর্থ তুলনা। একই বাক্যের স্বভাব বিজাতীয়-দুইটি পদার্থের সাদৃশ্য দেখানো হয়। তখন তা উপমা

উর্ম্মি পরে তল যায় গগন পায় হাতে।
হেটেতে নামিলে পরে বাসুকির মতে ॥

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারিদিকে ধায়।

চরখা তুলিয়া যেন পাকেতে ঘুরায় ॥ (পূর্ণোপমা)

উর্ম্মি, গগন, হেট, রাসুকি, দিক, চরখা, পাকেতে ইত্যাদি বিজাতীয় পদার্থের সাথে তুলনা করে দেখানো হয়েছে। এভাবে

কার্ত্তিক মাসেতে সখী গো হয় গজমতি।

ধান্যাদি শস্য সব হয় গর্ভবতি ॥

ভাগ্যফলে কেহু ধান্য কেহু পায় মতি।

আমি অভাগীর হইল কুলের অখ্যাতি ॥ (পূর্ণোপমা)

এখানে গজমতি, গর্ভবতী, মতি, অখ্যাতি, সাদৃশ্যবাচক শব্দ। সুতরাং উপমার অঙ্গ একই বাক্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে। কার্তিক, ধান্যাদি, ভাগ্য, কাঞ্চনমালা বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য করা হয়েছে বলে পূর্ণোপমা রূপ পেয়েছে।

একে মারি খুদায় নিদ্রায় অন্ন নাহি খাই।

তাহাতে সাধু বেটার কথার বড় দুঃখ পাই ॥

তুল্য মাংসে কুকুর যেন হয় অগ্রপান।

সেই মত হইয়াছে সাধুর পরাণ ॥ (প্রতিবস্তুপোমা)

উপমেয়র মাধ্যমে কাঞ্চনমালার কথা এক বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। উপমান কুকুরের ধর্ম-প্রকাশ পেয়েছে এক ভিন্ন বাক্যে। কুকুর যেমন মাংসের প্রতি লালায়িত থাকে। তেমনি ধনিক বণিক গঙ্গাধর সাধু কাঞ্চনমালার প্রতি লালায়িত। রাজকন্যা কাঞ্চনমালা সাধুর লালসা থেকে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করছে।দুই বিজাতীয় জীবের ভাষাগত পাথর্ক্য থাকলেও উভয়ের ধর্ম এক। এখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ অনুপস্থিত। সুতরাং প্রতিবস্তুপমায় রূপ লাভ করেছে।

আহারে প্রাণের প্রিয়া অনাথের নাথ।

কলঙ্কিনী করিলা মোরে দিয়া চিলের হাত ॥ (দৃষ্টান্ত অলংকার)

এখানে উপমেয় ও উপমান দুটি পৃথক বাক্যে আছে। তাদের সাধারণ ধর্ম তাৎপর্যে এক না হয়েও সদৃশ বলে প্রতীয়মান হয়। অথচ সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ হয় নাই বলে দৃষ্টান্ত অলংকার হয়েছে।

প্রিয়া মোরে ছারি গেল, একেশ্বর হইয়া রইল,

দুষ্টবর সাধুর নন্দন।

উন্মতি ভাব দেখি, মোর দিকে চাহে আঁখি,

নিশ্চয় বল করিব আসিয়া ॥ (সন্দেহ অলংকার)

Dhaka University Institutional Repository

উপমেয় ও উপমান উভয় পক্ষে সমান সংশয় আছে। বিজন সমুদ্রে একাকীনি নারীর সংশয় বা সন্দেহ। কারণ তার সাথে কেউ নেই। যৌবনবতী নারীর প্রতি লালসা লম্পটদের। বণিক সাধু লম্পট ও নিষ্ঠুর। তার চোখে মুখে লাম্পট্যের দৃষ্টি, যে কোন মূহূর্তে বল করতে পারে। সুতরাং উপমান ও উপমেয়র মধ্যে সমান সংশয় এখানে বিদ্যমান, তাই সন্দেহ অলংকার হয়েছে।

চৈত্র মাসেতে বড় ধূপের তারণ।
ছটফট করে অঙ্গ না সহে দাহন ॥

(দৃষ্টান্ত অলংকার)

এখানে উপমেয় ও উপমান দুটি পৃথক বাক্যে আছে। এদের সাধারণ ধর্ম ও তাৎপর্যে এক না হলেও সাদৃশ্য বলে প্রমানীত হয় এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ হয় তা বুঝে নিতে হবে। ধূপের তারণ ও দাহন সদৃশ বলে এক হলেও অর্থের দিক থেকে আলাদা-তাই দৃষ্টান্ত অলংকার হয়েছে।

কামবানে সাধু সদয় করে ধরফড়ি।
পঞ্চপ্রাণি বৈরী হইয়া রহিল কুমারি ॥ (বিরোধমূলক)

এখানে দুইটি বিষয়ের মধ্যে আপাতবিরোধ আছে, কিন্তু প্রকৃত বিরোধ নাই। আপাতবিরোধের ভাব সমস্ত বাক্যের মধ্যে ছড়িয়ে আছে বলেই বিরোধাভাস অলংকারে রূপ পেয়েছে।

মধুর আলাপে কন্যা পাইল বড় হাসি।
ষোলকলা, পাইল যেন পূর্ণশশী ॥
জলদ গর্জ্জন শুনি মুক্কের উল্লাস।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডি কন্যা আনন্দ বিশেষ ॥

(শৃঙ্খলামূলক অলংকার)

বাক্যের যোজনাকে কেন্দ্র করেই শৃঙ্খলামূলক অলংকারের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় অলংকার বাক্যের সৌন্দর্য ও অর্থ গৌরব বৃদ্ধি করে। মধুর, ষোলকলা, জলদ, সর্ব্ব, হাসি, শশী, উল্লাস বিশেষ আগাগোড়াই, পূর্বের কারণের কার্য, পরবর্তী কার্যের কারণ হওয়ায় এটা শৃঙ্খলিত হয়েছে বলে শৃঙ্খলামূলক অলংকার সার্থকতা লাভ করেছে।

মরা হংস জল পাইলে জীবন সঞ্চার।
হরিষে কহিল গিয়া কুমারে খবর ॥
পাইলাম অমূল্য ধন তোমার কারণে।
চিরদিনের দুঃখ মোর খণ্ডিল এক্ষণে ॥ (অনুক্ত প্রস্তুত)

Dhaka University Institutional Repository

এখানে অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনায়-প্রস্তুত বিষয়কে উম্মোচন করেছে। অপ্রস্তুত বিষয়-মরা হংস। অপ্রস্তুতের এই বর্ণনা হতে অনুক্ত প্রস্তুতে উন্নীত হয়েছে।

কিবা সাদ হইল মোর ধরিবারে চাঁদ।
আপনি পতিলাম আমি আপনার ফাঁদ ॥
হাসলাস দূরে গেল কামান্তর কায়।
ললাটে মারিয়া ঘাও করে হায় ২ ॥ (অতিশয়োক্তি অলংকার)

উপমেয় ও উপমানের অভেদত্বের জন্য উপমান উপমেয়কে একেবারে গ্রাস করে ফেললে অতিশয়োক্তি অলংকার হয়। তাতে উপমান সর্বেসর্বা রূপে অনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত বলে উপমেয় উল্লেখিত হয়নি।

নারীগণে হুলাহুলি দেয় জয় ২।
ঢাক ঢোল ডাকি বলে নৃপতি আইশয় ॥ (সমাসোক্তি অলংকার)

এখানে ঢাক ঢোল ডাকি এবং সেই ডাক নৃপতির আসন গ্রহণে ব্যবহৃত হয়েছে। ঢাক ঢোলের শব্দের উপর নৃপতির আসন আরোপিত হওয়ায় সমাসোক্তি অলংকার হয়েছে। এতে উপমানের উল্লেখ থাকে না, উল্লেখ থাকে তার ব্যবহার।

কাটাবৃক্ষ ভূমে যেন পরে আচম্বিতে।
এই রূপ ঢুলিয়া রাজা পড়িল ভূমিতে ॥ (স্মরণ অলংকার)

বর্ণনীয় বিষয়ের অনুভব হতে তার ন্যায় অপর বস্তুর স্মৃতি যদি জেগে উঠে তবে তা হয় স্মরোণপমা অলঙ্কার। রাজা প্রতাপ ভীমের কাছে দুইটি বালক ন্যায্য বিচার পেতে আসে এবং তারা তার কাছে উপযুক্ত বিচার দাবী করে। ঐ সন্তানদের দেখে তার সন্তানদের কথা মনে জাগ্রত হলে–তা স্মরোণপমা অলংকারে রূপ পেয়েছে।

কলঙ্কিনীর প্রাণ নিতে ঘৃনা করে কালে।
তে কারণে না দহিল অনলের জ্বালে ॥ (অর্থান্তরণাস অলংকার)

এখানে প্রথম লাইনে সতীত্বনাশের কারণে নায়িকাকে আগুন ঘৃণা করে। এই একটি সাধারণ বিষয় উপস্থিত করা হয়েছে। সুতরাং অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারে রূপ পেয়েছে।

ভাল কাজে ভাল হয় মন্দ হয় ছার।
এথাতে করিলে ভাল তথাতে নিস্তার ॥
সুজনের মন্দ হেথা খণ্ডে দিনে ২।
দুর্জ্জনের কথা সব হয় এক স্থানে ॥ (নিদর্শনা অলংকার)

Dhaka University Institutional Repository

এখানে গঙ্গাধর সাধুকে মন্দ কাজের জন্য মন্দ ফল পেতে হয়েছে এবং রাজকুমার বসন্তের ভাল কাজ করায় ভাল পেয়েছে। তা সুজন ও দুর্জ্জনের অবয়বে ব্যক্ত হয়েছে বিধায় নিদর্শনা অলংকার হয়েছে। এখানে একটি বাক্যে উপমেয় উপমান ভাবটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বলে একবাক্যগত নিদর্শনা বলা যেতে পারে। অন্যদিকে দুই বস্তুর অসম্ভব সম্বন্ধের নিদর্শনা হিসাবে লক্ষণীয়

এতেক শুনিয়া সাধু বর্জ্রাঘাত পরিল।
আচম্বিতে পুষ্প পবন অনলে দহিল ॥
ছটফট করে সাধু মুখে নাহি রাও।
কিবা মন্ত্র কহে কন্যা না বুঝি তার ভাও ॥ (বক্রভাষণ অলংকার)

যখন সভায় বিয়ের মন্ত্র পড়ার জন্য রাজকন্যাকে নীত হল। তখন সে রাজার সন্মুখে রাজকুমারের আনুপার্বিক ঘটনা অতিকৌশলে ব্যক্ত করে। যা লম্পট সাধুর কোনদিন আশা করেনি। রাজকন্যার অভিভাষণ শুনে সাধু চিত্তবৈকল্য ঘটে এবং উদ্বিগ্নে ছটফট করে ও মুখে কোন কথা ফুটে না। এই অবস্থাকে বলা যায় বক্রাভাষণ অলংকার।

নানারূপ সজ্জা করে বিচিত্র কোমল।
অতি মনোহর পুরি করিল নির্ম্মান ॥ (কারণমালা অলংকার)

কোন কারণের কার্য পরবর্তী কার্যের কারণ হয়ে পরস্পর চলতে থাকে। সজ্জা, বিচিত্র কোমল মনোহর, পুরি, নির্ম্মান-প্রথম বাক্যাংশের কার্য, দ্বিতীয়, বাক্যাংশের কারণ এবং দ্বিতীয় বাক্যাংশের কার্য তৃতীয় বাক্যাংশের কারণ হয়ে একটা যোজন শৃঙ্খলা জনিত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। ফলে কারণমালা অলংকারে রূপ পেয়েছে।

আতুর কুড়ে যদি হয় যজ্ঞপতি।
সেবা করিবেক নারী করিয়া ভকতি ॥
নানা মতে ভক্তি করি দেবতা পূজায়।
তাহার অধিক পূণ্য স্বামী সেবায় পায় ॥ (দৃষ্টান্ত অলংকার)

এখানে উপমেয় ও উপমাণ চারটি পৃথক বাক্যে আছে। তাদের সাধারণ ধর্ম তাৎপর্যে এক না হয়ে ও সদৃশ্য বলে প্রতীয়মান হয় এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। এতে উপমেয় ও উপমাণের যে সাদৃশ্য আছে তা বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিতে হবে।

স্মর্ম সব কহিলেন সাধুর সাক্ষাতে।
কর্ম্মদোষে সিংহবন্দি শৃগালের হাতে ॥ (তুল্যযোগিতা অলংকার)

Dhaka University Institutional Repository

এখানে একই গুণ বা ক্রিয়ার বন্ধন আছে। প্রাসঙ্গিক বস্তগুলিকে শুধু নয়, অপ্রাসঙ্গিক বস্ত গুলিকে একই গুণ বা ক্রিয়ার দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে বলে তুল্যযোগিতা অলংকারে রূপ পেয়েছে।

গগনের চাঁন্দ লুকাই উঠে পুনর্ব্বার।
আমার চাঁন্দ গেলে ফের না আসিবে আর ॥ (রূপক অলংকার)

এখানে একটি উপমেয়ের সাথে একটি উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে। অন্য উপমেয়ের সাথে অভেদ কল্পনার কারণ হয়েছে বলেই পরম্পরিত রূপক হয়েছে।

সুখনায় পরিয়া মাছ যেন ছটফট করে।
সেই মত হইল সাধু শয্যার উপরে ॥ (বিভাবনা অলংকার)

কোন কারণ ছাড়াই কার্যের উৎপত্তি হয়েছে। কাঞ্চনমালার রূপ দেখে বণিক সাধুর চিত্তচাঞ্চল্য হয়েছে বিধায় বিভাবনা অলংকার হয়েছে।

কবি হাফেজদ্দীন অল্প বিদ্যা নিয়ে লোকশ্রুতির উপর নির্ভর করে কাব্যকাননে প্রবেশ করেছেন। অল্প বিদ্যার অধিকারী হলেও বিদ্যা-বৈদগ্ধের অধিকারী ছিলেন।তার অলংকার শাস্ত্রেও বেশ দখল ছিল। তিনি বিভিন্ন অলংকারকে ব্যবহার করে তার কাব্যকে চমতকারিত্ব দান করেছেন।

ছন্দ ঃ (RHYTHM)

সমিল অক্ষরবৃত্ত ঃ-

(১) তথায় আসিয়া সবে / চাহেন দিদার। ৮+৬
দুই অশ্ব লইয়া তথা / রহিল কুমার ॥ ৮+৬
মহাদুঃখে নিদ্রা যায় / রহিছে পরিয়া। ৮+৬
প্রভাতে অরণ্য যেন / আকাশে উঠিয়া ॥ ৮+৬
আকাশের চন্দ্র যেন / ভূমিতে গড়ায়। ৮+৬
হেরিতে কোতয়াল সবে / দেখিল তাহায় ॥ ৮+৬
চমকিত হইয়া সবে / চর্তুদ্দিকে চায়। ৮+৬
চোর ২ বলিয়া যে / হাকিয়া উঠায় ॥ ৮+৬

(২)
সুধাইলা প্রেমভাবে / সুনিতে কারন। ৮+৬
কহিব কিঞ্চিত দুঃখ / শুন দিয়া মন ॥ ৮+৬
হীন হাফেজদ্দীন কহে / দরগায় আল্লার। ৮+৬
হেন দসা দুনিয়াতে / নাহি ঘটে কার ॥ ৮+৬
পয়ার ছাড়িয়া দিনু / ত্রিপদি লিখিয়া। ৮+৬
বসন্তের দুঃখ যাহা / কহি বিবরিয়া ॥ ৮+৬

Dhaka University Institutional Repository

(৩)

দীর্ঘ লঘু ত্রিপদী ঃ-

আমার মনের দুক্ষ / সবলে বিদরে বুক ৮+৮
আছিলাম রাজার নন্দন। ১০
মাতাহীন বিধি কৈল / তাতে পিতা বৈরী হইল ৮+৮
অরণ্যেতে করিলাম গমন ॥
আজ্ঞা দিল পিতাবরে / কহিল কোওয়ালের তরে ৮+৮
কাটিয়া আনহ দোহার শীর। ১০
ধর্ম্ম ভাবি সেই বীর / না কাটে দোহার শীর ৮+৮
বলিলেন্ত জাহ দূরদেশ ॥ ১০
দুই অশ্ব দুই ভাই / পন্থের কিছু চিহ্ন নাই ৮+৯
প্রবেশিলাম অরণ্য মাঝার ॥ ১০

৮+৮+১০, ৮+৮+১০, ৮+৮+১০, ৮+৮+১০, ৮+৯+১০।

(৪) সমিল অক্ষরবৃত্ত ঃ-

শুনহ কোতয়াল ভাই / আমি অভাগিয়া। ৮+৬
রাজবংশে জন্ম মোর / কহি বিভারিয়া ॥ ৮+৬
ভীম দেশে রাজা পিতা / প্রতাপ ভীম নাম। ৮+৬
মোর কর্ম্ম দোষে ভাই / এত দুঃখ পাম ॥ ৮+৬
শীত বসন্ত দুই পুত্র / হইল তাহান। ৮+৬
অকালে মরিল মাতা / দাই সব জানে ॥ ৮+৬

৮+৬, ৮+৬, ৮+৬, ৮+৬, ৮+৬, ৮+৬।

(৫) দীর্ঘ্য ত্রিপদী ঃ

আজ্ঞা দিল পিতা বরে / কটিতে দোহার তরে ৮+৮
রাখিলা যে করি কত দয়া। ১০
আসিলাম অরণ্য মাঝে / না খাইল পশুরাজে ১০+৮
তাহাতে প্রভু নিল উদ্ধারিয়া ৷৷ ১০
ভাই উদ্দেশে আইনু / পথে বহু দুঃখ পাইনু ৮+৮
তাতে মোর রাখিলা জীবন।

যে আনিল সঙ্গে করি / যে হইল আমার বৈরী ৮+৮
বড় দুঃখ রহিল মোর মনে। ১০
পিতা নিদারুন হইল / সেই মত ভাই কৈল ৮+৮
এবে আর নাহিক ভরসা। ১০
বিচার যে নহে করি / সাধুকে দিলেক ধরি ৮+৮
তুমি প্রভু নৈরাসের আশা ৷৷

৮+৮+১০, ৮+৮+১০, ৮+৮+১০,

৮+৮+১০, ৮+৮+১০, ৮+৮+১০।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) সমিল অক্ষরবৃত্ত ঃ-

হেনকালে অসুর আমি / কুমারের অঙ্গে। ৮+৬
থরে থরে কাপে নৌকা / সবে দেখে রঙ্গ ॥ ৮+৬
ক্রোধেতে জ্বলিয়া কুমার / নৌকায় উঠিল। ৮+৬
বিজলী চটকে নৌকা / জলেতে নামিল ॥ ৮+৬
জয় জয় হুলহুলি / দিল নারিগণ। ৮+৬
আনন্দিত হইল বড় / সাধুর নন্দন ॥ ৮+৬
বন্দি করি জেহেল ভরি / রাখ এই চোরে। ৮+৬
এহা হইতে বহু কার্য্য / হইবেক মোর ॥ ৮+৬

৮+৮+১০, ৮+৮+১০, ৮+৮+১০,

৮+৮+১০, ৮+৮+১০, ৮+৮+১০।

(৭)

আর ইতি পূর্বের রাজার / প্রতিজ্ঞা এমতি। ৮+৬
লাল মানিক্য যেই চেনে / মোর কন্যার পতি ॥ ৮+৬
নানা দেশে দূতগন / চাহিল বিচারি। ৮+৬
কোন রাজ্যে না পাইয়া / আসিলেক ফিরি ॥ ৮+৬

৮+৬, ৮+৬, ৮+৬, ৮+৬।

Dhaka University Institutional Repository

(৮) ত্রিপদী ঃ

আহা কন্যা কাঞ্চনমালা / মোরে কোন দুঃখ দিলা ৮+৮
কি শুনাইলা কন্যা শূল বাণী। ১০
তুমি ছারি যাবা মোরে / কি মতে রহিব ঘরে ৮+৮
দৈবে আমি ত্যাজিব জীবন ॥ ১০

৮+৮+১০, ৮+৮+১০।

(৯) মিশ্ররীতি

বৈশাখ মাসেতে সখি / ফুল নানা রাশি। ৮+৬
মত্ত হইয়া মধু খায় / ভেমরায় বসি ॥ ৮+৫
ভেমরা গুন গুন করি / ফুলের মধু খায়। ৮+৭
আমার ফুলের মধু / অকারনে যায় ॥ ৮+৬
ভেমরার রীতি দেখি / দগধে পরাণ। ৭+৫
আমার ফুলের মধু / কে করিবে পান ॥ ৮+৬

৮+৬, ৮+৫, ৮+৭, ৮+৬

৭+৫, ৮+৬।

Dhaka University Institutional Repository

(১০)

কি কার্য্য করিলা প্রিয় / বুঝি বুঝিতে না পারি। ৮+৮
মারিতে আনিলা মোরে / সওদাগরের পুরি ॥ ৮+৮
পাটের ঈশ্বর ভাই / রাজ্যের রাজন। ৮+৬
মন দিয়ে না শুনিবে / তোমার বচন ॥ ৮+৬
পূর্ব্ব বাক্য ভাই মোর / ভুলিছে নিশ্চয় । ৮+৬
তোমা মন্ত্র ভাই যদি / কর্নে না শুনয় ॥ ৮+৬

৮+৮, ৮+৮, ৮+৬, ৮+৬, ৮+৬, ৮+৬।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অদ্বিতীয় ছন্দ অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। এই ছন্দকে 'পয়ার ছন্দ' বলা হয়। মধ্যযুগের সকল কবিরা এই ছন্দে কাব্যচর্চা করেছেন। ৮+৬ পর্বে বিভক্ত এই ছন্দ সমিল ছন্দ নামেও পরিচিত। প্রথম চরণে এক দাঁড়ি, দ্বিতীয় চরণে দুই দাঁড়ি থাকে। আবার কোন কোন কবি দাঁড়ির স্থলে তাড়কা চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। মধ্যযুগের শুরু থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ছন্দে কাব্য চর্চা হয়েছে। এই ছন্দে রচিত কবিতাকে সুর দিয়ে পড়া যায়া। কারণ চরণেই একটি এটানা সুরের আবহ থাকে। দীর্ঘ পর্বের সমাবেশের জন্য ও সাধারণ ভঙ্গির উচ্চারণের জন্য লয়টা ধীর থাকে। ফলে ধ্বনিকে আচ্ছন্ন করে একটি তান প্রবাহ সমগ্র চরণের মধ্যে প্রবলভাবে বয়ে চলে। ১নং চিত্রে আমরা দেখতে পাই প্রতিটি লাইন দুই পর্বে বিভক্ত ৮+৬ এবং প্রতি চরণের শেষে মিল রয়েছে। কারণ সাম্যরক্ষাই হচ্ছে অক্ষরবৃত্তের বিশেষত্ব। (প্রবোধচন্দ্র সেন-ছন্দ জিজ্ঞাসা পৃ. ৯, প্রকাশ ১৯৭৪, কলিকাতা)।

কবি হাফেজদ্দীন তার কাব্যে পয়ার বা লঘু দ্বিপদী, তরল পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, তরল পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করেছেন। ১নং চিত্রটি লঘু দ্বিপদী তরল পয়ারের উদারহণ। কবি তার কাব্যে বিসর্গকে পুর্ববর্তী অক্ষরের অনুসঙ্গী ধরে এক মাত্রার হয়।

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দটি মধ্যযুগের প্রায় সকল কাব্যেই দেখা যায়। প্রত্যেক চরণে তিনটি পর্ব রয়েছে। এই চিত্রে চার চরণে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের প্রত্যেকটিতে ৮+৮ করে মাত্রা রয়েছে। তৃতীয় পর্বে ১০টি করে মাত্রা রয়েছে। পঞ্চম চরণে ব্যতিক্রম হয়েছে প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা, দ্বিতীয় পর্বে ৯ মাত্রা ও তৃতীয় পর্বে ১০ মাত্রা রয়েছে। [৮+৯+১০=২৭]

৪নং চিত্রে মিল বিন্যাসের ক্ষেত্রে পর্বগুলি সমন্বিত। ৫নং চিত্রটি দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দে রচিত, মাত্রা ও পর্ব গুলি ৮+৮+১০ নিয়মের অধীন। সমিল প্রবাহ অব্যাহত থেকেছে। ৬নং চিত্রের পর্ব

Dhaka University Institutional Repository

বিন্যাস যথাযথ নিয়মে হয়েছে। ৮নং দীর্ঘ লঘু ত্রিপদী ছন্দের পর্বগুলি বিভক্ত। মাত্রাগুলি সমন্বিত। ৯ ও ১০ চিত্র মিশ্ররীতিতে পর্যগুলি বিভক্ত, ৮+৬, ৮+৫, ৮+৭, ৮+৬, ৭+৫, ৮+৬, ৮+৮, ৮+৮, ৮+৬, ৮+৬, ৮+৬, ৮+৬।

কবি হাফেজদ্দীন তাঁর কাব্যে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে কাব্য রচনা করেছেন। তবে লঘু ত্রিপদী ও পয়ারের ক্ষেত্রে তিনি মিশ্ররীতিকে গ্রহণ করে পয়ারের বিভিন্ন ছন্দের প্রয়োগ কৌশল অবলম্বন করে তাঁর শিল্প সূলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন।

ভাষাগত বৈশিষ্ট্য

কবি হাফেজদ্দীন গ্রামীন সভ্যতার কবি হলেও তিনি পাণ্ডিত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি ও আদর্শ প্রচারে সচেষ্ট হয়েছেন। এই ন্যায়নীতি ও আদর্শ ও উপদেশবোধ তাকে প্রবাদ, প্রবচন ও সুবচন সৃষ্টিতে আগ্রহশীল করেছে।

প্রবাদ প্রবচন

১. প্রভুয়ার সুখী হয়, দুঃখ খণ্ডে প্রতিমিতে।

২. নিবর্বন্ধ আষ্টে পৃষ্টে তোমার হইল মরণ।

৩. চেষ্টাইত দুঃখ দশা খণ্ডান না যায় ॥

৪. সংসারে নিরাশ আমি বৃথায় পিরিত।

৫. ক্ষেণেক বিলম্বে সুখ হইবে কুমার।

৬. দুঃখ আছে যার দেলে, তার সুখ না হয় কখন ॥

৭. গুপ্ত থাকিয়া তুমি বেক্তের পতি।
নিলক্ষের লক্ষ তুমি অনাথের গতি ॥

৮. তুমি কি মারিতে পার শক্তি কি তোমার।

৯. মোর কর্ম্ম দোষে কেন হেন দশা হইল ॥

১০. আপনার দোষে মুই মরিলাম আপনি।
কিবা দোষ দিব আমি গুণমনি ॥

১১. তোর লাগি চোর দৈবের মোর গেল ধন।

১২. নক্ষত্রের মধ্যে যেন উদয় হইল শশী।

১৩. বিধির লিখন তাহা কে পারে খণ্ডাইতে।

১৪. হাস্যমুখে ডাকে পতি মিষ্টবাণী শুনি।

১৫. পতি বিনে সুখ মনে কিছু নাহি আর।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. আতুর কুড়ে যদি হয় যজ্ঞপতি।
সেবা করিবেক নারি করিয়া ভকতি ॥
১৭. অভাগির উল্লাস হইল ধরিবারে চাঁন্দ।
১৮. কপালে লিখিত কিবা ছিল এই ভুবনে।
১৯. কর্ম্ম দোষে সিংহ বন্দি শৃগালের হাতে।
২০. যে হউক সে হউক আজি জিজ্ঞাসা করিয়া।
২১. গগনের চাঁন্দ লুকাই উঠে পুনর্ব্বার।
আমার চাঁন্দ গেলে ফের না আসিবে আর ॥
২২. জিয়নে মরণে কন্যা রহিছে কার ঘরে ॥
২৩. জন্মিলে মরণ পন্থ আছয় নির্শ্চয়।
বাঁচিলে তথাপি তারে পরে লিয়া যায় ॥
২৪. পুত্র কন্যা ঘাটে ২ হয় নানা মতে।
কেহুর পুত্র কেহুর কন্যা মিলায়ে শাস্ত্রেতে ॥
২৫. কন্যা হইলে তারে কেবা রাখে ঘরে।
২৬. জামাতা নিষ্ঠুর লোক শাস্ত্রেতে লিখিত।
২৭. সুখনায় পরিয়া মাছ যেন ছটফট করে।
২৮. শৃগালের হাতে বন্ধি সিংহের নির্দ্দন।
২৯. কপালে নির্ব্বন্ধ প্রভু না যায় খণ্ডান।
৩০. শৃগালে খাইতে চাহে বাঘের মাংস ধরি।
৩১. আকাশের চন্দ্র দেখি ধরিবার আস।
ঢেউটির হাতে যেন পতঙ্গের বিনাস ॥
৩২. হীন সঙ্গে হেন বাক্য না হয় উচিত।
৩৩. চন্দ্র সূর্য্য খসি পড়ে ভাঙ্গে ত্রিভুবন।
৩৪. দুপিসুতে শত যুক্তি দিপি নাহি হয়।
৩৫. নির্ব্বন্ধ আছিল প্রিয়া কপালের লিখন।
৩৬. অনাথের নাথ বন্ধু, কৃপার সাগর সিন্ধু,
উদ্ধার করি লেহ অভাগীরে ॥

Dhaka University Institutional Repository

৩৭. কামবানে সাধু সদা করে ধরফড়ি।
পঞ্চপ্রাণি বৈরী হইয়া রহিল কুমারী।

৩৮. উর্ম্মি পরে তল যায় গগন পায় হাতে।
হেটেতে নামিলে পরে বাসুকির মতে ॥

৩৯. কিবা দর্প করে সাধু কিবা করে আস।
হেন ছার থুইয়া জমে করে উপহাস ॥

৪০. পুরুষ নিষ্ঠুর বড় স্মরণ না করিনু।

৪১. মৃত্যুদেহে প্রাণি আসি সঞ্চার হইল।

৪২. জলদ গর্জ্জন শুনি মুক্ষের উল্লাস।

৪৩. তুল্য মাংসে কুকুর যেন হয় অগ্রপান।

৪৪. নির্ব্বন্ধ লেখিত যাহা এরাইবারে নাই।

৪৫. মরা হংসে জল পাইলে জীবন সঞ্চার।

৪৬. এক মন হইয়া মোর মন্ত্র যে শুনিবে।

৪৭. কিবা সাদ হইল মোর ধরিবারে চাঁদ।
আপনি পাতিলাম আমি আপনার ফাঁদ ॥

৪৮. অমৃততে বিষ কন্যা শেষে কেনে দিলা।

৪৯. ভালা যে মন্দ করে এই ফল তার।
মরণ লিখিত হেতু এই ছিল আমার ॥

৫০. লিখিত আছিল মোর খণ্ডিবে কি মতে।

৫১. চিন্তা স্থির কর ভাই নহে হুতাসন।

৫২. ধনের অধিক ইষ্ট কেবা আছে আর।

৫৩. হস্তে আনি দিল বিধি আকাশের শশি।
হেন চন্দ্র বুদ্ধি দোষে পরি গেল খসি ॥

৫৪. যে হউক সে হউক ভাই স্থির কর মন।

৫৫. ভাল কাজে ভাল হয় মন্দ হয় ছার।
এথাতে করিলে ভাল তথাতে নিস্তার ॥
সুজনের মন্দ হেথা খণ্ডে দিনে ২।
দুর্জ্জনের কথা সব হয় এক স্থানে ॥

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. নারীর মর্ম্ম না বুঝিয়া হুকুমিলা তখন।

৫৭. কাটা ঘায় কেন দেও লবণ ছিটাইয়া।

৫৮. কার পুত্র দিল আনি আমি পাপী অভাগিনী

যাইবার কালে ফিরি নাহি চায়।

৫৯. কাটিলে এ হেন চাঁদ না দেখিব আর।

৬০. চিরজীবি চিরকাল দ্রীর্ঘ পরমায়ু।

৬১. মিছা অপরাধে যেবা যার মন্দ করে।

আপনার মন্দ হেন জানহ সত্তরে ॥

৬২. কল্পনা করিতে বেথা সাক্ষাতে আসিলা।

যক্ষের অমৃত দিয়া অগ্নি নিবারিলা ॥

৬৩. পুত্র জন্মে এই সংসারে আনন্দের কারণ ॥

মৈলে কাষ্ঠ অগ্নি দিবে জনক জননি।

৬৪. বড়ই চঞ্চল বুদ্ধি কাম আতুর কায়।

বাগ্‌বিধি

ফাঙ্কর, ফাফর, তুরমানে, এস্ক, আপনার ফাঁদ, কাটাবৃক্ষ, পবননন্দন, দুঃখের ভারতি, বুদ্ধিমন্ত, অগ্নি অবতার, ক্ষেপিল আগুন, সুস্থারিয়া, শিশুমতি, মায়া রাক্ষসীনি, পরদলে, বুড়ার বিলাফ, দেলের গুমানে, লন্টবাদ, সিংহনাদ, পবনগতি, তুরুক সেনাপতি, যুজ্জজনের, মহানিধি।

ভাষা

ভাষার ক্ষেত্রে কবি সাধু ভাষাকে অবলম্বন করেছেন। চলিত ভাষা ব্যবহার করেননি। তবে আঞ্চলিক শব্দকে গ্রহণ করেছেন।

কবি তার কাব্যে বেশী আরবী শব্দ ব্যবহার করেছেন। ফারসী, উর্দু, সংস্কৃত ভাষার শব্দকে ব্যবহার করেছেন, তবে তা আরবীর তুলনায় অনেক কম। মোঘল আমলের পূর্বে এদেশ ছিল স্বাধীন। যদিও পাঠানেরা অধিকারের জন্য হামলা করেছে, কিন্তু অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। আর এই পাঠানেরা ছিল ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষী। মোঘলদের জয়ের জন্য যথেষ্ঠ পরীক্ষা ও খেশারত দিতে হয়েছে। বাঙ্গালী জাতি চিরদিন স্বাধীন জাতি। তাছাড়া সমুদ্র তীরবর্তী হওয়া প্রকৃতির প্রতিকূলতায় তারা অত্যন্ত সাহসী ও দুর্ধর্ষ ছিল। ফলে কোন জাতি আক্রমণ করে এদেশ বেশী দিন বশে রাখতে পারেনি। আরবীয় বণিকরা শুধু বানিজ্য উপলক্ষে এসেছে জয়ের নেশায় নয়।

Dhaka University Institutional Repository

মোঘলরা বাংলা অধিকার করেই রাজকার্যে ফার্সী ভাষার প্রচলন করেন। এ ভাষা আগন্তুক ভাষা। ফার্সী ভাষার প্রচলনের বহু পূর্বে অর্থাৎ ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব থেকেই এদেশবাসীর সাথে আরবী ভাষার পরিচিত ছিল। ফলে আরবী শব্দাবলী বাংলাভাষী মানুষেরা আবলীলাক্রমে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়াও আরবী ছন্দের সাথে বাংলার ছন্দের এক অপূর্ব মিল রয়েছে। আরবীয় বণিকরা ৬৬০খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব থেকে পকপ্রণালী অতিক্রম করে সমুদ্র পথে এদেশের সাথে বানিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। অনেক সময় আরবীয় বণিকরা এদেশীয় মেয়েদের বিয়ে করে সংসার যাপণ করেছেন।

অনেক সময় আরবীয় বণিকের বানিজ্য জাহাজ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। তাদের মধ্যে যারা ভাগ্যক্রমে তরঙ্গাঘাতে তীরে আসে–তাঁরাই বেঁচে যায় এবং সর্বহারা হয়ে উপকূলীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে আশ্রয় পেত এবং তাদের সাহায্য সহযোগীতায় ফিরে পেত হারানো জীবন ও জীবন চলার নতুন পথ। স্থানীয় মেয়েদের বিয়ে করে এদেশীয় হয়ে ঘর সংসার করতে থাকেন। পারস্পপারিক অবস্থানের ফলে তাদের থেকে প্রচুর আরবী শব্দ বাংলার শব্দ ভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার পায়। লোকসাহিত্যে ছড়ানো ছিটানো গল্পগুলোকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলে এ তথ্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সৃষ্ট সাহিত্যের সাথে উত্তরাঞ্চলের সাহিত্যের তুলনা করলে এ প্রভেদটুকু পরিষ্কার হয়ে যাবে। কেননা উত্তরাঞ্চলের সাহিত্যে ভারত থেকে আসা হিন্দি, উর্দু ও ফারসী শব্দ প্রবেশ করেছে। কারণ ভারতে সর্ব প্রথম আরবীয় বণিকেরা আসেননি। এসেছে ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষী তুর্কী মুসলমানরা। ভারতের সৃষ্ট সাহিত্যের সাথে বাংলাদেশের সাহিত্যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এব বিরাট পার্থক্য রয়েছে। ভারতের সৃষ্ট সাহিত্যে আরবীয় শব্দের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম। কারণ উৎস **"ExoGamous marriages, migration of people, trades"** ভারতের ক্ষেত্রে আরবীয় বণিকদের বানিজ্যের কোন সুযোগ ছিল না।

সংস্কৃত ভাষার দাপটে–আরবীয় শব্দাবলীর প্রবেশের দ্বার ছিল এক রকম বন্ধ। ফলে দুই বাংলার রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যবধান হয়েছে।

বাংলাদেশে পঞ্চাদশ শতাব্দীতে সৃষ্ট সাহিত্য শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ও মনসা মঙ্গলে আরবীয় শব্দের যথেষ্ট ব্যবহার পাওয়া যায়। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে বাংলা সাহিত্যে নব্য ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ শুরু হয়। মুসলমান হিন্দু, বৌদ্ধদের রচনায় এর প্রমাণ রয়েছে। সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খান, মোহাম্মদ কবীর, মাগন ঠাকুর, দৌলত উজীর বাহরাম খান, সৈয়দ আলাওল, কৃষ্ণরাম দাস, বিজয় গুপ্ত, কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, রায় গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রচুর আরবী ও ফার্সী শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এমন কি লোকসাহিত্যে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে আরো বেশী। কারণ লোকসাহিত্য কোন একক কবির রচনা নয়। কবি হাফেজদ্দীন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৮ভাটির কবি ছিলেন বিধায় তার কাব্যে তুলনামুলকভাবে আরবী শব্দের প্রয়োগ বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

কবির কাব্যে মধ্যযুগের বানান রীতির স্বাক্ষর রয়েছে। মধ্যযুগের পাণ্ডুলিপির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য–অকারণে রেফ-ফলার ব্যবহার। ব্যবহৃত রেফ-ফলার অর্থ যদি ধরা হয় তবে তার কোন যথার্থ শব্দার্থ পাওয়া যাবে না। যা পাওয়া যাবে, তাতে কবির আদর্শকে নিধন করা হবে। পণ্ডিত মহল এই অকারণ 'রেফ-ফলার' নামকরণ করেছেন 'ক্যালিওগ্রাফি'। কিন্তু ক্যালিওগ্রাফি বলতে আমরা বুঝি হাতের লেখা। এই সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে তার কিছুই বুঝা যায় না। অতএব, আমি ক্যালিওগ্রাফি বলতে রাজি নই। এটি মধ্যযুগের পংক্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধির একটি উপায় মাত্র। যাকে বলা যায় নক্‌শাদার বা **Artistic design.**

কবি হাফেজদ্দীন বাংলা ভাষার শব্দাবলী ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ দক্ষ ছিলেন। তার কাব্যে প্রতিভার ছাপ রয়েছে। ভাষও ছন্দে অলংকার ও চিত্রে তার দক্ষতার পরিচয় অতুলনীয়।

---

১৮ ভাটি- বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলকে ১৮ ভাটি বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কাব্য-সংকলন

১ম পরিচ্ছেদ

ভাগ্য অন্বেষণ

ঃ পয়ার ঃ

তথায়ে আসিয়া সবে চাহেন দিদার[১]।
দুই অশ্ব লইয়া তথা রহিল কুমার।
মহাদুঃখে নিদ্রা যায় রহিছে পরিয়া।
প্রভাতে অরন্য যেন আকাশে উঠিয়া।
আকাশের চন্দ্র যেন ভুমিতে গড়ায়।
হেরিতে কোতয়াল সবে দেখিল তাহায়॥
চমকিত হইয়া সবে চর্তুদ্দিকে চায়।
চোর বলিয়া যে হাকিয়া উঠায় ॥
ফিরিয়া রহিল সবে অশ্ব করে ধরি।
নেজা[২] বরছি[৩] লাঠি লইয়া সারি ২ ॥
কুমার বুঝিল মনে এই সব জন।
আমার ভাইকে বুঝি করি নিধুবন[৪] ॥
এবে আসিয়াছে সবে আমাকে মারিতে।
দুই অশ্ব নিবে যুজে মারিয়া যে সত্য ॥
ভয়ঙ্কর হইয়া শিশু কাতর বচনে।
জিঙ্গাসিলা অই তোমরা আইলা কোথা গোণে ॥

বর্ণ বিপর্যয় ঃ- প্রতিলিপিতে আছে "আমার ভাইকে বুঝি নিধুবন" ।লিপিকরের প্রমাদ বশত এরূপে লিখিত হয়েছে।

দিদার[১](ফারসি শব্দ) = সাক্ষাত করা। নেজা[২]= অস্ত্র বিশেষ । আগ্নেয়াস্ত্র আবিস্কারের পূর্বে মানুষ একে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। বর্তমানে গ্রামের মানুষেরা চোর-ডাকাতের উপদ্রপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নেজা ব্যবহার করে থাকে। বরছি[৩]= বর্শা এক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ। নিধুবন[৪] = নিস্পেশিত করা, নির্যাতন করা।

Dhaka University Institutional Repository

কোতয়াল[৪] বলে শিশু তুই অশ্ব চোর।
নৃপতির আজ্ঞা তোরে বন্দি নিবার মোর ॥
কুমার কহিল ভাই একি বিপরিত।
হেন বচনেতে মোর মনে লাগে ভিত ॥
বিদেশি দুঃখিত আমি ভাই হারাইয়া।
উদ্দিশ না পাই কোথায় গেল পালাইয়া ॥
মিছা[৫] পরিবাদ[৬] দেহ কোন দোষ পাইয়া।
বিচার করিতে চাহ একলা পাইয়া ॥
নিদয়া নিষ্ঠুর বরা বজ্জাত[৭] জাত।
ক্রোধ করি ধরে গিয়া কুমারের হাত॥
কুমারে রজু দিয়া নিলে বান্দিয়া।
নৃপতির আগে কোতয়াল গেল চলিয়া॥

কোতয়াল[৪]= ফারসী কুৎবাল শব্দ থেকে উদ্ভব। সংস্কৃত কোটাল> কোটর্বাল> কোর্টআল> কোটাল বা কোতয়াল অর্থাৎ নগর রক্ষক বা প্রহরী বা পাহারাদার । মিছা[৫](আরবী শব্দ)=মিথ্যা। পরিবাদ[৬](ফারসী শব্দ)= বদনাম, দুর্নাম, অপবাদ। বজ্জাত[৭] [ফারসী শব্দ বদ- জাত]=খারাপ।

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

"চোর আনি আছি বান্দিয়া"

ঃ পয়ার ঃ

অল্প বয়সের শিশু কোমল গঠন।
বধ করিতে শিশু দয়া নাই মন ॥
বিচার না করি তবে কহে নৃপবর।
বন্দি করিয়া রাখ নিয়া বন্দখানা ঘরে ॥
পুঁছিতে[৮] লাগিল দ্বারি[৯] কুমারের তরে।
দেখিয়া তোমার রূপ কলেজা[১০] বিদরে ॥
সোনার কুমার আমি বলিজে বচন।
অশ্ব চুরি কৈল্লা[১১] তুমি কিসের কারণ ॥
অনল বরণ রূপ না পারি চাহিতে।
নয়ান মুদিতে হইল তোমারে দেখিতে ॥
ভানুর[১২] উদয় যেন বন্দখানা ঘর।
তস্কর[১৩] লক্ষণ কিছু নাই তোমার ॥
নৃপতি তোমার রূপ একই সমান।
কেন হইলা চোর কহ ভাইজান ॥

পুছিতে[৮]=(সংস্কৃত প্রিচ্ছ ধাতু থেকে এসেছে) = জিজ্ঞাসা করা, জানা। দ্বারি[৯]=[ফারসী দার শব্দ থেকে এসেছে, দার+তৎ প্রত্যয় যোগে দ্বারি হয়েছে] =অধিকারী, বৃত্তিযুক্ত কর্মচারী। কলেজা[১০]=(হিন্দী শব্দ কলিজা থেকেএসেছে)= যকৃৎ। কৈল্লা[১১]=করিলা বা করলা। ভানু[১২] (সংস্কৃত ভি+নু)= সূর্যের আর এক নাম। তস্কর[১৩](সংস্কৃত শব্দ তৎ+√কৃ+আ)= চোর, অপহারক।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে দেখিতে মোর দয়া লাগে মন।
শুনিবার শ্রদ্ধা বড় তোমারই বচন ॥
এতেক শুনিয়া বলে রাজার নন্দন।
আমা হেন অভাগিয়া নাহি ত্রিভূবন ॥
আমার কথপ[১৪] কিছু প্রত্যেক[১৫] হবে নাই।
মিছা ২ দুঃখ যেন মোর হইল ভাই ॥
'শুধাইলা প্রেমভাবে শুনিতে কারণ।
কহিব কিঞ্চিত দুঃখ শুন দিয়া মন ॥
হীন হাফেজদ্দীন কহে দরগায়[১৬] আল্লাহর।
হেন দশা[১৭] দুনিয়াতে নাহি ঘাটে কার ॥
পয়ার ছাড়িয়া দিনু ত্রিপদি লিখিয়া ।
বসন্তের দুঃখ যাহা কহি বিবরিয়া[১৮] ॥

কথপ[১৪](আঞ্চলিক শব্দ) = বলার মতো বাক্য, বাগ্যলিপি।
প্রত্যেক[১৫](আঞ্চলিক শব্দ)=পৃথক।
দরগায়ে[১৬](ফারসী শব্দ)=যে আসনে বসে মুরিদের উপদেশদেয়া হয়।
দসা[১৭]=অবস্থা। বিবরিয়া[১৮]=বিস্তৃত করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় পরিচ্ছেদ

"বসন্তের দুঃখ"

ঃ ত্রিপদী ছন্দ ঃ

আমার মনের দুখ সবলে বিদরে বুক।
আছিলাম রাজার নন্দন ॥
মাতাহীন বিধি কৈল তাতে পিতা বৈরি হইল।
অরন্যেতে করিলাম গমন ॥
আজ্ঞা দিলা পিতাবরে কহিল কোতয়ালের তরে।
কাটিয়া আনহ দোহার শীর ॥
ধর্ম্ম ভাবি সেই বীর না কাটে দোহার শীর ।
বলিলেন্ত , জাহ দুরদেশ
দুই অশ্ব দুই ভাই, পন্থের[১৯] কিছু চিহ্ন নাই।
প্রবেশিলাম অরণ্য মাঝার ॥
কহিনু ভাইয়ের পাশ, ত্রিষ্ণর্নায় হইনু নাস॥
জল দিয়া প্রাণ রাখ মোর।
আমার কাকুতি[২০] শুনি ভাই যে কহিল পুনি[২১] ॥
আমি যাই জলের কারণ।
ফিরিয়া আসিব যবে দরশন হবে তবে।
না আসিলে দেশে তুমি করিও গমন ॥
বৃক্ষের মূলেতে বাস, অশ্ব থুইয়া[২২] মোর পাস।
পদাতিকে[২৩] করিল গমন।
দিবা অবসান হইল ভাই মোর ,না আসিল ॥
পুন উর্ষে[২৪] চলিলাম তালাসিতে।

পন্থের[১৯]=পথের। কাকুতি[২০]= অনুণয়। পুনি[২১]=পুনরায়। থুইয়া[২২](আঞ্চলিক শব্দ)= রেখে যাওয়া । পদাতিক[২৩] (ফরাসী পাইক ও সংস্কৃত পদ শব্দ থেকে এসেছে) = সংবাদ বাহাক কিন্তু এখানে এই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বরং পায়ে হেটে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। উষে[২৪] (বিশেষ্য) = পূর্ব দিক।

Dhaka University Institutional Repository

দুই হয় করে ধরি চলি গেল নদী ত্রিরি[২৫]
ভাই সোগে মনে ব্যাথা।
সে ভাই গেল চলি আর না আসিল ফিরি
বসিয়া রাহিলাম সেইখানে॥
অবিচারে বন্দি করি আনিল আমাকে ধরি।
নিবেদিলাম মোর দুঃখ ভাই।
পলাইলাম পিতার ঠাঁই নির্ব্বন্দ[২৬] এরাণ নাই।
বিচার করিবে নরপতি।
অধীন হাফেজদ্দীন কয়, প্রভুয়ার[২৭] সুখী হয়।
দুখ খণ্ডে প্রতিমিতে[২৮]॥

ত্রিরি[২৫]= নদীর পার বা নদীর তীর। নির্ব্বন্দ[২৬]=বিধিবদ্ধ, ভাগ্যের লিখন। প্রভুয়ার[২৭]=স্রষ্টা বা ঈশ্বর। প্রতিমিতে[২৮]=প্রথমেতে ,পহেলা, সূচনা লগ্নে।

Dhaka University Institutional Repository

৪ র্থ পরিচ্ছেদ

আপন পরিচয় ব্যক্তকরণ

ঃ পয়ার ছন্দ ঃ

শুনহ কোতওয়াল ভাই আমি অভাগিয়া।
রাজবংশে জন্ম মোর কহি বিভারিয়া ॥
ভীম দেশের রাজা প্রতাপ ভীম নাম।
মোর জন্ম দোষে ভাই এতো দুঃখ পাম ॥
শীত ও বসন্ত দুই পুত্র হইল তাহানে।
অকালে মরিল মাতা দাই সব জানে ॥
শীত নামে বড় ভাই বসন্ত নাম মোর।
দুই অশ্ব দুই ভাই আনিলাম সত্তর[২৯] ॥
মাতা বিহনে পিতা বিমাতার মরণ।
নানা মতে বধিবারে চাহিল পরাণ ॥
বিবাহ করিল পিতা সত মাতাসি[৩০]।
ইহার কারণে মোরা হইলাম পরবাসী[৩১] ॥
পিতা রাজ্য ছাড়ি মোরা রহিলাম আসিয়া।
ত্রিষ্ণর্নায় আকুল হইয়া গলা সুখাইয়া ॥
চোর বলি বান্দি মোরে আনিল সকলে।
রাজপুত্র হইয়া মোর এই ছিল কপালে ॥
মোর দুখ নিবেদিলাম তোমার চরণে।
মাতাহীন দেখি কৃপা করিবা জেমনে ॥
ধর্মভাই[৩২] দয়া কর ,আমার সমন্ধে।
প্রাণ দান দেহ মোরে করি ধনবন্ধে[৩৩] ॥

সত্তর[২৯]=তারাতারি। সত মাতাসি[৩০]=বিমাতা এল।

পরবাসী[৩১]=অপর দেশে বাস।

ধর্মভাই[৩২]= ভাই সম্বন্ধীয়।

ধনবন্ধে[৩৩]=অনুরোধ, হাত জোড় করে কিছু বলা।

Dhaka University Institutional Repository

এক কথা বলি এই নিবেদন।
তোমার রাজ্যের রাজা হয় কোন জন ॥
শুনিলে রাজার নাম পাপ হয় ক্ষয়।
তে কারণে জিজ্ঞাসিলাম তোমার স্থানায়[৩৪] ॥
কাতর বচন শুনি বন্দি রক্ষজন।
দুঃখ ভারে কহে তবে রাজার বিবরণ ॥
জকুম রাজ্যের রায় কবিচন্দ্র পতি।
আয়ু শেষ হইল রাজা পরলোকে গতি ॥
চিন্তিত হইয়া যত পাত্র আদি প্রজা।
গজহস্ত[৩৫] ছাড়ি দিল আন গিয়া রাজা ॥
আনিলেক পাটে থুইল হৈল পাটেশ্বর।
দেখিতে সুন্দর বড় তোমা সবেস্বর[৩৬] ॥
সকলে কহিল এই রাজার নন্দন।
শীত নাম হয় সেই বুঝিবা কারণ ॥
সংগ্রামে বিজয় অতি জ্ঞানে অনুপম।
তোমার আকৃতি সব সেই গুণধাম ॥
এতেক শুনিয়া তবে কুমার ভাবিল।
এই হেন ভাই মম মনেতে বুঝিল॥
করি থুইলেক নিয়া পাটের উপরে।
নৃপতি হইয়া ভাই পাসরিলা মোরে॥
কেমনে যাইব আমি ভাইয়ের সম্মুখ।
অবশ্য চিনিবে ভাই দেখিলে মোর মুখ ॥
এবে আর দুখ নাই করিলাম ভরসা।
তুরিত[৩৭] বিধাতা মোর পুরাইবে আশা ॥

স্থানায়[৩৪](আঞ্চলিক শব্দ)=কাছে । গজহস্ত[৩৫]=বড় দাতওয়ালা হাতি।
সবেশ্বর[৩৬]=তোমার মত সমান। করি[৩৭]= হাতি, হস্তি,দ্বিপ,মাতঙ্ক,বার্ষন,গজ,কুঞ্জর, দন্তী, দ্বিরদ। তুরিত[৩৮]=তারাতারি।

Dhaka University Institutional Repository

তবেতে কহি শোন কোতয়াল ভাই।
আজ্ঞা দিয়া নেহ মোরে নৃপতির ঠাঁই ॥
তোমার রাজ্যের রাজা হয় কোন জন।
নিরক্ষিয়া[৩৯] দেখিব আমি তাহার চরণ ॥
কোতয়াল বলে ভাই সময় বুঝিয়া ।
নৃপতির আগে তোমা নিব যে আসিয়া ॥
জিজ্ঞাসা করি[৩৩] যে নৃপতির আগে।
সাক্ষাতে আসিয়া তোমায় নিব শেষ ভাগে॥
এতেক শুনিয়া তবে, বহিল নয়নের জল।
ঝরে বরিষার ধার।
অন্তরে অগ্নি জলে, উঠে ঘরে কতদিনে,
ভাইয়ের সঙ্গে হবে দরশন ।
কহে হীন হাফেজদ্দীন ভাবিয়া খোদায়।
আশ্চর্য বিষয় কিছু শুনহ সবায় ॥

প্রক্ষেপঃ- ৫ম পাতায় ১৮ লাইনের পর পয়ার ছন্দের মধ্যে ৪ লাইন "ত্রিপদি ছন্দ" বিক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হয়েছে। লিপিকরের ভুলের কারণে বা অসাবধানতায় প্রতিলিপিতে এ ধরণের ভুল সংগঠিত হয়েছে।

সত মাতাসি- মূলে আছে কিন্তু হওয়া উচিত ছিল সত মা আসি, প্রাচীন মধ্যযুগের করিবা লিপিকরদের মন মর্জিভেদে অক্ষর ব্যবহার করতেন। বিশেষ কোন নিয়ম তারা মানতেন না।

নিরক্ষীয়া[৩৯]=যত্ন সহকারে দেখা।

Dhaka University Institutional Repository

৫ম পরিচ্ছেদ

গঙ্গাধর সাধুর পরিচয়

ঃ পয়ার ছন্দ ঃ

গঙ্গাধর সাধু এক সেই দেশে ছিল।
বহুমূল্যে এক ডিঙ্গা[৪০] তৈয়ার করিল ॥
নির্ম্মাণ করিল ডিঙ্গা বহুমূল্য দিয়া।
নানান প্রকার ডিঙ্গা চাহিল টানিয়া ॥
সকল রাজ্যের লোক হইয়া একস্তর[৪১]।
তথাচ না নামে তরি জলের মাঝার ॥
হেন দশা হইল কেন ভাবে সওদাগর।
কহিল হাবিলাসে[৪২] ডিঙ্গা করিলাম তৈয়ার ॥
জলে না নামিলে প্রাণ দিব তোমান্তরে।
এই বলে দিবা নিশি ভাবে মনান্তরে ॥
ঈশ্বর স্মরণে করি সাধু সওদাগর।
নিশিকালে নিদ্রা যায় দুঃখিত অন্তর ॥
স্বপনে দেখেন সাধু কহে একজন।
শুনহারে সওদাগর দুঃখ কেনে মন ॥
এক নরবলি[৪৩] দান দেহ ডিঙ্গা পরে।
তবেত জলেতে ডিঙ্গা নামিবে সত্তরে ॥
চমকিয়া উঠে সাধু স্বপন দেখিয়া।
কোনজন কিবা মোরে কহেন আসিয়া ॥
ইষ্টদেব[৪৪] কৃপা কিবা দেখিলাম স্বপন।
নহে কি ধান্দা আমি সুনিলাম বচন ॥
মনেতে ভাবিয়া সাধু করিবেন সার।
প্রভাতে জাইব আমি রাজার গোচর ॥

ডিঙ্গা[৪০]=নৌকা। একস্তর[৪১]=এক সঙ্গে। হাবিলাস[৪২]=উল্লাসে বা আনন্দে।
নরবলি[৪৩]=যে পূজা মণ্ডবে দেবীর সামনে মানুষ বলি দেয়া হয়।
ইষ্টদেব[৪৪]= ঈশ্বর বা পরমেশ্বর।

Dhaka University Institutional Repository

হেনকালে ভানু যেন গগনে আরহিল।
রাজার ধারেতে আপে[৪৫] সাধুয়ে চলিল ॥
সুবর্ণের থালে করি সহস্র কাঞ্চন।
রাখিলেন নিয়া সাধু নৃপতির স্থান ॥
এক ডিঙ্গা বানাইলাম বহু হাবিলাস।
সেই হইতে রাজা আমি হইলাম নিরাস ॥
ভক্তি করিয়া কহে জোর করি হাত।
মোর দুঃখ নিবেদন নৃপতির সাক্ষাত ॥
অনেক প্রকার করি চাহিলাম তাহার।
তথাচ না নামে তরী আবের মাঝার ॥
নির্শ্চিত হইয়া নিশি করিলাম শয়ন।
ইষ্টদেব আসি আমায় দেখাইল স্বপন ॥
এক নরবলি দান দেহ নৌকাপর।
তবেত নামিবে নৌকা জলের মাঝার ॥
এতেক শুনিয়া আমার পৈল[৪৬] বজ্রাঘাত[৪৭]।
সেই কারনে মহারাজা আসিলাম সাক্ষাৎ ॥
হেন আশা পুরাইতে নাহি আর স্থান।
মেহের[৪৮] করিয়া আপে কৃপা যদি করেন ॥
বন্দখানা[৪৯] ঘর হইতে পাই একজন।
নহেত সবংশে আমি হইব নিধন॥
এতেক শুনিল যদি রাজা নৃপবর।
বন্দি রক্ষিগনে ডাকি কহিল খবর ॥
অশ্বচুরি যেই জনে করিল আসিয়া।
সেই চোরে দেহ আনি সাধুর লাগিয়া ॥

আপে[৪৫]=সমীপে। আবের[৪৬]=পানি। পৈল[৪৭]=পড়ল।
বর্জ্রাঘাত[৪৮](সংস্কৃত শব্দ)=আকস্মিক বিপদ।মেহের[৪৯] (ফারসী শব্দ)=অনুগ্রহ।
বন্দখানা[৫০]=কারাগার।

Dhaka University Institutional Repository

শুনি দ্বারিপাল গেল বন্দখানা ঘরে।
কুমারের মুখ চাহি কহে ধীরে ২ ॥
সুনহ কুমার এবে সুপিলাম বচন।
নিকটে আসিয়া তোমার হইল মরণ ॥
নির্ব্বন্দ আষ্টেপৃষ্টে[৫১] তোমার মরণ নির্শ্চয়।
চেষ্টাইত দুঃখ দসা খণ্ডান না যায়ে ॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ মোর প্রাণ ফাটে।
বিলম্ব না সহে কুমার চল তুমি ঝটে[৫২] ॥
কুমার কহিল শোন কোতয়াল ভাই।
আজিকা তোমার বচন নিষ্ঠুর কেনে পাই ॥
রাজার ধারে গিয়াছিলা কি সুনিলা আজি।
মিষ্ট মধ্যে বিষ দিয়া কেন দিলা বাজি ॥
কুমারকে দ্বারিপাল কহে বিবরণ।
গঙ্গাধর নামে সাধু রাজ মহাজন ॥
বহু মূল্যে এক ডিঙ্গা করিলাম নির্ম্মান।
সেই নৌকায় মানুষ এক দিব বলিদান ॥
তো কারণে আসিয়াছি তোমার হুজুরে।
আজ্ঞা দিল বন্দি তোমা দিবার সাধুরে ॥
তাহার লাগি সম্বাদিয়া[৫৩] নিয়াছিল মোরে।
চল ভাই শীর্ঘ্র করি বলি যে তোমারে ॥
এতেক শুনিয়া কুমার বুদ্ধিহীন হইল।
ধরণী পরিয়া তবে কাঁদিতে লাগিল ॥
হাহাঙ্কার[৫৪] করিয়া কুমার উঠে আর পড়ে।
ওহে প্রভু নিরঞ্জন ভুপতি সংসারে ॥

আষ্টেপৃষ্টে[৫১]=ধরে বেঁধে। ঝটে[৫২]=দ্রুত।
সম্বাদিয়া[৫৩]=সংবাদদিয়া। হাহাঙ্কার[৫৪]=আর্তনাত।

Dhaka University Institutional Repository

সংসারে বান্দব[৫৫] দিলা পিতা মাতা ভাই।
সেই হইতে দূর্গতি হইল সর্ব্ব ঠাঁই ॥
লক্ষ্য নাহি ধরিলাম ভাই হেন নিধি।
সঙ্গে আনি কোন দোষে হইল প্রাণে বধি ॥
নির্ব্বন্দ লিখিত মোর আছিল নির্শ্চয় ।
এবে কেন পিতার বাক্যে না করিলাম ক্ষয় ॥
বিদেশে আসিয়া ভাই হইবা রাজন।
পিতার ধর্ম্ম রাখি মোরে করিলা নির্দ্দন[৫৬] ॥
জনম সাফল্য ভাই হইল তোমার।
পিতার বাক্য বাম করিলা কাটিয়া আমার ॥
পিতায় করিলা আজ্ঞা সৎ মায়ের লাগিয়া।
তুমি যে কাটিবা মোরে কোন দোষ পাইয়া ॥
মরণে রহিল মোর এই সব দুঃখ।
ফিরিয়া দেখিলাম ভাইর চন্দ্রমুখ ॥
শুন ভাই কোতয়াল কহি[৫৭] যে তোমারে।
নৃপতি সাক্ষাতে নিয়া কাটহ্ আমারে ॥
কোতয়াল বলে নৃপ যেই আজ্ঞা দিছে।
সাক্ষাতে নিবার তরে কার শক্তি আছে ॥
অধিক কথায় কার্য্য নাই জাহরে[৫৮] চলিয়া।
নৃপতি শুনিলে তোমায় ফেলিবে কাটিয়া ॥
এইরূপ কোতয়াল বর আছিল নিষ্ঠুর[৫৯]।
বান্দিয়া দিলেক নিয়া সাধুর হুজুর ॥
হস্তে কণ্ঠে রুজু দিয়া সাধু যায় লইয়া।
ভুমিতে পরিয়া শিশু গড়াগড়ি যায় ॥

বান্দব[৫৫]=স্বজন। নির্দ্দন[৫৬]=নিদন। কহি [৫৭] (আঞ্চলিক শব্দ)=বলি।
জাহরে[৫৮]= চলে যাওয়া। নিষ্ঠুর[৫৯]=দয়ামায়া হীন।

Dhaka University Institutional Repository

কুহুরী[৬০] ২ কুমার কান্দে দীর্ঘ স্বরে।
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পরে বুদ্ধি নাহি সরে ॥
সৈন্যগণে মারে ছড়ি ক্রোধ হইয়া বরি।
কাতর হইয়া কহে কুমার চরণেতে ধরি॥
না মার ২ ভাই প্রাণ ফাটি যায়।
ক্রেপা[৬১] কর অর্ধমের ধরি তোমায় পায়।
অকালে ছাড়িয়া মাতা গেল স্বর্গপুর।
শিশু কালে পিতা মোর হইল নিষ্ঠুর ॥
ভাই সঙ্গে আসিলাম প্রাণ রাখিবারে।
সেই ভাই নিদারুণ হইল আমারে ॥
না জানিনু ভাইয়ের কিবা আছয় স্মরণ।
নহে কি বুঝি মোর বধিবে জীবন ॥
হেন জন না পাইনু অনাথের[৬২] নাথ।
লইয়া যাও সেই মোর ভাইর সাক্ষাত ॥
একবার দেখা হইলে ভাইর সহিত।
বুঝিয়া জাইতাম আমি সংসারের পিরিত ॥
আহারে কোতয়াল তুমি যাহ ভাইর তর।
মোর নিবেদন কহ ভাইকে আমার ॥
কোন অপরাধে মোরে কাটিতে যে দিল।
এ কারণে ভাই মোর সঙ্গতি[৬৩] আনিল ॥
যোম ঘরে জন্ম আজ জননীর ঠাঁই।
কহিব এসব কথা মাতাকে বুঝাই ॥
উষ্ণস্বরে[৬৪] ডাক দিল ভাই ২ বলি।
আহারে প্রাণের ভাই মোরে রইলা ভুলি ॥

কুহুরী[৬০]= ঢুকরে ঢুকরে কেঁদে উঠা। ক্রেপা[৬১]=দয়া বা অনুগ্রহ।
অনাথ[৬২]=এতিম, অসহায়। সঙ্গতি[৬৩]=কাছে বা নিকটে।
উষ্ণস্বরে[৬৪]=কাঁদ কাঁদ স্বরে।

Dhaka University Institutional Repository

আহারে প্রাণের ভাই মোরে নিল ধরি।
কাটিতে লইয়া যায় সওদাগরের বাড়ী ॥
দয়ার সাগর ভাই মোরে রাখ কারি।
নহেত চলিয়া যাই নিজ স্বর্গপুরি ॥
জনক জননীর দুস্ক[৬৫] ইশ্ব[৬৬] ভাবিয়।
সত্য তোর ভাই আমি বড় অভাগিয়া ॥
জননী বিহনে দোহে দাই লইল পালি।
তোমার সঙ্গে আইনু এবে নৌকায় দিবা বলি ॥
উদ্ধারিয়া রাখ ভাই ক্রেপারঠাকুর[৬৭] ।
একেবারে এতদিনে হইল নিঠুর ॥
পিতা দূরদেশে মাতা অভিলাস করি।
ইষ্ট নাহি মিত্র নাহি কহিব কাহারি ॥
তুমি বিনা বান্দব নাহি সংসার মাঝার।
বিদেশে আনিয়া কেন করিলা সংহার[৬৮] ॥
রাজপাট রাজ্য মোর কিছু কার্য্য নাই।
কি বুঝিয়া মার মোরে ওহে প্রাণের ভাই ॥
তোমা মুখ দেখি আমি মাগিয়া খাইব।
দিবা শেষে আসি তোমর চরণ সেবিব ॥
এই বাঞ্ছা করি আমি ভাইরে ঠাকুর।
সেবিব চরণ তোমার হইয়া কিঙ্কর[৬৯] ॥
শিশুর কান্দন আর সহিতে না পাই।
দারুণ সংসারের লোভে ভুলিয়াছে ভাই ॥
কান্দিতে লাগিল জত দ্বারিপালগণে।
শিশুর কান্দন শুনি দুঃখ ভাবি মনে ॥

দুস্ক[৬৫]=দুঃখ। ইশ্ব[৬৬]=ঈশ্বর বা স্রষ্টা। ক্রেপার ঠাকুর[৬৭]=দয়ার ঠাকুর।
সংহার[৬৮]=হত্যা। কিঙ্কর[৬৯]=(সংস্কৃত শব্দ) = চাকর, দাস।

Dhaka University Institutional Repository

এতেক শুনিয়া সাধু ক্রোধ হইয়া বলে।
টানিলেহ চোর বেটায় রসি দিয়া গলে ॥
আজ্ঞা পাইয়া সৈন্যগণে বান্দিল যতনে।
টানিয়া লইয়া গেল সাধুর ভুবনে ॥
জয় ২ ধ্বনি হইল সাধুর পুরিতে।
আবাল বৃদ্ধ যুবা আইল কুমারকে দেখিতে ॥
রূপ নিরক্ষিয়া সবে সাধুকে কহিলা।
হেন কাটিবারে শিশু কি জন্য আনিলা ॥
পাটেশ্বরী[৭০] সন্তাসিয়া[৭১] লইবে এহারে।
কান্দিয়া কহেন সবে দুঃখ লাগে মোরে ॥
কিবা ভাল হয় কিবা সাধুর নন্দন।
বুদ্ধিমান জনে কহে নয় মোর মন ॥
হরিষ বদনে তবে সাধু আজ্ঞা করে।
পুজার সামিগ্রী[৭২] শীঘ্র আনহ হুজুরে ॥
ধূপ দিপ[৭৩] নানা সাজে পূজা আরম্ভিল।
স্নান করাই শিশু পুজাস্থানে নিল ॥
সুগন্ধি চন্দন চূয়া অঙ্গেতে মাখিয়া।
মুণ্ড মাথা কাটিবারে লইয়া যায় বান্দিয়া ॥
কুমারে কহিল ওহে সাধু সওদাগার ।
এই নিবেদন করি সোনহ সওর ॥
আরাধনা করি কিছু ঈশ্বরের ঠাঁই।
তবেত কাটিবে শীর কিছু রক্ষা নাই ॥

পাটেশ্বরী[৭০]=স্বরসতী দেবী। সন্তাসিয়া[৭১]=ছিনিয়ে নেয়া।
পূজার সামিগ্রী[৭২]=পূজার উপকরণ।
দিপ[৭৩]=আলো, প্রদীপ, পিলসুজ।

Dhaka University Institutional Repository

আর না করিব আমি ঈশ্বর স্মরণ।
অল্প বয়সে আমি হইব নির্দ্দন ॥
পিতা মাতাহীন আমি বিদেশী দুঃখিত।
সংসারে নিরাস আমি ব্রথায়ে[৭৪] পিরিত ॥
মোর দুঃখ নিবারিতে আর লক্ষ্য নাই।
প্রভু স্থানে কহি কিছু আজ্ঞা দেহ ভাই ॥
তবেত কহিল সবে তিলেক[৭৫] রাখিয়া।
মনের মানস যাহা লউক পুরিয়া ॥
হেট সির উঁচা করে শিরে হস্ত দিয়া।
কান্দিতে লাগিল কুমার ঈশ্বর ভাবিয়া ॥
অধম হাফেজদ্দীন কহে না কান্দিও আর।
ক্ষেণেক[৭৬] বিলম্বে সুখ হইব কুমার ॥
হইল কুকলম বন্ধ কান্দন সুনিয়া।
হস্ত নাহি চলে মোর চরিত্র দেখিয়া ॥
নিবারিয়া প্রবোধিয়া[৭৭] নিজ বিবরণ।
শোনহ বসন্ত তথা করিল কেমন ॥

ব্রথায়ে[৭৪]=অকারণ, বিনা কারণ। তিলেক[৭৫]=কিছু সময়।
ক্ষেণেক[৭৬]= মূহর্তে, সময়,সময়। প্রবোধিয়া[৭৭]=শান্তনা দিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ পরিচ্ছদ

পিতার আজ্ঞা

ঃ ত্রিপদি ঃ

আজ্ঞা দিল পিতা বরে, কাটিতে দোহার তবে,
রাখিলা যে করি কত দয়া।
আসিলাম অরণ্য মাঝে, না খাইল পশুরাজে[৭৮],
তাহাতে প্রভু নিলা উদ্ধারিয়া ॥
ভাই উদ্দেশ্যে আইনু, পথে বহু দুঃখ পাইনু,
তাতে মোর রাখিলা জীবন।
যে আনিল সঙ্গে করি, সে হইল আমার বৈরী,
বড় দুঃখ রহিল মোর মনে ॥
পিতা নিদারুণ হইল, সেই মত ভাই কৈল,
এবে আর নাহিক ভরসা ॥
বিচার যে নহে করি, সাধুকে দিলেক ধরি,
তুমি প্রভু নৈরাশের[৭৯] আশা ॥
নির্দ্দয় যে সওদাগরে, কাটিবেক নৌকাপরে,
উদ্ধারিতে না দেখি উপায়।
আরহিল ডিঙ্গা জলে, প্রভু আসি মোরে বলে,
নহেত পরাণি মোর যায় ॥
ইষ্ট মিত্র বন্ধু গোণ, সব দেখি অকারণ,
তুমি প্রভু ত্রিভুবনের সাঁই[৮০]।
কিঞ্চিত নয়ান হেরি, যদি ক্রিপা কর বারি,
তবে আমি জিউ দান[৮১] পাই ॥

পশুরাজে[৭৮]=সিংহ। নৈরাশের[৭৯]=যার কোন আশা নাই।

ত্রিভুবনের সাঁই[৮০]=স্রষ্টা বা ঈশ্বর।

জিউ দান[৮১]=(সংস্কৃত জীব থেকে উদ্ভব) =জীবন, প্রাণ।

Dhaka University Institutional Repository

জগত দুর্ল্লভ তুমি, গুপ্ত ব্যক্তের স্বামী,
অল্প বয়েসে হইলা নিঠুর।
কিবা দিনু পরিবাদ[৮২], না পুরিল মন সাধ,
কোন দোষে হইল নিঠুর ॥
এই সে রহিল দুক্ষ, না দেখিলাম ভাইর মুখ,
এ জনমে না হইল দরশন।
অধীনে হাফেজদ্দীন বলে, দুঃখ[৮৩] আছে যার দেলে[৮৪],
তার সুখ না হয় কখন ॥

পরিবাদ[৮২]=অপবাদ। দুক্ষ[৮৩]=দুঃখ। দেলে[৮৪]=হৃদয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭ম পরিচ্ছদ

" নিজ দুঃখ বর্ণন"

ঃ পয়ার ঃ

এই মত কান্দে কুমার পূজার স্থানয়।
আষাঢ়ের মেঘ যেন নয়ান ঝরায় ॥
চতুর্দ্দিকে[৮৫] ধূয়াকার দিপ ধুপ অতি।
অন্ধকার হইল যেন প্রদীপের যুতি ॥
তাবু মধ্যে বসি কুমার ভাবে নিরন্তর।
নাহ কে পরিয়া ভাবে ছাড়িয়া সংসার ॥
গুপ্ত থাকিয়া তুমি ব্যক্তের পতি।
নিলক্ষের[৮৬] লক্ষ তুমি অনাথের গতি ॥
দয়ার পতি তুমি গুণের হানি সীমা।
ক্ষেণে ক্রোধ ক্ষেণে কৃপা তোমার মহিমা ॥
পূর্ব্বকালে রাজা এক পুষ্কুরিণী ছেদিল[৮৭]।
এক সপ্তা মধ্যে সেথা জল না উঠিল ॥
মনেতে ভাবিল রাজা কি হবে উপায়।
হেন কালে কৃপা হইলা তুমি গুণময় ॥
এক ব্রাহ্মণের পুত্র যথা গিয়া পাও।
আপন হস্তে কাটি আনি পুষ্কুনিতে[৮৮] দেও ॥
সেই রাজ্যে ছিল এক দাদ্র[৮৯] ব্রাহ্মণ।
ধন লোভে পুত্র দিল কাটিতে রাজন ॥
খরগ[৯০] উদ্দারি রাজা কাটিবে জখন।
পুষ্কুনিতে জল দিলা তুমি নিরাঞ্জন ॥

চতুর্দ্দিকে[৮৫]=চারিদিকে। নিলক্ষের[৮৬](সংস্কৃত শব্দ)=লক্ষ্য করা যায় না এমন।
ছেদিল[৯৬](আঞ্চলিক শব্দ)=খনন করা। পুষ্কুনি[৮৮](সংস্কৃত)=পুকুর বা দীঘি বা জলাশয়।
দাদ্র[৮৯](আঞ্চলিক শব্দ) দরিদ্র, গরীব। খরগ[৯০]=ভারি ধারালো অস্ত্র।

Dhaka University Institutional Repository

হেন কৃপা হউক সেই অধমেরে।
সাধু কাটিবে মোরে কিবা শক্তি ধরে ॥
প্রভু ভাবেতে পরনিন্দা আসি হইল।
নয়ান মুদিতে কুমার স্বপন পুরে গেল ॥
স্বপ্নেত দেখয় কুমার কাছে একজন।
মন দুঃখ পাও তুমি কিসের কারণ ॥
কুমার কহিল সব গোঁসাই[৯১] সুনহ খবর।
এই ক্ষণ বলিদান দিবে সওদাগর ॥
এই কথা বলিয়া কুমার কান্দিতে আছিল।
হেন কালে সেই জনে কহিতে লাগিল ॥
না কান্দ ২ তুমি রাজার কুমার।
সদয় হইবে প্রভু উপরে তোমার ॥
জিজ্ঞাসা করিয়া লও সাধু সওদাগরে ।
জলেতে নামিলে নৌকা ছাড়িবা আমারে ॥
নিদ্রা হইতে রাজকুমার চেতন পাইয়া।
কহিতে লাগিল কথা কাতর হইয়া ॥
সোন বলি সওদাগর আমার বচন।
তোমার হুজুরে আমি করি নিবেদন ॥
প্রভুর কৃপায় যদি নৌকা যায় জলে।
ছাড়িবা আমারে কিনা কামনান্তরে ॥
এই কথা শুনিয়া সাধু কহিলা তখন।
নৌকা নামাইলে তোমা নাহি প্রয়োজন ॥
এই বাক্য শুনিয়া কুমার করে আরাধন[৯২]।
দয়া কর অধমেরে প্রভু নিরঞ্জন ॥

গোঁসাই[৯১] (সংস্কৃত শব্দ)=প্রভু , জগদীশ্বর।
আরাধন[৯২]=প্রার্থনা।

Dhaka University Institutional Repository

এতেক বলিয়া কুমার কোমর বান্ধিল।
দোমে[৯৩] ২ প্রভুর নাম লইতে লাগিল ॥
যখন ধরিল নৌকা রাজার কুমার।
দোমে ২ আল্লার নাম লইল শতবার ॥
হেনকালে দৈত্ত[৯৪] আসি কুমারের অঙ্গে।
থরে ২ কাপে নৌকা সবে দেখে রঙ্গ[৯৫] ॥
ক্রোধিত[৯৬] হইয়া কুমার নৌকা যে ঠেলিল।
বিজলী চমকে[৯৭] নৌকা নদী এ ভাসিল ॥

দোমে[৯৩] (ফারসী শব্দ) =শ্বাসে। দৈত্ত[৯৪]=শক্তি শালী অতি মানব। রঙ্গ[৯৫]=তামাশা। ক্রোধিত[৯৬]=রাগান্বিত। বিজলী চমকে[৯৭]= অতি দ্রুত।

Dhaka University Institutional Repository

৮ম পরিচ্ছেদ

অলৌকিক ক্ষমতা

জয় ২ আল্লাহ ২ বলে সাতবার

ঃ পয়ার ঃ

হেন কালে অসুর[৯৮] আসি কুমারের অঙ্গে।
থরে ২ কাঁপে নৌকা সবে দেখে রঙ্গ ॥
ক্রোধেতে জ্বলিয়া কুমার নৌকায় উঠিল ।
বিজলী চটকে[৯৯] নৌকা জলেতে নামিল ॥
জয় ২ হুলাহুলি[১০০] দিল নারীগণ।
আনন্দিত হইল বড় সাধুর নন্দন ॥
বন্দি করি জেহেল ভরি রাখ এই চোর।
এহা[১০১] হইতে বহু কার্য্য হইবেক মোর ॥
সহরে লইয়া যাব না দিব ছাড়িয়া।
জলেতে ঠেকিলে নৌকা দিবে নামাইয়া ॥
জেহেল ভরিয়া তবে কুমারে রাখিল।
সাজন করিতে ডিঙ্গা সাধু আজ্ঞা দিল ॥
দুঃখিত হইয়া কুমার কহিতে লাগিল।
না বুঝি কারণ কিছু কি গতি হইল ॥
ডিঙ্গা নামাইলে জলে হইব খালাস[১০২]।
এইতো মনেতে মোর ছিল বড় আস ॥
কোনমতে হইত মোর ভাই দরসন।
অবশ্য চিনিত তিনি পূর্ব্বের স্মরণ ॥
সে সকল আশা মোর নিল হরিয়া[১০৩]।
ভুবনেতে আমা হেন নাই অভাগিয়া ॥

অসুর=[৯৮]বেদের প্রাচীনতম অংশে অসুর অর্থে দেবতা তুলনা পারসিক আবেস্তার আহুর দেবতা হিসেবে ইন্দ্র, অগ্ন এবং বরুণকে অসুর বলা হত। পরে এর অর্থ সম্পূর্নরূপে পরিবর্তিত হয়। যারা দেবতার সাতে বিরোধ করে এবং সমুদ্র মন্থনে উথিত সুধা পায়নি তাদেরই অসুর বলে। বিজলী চটকে[৯৯]= অতি দ্রুত। হুলাহুলি[১০০]=জোবার ধ্বনি। এহা[১০১]=এর। খালাস[১০২]=মুক্ত। হরিয়া[১০৩]=হরণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

দিবা নিশি বসি সদা কান্দেন কুমার।
আহা প্রভু তুমি বিনা লক্ষ্য নাহি আর ॥
হেনকালে সাধুর ঠাঁই কহিল খবর।
সাজন হইয়াছে ডিঙ্গা চলহ সত্তর ॥
কুমার লইয়া তবে সাধুর নন্দন।
আরোহণ হইয়া যায় দক্ষিণ পাটন[১০৪] ॥
হিমান্তের[১০৫] পবনেতে ডিঙ্গা ছারি দিল।
ত্রিতিয়া[১০৬] বৎসরে ডিঙ্গা সেকুল[১০৭] পাইল ॥
জঙ্গি সহরের রাজা কিশ্বর নরপতি।
সেইত রাজ্যেতে গিয়া নৌকা কৈল স্থিতি ॥
বিকি কিনি[১০৮] করিতে লাগিল বহুধন।
এক দিন রাজদ্বারে করিলা গমন ॥
অমরার হেন পুরি দেখে সেই ঠাঁই।
জকুম সহর বিচে হেন মোর নাই ॥
নানাস্থানে সিতাল পুষ্কুরিণী বহে পানি।
চারিপার বান্ধিয়াছে কাঞ্চন হিরামনি ॥
স্থির সব লাখে ২ সুবর্ণের কলশি।
সর্গপুর হইতে যেন আইল ইন্দ্রশশি ॥
দাস দাসি দেখিলেন্ত ইন্দ্রের ইন্দ্রানি।
এ রাজ্যের রাজার জানি কেমন রমণি ॥
নানা স্থানে সেজন[১০৯] দেখায় ভাতি[১১০] ২।
লম্প দিয়া অরুণ পরসে আসি ক্ষণি ॥
সুগন্ধি পুষ্পের গন্ধ যেন সর্গ শশি।
ভ্রেমরা গুঞ্জন তার চতুর্দ্দিকে বসি ॥

দক্ষিণ পাটন[১০৪]=প্রসিদ্ধ বানিজ্য নগরী। হিমান্তে[১০৫]=মৌসুমী বায়ু।
ত্রিতিয়া[১০৬]=তিন।সেকুল[১০৭]=অভিষ্ট স্থান। বিকি কিনি[১০৮]=বেচাকেনা।
সেজন[১০৯]=সাজন। ভাতি[১১০]=দিপ্তি।

Dhaka University Institutional Repository

নানা স্থানে দেখি তার সাধুর নন্দন।
রাজদ্বারে চলি গেলা কতুহল মন ॥
নৃপতির পাটাম্বর হিমগিরি[১১১] যিনি।
কাঞ্চন নির্ম্মান করি ঘাটিয়াছে পুনি ॥
নিশি অন্ধকার কালে দিবা হেন জ্বলে।
তিমির[১১২] বঞ্চিত তথা কে এক ছলে ॥
দেখিয়া আর্শ্চয্য করি সাধু সওদাগর।
বহু হাবিলাস হইল হরিষ[১১৩] অন্তর ॥
সাধুকে দেখিয়া তবে দ্বারিয়ে পুঁছিলা।
কোথায় থাকিয়া তুমি হেথায় আসিলা ॥
সাধু বলিল আসি জকুম রাজ্য হইতে।
বানিজ্য করিতে জান আসিছি এথাতে ॥
হুর পরি দেখি মোর তুষ্ট হইল মন।
এখানে দেখিব তোমার নৃপতির চরণ ॥
সম্ভাসিয়া[১১৪] লেহ মোরে নৃপতির ঠাঁই।
সম্মুখেতে নিয়া মোরে বিদায় কর ভাই ॥
পিরিতের বচন সুনি দ্বারি পালগণ।
নৃপতির আগে গিয়া কহিল তখন ॥
এক সাধু আসিয়াছে জকুম রাজ্য বাস।
দর্শন করিতে তোমা বড় হাবিলাস ॥

হিমগিরি[১১১]=হিমালয় পর্বত। তিমির[১১২]=অন্ধকার।
হরিষ[১১৩]=আনন্দিত। সম্ভাসিয়া[১১৪]=সম্ভোধন।

Dhaka University Institutional Repository

নৃপতির আজ্ঞা পাইয়া পাত্র মিত্রগণ।
মানিক্য আনিয়া দিল সাধু বিদ্যমান ॥
মানিক্যেতে সওদাগর বহুতঙ্কা[১২১] দিল।
নৃপতি প্রণাম করি নৌকায় চলিল ॥
শুভক্ষণে আসিলাম বানিজ্য করিতে।
বহুমূল্য নিরাঞ্জন ধন দিল তাতে ॥
এক মানিক্য দিব নিয়া নৃপতির ঠাঁই।
সাত মানিকের ধন পাব দেশে যাই॥
এই মত মনে ভাবে সাধুর নন্দন।
নৌকাতে চড়িল গিয়া হরষিত মন ॥
এমনি যে য়াদি[১২২] স্বর্ন সকলে দেখিয়া।
ভাল ২ কহি সবে বসিল আসিয়া ॥
দূরে থাকি দেখিলেন্ত রাজার কুমারে।
ইঙ্গিতের ছলে[১২৩] হাসি উপহাস্য[১২৪] করে ॥
ভাল মানিক্য আনিয়াছ সাধু সওদাগর।
মানিক্য লইয়া দেশে চলহ সত্তর ॥
কেরিয়া রাজায়[১২৫] সুনি সন্য পাঠাইয়া।
মানিক্য লইবে সাধু তোমাকে মরিয়া ॥
বহু ধন ভাণ্ডি সাধু আনিছ সত্তর।
তৈরিত গমন কর আপনার ঘর ॥
উপহাস্য শুনি বহু সাধুর নন্দন।
কি কহে বন্ধি আন বেটা না বুঝি কারণ ॥
ধরি আন সৈন্যগণ বান্ধিয়ান বেটারে।
মানিক্য চিনিয়া আসি দেউক আমারে ॥

বহুতঙ্কা[১২১](ফরাসী তনখান থেকে উদ্ভব) অনেক টাকা। য়াদি[১২২]=পুরাতন, প্রাচীন। ইঙ্গিতের ছলে[১২৩]=ইশারায়। উপহাস্য[১২৪]=তামাশা। কেরিয়া রাজা[১২৫]=আরাকানের দস্যু রাজা। লুঠ-তরাজ ছিল তাদের একমাত্র আয়ের উৎস। উপকূলবর্তী অঞ্চলে আরাকানের রাজাকে কেরিয়া রাজা বলে অভিহিত করা হত।

Dhaka University Institutional Repository

নহেত কাটিয়া জান করিব নির্দ্দন।
উপহাস্য করে বেটা কিসের কারণ ॥
তবেত আনিল কুমার সাধুর সাক্ষাতে।
অন্ধ মানিক্য দেখি লাগিল কহিতে ॥
শোন সওদাগর আমি বলি যে তোমারে।
মিছা ক্রোধ কেন করহ আমারে ॥
তিন মানিক্য আনিয়াছ অন্ধ যে দেখিয়া।
তিন মানিক্য দেখ আমি দিলাম বাছিয়া ॥
ভাল মানিক্য হইলেত বহু ধন হয়।
অন্ধ হইলে কোন কার্য্য না আসায়ে ॥
সাধুয়ে কহিল যদি অন্ধ নাহি হয়।
সমুদ্রে ফেলিব তোমায় জানিবা নির্শ্চয় ॥
হাসিয়া কহিল কুমার মারিবে ঈশ্বর।
তুমি মারিতে পার কি শক্তি তোমার ॥
লইয়া যাহ আগে তুমি রাজার হুজুরে।
তথা হইতে আসি তুমি মারিও আমারে ॥
মানিক্য লইয়া তবে সাধুর নন্দন।
নৃপতির আগে গিয়া দিল দরশন ॥
জিজ্ঞাসা করিল যত দ্বারিপালগণ।
ফিরিয়া আসিলা তুমি কিসের কারণ ॥
সাধু বলে কহ ভাই নৃপতির আগে।
দেখা করি দেশে আমি যাব দিন ভাগে[১২৬] ॥
সোম্বা দিয়া সওদাগর লিলেক[১২৭] সাক্ষাতে।
নির্ভয় হইয়া সাধু লাগিল কহিতে॥

দিনভাগে[১২৬]=বেলা থাকা অবস্থায় বা সূর্যের আলো থাকতে।
লিলেক[১২৭]= দিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শুন মহারাজা তুমি ধর্মশীল অতি।
ইন্দ্র সভাতুল্য তোমা দেখিয়া মুরতি ॥
পুরন্দর রাজা তুমি মহিমা তোমার ।
তুমি হেন রাজা নাই জগত সংসার ॥
নানা রাজ্য ফিরি আমি শুনহ রাজন।
তোমা হেন রাজা নাহি দেখি কদাচন[১২৮] ॥
নগর দেখিলাম আমি যেন স্বর্গপুরি।
নানা স্থানে নৃত্ত করে জেন বিদ্যাধরি॥
নানা স্থানে পুষ্করিনী শীতল বহে বাও[১২৯]।
চর্তুপার্শ্বে ফুলবৃক্ষ ভেমর সুন্দর রাও[১৩০] ॥
বৃন্দাবনে পুষ্পগন্ধ ভেমরা গুঞ্জন।
শ্রবণে শুনিলাম আমি মধুর বচন ॥
সুলক্ষণ তাতে দেখি সাফল্য মানিল।
মোর কর্ম্ম দোষে কেন হেন দশা হইল ॥
সাত মানিক্য মহারাজা প্রসাদ আজ্ঞা হইল।
তিন মানিক্য রাজা তাথে অন্ধ কেনে দিল ॥
এত বলি মানিক্য রাজার সাক্ষাতে রাখিল।
মহারাজা সাধু প্রতি কহিতে লাগিল ॥
তোরে আমি মানিক্য প্রসাদ[১৩১] দিনু।
পূণ্য পাইব বলি মনেতে বুঝিনু ॥
তাথে একি পরিবাদ সভা বিদ্যমানে।
এত বলি মহারাজা আজ্ঞা যে করিল।
জল্লাদ[১৩২] ডাকিয়া রাজা কহিতে লাগিল ॥

কদাচন[১২৮](সংস্কৃত শব্দ)= কখনও। বাও[১২৯]= বাতাস। রাও[১৩০]= সাড়া, রব।
প্রসাদ[১৩১](সংস্কৃত প্র+সিদ+অ) =দেবতাদের সামনে পূজার অর্ঘ্য।
জল্লাদ[১৩২]= রাজার আদেশে যিনি মানুষ হত্যা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

জিবন সংহার কর সওদাগরে নিয়া।
মানিক্য চিনিল বেটা কেমন করিয়া ॥
এহা শুনি সওদাগর ধারণা[১৩৩] করিয়া।
কর জোরে রাজা স্থানে কহে বিনাইয়া ॥
মহারাজা রাজ্যশ্বর প্রাণ রক্ষা পাই।
অন্ধ মানিক্য কভু আমি কহি নাই ॥
বন্দিয়ান আছে এক নৌকার উপর।
সেইত করিল মোর এতেক খাকার[১৩৪] ॥
তাহাকে হুজুরে আনি দোহাই রাজার।
মহারাজা চরন্নেতে কহি বারবার ॥
এতেক শুনিয়া চিন্তিত হইল রাজন।
বন্দিয়ান হইয়া মানিক্য চিনিল কেমনে ॥
আর ইতি পূবের্ব রাজার প্রতিজ্ঞা এমতি।
লাল মানিক্য যেই চেনে মোর কন্যার পতি ॥
নানা দেশে দূতগণ চাহিল বিচারি[১৩৫]।
কোন রাজ্যে না পাইয়া আসিলেক ফিরি ॥
মানিক্য লইয়া সাধু গেলেন জখনে।
চিনিলে অবশ্য সাধু কহিত তখনে ॥
মহা ২ রাজা আছে উজানী নগরে।
তার কোন জন জানি নৌকার উপরে ॥
এমত শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিল।
সত্য ২ কহ মানিক্য মন্দ কে কহিল ॥
শুনিয়া সাধু তবে কম্পিত হইল।
রোদন করিয়া সাধু কহিতে লাগিল ॥

ধারণা[১৩৩] =বি,বোধ বা প্রতীতি। খাকার[১৩৪](হিন্দী শব্দ)=কলঙ্ক,দূর্নাম,নিন্দা।
বিচারি[১৩৫]=খোঁজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

শোন নরপতি আমি করি নিবেদন।
নৌকা নামাইনু এক বহুশ্ব[১৩৬] যতন ॥
বিধি বিরম্বনা নৌকা জলে না নামায়ু।
চিন্তিত হইয়া মুই শুইলাম শয্যায়॥
আচম্বিতে[১৩৭] ইস্টদেব[১৩৮] আসিল নিকটে।
কাহিলেক নৌকায় বলিদান দেহ ঝটে ॥
স্বপন দেখিয়া মোর বর্জ্রাঘাত[১৩৯] প্রায়।
নিবেদিলাম ইহা সব আপনি রাজায় ॥
আমার বৃত্তান্ত রাজা শুনিয়া শ্রবণে।
তরিত কহিল রাজা দ্বারি পালগণে ॥
বন্দআন[১৪০] একজন দেহ সাধু স্থানে।
নৌকার নিকটে গিয়া দিবে বলিদানে ॥
শুনিয়া কোতয়াল দ্বারি চলিল তরিতে।
বন্ধিয়ান একজন দিল মোর সাক্ষাতে ॥
প্রণামিয়া রাজা স্থানে জানিলাম ভুবন।
বলিদান দিব এই মনে অনুমান ॥
তাহাতে বন্দিয়ান বেটা নৌকার কাছে গিয়া।
একা এক সেই নৌকা দিল নামাইয়া ॥
সেই বন্দিয়ান মোর সংহতি[১৪১] আছয়।
অন্ধ মানিক্য বলি কহিল আমায় ॥
এহা রাজা ধর্ম্মশীল তুমি ধর্ম্মরায়[১৪২]।
অপরাধ নাহি আমার কাটহ তাহায় ॥
এতেক শুনিয়া রাজা কহে সাধু তরে।
সেই বন্দিয়ান আন আমার হুজুরে ॥

বহুশ্ব[১৩৬](সংস্কৃত শব্দ)=অনেক,প্রচুর। আচম্বিতে[১৩৭]=হঠাৎ।
ইস্টদেব[১৩৮]=কল্যাণের দেবতা বা ইন্দ্র।বর্জ্রাঘাত[১৩৯]=আকস্মিক বিপদ।
বন্দআন[১৪০]=কারারুদ্ধ ব্যক্তি। সংহতি[১৪১]=(সংস্কৃত শব্দ)=অবলম্বন বা সঙ্গি।
ধর্ম্মরায়[১৪২]=ন্যায় বিচারক।

Dhaka University Institutional Repository

সাধু বলে জেহেল ভরি রাখিনু জতনে।
পদন্তে[১৪৩] কেমনেতে আনিব তোমাস্থানে ॥
তবেত কহিল সাধু সুপালা লইয়া।
বন্দিয়ান আন তুমি সংহতি করিয়া ॥
সুপালা[১৪৪] লইয়া তবে সাধুর সংহতি।
নৌকা ঘাটে চলি যায় সাধুর সংহতি॥
সুপালা দেখিয়া কুমার সাধুর সংহতি।
উপায় হইবে কিবা আমি পাপী প্রতি ॥
সত্য কিবা মরতের সুপালা আইসয়।
বন্দিয়ান কহি মোরে বধায়ে নির্শ্চয় ॥
মানিক্য না হয় অন্ধ কহে রাজন।
না জানি কি মতে মোর বধায়ে জিবন ॥
আশা মোর না পুরিল ভাইসহ দেখা।
বিদেশে মরিব কিবা এই ছিল লেখা ॥
আপনার দোষে মুই মরিলাম আপনি।
কিবা দোষ দিব আমি প্রভু গুণমণি ॥
অন্ধমনিক্য কহি মোর কিবা ছিল কাজ।
বারে ২ বিরম্বনা তবু নাহি লাজ ॥
আহা প্রভু নিরাঞ্জন মিছা দুঃখ পাই।
যে কিছু তোমার লেখা কার না এরাই ॥
মনে২ বিমর্শিয়া[১৪৫] মোর চিন্তিত হইল।
নিকটে থাকিয়া সাধু কহিতে লাগিল ॥
আর বন্দিয়ান বেটা তোমার কারণ।
রাজায় চাহিল মোর মারিতে জীবন ॥

পদন্তে[১৪৩]=পায়ে হেঁটে। সুপালা[১৪৪]=এক প্রকার যানবাহন বা পাল্কি বিশেষ।
বিমর্শিয়া[১৪৫](সংস্কৃত বি+মৃশ+অবা অন)=দুঃখিত।

Dhaka University Institutional Repository

কিমতে চিনিল মানিক্য চল নৃপ আগে।
সাক্ষাতে আসিয়া চিনি দেহ ভাগে ২ ॥
অন্ধ করি কহ তোর মারিব জীবন।
তোর লাগি চোর দৈবের[১৪৬] মোর গেল ধন ॥
কুমার কহিল সাধু শুন দিয়া মন।
মিছা দুঃখ ভাব তুমি কিশের কারণ ॥
সত্য প্রাণ বধে মোর নৃপতি রাজন।
তবে কেন বধি তোমা নিবে সব ধন ॥
কহিয়া নৃপতি আগে নিব ছাড়াইয়া।
ধন লইয়া দেশে তুমি জাইও চলিয়া ॥
এত মানিক্য অন্ধ আমি কাইনু নির্শ্চয়।
আমারে কাটিবে রাজা তোর কিবা ভয় ॥
সুপালায় তুলিয়া তবে নিয়া যায় কুমার।
সাধুর সংহতি কুমার চলে দরবরি[১৪৭] ॥
আর কিছু কহি এবে শুন গুণিজন।
অপরাধ ক্ষেমি[১৪৮] মোর লইবে বচন ॥
নেওয়াজ মন্দ হাফেজদ্দীন কহে খাকছার[১৪৯]।
বসন্তের দুঃখ সম বিন্দ্রিতে[১৫০] আমার ॥
নিশি দিশি[১৫১] স্বরসতি বুঝিয়া আকুল।
এক্সসুনে[১৫২] নিন্দ্রা জালে হইয়া ব্যাকুল ॥

দৈবের[১৪৬]=দেবতার। দরবরি[১৪৭]=দ্রুত চলা। ক্ষেমি[১৪৮]=ক্ষমা করা।
খাকছার[১৪৯](ফারসী শব্দ)= তুচ্ছ সেবক।
বিন্দ্রিতে[১৫০]=বিদ্ধ হওয়া। নিশি দিশি[১৫১]=দিবারাত্রি।
এক্সসুনে[১৫২](আরবী শব্দ ইশক শব্দ থেকে এসেছে)=অনুরাগ বা আসক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

৯বম পরিচ্ছেদ

কন্যার সংলাপ

ঃ পয়ার ঃ

এবে কহি কুমার তথা বিবাহ করিবে।
কিন্তু সেই হইতে প্রাণ সংশয় হইবে ॥
সেই তো রাজ্যের কন্যা কাঞ্চনমালা নাম।
অতি রূপবতী কন্যা গুণে অনুপম ॥
দিবা নিশি করয় কন্যা করয় ভকতি।
লালমানিক্য যে চেনে সেই মোর পতি ॥
ঈশ্বর ভাবিয়া কন্যা করয় তপস্বী।
কত দিনে বিধি মোর করিবেক খুশী ॥
বিরহ অনলে মরি না সহে শরীরে।
যৌবন পুরিল পতি দেও শীর্ঘ্র করে ॥
যেই দিন রাজকুমার রাজদ্বারে গেল ॥
সেই দিন কামবাণে কন্যাকে হানিল।
মনেতে কল্পনা করি যক্ষ্যার[১৫৩] উপরে ॥
শয়ন করিল নিশি দুঃখিত অন্তরে।
নয়ন মুদিতে কন্যা স্বপ্নপুরে গেল।
দেখিলেক রাজদ্বারে সুপতি[১৫৪] আইল ॥
ঈশ্বর চিনাইল কন্যা এই তোমা পতি।
খণ্ডাও মনের দুঃখ পতি লইয়া মতি ॥
ভীম রাজ্যের রাজা জান প্রতাপভীম[১৫৫] নাম।
তার পুত্র বসন্ত যে অতি গুণমান ॥

যক্ষ্য[১৫৩]=ধন পতি বা যারা মাটির নিচে সম্পদ পাহাড়া দেয়।

সুপতি[১৫৪]=যথার্থ স্বামী।

প্রতাপভীম[১৫৫]=ভীম রাজ্যের রাজা প্রতাপভীম এবং শীত ও বসন্তের পিতা।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম বৎসরের পথ রাজার সেই পুরি।
তোমার বিবাহ হেতু আনিয়াছে হরি ॥
মানিক চিনিবে কুমার গুণে মহামতি।
নির্শ্চয় জানিবা কন্যা এই তোমার পতি ॥
স্বপন দেখিয়া কন্যা জাগিয়া উঠিল।
আপনার মনে ২ ভাবিতে লাগিল ॥
কিবা স্বপন দেখিলাম ভাবিতে লাগিল।
না জানি বিধাতা কিবা কপালে লিখিল ॥
নিকটৈ পাইব পতি হেন ছিল আশা।
সেই আশা বিধি মোর করিল নিরাশা ॥
স্বপনের কথা কিছু মোর প্রত্যেক নাই।
দেখাইয়া বঞ্চিত মোরে করিলেক সাঁই[১৫৬] ॥
পুরাণে কহিছে কিবা স্বপনের কাহিনী ।
ভাল কিবা মন্দ হয় আমি অভাগিণী ॥
কান্দিতে লাগিল কন্যা স্বজল নয়ন।
হেন কালে নিশি নিয়া হইল বেহান[১৫৭] ॥
অন্তঃপুরে বসি কন্যা অভিমান করি।
বিরহ অনলে ভাবি রহিলেক মরি ॥
বাহির দ্বারেতে পতি কল্প নাহি জানি।
তে কারণে অন্তঃপুরী কান্দে কন্যা পুনি ॥
প্রভাত কালেতে রাজা সভার মধ্যে বসি।
নক্ষত্রের মধ্যে যেন উদয় হইল শশী ॥
হেনকালে মহারাজ কুমারে ডাকিল।
মাধুর বচনে কথা জিজ্ঞাসা করিল ॥

সাঁই[১৫৬]=প্রভু। বেহান[১৫৭]=প্রভাত।

Dhaka University Institutional Repository

কোন মানিক অন্ধ হয় দেও যে বাছিয়া।
নতুবা তোমারে আজি ফেলিব কাটিয় ॥
এই কথা শুনিয়া সাহা হরিষ অন্তরে।
অন্ধ মানিক বাছি দিল রাজার হুজুরে ॥
মহারাজা দেখি সব আশ্চর্য্য হইল।
সামান্য বলিয়া বিশ্বাস মৰে না করিল ॥
কন্যা বিবাহ দিব আমি তাহার তরেতে।
বিধির লিখন তাহা কে পারে খণ্ডাইতে[১৫৮] ॥
অন্দরে[১৫৯] খবর দিল রাণীর বাখানে।
বিধি বর মিলাইয়া দিল এতদিনে ॥
অন্দরেন্তে নিয়া বে খোসাল[১৬০] হইল।
বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিল ॥
শুনিয়া কুমার তবে খোসালিত অন্তরে।
আশা মোর পূর্ন হইল এত দিন পরে ॥
শুভক্ষণে শুভলগ্নে কহে দৈবগণ।
কন্যা সাজ দিবা মৰে ওগো রামাগণ[১৬১] ॥
মহারাজা পাত্র ডাকি কহিব তমিন[১৬২]।
নিমন্ত্রের পত্র সব করহ লিখন ॥
এই কথা শুনিয়া পাত্র লিখিয়া লিখন।
ইষ্টমিত্র যে যেখানে দিল যে তখন ॥
এই রূপ সাত দিন অবসান হইল।
অধিবাস[১৬৩] দিন তথা আসিয়া পৌঁছিল ॥
রাজার লিখন পাই সকল রাজায়।
তৈয়ার হইল সবে আসিতে তথায় ॥

খণ্ডাইতে[১৫৮]=দূর হওয়া। অন্দরে[১৫৯]=ঘরের ভিতরে।
খোসাল[১৬০](ফারসী শব্দ)=আনন্দিত। রামাগণ[১৬১]=নারীগণ।
তমিন[১৬২] (আরবী শব্দ তামিল থেকে উদ্ভব)=সম্পাদন বা পালন।
অধিবাস[১৬৩](সংস্কৃত শব্দ)=বিয়ে আগে শুভ কর্মাদির পালনীয় সংস্কার।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে বিবাহের করে আয়োজন।
ছিটিল শহরে সব কস্তরী চন্দন ॥
নানারূপ সহ্যা করে বিচিত্র কোমল।
অতি মনোহর পুরি করিল নির্ম্মাণ ॥
হেম রত্ন জহোর মুকতা চামর।
শত ২ লটকাইল[১৬৪] শুন্যের উপর ॥
এইরূপ পুরি মধ্যে আছে সব রঙ্গে।
নাচে সাজে কোলাকুলি করে কত রঙ্গে ॥
যেই মত বিবাহের ছিল ব্যবহার।
শুকুর[১৬৫] করিল শুনি শাস্ত্রের প্রকার ॥
শুভক্ষনে শুভলগ্নে যত রসবতী।
সাজাইতে বরকন্যা জ্বালাইল বাতি ॥
সাজাইতে সাহজাদা আইল পাত্রগণ।
পরাহ্ কটিতে[১৬৬] পরাইল কাপড় চির্ক্কন[১৬৭] ॥
সোনালী সাজন সাজ যত ইতিয়াছে[১৬৮]।
তাহা দিয়া সাহজাদার সাজ করিয়াছে ॥
মনহর বিছানায়েতে বর বসাইল।
সুগন্ধিত তাম্মুল[১৬৯] ফের কত আনি দিল ॥
খাবার ছামান[১৭০] আনি দিল তথক্ষণে।
সাজন করিয়া বিবাহ্ দিল শাস্ত্রের মতন ॥
কাজি মোল্লা আনিয়া যে নিকা পরাইল।
কন্যা শীর্ঘ্র রাজ কুমারকে হুকুম করিল ॥
শীর্ঘ্র ছামান আনি সবে কন্যা সাজাইয়া।
হুলুয়া [১৭১] দেহ্ নাকো দোহে খাটেতে তুলিয়া ॥

লটকাইল[১৬৪]=টানানো। শুকুর[১৬৫]=প্রসংশা। কটিতে[১৬৬]=কোমরে।
চির্ক্কন[১৬৭]=পাতলা বা ফিনফিনে। ইতিয়াছে[১৬৮]=ইত্যাদি বা যত প্রকার।
তাম্বুল[১৬৯]=পান। ছামান[১৭০]=সকল দ্রব্যাদি। হুলুয়া[১৭১]=উলুধনি,জোবার।

Dhaka University Institutional Repository

হুকুম পাইয়া কন্যা সাজাইতে লাগিল।
কিরূপে সাজাইবে কন্যা তা ভাবিল ॥
সখিগণ মিলি সবে কন্যাকে সাজায়।
চন্দ্র সূর্য জিনি রূপা অতি শোভা পায় ॥
পহেলা হরিদ্রা[১৭২] তৈল অনেক অনুপম মাখাইল।
গোলাপের পানি দিয়া গোছল করাইল ॥
হীরা পান্না পরাইল রত্ন অলংকার।
কুটি ২ শষি গায়ে জ্বলে তার ॥
যত অলংকার পরে কত নিব নাম।
লিখিলে পুস্তক বারে না হয় তামাম[১৭৩] ॥
এই রূপে সাজাইয়া কুমারীর তরে।
মাররোয়ার[১৭৪] নীচে রাখিলেক বরে ॥
কুমার কুমারী দোহে বসিলে যখনে।
মলিন হইল গেল শশিরাকারে ॥
দেখিয়া সাহার রূপ সবে ব্রজমন[১৭৫]।
সবে ইচ্ছা করে তান করিতে যৈবন ॥
রূপে ঝলমল সখী দেখিয়া কুমার ।
খসিয়া পরিয়া গেল পরণের কাপড় ॥
কি লিখিব আমি সে সব বৃত্তান্ত।
লিখিলে পুস্তক না হয়ে সমাপ্ত ॥

হরিদ্রা[১৭২](সংস্কৃত শব্দ)=হলুদ। তামাম[১৭৩](আরবী শব্দ)=শেষ,সমাপ্তি।
মাররোয়ার[১৭৪]=সাঁজঘর, ব্রজমন[১৭৫]=শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজদুলাল।

Dhaka University Institutional Repository

১০ম পরিচ্ছেদ

মাতার জামাতা দর্শন

কন্যার মাতা জামাতা দেখিতে যায় তাহার বয়ান

ঃ পয়ার ঃ

নানা ছন্দে মহাদেবী জামাতা বরায়[১৭৬]।
সুর ছাড়িয়া সখীগণ মঙ্গল গায়[১৭৭] ॥
জয় ২ জোবার[১৭৮] ধ্বনি হুলাহুলি করি।
আসিল জামাতা বরি আপনার পুরি ॥
কুমারের সঙ্গে কন্যা রহিল তথায়।
কুমারের মনে এহা কিছু নাহি বায় ॥
শয়নেতে নিদ্রা নাহি সদা হাহাঙ্কার[১৭৯]।
ভাই ২ বলি তার গতি নাহি আর ॥
শীতল সয্যায়[১৮০] করি সুগন্ধি বয়।
তাহাতে কুমার যেন অনল ফোটায় ॥
কন্যার রূপ দেখিয়া যে মনির মন যায়।
হেন রূপ কুমারের মনে নাহি লয় ॥
অঙ্গেতে লাগিলে অঙ্গ অগ্নি হেন জ্বলে।
চমকিয়া যায় কুমার সয্যার এক ধারে ॥

বরায়[১৭৬]=বরণ করে। মঙ্গল গায়[১৭৭]=কল্যানার্থে যে গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয়। জোবার[১৭৮]=উলুধ্বনি। হাহাঙ্কার[১৭৯]=আক্ষেপ ধ্বনি। সয্যায়[১৮০]= বিছানা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গক্রমে পর পর দুজন লিপিকরের নাম দিয়েছেন। কবির আরও একটি পাণ্ডুলিপি "জয়-বিনয়" নামে পাওয়া যায়।

আবদুল আপিছ নাম মোর শোন মন দিয়া।
বিদ্যা বুদ্ধি নাহি মোর আমি অভাগিয়া ॥
কলাগাছিয়া গ্রাম[১৮১] পিছে বেসতি[১৮২] আমার।
পিতার নাম এছমাইল সিকদার বেরাদর[১৮৩] ॥
আল্লা নবীর নাম আমি মুখেতে লইয়া ।
জয়-বিনয়ের পুঁথি করিনু শুরু বেছমিল্লা বলিয়া ॥
আমি অতি বিদ্যাহীন শুনেন যুবাগণ।
কবিতা লিখিতে আমি না পারি কখন ॥
শ্রী জবেদ আলি মৃধা সাং ঝাটিবুনিয়া[১৮৪] ।
উপরেতে যার নাম লেখা আছে ভাই।
বড় দুষ্ট লোক সেই জানিবে সবাই ॥
তার পিতা আরসাদ আলি মৃধা ছিল।
সে বড় দুষ্ট হার্ম্মাদ[১৮৫] দুনিয়াতে ছিল ॥

জয় বিনয়=এই নামে আরো একটা পুথির উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনো পুথিটি উদ্ধার হয়নি।

শ্রী জবেদ আলি মৃধা ছিলেন একজন লিপিকর। কিন্তু বৃটিশ শাসনামলে মুসলমানদের নামের পূর্বে মোহাম্মদ না লিখে-শ্রী লেখা হত। তাই লিপিকর জবেদআলী মৃধার নামের পূর্বে শ্রী যোগ করা হয়েছে।

কলাগাছিয়া গ্রাম[১৮১]=মির্জাগঞ্জ থানার ২নং ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম।
বেসতি[১৮২]=বসতি।বেরাদর[১৮৩]=ভাই।
ঝাঁটিবুনিয়া[১৮৪]=মুর্জিাগঞ্জ থানাধীন ৩নং আমড়া গাছিয়া ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম।
হার্ম্মাদ[১৮৫]=পর্তুগীজ জলদস্যু।

Dhaka University Institutional Repository

১১তম পরিচ্ছেদ

বিরস দেখিয়া কন্যা হইল ফাফর

ঃ পয়ার ঃ

নিরবধি ভাইর দুঃখ হানিল পরাণে।
কামরস ভঙ্গ দিল কিছু নাহি মনে ॥
সদয়ে বিরস দেখি হানিল অধর।
এই সব দেখিয়া কন্যা হইল ফাফর[১৮৬] ॥
কি কার্য্য করিল পিতা ছিল কার ঠাঁই।
পতির মনের মর্ম্ম বুঝিতে না পাই ॥
পাখকাটা[১৮৭] পক্ষি যেন ছটফট করে।
সেই মত রহিল কুমার শয্যার উপরে ॥
কি মত কামিনী যেন রাখিছে আসিয়া।
উড়িয়া যাইতে চাহে আমাকে ছাড়িয়া ॥
এ পাপ যৌবন মোর হইল ছাড়খার[১৮৮]।
এত দিনে পাইলাম পতি সে আমার ॥
দাসি তুল্য জানিয়া প্রভু না কহিল বাণী।
না চাহিল মোর তরে দিবস রজনী ॥
কি দেখিলাম স্বপ্নেতে কি করিল পিতায়।
না জানি কপালে কি লিখিল বিধাতায় ॥
অবলা আছিলাম আমি সেই ছিল ভাল।
প্রভুর বিরস দেখি ঘটিল জঞ্জাল[১৮৯] ॥
আর সব দুঃখ যত নিবারিতে পারি।
পতির বিরষ দেখি কলিজা বিদারি[১৯০] ॥

ফাফর[১৮৬] (হিন্দী ফেফড়ী শব্দ থেকে উদ্ভব)=কিংকর্তব্যবিমূঢ়, নিরুপায়। পাখকাটা[১৮৭]=আহত। ছাড়খার[১৮৮]=ভস্মিবুত। জঞ্জাল[১৮৯]=(হিন্দী ঝঞ্জাট থেকে উদ্ভব)=উপদ্রুপ ,ঝামেলা ,নানা বিধ সমস্যা। বিদারি[১৯০]=আঘাত প্রাপ্ত হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

হাস্যমুখে ডাকে পতি মিষ্টবাণী শুনি।
গৃহবাসে অন্য বাসায় সুখ নাহি পুনি ॥
পুত্র কন্যা ধন জন সব অন্ধকার।
পতি বিনে সুখ মনে কিছু নাহি আর ॥
আতুর কুড়ে[১৯১] যদি হয় যজ্ঞপতি[১৯২]।
সেবা করিবেক নারি করিয়া ভকতি ॥
নানা মতে ভকতি করি দেবতা পুঁজয়।
তাহার অধিক পূর্ন্য স্বামী সেবায় পায় ॥
কি মতে করিব সেবা মুই অভাগিনী ।
নির্শ্চয় ছাড়িয়া যাবা অনুমানে জানি ॥
কি কার্য্য করিল পিতা বাজাইল ফান্দে।
অভাগীর উল্লাস কিবা ছিল এই ভুবণে ॥
কপালে লিখিত কিবা ছিল এই ভুবণে।
জিয়ন্তে[১৯৩] বিধবা হইয়া রহিব কেমনে ॥
সদয় কঠিন মন বিরস বদন।
জিজ্ঞাসিত করি সাদ লজ্জায় বিষম ॥
নিকটে হইল বিবাহ পরিচয় নাই।
কোন ছার মুখে জিজ্ঞাসিব পতির ঠাঁই ॥
এই সব লজ্জায় মরি কি করিব আর।
ছাড়িয়া গেলেত শেষে হইব দুঃখ ভার ॥
জিজ্ঞাসা করিব আগে যতেক বিশেষ।
বৈরাগী[১৯৪] হইয়া মুই যাব সেই দেশ ॥
বিরহের তেজে কন্যা কান্দে অভিমানে।

জিজ্ঞাসিতে অধরেতে না ফুটে যবানে ॥আতুর কুড়ে[১৯১]=পঙ্গ।
যজ্ঞপতি[১৯২]=হিন্দু দেবতা বিষ্ণু বা হিন্দু পুরাণোক্ত ধর্মদেবতা।
জিয়ন্তে[১৯৩]=জীবিত অবস্থায়।
বৈরাগী[১৯৪]=সংসার বিষয় ভোগ ত্যাগ করে ধর্ম সাধনায় থাকেন যিনি।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তপুরে দেখিয়া কুমার অতি দুঃখ ভরে।
লজ্জা ছাড়িয়া কন্যা কহে মিষ্ট সুরে ॥
শুন প্রাণনাথ মুই অধম দুর্গতি।
বড় অভাগ্য কালে পাইলাম হেনপতি ॥
ঈশ্বরের ঠাঁই বহু তপস্যা করিয়া।
গগনের চাঁদ মোরে দিলেক আনিয়া ॥
হেন চন্দ্র মলিন কেন থাক সর্ব্বদায়।
কোন জন ডুরি[১৯৫] ধরি টানায় তোমায় ॥
কেমন কামিনী[১৯৬] প্রভু আসিছ রাখিয়া।
উড়িয়া যাইতে চাহ আমাকে ছাড়িয়া ॥
আমি তোমার যুক্ত প্রিয়া নহে কদাচন।
তোমার রমণী জানি আছয় কেমন ॥
মোরে সত্য ছারি প্রিয়া যাও সেই পুরি।
তোমার সাক্ষাতে আজি বিষ খাইয়া মরি ॥
গরল খাইয়া যদি মরি তোমর দাসী।
ঈশ্বরের ঠাঁই প্রিয়া হইবা বড় দোষী ॥
নহে মোরে সঙ্গে করিলেহ সেই দেশ।
দাসী হইয়া সেবা আমি করিব বিশেষ ॥
প্রিয়সীর নিষ্ঠুর বাণী কুমার সুনিয়া।
আলিঙ্গন দিল তার গলায় ধরিয়া ॥
কি কথা কহিলা প্রিয়ে হৃদয়ে হানিলা।
এমত অশঙ্ক বাক্য[১৯৭] কিসেরে কহিলা ॥
তোমার শরীর মধ্যে আমার প্রাণ ধরি।
তোমাকে ছাড়িয়া গেলে আমি প্রাণে মরি ॥

ডুরি[১৯৫](সংস্কৃত ডোর থেকে এসেছে)=সুতা ,রশি।

কামিনী[১৯৬]=নারী। অশঙ্ক বাক্য[১৯৭]=সন্দেহ বা সংশয় বাক্য।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি বিনে প্রাণ প্রিয়া নাহিক দোসর।
দিব্য করি কহি আমি তোমার গোচর ॥
যে কারণে অনলে দগ্ধে মোর মন।
নিকটে বৈশহ[১৯৮] প্রিয়া করি নিবেদন ॥
করে ধরি বসাইল পালঙ্ক উপর।
আদি অন্ত বাণী সব লাগে কহিবার ॥
এক গর্ভে দুই ভাই যে মতে জন্মিল।
যে মতে পিতা মোদের বৈরি যে হইল ॥
দুই ভাই কাটিতে যে পিতায় আজ্ঞা দিল।
বৃক্ষতলে বসি দোহে যে মতে কান্দিল ॥
দুই অশ্ব দিয়া কোতয়াল পার করে দিল।
পার করে দিয়া কোতয়াল দেশে চলিয়া গেল ॥
বিটপির[১৯৯] তলে বসি দোহে যে প্রকার কান্দিল।
জল খাইবারে যেন ভাইকে কহিল ॥
জল আনিবারে ভাই নদী তীরে গেল।
রাজহস্তী আসি ভাই পৃষ্ঠে তুলে নিল ॥
যে মতে রাজপাটে[২০০] রাখিলেন্ত নিয়া ।
রাজা হই গেল ভাই আমাকে ভুলিয়া ॥
কোতয়াল যে মতে চোর বলি কান্দিল ॥
একে ২ যত বাক্য কন্যায় নিবেদিল।
সওদাগরে নিল যে কাটিবার কারণ ॥
ডিঙ্গা নামাইল যেন ঈশ্বরের স্মরণ।
বন্দি করি সওদাগরে বানিজ্যে আনিল।
মানিক্য চিনিয়া যেন রাজ্যতে ঠেকিল ॥

বৈশহ[১৯৮]=বসা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
বিটপির[১৯৯](সংস্কৃত শব্দ)=গাছ,তরু।
রাজপাটে[২০০]=রাজসিংহাসনে।

Dhaka University Institutional Repository

আদি অন্ত বৃত্তান্ত যত ছিল ঠাঁই ২।
কন্যাকে বৃত্তান্ত সব কহিল বুঝাই ॥
তবে ত কহিল কুমার শুন প্রাণেরশ্বরী[২০১]।
ভাইর দুঃখে সদা আমি দহিয়া যে মরি ॥
নির্শ্চয় যাইব আমি ভাইর তালাসেতে।
মোর সঙ্গে চল প্রিয়া যাব সেই দেশে ॥
নহে মোরে বিদায় দেহ যাইব একেশ্বর[২০২]।
ভাইর সঙ্গে দেখা করি আসিব সত্তর ॥
কুমারের বচনে কন্যা কান্দে পুনি ২।
পাটেতে লিখিয়া লইল আদি অন্তবাণী ॥
দূরদেশে যাব আমি প্রিয়ার সংহতি।
কর্ম্মহীন দোষে যদি পরায় কুমতি ॥
নৌকায় চড়িয়া আমি যাব প্রিয়ার সঙ্গে।
নৌকা যদি মারা যায় নদীর তরঙ্গে ॥
দুই দেশে দুই জন দৈবে লইয়া যায়।
এই পতি লইয়া আমি যাইব তথায় ॥
অবশ্য চিনিব প্রিয়া পত্র যে পরিয়া।
তেকারণে পত্র কন্যা রাখিল লেখিয়া ॥
তবেত কহিল কন্যা শুন প্রাণনাথ।
যেই মতে যাইবে তুমি যাব তোমার সাত ॥
সমুদ্রে ভাসাও কিবা জঙ্গলে ফেলাও।
যেই দিগে ইচ্ছা তোমার সেই দিকে নেও ॥
বিকাইনু[২০৩] তোমার পদে এথাতে উথাতে[২০৪]।
কুন্তলে[২০৫] বাদি য়াপদ[২০৬] রহিব কি মতে ॥

প্রানেরশ্বরী[২০১]=প্রানের ইশ্বরী অর্থাৎ প্রিয়া। একেশ্বর[২০২]=একা।
বিকাইনু[২০৩]=বিক্রীত হলাম। এথাতে উথাতে[২০৪]=এখানে সেখানে।
কুন্তল[২০৫](সংস্কৃত শব্দ)=চুল। য়াপদ[২০৬]=বিপত্তি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়ার নিষ্ঠুর শুনি সঙ্গে যাইবার।
কামরসে মজি গেল কুমার কুমারী ॥
উড়ে ২ জড়ি তবে সেঙ্গার করিল।
কুমারীর মনস্তাব[২০৭] কুমার রাখিল ॥
দোহার পুড়িল সাদ অতি সুললিত।
কৌতুকেতে শেষ রায়[২০৮] নিদ্রায় ঘটিত ॥
করে ২ গলে ২ অঙ্গে ২ ধরি।
মহা সুখে নিদ্রা যায় কুমার কুমারী ॥
হেন কালে নিশি গতে[২০৯] হইল বেহান।
কুমার কুমারী দোহে করিলেক স্নান ॥
বসন পরিয়া যে সুগন্ধি দেয় গায়।
অধরে তাম্বুল দিয়া চলিল সভায় ॥
কুমার দেখিয়া সবে করিল আদর।
সভা সঙ্গে কুমার যে বসিল সত্তর ॥
কুমারের বাখানি[২১০] করে জনে ২ ।
হেন পতি পাইল কন্যা মহাভাগ্য গুণে ॥
সভা সঙ্গে কুমার মহা গৌরব ধরিয়া।
কৌতুকেতে অন্তঃপুরি গেলেন চলিয়া ॥
এই মতে কতদিন আনন্দে রহিল।
ফিরিয়া স্মরণে ভাইর ব্যেকুল হইল ॥
শুন ২ প্রিয়া আমি করি নিবেদন।
অনলে দহিয়া মোর যায়ত জীবন ॥
ভাইর স্মরণে মোর পরাণ বিধরে।
যাও প্রিয়া কহ গিয়া নৃপতির গোচরে ॥

মনস্তাব[২০৭](সংস্কৃত শব্দ)=মনো দুঃখ। শেষ রায়[২০৮]=শেষ রাতে।
নিশি গতে[২০৯]=রাত গিয়ে। বাখানি[২১০]=বর্ণনা।

Dhaka University Institutional Repository

নৌকা করি পাঠাইবে কহি যে বিশেষ।
বিধায় দেহ যাই এবে মুই ভাইর দেশ ॥
সজল লোচনে কন্যা পিতার ঠাঁই গেল।
কান্দিতে ২ বাত কহিতে লাগিল ॥
জামাতার সঙ্গে কন্যা দিবা চালাইয়া।
আগে কহি এখন বিলম্ব কর কি ল্যাগিয়া ॥
ভাই ২ করিয়া তার প্রাণ নাহি রয়।
আমাকে ছাড়িয়া যাইবে জানিনু নির্শ্চয় ॥
জিয়ন্তে বিধবা হইয়া কেমনে রহিব।
কলঙ্কিনী হই প্রাণ কি মতে রাখিব ॥
কপালের নিব্বর্ন্ধ প্রভু না যায় খণ্ডান।
এবে দুঃখ দেও পিতঃ[২১১] কিসের কারণ ॥
নৌকা পথে যাইতে এখন মনে যুক্ত হয়।
দক্ষিণ পবনে এবে খরতর[২১২] বয় ॥
রাজা বলে শুন কন্যা বলি যে তোমায়।
হিমান্তের সময় আরোহণ দিবা নৌকায় ॥
এতেক শুনিয়া কন্যা গেলেন্ত বাসরে।
হিমান্তের কালে নৌকা দিবে পিতা বরে ॥
চিন্তিত হইল কুমার শুনিয়া বচন।
গঙ্গাঘাটে[২১৩] চলি গেল বিরস বদন ॥
নদীতটে বসি কুমার করে অভিমান।
আহা ভাই কি মতে আসিব তোমাস্থান ॥
সমুদ্রেতে দিয়া ঝাপ উর্ম্মি[২১৪] পরে ভাসে।
মনে লয় তোমা স্থানে অতি শীর্ঘ্র আসি ॥

পিতঃ[২১১](সংস্কৃত শব্দ)=জনক,পিতা। খরতর[২১২]=স্রোতস্বিনী।
গঙ্গাঘাটে[২১৩]=গঙ্গাদেবীকে যে ঘাটে বিসর্জন দেয়া হয়।
উর্ম্মী[২১৪]= ঢেউ।

Dhaka University Institutional Repository

মহা দুঃখ ভাবি কুমার ঘাটেতে বসিল।
হেন কালে এক জন কান্দিয়া উঠিল ॥
ভাই ২ বলিয়া কান্দে মহা উচ্চস্বরে।
আহা ভাই প্রাণনাথ ছাড়িলা আমারে ॥
আছার পাছার খায় ভূমিতে পরিয়া।
প্রাণের দোসর ভাই কে নিল হরিয়া ॥
ভাই বিনে ধন নাহি সংসার ভুবনে।
হেন ভাই ছাড়িপ্রাণ রাখিব কেমনে ॥
না যাইব দেশে আমি মাঙ্গিয়া[২১৫] খাইব।
ভাইকে ছাড়িয়া আমি কি মতে রহিব ॥
তোমাকে ছাড়িপ্রাণ কি মতে লইব।
স্ত্রীর সঙ্গে আমি রহিব যে গিয়া ॥
ডিঙ্গার যত ধন মাল দিল লুটাইয়া।
রহিলেক শেষে সাধু বৈষ্ণব[২১৬] হইয়া ॥
এই সব দেখিয়া কুমার হৃদয় হানিল।
অনলে অনল দিয়ে দহিতে লাগিল ॥
ভাইর বিহনে দেখ এই মহাজন ।
স্ত্রী পুত্র ত্যাগিল আর ধনজন ॥
আমি বড় অভাগিয়া বুদ্ধি ধরে নাই।
স্ত্রী লইয়া থাকি আমি পাসরিয়া[২১৭] ভাই ॥
আর না যাইব ঘরে সমুদ্রে পরিব।
দেহ ছাড়ি যাই আমি ভাই উদ্দেশিব[২১৮] ॥
ঢেউ পরে ভাসি আমি যাব ভাইর দেশ।
প্রিয়ার করমে যেবা আছয় বিশেষ ॥

মাঙ্গিয়া[২১৫]=ভিক্ষা করে বা খয়রাত করে।

বৈষ্ণব[২১৬]=চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্ম সম্প্রদায়।

পাসরিয়া[২১৭]=অতিক্রান্ত হয়ে। উদ্দেশিব[২১৮]=উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

নৌকা করি যাইতে না দিবে নৃপবর।
ফিরিয়া না যাব আমি রাজকন্যার ঘর ॥
সমুদ্রে পরিবে কুমার করিলেক সাজ।
হেন কালে এক ডিঙ্গা দেখে নদীর মাঝ ॥
দক্ষিণ সহর হইতে আইল নদী ধারে।
কুমার দেখিয়া তবে প্রাণ স্থীর করে ॥
জোয়ারে তুলিয়া দিছে বাদামের[২১৯] বাও।
অনিলের বেগে[২২০] যেন আসে সেই নাও ॥
কুমার জানিল নৌকা উজানি সহরে[২২১]।
নির্শ্চয় যাইবে সাধু সেই ত নগরে ॥
নিকটে আসিলে নৌকা জিজ্ঞাসা করিব।
এইত ডিঙ্গাতে চড়িভাইর দেশে যাইব ॥
এক দৃষ্টে নিরন্তরে হেরে নদীর তীরে।
হেনকালে নৌকা আসি লাগিল ধারেতে ॥
অতিবেগে গেল কুমার সেই ডিঙ্গা ধারে।
গঙ্গাধর সাধু দেখে নৌকার উপরে ॥
বিনয় বচনে কুমার জিজ্ঞাসা করিলে।
আমাকে ছাড়িয়া সাধু কোথায় গিয়াছিলে ॥
নিদয়া[২২২] হইয়া তুমি ছাড়ি গেলা মোরে।
দিবা নিশি কান্দি আমি না দেখে তোমারে ॥
সাধুয়ে বলিল আমি দক্ষিণ পাটনে[২২৩]।
তথাকার গিয়াছিলাম বানিজ্য কারণে ॥

বাদামের[২১৯]=নৌকার পালের। অনিলের বেগে[২২০]=দ্রুত গতিসম্পন্ন।
উজানি শহরে[২২১]=বানিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ এক প্রাচীন শহর।
নিদয়া[২২২]=দয়াহীন ভাবে। দক্ষিণ পাটনে[২২৩]=বানিজ্য স্থান।

Dhaka University Institutional Repository

সবে মিলি যুক্তি করি ডিঙ্গা ছাড়ি দিল।
তে কারণে তোমা সঙ্গে দেখা না হইল ॥
এবেত চলিয়াছি আমি যাব নিজ দেশ।
আপন সংবাদ কিছু কহ ত বিশেষ ॥
কুমার কহিল কন্যা নৃপতি রাজন।
আমা ঠাঁই বিবা জানি দিল কি কারণ ॥
না জানি কপালে কি বুঝিতে না পারি।
সঙ্গে করি নেও মোরে যাব তোমার পুরি ॥
প্রাণ দান তুমি মোরে দিছ নানা মতে ।
বাসা করিব আমি তোমার ছায়াতে ॥
পরদেশী[২২৪] রাজা এই মর্ম্ম নাহি জানি।
তোমা সঙ্গে যাব আমি শুন মোর বাণী ॥
মর্ম্ম সব কহিলেন সাধুর সাক্ষাতে ।
কর্ম্ম দোষে সিংহ বন্ধি শৃগালের হাতে ॥
সাধুয়ে কহিল কিবা রাজাকে কহিবা।
কন্যা সঙ্গে নিবা কিনা একেলা[২২৫] যাইবা ॥
কুমার কহিল কন্যা যাবে মোর সাথে ।
জিজ্ঞাসা করিছি আমি সন্দে[২২৬] নাহি তাথে ॥
তবেত কহিল সাধু আইশ শীর্ঘ্র করি।
এতেক শুনিয়া কুমার চলিল দরবরি[২২৭] ॥
শীর্ঘ্র করিয়া কুমার চলিল ভুবনে।
হাটিতে ২ দুঃখ ভাবে মনে ২ ॥

পরদেশী[২২৪]=ভিন্ন দেশী।একেলা[২২৫]=একা।
সন্দে[২২৬]=সংশয়।
দরবরি[২২৭](ফারসী শব্দ)=দ্রুত বা তারাতারি।

Dhaka University Institutional Repository

কি মতে কহিব গিয়া কন্যার স্থানয়।
রাজায় শুনিয়া দুঃখ ভাবিবে নির্শ্চয় ॥
যে হউক সে হউক আজি জিজ্ঞাসা করিয়া।
নহে পালাইয়া যাব কন্যায় না কহিয়া ॥
দুঃখিত মনেতে পুরি প্রবেশ করিল।
বিরস দেখিয়া কন্যা কহিতে লাগিল ॥
আজি তোমা মুখ কেনে দেখি যে মলিন[২২৮]।
কোন রাহু[২২৯] আসিয়া চন্দ্র করিল গ্রহণ ॥
নির্শ্চয় কহত প্রিয়া আনি ওকে ধরি।
অভাগির অনল ছেল তার বুকে মারি ॥
অধর নিষ্ঠুর দেখি শরীরে না সয়।
পঞ্চপ্রাণী হানি বিষে হৃদয়ে দহি যায় ॥
নহে কোন রোগ হইয়াছে তোমার শরীরে।
ঔষধ করিব নাথ কহ্ সত্ত মোরে ॥
গলাতে ধরিয়া কুমার কহে প্রিয়া স্থানে।
তুমি বিনে ঔষধ আর দিবে কোন জনে ॥
যেবা সাধুর সঙ্গে আমি আসিলাম এথায়[২৩০]।
সেই সওদাগর এবে দেশে চলি যায় ॥
তাহার সঙ্গেতে আমি করিব গমন।
তুমি না যাইবা সঙ্গে দুঃখ এ কারণ ॥
বিলম্ব না কর সাধু যায়েন্ত চালিয়া।
রাখিলাম মিনতি[২৩১] করি করেতে ধরিয়া ॥
মোর সঙ্গে যাইবে যদি চলহ্ সত্তর।
সাধুয়ে ছাড়িয়া গেলে না আসিবে আর ॥

মলিন[২২৮]=অনুজ্জ্বল। রাহু[২২৯]=দানব।

এথায়[২৩০]=এখানে। মিনতি[২৩১]= প্রার্থনা বা অনুনয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বজল লোচনে কন্যা লাগিল কহিতে।
যাইব তোমার সঙ্গে রহিব কি মতে ॥
কিছু মাত্র সাধুর মতি বুঝিতে না পারি।
আমাকে বলিবে তবে কলঙ্কিণী নারী ॥
নিকটের দেশ নহে দূরেতে গমন।
না জানি কপালে মোর কি আছে লিখন ॥
ঈশ্বর করায় যেবা কভু এরাণ নাই।
কান্দিতে ২ যায় জননীর ঠাঁই ॥
উচ্চস্বরে ডাক দিল মাতা ২ বলি।
দুহিতার[২৩২] ডাক শুনিয়া দেবী হইল ব্যাকুলি[২৩৩] ॥
তরাস[২৩৪] করিয়া দেবী আইল কন্যার সাক্ষাতে।
জননী দেখিয়া কন্যা লাগিল কহিতে ॥
দশ মাস দশ দিন রাখিয়া উদরে।
না পারিলাম তোমার চরণ সেবিবারে ॥
সুপিয়া যে দিলা মোকে বিদেশীর ঠাঁই।
বিদায় কর এবে আমি তার সঙ্গে যাই ॥
তিনির[২৩৫] দেশ হইতে আইল এক মহাজন।
সেই ত নৌকায় চড়ি করিব গমন ॥
আমারে কহিল তুমি চল মেরা সাতে।
নহে আমার পিতার পুরি বসি খাও ভাতে ॥
নির্ভয় চলিছে প্রিয়া আমাকে ছাড়িয়া।
কি মতে রহিব মাতা বিধবা হইয় ॥
মোরে ছাড়ি গেলে প্রিয়া না আসিবে আর।
পশ্চাতে আমার লাগি পাবা দুঃখ ভার ॥

দুহিতার[২৩২]=কন্যার। ব্যাকুলি[২৩৩]=উদ্বিগ্ন।

তরাস[২৩৪](ফারসী শব্দ)=ভয় বা ত্রাসযুক্ত ভাবে।

তিনির[২৩৫](হিন্দী শব্দ)=তার।

Dhaka University Institutional Repository

পালন করিলা মাতা অধিক যত্তনে।
অপরাধ ক্ষেমী মোর লইবা চরণে ॥
তৃতীয় বৎসর পন্থ[২৩৬] সাধুর যে পুরি।
আর্শিব্বাদ কর যেন সমুদ্রেতে তরি ॥
এতেক শুনিয়া দেবী মূর্চ্ছিত[২৩৭] হইল।
চৈতন্য হইয়া তবে কহিতে লাগিল ॥
কি কথা কহিলা কন্যা মোর প্রাণধন।
তোমা বিহনেতে আমি ত্যাজিব জীবন ॥
না দেখিয়া তোমা আমি কি মতে রহিব।
এই যে দারুণ প্রাণ কিমতে রাখিব ॥
কন্যার তীক্ষ্ণ সুলে[২৩৮] সেই ভাল সুনা।
পাঁচালি[২৩৯] প্রবন্ধে কহি দেবীর করুণা ॥
হীন হাফেজ আলী কহে করিয়া বিনয়।
হেন দশা প্রভু যেন না করে কাহায় ॥

পন্থ[২৩৬]=পথ। মূশ্চির্ত[২৩৭]=অচৈতন্য। তীক্ষ্ণ সুলে[২৩৮]=তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রবিশেষ, ত্রিশুল,শিক। পাঁচালি[২৩৯] (পঁঞ্চালক > পাঁঞ্চালিক > পাঁচালী)=এক প্রকার বর্ণনাত্মক কাব্য যা রাগিনী সমেত গায়েন মুখে নাচ গান-বাদ্য যোগে গীত গেত।

Dhaka University Institutional Repository

১২তম পরিচ্ছেদ

কাঞ্চনমালার পিতা মাতার দুঃখ বর্ণনা

লাচারী রাগ ভাও করুণা

ঃ ত্রিপদি ছন্দ ঃ

আহা কন্যা কাঞ্চনমালা, মোরে কেনে দুঃখ দিলা,
কি শুনাইলা কন্যা শূলবাণী।
তুমি ছাড়ি যাবা মোরে, কি মতে রহিব ঘরে,
দৈবে আমি ত্যাজিব জীবন ॥
পুত্র কন্যা আর না হইল, সেই দুঃখ পাসরিল,
দেখি হেন তোমা চন্দ্রমুখ।
মোরে অনাথিনী করি, কেবা তোমায় নিবে হরি,
নির্শ্চয় মরিব এই দুঃখে ॥
তোমার পিতার গৃহবাস, এই তক[২৪০] হইল নাস,
এতেক করিলা কিশেরে।
বিদেশী দুঃখিত জন, হেন দেখি কি কারণ,
তার হাতে শুপিল[২৪১] তোমারে ॥
তোমা পিতা চতুরাই[২৪২], না কহিল মোর ঠাঁই,
লইয়া যাবে তবে তোমাপতি।
তবে কেনে মনের আশা, বিবাহ দিতাম তার পাস,
এবে মোর হইবে কোন গতি ॥
গর্ব্বেতে আছিলা যবে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সবে,
কহিল মরিবে দুইজনে।
জন্মিবার কালে তুমি, বড় দুঃখ পাইনু আমি,
তাহাতে না হইল মরণ ॥

তক[২৪০](হিন্দী শব্দ)=অবন্ধি,পর্যন্ত। শুপিল[২৪১]=সমর্পন।
চতুরাই[২৪২](সংস্কৃত চতুরা থেকে উদ্ভব)=চালাক, নিপুন।

Dhaka University Institutional Repository

স্বরশয্যা[২৪৩] বিছাইয়া, তাথে তোমায় না দেখিয়া,
কোলে করি তখন রহিলাম।
বহুত দুঃখিত হইয়া, রাখিলাম কোথায় নিয়া,
বুকে রাখি রাতি পোহাইলাম ॥
অকালে পালিয়া তোমায়, এবে আমি দিব কাহায়,
এই দুঃখ সহিব কেমনে।
আজি সে তোমার সাক্ষাতে, প্রাণ পণ দিব তাতে,
বিষ খাই দেহ ছাড়ি যাইমু ॥
জাওগো জামাতার ঠাঁই, কহিও সকল বুঝাই,
কহিবা আমার নিবেদন।
রহ দিন[২৪৪] দুই চারি, তোমা রূপ দেখি হেরি,
কেন বধ শাশুরীর জীবন ॥
কন্যা বলে ওগো মা, তুমি মোরে কর ক্ষমা,
তোমার দুঃখ না সহে পরাণে।
অনলে অনল দিয়া , মোরে পুরি মার কিয়া,
কি মতে রাখিবা অভাগীরে ॥
বৈদেশী দুঃখিত পতি, কহিনু অনেক ভাতি,
না রাখিল আমার বচন।
কহে যাইমু একেশ্বরি, রহ তোমার পিতার পুরি,
মোরে ছাড়ি করিছে গমন ॥
আমি অভাগিনী রামা, শুন মাগো কহি তোমা,
এত দুঃখ করহ কিসেরে।
যখন বিদেশী তরে, দিলা মোরে যোম[২৪৫] ঘরে,
তখন যে ছাড়িলাম তোমারে ॥

স্বরশয্যা[২৪৩]=কাটা যুক্ত বিছানা। রহ দিন[২৪৪]= অপেক্ষার দিন।

যোম[২৪৫]=সকল জীবের প্রান হরনকারী। এখানে জামাইকে যমের সাথে তুলনা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ্যহীন বিধি করি, জন্মাইলাম মৃত্যু পুরি,
মোর কিছু নাহিক উপায় ।
তোমা রাজ্য ছাড়িয়া যাইমু, শ্বশুর কুল নাহি পাইমু,
তবে মোর হবে কোন গতি ॥
তুমি গুরু হও জননী , এই নিবেদন পুনি,
আর্শীর্ব্বাদ কর অভাগিরে।
বৈদেশী নৌকার পরে, প্রভু নিয়া যায় মোরে,
কলঙ্কিণী না করে ঈশ্বর ॥
দুহিতার বাক্য শুনি, কান্দিতে লাগিয়া পুনি,
ভূমে মাতা হানে বারে ২।
দেবীর নিঠুর বাণী, স্বস্নানে[২৪৬] লাগায়ে পানি,
সদায় করায় হাহাঙ্কার ॥
অধীন লাচার[২৪৭] কহে, প্রভু যার সখা হয়,
তার মন সদা হরষিত ॥
পুত্র কন্যা ধন জন, নাহি যার ত্রিভুন,
তার মন রহে দুঃখিত ॥

স্বস্নানে[২৪৬] =গোছল রত অবস্থায়।

লাচার[২৪৭] (সংস্কৃত নৃত্য থেকে উদ্ভব)=নাচের গান ত্রিপদী ছন্দে রচিত গান।

Dhaka University Institutional Repository

১৩ তম পরিচ্ছেদ

কন্যার মাতার খেদ

ঃ পয়ার ঃ

ওগো কন্যা হেন দুঃখ সহিতে না পারি।
স্মরণে উঠায় মোর পাঞ্জর[২৪৮] বিদরি ॥
যখন তোমার পিতা বিবা করে মোরে।
বৎসর দুই ছিলাম আমি কৌতুক অন্তরে ॥
শাস্ত্রেতে শুনিলাম শেষে কহিল সকলে।
পুত্র কন্যা না জন্মিল তোমার কপালে ॥
নানা মতে ঈশ্বরের তপস্যা করিয়া।
মনসা[২৪৯] পুজিনু কত ছাগল কাটিয়া ॥
সে সব ফলেতে আমি তোমাকে পাইলাম।
তোমাকে পাইয়া সব দুঃখ নিবারিলাম ॥
তোমা পিতা গৃহবাস সব ছাড়িয়া।
পালিয়া লইতাম তোমা কোলেতে করিয়া ॥
পুত্রকন্যা নাহি মোর কোলে নাই বাছা।
তোমার কারণে জলে ঝাপ দিব সাচা[২৫০] ॥
তব বিবাহ দিয়া মোর খশিয়া[২৫১] ছিল দুঃখ।
ঘরেতে বসিয়া দেখি তোমা চন্দ্রমুখ ॥
গগনের চাঁন্দ লুকাই উঠে পূনর্ব্বার।
আমার চান্দ গেলে ফেরনা আসিবে আর ॥
এ চন্দ্র মোর হরি নিল কোন জন।
দারুণ রাহুতে আসি করিল গ্রহণ ॥

পাঞ্জর[২৪৮](সংস্কৃত শব্দ)=পাজর।

মনসা[২৪৯]=সাপের দেবী (বিস্তারিত টিকাংশ দেখুন)।

সাচা[২৫০]=খাঁটি। খশিয়া[২৫১]=স্খলিত করা বা পৃথক করা।

Dhaka University Institutional Repository

সুতমাতা[২৫২] কান্দে দোহে গলাগলি ধরি।
বৃক্ষ পত্র ঝরি পড়ে সহিতে না পারি ॥
অন্তঃপুরে নারি সব কান্দে উচ্চস্বরি।
কুহুরি২ কান্দে ভুমিতলে পড়ি ॥
সভাতে বসিয়া রাজা চমকিত প্রাণী।
কান্দনে রোল হেন অন্তপুরি শুনি ॥
তুরিত গমনের রাজা গেল অন্তপুরি।
কন্যা ধরি কান্দে দোহে ধুলয় ধুসরি[২৫৩] ॥
জিজ্ঞাসা করিল রাজা কান্দ কি কারণ।
ক্রোধ হইয়া দেবী তারে কহিলা বচন ॥
কন্যা বিবা দিলা মোর বিদেশীর তরে।
না জানি লইয়া সে যায় কোথাকারে ॥
বৃদ্ধ কাল হইল মোর কবে জানি মরি।
দিন কত কন্যা দেখি যাইতাম যমপুরি ॥
তাহাতে দারুণ বিধিবাম হইল মোরে।
আমাকে ছাড়িয়া কন্যা যায় দেশান্তরে ॥
হেন লয় মোর মনে যাই কন্যার দেশ ।
তোমাকে রান্ধিয়া অন্ন না দিব বিশেষ ॥
কাঞ্চনমালা কন্যা বিনে কুলে কেহ্ নাই।
কারে দেখি পাসরি রহিব তোমা ঠাঁই ॥
যত দুঃখ পাইনু আমি পুত্র কন্যা লাগি।
সকল জান ত প্রভু আমি অভাগিনী ॥
শেষ কালে শোক মোর হইলেক দুনা[২৫৪] ।
আজি হইতে গৃহবাস সব হইল মানা ॥

সুতমাতা[২৫২]=কন্যার মা।
ধুলয় ধুসরি[২৫৩]=ধুলায় গড়াগড়ি যাওয়া।
দুনা[২৫৪]=দ্বিগুণ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজায় বলিল প্রিয়া বুদ্ধি নাই তোরে।
জিয়নে মরণে কন্যা রহিছে কার ঘরে ॥
জন্মিলে মরণ পন্থ আছয় নির্শ্চয়।
বাঁচিলে তথাপি তারে পরে লিয়া যায় ॥
কি কারণে কান্দ প্রিয়া শুন মেরা বাত[২৫৫]।
কন্যা চালাই দেও জামাতার সাত ॥
দুহিতা সৃজিলে দেখ প্রভু নিরাঞ্জন।
ঘরেতে রাখিতে চাও একথা কেমন ॥
পুত্র কন্যা ঘাটে ২ হয় নানা মতে।
কেহুর পুত্র কেহুর কন্যা মিলায়ে শাস্ত্রেতে ॥
রামালোক[২৫৬] অবোধ দেখহ সংসারে।
কন্যা হইলে তারে কেবা রাখে ঘরে ॥
কাঞ্চনমালা কন্যা তোর সাফল্য জন্মিল।
উজানি নগরে গিয়া সমাজি[২৫৭] হইল ॥
মহা মহারাজার কন্যা উজানি নগরে।
সমাজি হইল গিয়া সেই কন্যার ধারে ॥
এই মত বুঝাইয়া কহে নৃর্পবরে।
পরেতে চলিয়া গেল জামাতার হুজুরে ॥
কহিবারে লাগিলেন্ত শুনহ গো জামাতা।
অপুত্রের পুত্র মোর ছিল এই সুতা ॥
তাহাকে বিবাহ জান দিলাম তোমা ঠাঁই।
রাজ্য ছাড়ি জাইবা তুমি মোর পুত্র নাই ॥

বাত[২৫৫]=উক্তি বা বাক্য।

রামা লোক[২৫৬]= স্ত্রীলোক ,মেয়ে মানুষ।

সমাজি[২৫৭]=সমাজের সদস্য হিসাবে অর্ন্তভূক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ঈশ্বর সৃজিল মোরে পুত্রহীন করি।
মৃত্যু কালে কাষ্ঠ অগ্নি তুমি দিবা ধরি ॥
শেষকালে আসা মোর আসি হইল স্থিতি[২৫৮]।
জামাতা নিষ্ঠুর লোক শাস্ত্রেতে লিখতি ॥
বিলম্ব না সহে যার সংগ্রহ কিশের।
বিরস করিয়া এবে যাও কেনে মোরে ॥
তাহাতে হরিয়া সত্ত যাও মোর দেশ।
নৌকা আরোহণ দিমু যাও ভাইর দেশ ॥
কুমার কহিল তুমি পিতার সমান।
দুঃখ বিনে দিনু আমি মহাশয়ের স্থান ॥
প্রাণ স্থির নাহি মোর ভাইর স্বরণে।
বিদায় দেও এবে আমি ভাইর স্থানে ॥
যেবা সাধু হইতে মোরে রাখিলা রাজন।
সেই সাধু দেশে এবে করিছে গমন ॥
নৌকা করি মহারাজা চাও মোরে দিতে।
প্রাণীর সংকট পন্থ আসিতে যাইতে ॥
তৃতীয়া বৎসরের পন্থ ভাই মোর যথা।
পঞ্চম বৎসর পন্থ পিতা মোর তথা ॥
ভাইর দর্শনে আমি পিতার দেশে যাইব।
তোমার নৌকার লোক কেমনে আসিব ॥
গঙ্গাধর সাধু এই মোর ভাইর দেশে।
গৌরব করিয়া মোরে নিবেন্ত[২৫৯] বিশেষে ॥
জামাতার অধিক দুঃখ এই যে রহিল ॥
তোমাকার চরণ আমি সেবিতে নারিল।

স্থিতি[২৫৮]=স্থগিত।

নিবেন্ত[২৫৯] =নিয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সদায় অন্তর জ্বলে ভাইর স্মরণে ॥
সংসারের সুখ ভোগ নাহি কিছু মনে।
আমারে বিদায় দেও আশির্ব্বাদ করি ॥
ভাই সঙ্গে দেখা হয় সমুদ্রেতে তরি।
বহুত ভকতি করি চরণে পরিল ॥
বিস্তর মিনতি[২৬০] করি কহিতে লাগিল।
তবেত কহিল রাজা জামাতার তরে ॥
দাস দাসী ধন কিছু নেও ডিঙ্গা পরে।
কুমার কহিল তাথে কিছু কার্য্য নাই ॥
অন্য লোকের নৌকা আমি রাখিব কোন ঠাঁই।
শ্বাশুরীর চরণ তবে দণ্ডবৎ[২৬১] হইয়া ॥
সভা হইতে বিদায় হইল বহুত কহিয়া।
কান্দনের রোল হইল রাজার পুরিতে ॥
দুধের ছাওয়াল[২৬২] আদি[২৬৩] লাগিল কান্দিতে।
গ্রামবাসী ইহা শুনিতে পাইয়া বড় ভয় ॥
কি কারণে শব্দ শুনি নৃপতির আলয়।
ডাকাডাকি কহে সবে রাজার যে সুতা।
কন্যা লইয়া যায় দেশে রাজার জামাতা ॥
তবে কন্যায় পিতা মাতার চরন বন্দিয়া।
বিস্তর কান্দিয়া যায় বিদায় হইয়া ॥
এ জনমে তোমা ঘর না দেখিব আর।
এই সে কপালে বিধি লিখিল আমার ॥

মিনতি[২৬০](সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি > প্রা. বিন্নাও > বিনতি > মিনতি > আ. মিন্নৎ)=অনুনয়, বিনয়।

দণ্ডবৎ[২৬১]=কদমবুচি।

ছাওয়াল[২৬২](উর্দূ শব্দ)=সন্তান। আদি[২৬৩]=পুরাতন।

Dhaka University Institutional Repository

মাতা পিতা ছাড়ি আমি ঘরেতে রহিব।
জিয়নে মরণে আমি খবর নাহি পাব ॥
যত বিলাপ করি কন্যা নৌকা ঘাটে যায়।
সেই সব লিখিলে পুথি না হয় আদায় ॥
পাছে ২ ধায় দেবি ছন্ন কেশ বেশ।
উর্দ্ধমুখী হইয়া যায় পাগলের বেশ ॥
আর না রহিব ঘরে ছাড়িব সংসার।
কাঞ্চনমালা বিনে আমার নাহিক নিস্তার ॥
এই মতে বিলাপ করে মহাদেবী।
ফিরি ২ চাহে কন্যা মনে দুঃখ ভাবি ॥
কান্দিতে ২ সবে ঘাটেতে আইল।
সকল রাজ্যের লোক একত্র হইল ॥
পন্থেতে[২৬৪] যাইতে কুমার কুমঙ্গল[২৬৫] দেখয়।
মনে ২ ভাবে কুমার না জানি কি হয় ॥
দক্ষিণে শৃগাল বামে সর্প যে দেখিল।
গাভীর বাছুর[২৬৬] দেখি দুগ্ধ ছাড়ি দিল ॥
আচম্বিতে কুমারের উছাটন[২৬৭] মন।
পতি ২ করিয়া যে কান্দে একজন ॥
এত ভাবি কুমার ভাবয়ে অন্তরে।
আমা মারি কন্যা যে নিবে সওদাগরে ॥
নহেত সমুদ্রে পরি আমি যাব মরি।
তরঙ্গাপরে[২৬৮] ভাসি কিবা কুলে যাই তরি ॥
আমার লাগিয়া কন্যা যাইবে মরিয়া।
সেই সাক্ষী ঈশ্বর কিবা দেখায় আসিয়া ॥

পন্থেতে[২৬৪] =পথেতে। কুমঙ্গল[২৬৫]= খারাপ লক্ষণ।
বাছুর[২৬৬]=গাভীর বাচ্চা। উছাটন[২৬৭](সংস্কৃত শব্দ)=উদ্বিগ্ন।
তরঙ্গা'পরে[২৬৮]=ঢেউয়ের উপরে।

Dhaka University Institutional Repository

সেই সব গণিয়া মোর কিছু ফল নাই।
ভাইর উদ্দেশে গেলে যে করে খোদাই ॥
বহু দুঃখ ভাবি দোহে নৌকায় উঠিল।
তুরমানে[২৬৯] সওদাগর নৌকা খুলি দিল॥
আরোহণ করি সাধু গেল দুরান্তরে।
সকল রাজ্যের লোক ফিরি গেল ঘরে ॥
যতদুর গেল কন্যা চাহে ফিরি ২ ।
না দেখিয়া ভঙ্গ দিয়া বসিল সুন্দরী ॥
ডিঙ্গা আরোহিয়া সাধু কত দুরে গেল।
হেন কালে আচম্বিতে কন্যাকে দেখিল ॥
কুমারীর রূপ দেখি সাধুর নন্দন।
কামবাণে মগ্ন হইয়া অনলে দহন ॥
সুখনায়[২৭০] পরিয়া মাছ যেন ছটফট করে।
সেই মত হইল সাধু শয্যার উপরে ॥
কি কহিব কি করিল ভাবে মনে ২।
কি মতে কন্যার সঙ্গে হইবে মিলন ॥
কাহারে দিব আমি এই ত সুন্দরি।
কিঙ্করের[২৭১] নারি মোর এই তো কুমারী ॥
দেশে নিয়া এই কুমার বানিজ্যে পাঠাইব।
আপনার ঘরে নিয়া কুমারী রাখিব ॥
এই যুক্তি করিয়া যে ভাবে মনান্তরে।
এই কিছু নহে মন ফিরাইল তারে ॥
কন্যা বিবা দিলা রাজা সুরূপ নন্দিনী।
কি কারণে বিবা দিলা মর্ম্ম নাহি জানি ॥

তুরমানে[২৬৯](সংস্কৃত তুর > ত্বরা+মান)=সত্বর।

সুখনায়[২৭০]=পানি নাই এমন স্থান।

কিঙ্করের[২৭১]= দাসের।

Dhaka University Institutional Repository

নাহি জানি এই কুমার হয় কোনজন।
দেশে নিবার কার্য্য নাই অশুভ লক্ষণ ॥
সাত মানিক দিল রাজা এই চোরা হইতে।
হেন শালা দেশে নিয়া যাইব কি মতে ॥
এই সব সংবাদ যদি কহে নৃপ আগে।
ধন হেতু[২৭২] রাজায় কাটিবে ভাগে ২ ॥
নানা মতে ভাবি সাধু করিলেন্ত সার।
হস্তে গলে বান্দি ফেলি সমুদ্র মাঝার ॥
তবে একাশ্বরি কন্যা কি করিতে পারে।
লক্ষ্য না দেখিয়া তবে যাবে মোর ঘরে ॥
বিদেশে রহিবে কন্যা আমাকে বরিয়া।
আনন্দ করিব আমি সুন্দরী লইয়া ॥
তবেত কহিল সাধু আনহ সত্তর ।
করে গলে বান্ধি ফেলি সমুদ্র মাঝার ॥
আজ্ঞা পাই সৈন্যগর্নে ধরিয়া আনিল।
মজবুত[২৭৩] করিয়া সবে বান্ধিতে লাগিল ॥
ভয় পাইয়া কুমার ভাবে একি পরিবাদে[২৭৪]।
তোমাকে করিলাম দোষ কোন অপরাধে ॥
ডিঙ্গা নামাইয়া দিলাম সংহতি আনিলা।
আমারে বেচিয়া সব মালিক হইলা ॥
কার্য্য বুজাইবা তুমি দেশে লিয়া যাও।
কেন দুঃখ দেও মোরে ধর্ম্মের দিকে চাও ॥
সাধু বলে তোমাকে যে ফালাইব জলে।
এই সে কারণে বান্ধি করে আর গলে ॥

ধন হেতু[২৭২]=সম্পদের কারণে।

মজবুত[২৭৩](আরবী শব্দ মাযবৎ)=শক্ত বা কঠিন।

পরিবাদ[২৭৪](সংস্কৃত শব্দ)=নিন্দা ,অপবাদ বা দোষ।

Dhaka University Institutional Repository

এতেক শুনিয়া কুমার ভাবে মনে মন।
শৃগালের হাতে বন্ধি সিংহের নির্দ্দন ॥
চাহিতাম বিক্রম[২৭৫] করি এই ভয় তার।
বহু সৈন্য মারা যাবে সমুদ্র মাঝার ॥
লিখিত আছয় মোরে সাধুয়ে মারিবে।
ডুবাইলে নৌকা মোর কি কার্য্য হইবে ॥
যেবা আশা করি তা প্রভু দেয় ভঙ্গ।
হেন জানি প্রাণ কেন আনিয়াছি সঙ্গ ॥
ইস্ট মিত্র[২৭৬] নাহি মোর ভাই নাহি এবে।
আমারে মারিলে কন্যার কোন গতি হইবে ॥
আসিবার কালে বহু কুমঙ্গল দেখিলাম।
তার প্রতিফল আমি হাতে ২ পাইলাম ॥
রাজকন্যা দেখি সাধু হইল উল্লাস।
এ কারণে চাহে মোরে করিতে বিনাস ॥
কলঙ্কিণী হইনু আমি রাজকন্যা আনি।
শ্বশুর-শ্বাশুরী মোরে নিষ[২৭৭] দিল পুনি ॥
কি কার্য্য হইল মোর আসিয়া ভুবনে।
নরকি হইব আমি প্রিয়ার কারণে ॥
আইশ প্রিয়া দেখি তোমায় ক্ষেম অপরাধ।
এতদিনে বিধি মোর ফলিল প্রমাদ[২৭৮] ॥
নয়ান ভরিয়া রূপ দেখি একবার।
এই জনমে দেখা মোর না হইবে আর ॥
ওহে সাধু বন্ধি করি দুঃখ দেও কি কারণ।
বিনে বন্ধনে মোর জাইবে জীবন ॥

বিক্রম[২৭৫]=শক্তি। ইস্ট মিত্র[২৭৬]=আত্মীয় স্বজন।

নিষ[২৭৭]=নিষেধ।

প্রমাদ[২৭৮]=ভুল, ত্রুটি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাণ ফাটে মোর তব বন্ধনের তেজে।
তুরিত ফেলিয়া দেও সমুদ্রের মাঝে ॥
অন্তপাটে[২৭৯] আরে থাকি দেখয় কুমারী।
প্রিয়ার কাকুতি[২৮০] আর সহিতে না পারি ॥
অরুণ বরুণ আর গগনের আঁশ।
প্রিয়ার দুর্গতি দেখি কুমারী তরাস ॥
ছটফট করে প্রাণ হানিল অন্তরে।
লজ্জা ছাড়ি কহে কন্যা সাধুর হুজুরে ॥
কি লাগিয়া বধ তুমি মোর প্রাণপতি।
বিনা দোষে কেন কর এতেক দুর্গতি ॥
কি আশা করিয়াছ সাধু বুঝিতে না পারি।
শৃগালে খাইতে চাহে বাঘের মাংস ধরি ॥
আকাশের চন্দ্র দেখি ধরিবারে আস।
টেঁউটির[২৮১] হাতে যেন পতঙ্গের বিনাশ ॥
দেহ ত্যাগিয়া মাংস করিও ভক্ষণ।
হেন দুষ্ট আশা[২৮২] সাধু কর কি কারণ ॥
প্রিয়া সঙ্গে নেও মোরে তোমার ভুবন।
দাস দাসী হইয়া সেবা করিব তখন ॥
সাধুয়ে কহিল কন্যা শুন বিবরণ।
কাটিবারে দিছে মোরে নৃপতি রাজন ॥
না কাটিয়া রাখিয়াছি সঙ্গেতে রাখিয়া।
কোন মতে নিব তাকে দেশে ফিরাইয়া ॥
এহা শুনি ক্রোধ হইবে নৃপতি রাজন।
এই কারণে বান্দি ফেলি সমুদ্রে এখন ॥

অন্তপাটে[২৭৯] = অন্দর মহলে।। কাকুতি[২৮০]=অণুনয় বিনয়।

টেঁউটি[২৮১]= তরঙ্গ।

দুষ্ট আশা[২৮২]=খারাপ উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বজ্র্যাঘাত হইল কন্যা সাধুর কথা শুনি।
সেই কালে জানিছিলাম আমি অভাগিণী ॥
পূর্ব্বেতে সকল কথা পতি যে কহিল।
সেই সকল বাক্য এবে নির্শ্চয় ফলিল ॥
প্রিয়াকে বান্ধিয়া মোর ফেলিবেক জলে।
আশা করিয়াছে মোরে বিদেশীতে নিবে ॥
সঙ্গে হেন জন নাই উদ্ধারিবে আসি।
নির্শ্চয় জানিলাম মোরে করিবেক দাসী ॥
এই সব আশায় আছে সাধূর নন্দন।
মারিবারে চাহে ম্যের পতির জীবন ॥
এবেত ভরসা মোর আর কিছু নাই।
ভগবানের আগে কিছু কহিব বুঝাই ॥
নহেত নির্ব্বন্ধে মোর খণ্ডাইব তাফ[২৮৩]।
প্রিয়ার সঙ্গেতে আমি জলে দিব ঝাপ[২৮৪] ॥
তবেত কহিল কন্যা সাধুর গোচরে।
নিবেদন করি আমি কৃপা কর মোরে ॥
পতির সঙ্গেতে মার একত্রে বান্দিয়া।
সমুদ্রে ফালাও[২৮৫] সাধু ঈশ্বর ভাবিয়া ॥
পতির সঙ্গে পরলোক যদি আমি পাই।
অবশ্য ঈশ্বর আগে পাইব ভালাই ॥
দুর্গতি করিলে তোমা হবে কোন কাজ।
কলঙ্কিণী কেন কর লোকের সমাজ ॥
প্রিয়ার উদ্দেশ্যে মোর অবশ্য মরণ।
এবে না মরিলে মোরে মরিব তখন ॥

তাফ[২৮৩](সংস্কৃত√তপ+অ)=উষ্ণতা, উত্তাপ, দাহ।
ঝাপ[২৮৪](সংস্কৃত শব্দ)=লাফ দেয়া।
ফালাও[২৮৫]=নিক্ষেপ করা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়ার বিচ্ছেদ মোর প্রাণে না সইবে।
তবেত রাখিলে তোমার কি কাম হইবে ॥
দুঃখি দিগে চাহি এই কর প্রতিকার।
বিধবা হইতে মোরে করহ উদ্ধার ॥
কাতর হইয়া বহু কহিল কুমারী।
উদ্ধারি না দিল সাধু মনে আন করি[২৮৬] ॥
প্রিয়ার কাকুতি শুনি কুমারী দুঃখিত।
হীন সঙ্গে হেন বাক্য না হয় উচিত ॥
চন্দ্র সূর্য্য খসি পড়ে ভাঙ্গে ত্রিভুবন।
তাহাকে কাটিতে কহে যেজন কুজন ॥
দুপিসুতে[২৮৭] শত যুক্ত দিপি[২৮৮] নাহি হয়।
তথাপিও হীনজাতি ধর্ম্মশীল নয় ॥
ধর্ম্ম বির্মষিয়া[২৮৯] জান কোন ফল নাই।
আমার নিবর্বন্ধে প্রিয়া আছিল এছাই[২৯০] ॥
কিন্তু রবে এই দুঃখ অন্তর মাঝারে।
মাতা পিতা ছাড়াইয়া আনিলাম তোমারে ॥
ভাল মতে হাস্যলাস তোমা সঙ্গে না হইল।
এই সে দারুণ দুঃখ মরণে রহিল ॥

বিঃ দ্রঃ

দুপিসুতে শত যুক্ত দিপি নাহি হয়।
তথাপিও হীন জাতি ধর্ম্মশীল নয় ॥
ধর্ম্ম বির্মষিয়া জান কোন ফল নাই।
আমার নিবর্বন্ধে প্রিয়া আছিল এছাই ॥

অর্থাৎ আগুন জ্বালিয়ে তাতে শত শত মন ধুপ দিলে আলোর উজ্জ্বলতা বাড়ে না। বরং ধোঁয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তেমনি খারাপ ব্যক্তিকে যত উপদেশ দেওয়া হোক না কেন, সে কখনই ধার্মিক হতে পারে না বরং ধর্মের আবারণ পরিধান করে 'বক ধার্মিক' সাজে মাত্র।

আন করি[২৮৬]=অন্য ভাবনা। দুপিসুতে[২৮৭]=জলন্তধূপ।
দিপি[২৮৮]=আলো বা উজ্জ্বলতা।
বিমর্ষিয়া[২৮৯]=ভুলে যাওয়া। এছাই[২৯০]=এই রকম।

Dhaka University Institutional Repository

আর এই উঠে সদা মোর মনান্তরে।
রাজকন্যা হইয়া তুমি যাবা সাধুর ঘরে ॥
অবলা বিধবা করি যাইব আমি চলি।
মনে দুঃখ ভাবি কন্যা নাহি দিবা পানি ॥
তোমার জনক স্থানে বহুত কহিল।
তথাপি আমার নিকট তোমা বিভা দিল ॥
নির্ব্বন্ধ আছিল প্রিয়া কপালের লিখন।
এতে দুঃখ ভাব তুমি কিসের কারণ ॥
এ জনমে বিদায় দেও দেখা নাহি আর।
প্রণয় কালেতে দেখা তোমার আমার ॥
পুরাইতে নাহি দিল আশা বিধাতা।
আর এক নিবেদন শুন রাজসুতা[২৯১] ॥
আদি অন্ত বৃত্তান্ত সব কহি একারণে।
বুঝিয়া করিবা কার্য্য যেবা লয়ে মনে ॥
হেন কালে কুমারীর স্মরণ হইল।
বৃক্ষ মূলে স্বপ্ন কথা যেমন কহিল ॥
কন্যার গলে ধরিয়া কহিলেক বাণী।
ছয় মাস অবধি[২৯২] বিলম্ব করিবা সুরধনি[২৯৩] ॥
তারপরে যেবা যুক্তি হয় তোমার মন।
আমার লাগিয়া প্রিয়া প্রাণ কর পণ ॥
কান্দিয়া কহিল কন্যা পতির গোচরে।
এবে সন্তাসিয়া তুমি যাও হে আমারে ॥
নিলঙ্গ[২৯৪] সমুদ্রে তোমায় ফেলিবে বান্দিয়া।

রাজসুতা[২৯১]=রাজার কন্যা। অবধি[২৯২]=অপেক্ষা।

সুরধনি[২৯৩]=যৌবনবতী কন্যা।

নিলঙ্গ[২৯৪]=ফুল কিনারা বিহীন বিশাল সমুদ্র।

Dhaka University Institutional Repository

এহাতে বাঁচিয়া যাবা আমার লাগিয়া ॥
তখন কহিলাম প্রিয়া আমি অভাগিনী।
বৈদেশির সঙ্গে মোরে নেও একাকিনি ॥
জনক জননীর বাক্য তখন ফেলিয়া।
আমারে আনিলা প্রিয়া দুর্গতির লাগিয়া ॥
স্বর্গবাসী হইয়া তুমি যাবা স্বর্গপুরি।
না জানিনু অভাগিনি কত দুঃখে মরি ॥
দুষ্টের হাতে উদ্ধার আমি কিমতে হইব।
কিমতে বিলম্ব প্রিয়া কিমতে চাহিব ॥
হেন দুসা[২৯৫] হইব প্রিয়া ছিল তোমার মনে।
বিবাহ করিলা মোরে কিসের কারণে ॥
গলে হাতে নাহি আর বিবাহের বাস[২৯৬]।
হেন কালে ছাড়ি যাও করিয়া নৈরাশ ॥
অল্প বয়সের কালে দুষি মোরে করিলা।
রাজপুত্র হইয়া প্রিয়া দুঃখ না গণিলা ॥
জনক জননীর আমি পরাণের সমান।
বড় অভিলাষে বিবাহ দিল তোমাস্থান ॥
এই কর্ম্ম তার ঘরে করিলা আপনি।
এক কন্যা ছিল তার কুলের কলঙ্কিণী ॥
আপনার দুঃখ কন্যা লাগিছে কহিতে।
দুষ্ট মতি[২৯৭] সওদাগর না পায় শুনিতে ॥
আজ্ঞা দিল সাধু তবে শুন সৈন্যগণ।
কুমার ফেলিয়া কর কন্যার রক্ষণ ॥

হেন দুসা[২৯৫]= তৎকালীন অবস্থা।

বিবাহের বাস=বিবাহের লক্ষণ।

দুষ্ট মতি[২৯৭]=কুমতলব সম্পন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

সাধুর বচনে তবে ধরিয়া কুমার।
তুরমানে[২৯৮] ফেলি দিল জলের মাঝার ॥
হাহাঙ্কার করি কন্যা উপায় না দেখিল।
এক বালিশ[২৯৯] প্রিয়ার আগে ফেলিয়া দিল ॥
সেইত বালিশ ধরি সমুদ্রে ভাসয়[৩০০]।
কোন দিকে লইয়া গেল নাহিক নির্ণয় ॥
উর্দ্ধমুখী[৩০১] হইয়া কন্যা চাহে ফিরি ২।
প্রিয়া না দেখিয়া কান্দে কুহুরি২ ॥
হীন হাফেজদ্দীন কহে ভাবি করতার।
পুরা করি দেহ মোরে প্রভু করতার ॥

তুরমানে[২৯৮] (সংস্কৃত শব্দ)=শীঘ্র, দ্রুত, সত্বর।
বালিশ[২৯৯](ফারসী শব্দ)=উপাধান।
ভাসয়[৩০০]=ভাসে।
উর্দ্ধমুখী[৩০১]=উপর ওয়ালার দিকে মুখ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪ তম পরিচ্ছেদ

কুমারের বিচ্ছেদে কন্যার বিলাপ

ঃ ধুয়া একাবলি ছন্দ ঃ

এত দুঃখ আর সহিতে না পারি।
প্রবোধ[৩০২] না মানে যেন দেলে বেকরারি[৩০৩] ॥
কি ক্ষেণে রুপিণু[৩০৪] বৃক্ষ না হইল ফল।
হৃদয়েতে অগ্নিজলে সদাই বিকল ॥
সংসারের জত সুখ ছাড়িলাম যার কারণ।
সে যদি না করে দয়া বিফল জীবন ॥
মনবাঞ্ছা না পুরিল পাই উপদেশ।
দৈবগতি[৩০৫] হতে মৃত্যু জানিবেক শেষ ॥
একমন হইলে দোহে দুজনাকে লাগে।
একি বিপরীত হইল আমা হইতে ভাগে ॥

প্রবোধ[৩০২]=সান্ত্বনা, আশ্বাস, যে বাক্য দিয়ে কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করা হয়।
বেকরারী[৩০৩] (ফারসী শব্দ)=অজুহাত।
রুপিণু[৩০৪]=রোপণ করি।
দৈবগতি[৩০৫]=হঠাৎ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫ তম পরিচ্ছেদ

কাঞ্চন মালার দুঃখ বর্ণনা

ঃ ত্রিপদি ঃ

বুদ্ধিমন্ত পিতা বরে,   বৈদেশীরে দিল মোরে,
সম্পূর্ণে হইলাম আমি ধন্ধ[৩০৬] ॥
তাথে নাহি বলা বল,   যে ছিল করমের ফল,
এই ছিল আমার নির্ব্বন্ধে ॥
রাজপুত্র নিজ দেশে,   আসিল অপরূপ বেশে,
পিতা কহিল বারে বার ॥
পিতার বাক্য না রাখিল,   কুলের কলঙ্ক হইল,
কিবা দোষ দিব যে কাহারে ॥
প্রিয়া মোর ভাই সোগে[৩০৭],   তাথে জন্মিল রোগে,
আমি না কহিলাম ভয় করি ॥
পিতা মোর রাজ্যেশ্বরে,   নৌকা করি দিবে মোরে,
যাব তোমার নিজ পুরি ॥
যুক্তপতি প্রধান,[৩০৮]   না ফেলিত মোর বচন,
কভু না ফেলিত মোর বাণী ॥
তবে কেন সাধু তরে,   আসিলাম নৌকার পরে,
বুদ্ধি দোষে হারাইলাম প্রাণী ॥
পিতা মাতা বন্ধু জন,   হারাইলাম অকারণ,
প্রিয়া সঙ্গে বিদেশে আসিলাম ॥
আমাকে অনাথ[৩০৯] করি,   প্রিয়া গেল স্বর্গপুরি,
কেন তোমার আগে না মরিলাম ॥
দাস দাসী সঙ্গে করি,   আসি নাই দুঃখ ভাবি,
কার সঙ্গে কহিব বচন ॥

ধন্ধ[৩০৬](সংস্কৃত শব্দ থেকে উদ্ভব)=দৃষ্টিভ্রম। সোগে[৩০৭]=সোকে।
যুক্তপতি প্রধান[৩০৮]=মন্ত্রনাসভার মুখপাত্র। অনাথ[৩০৯]=এতিম, অসহায়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়া মোরে ছাড়ি গেল, একেশ্বর হইয়া রইল,
দুষ্টবর সাধুর নন্দন ॥
উন্মতি ভাব[৩১০] দেখি, মোর দিক চাহে আঁখি,
নিশ্চয় বল করিব আসিয়া ॥
উপায় নাহিক আর, সব তুমি করতার,
দুষ্ট হাতে করিবা উদ্ধার ॥
প্রিয়ার কহিল বাণী, ছয় মাস রহিবা তুমি,
শেষে আমি ত্যাজিব জীবন ॥
যদি পার করে বিধি, ছলে গিয়া পায় নদী,
মোর লাগি দুঃখ পাবে মনে ॥
সে আশাতে কি করিব, দুষ্ট হাতে না তরিব[৩১১],
সঙ্গে হেন বন্ধু নাহি আর ॥
চাহিয়া মিনতি করি, যদি কৃপা কর বিধি,
তবে সে হইতে পারি পার ॥
আছিলাম রাজসুতা, অকুমারী অবিবাহিতা,
এবে মোরে করিলা কলঙ্কিনী ॥
অনাথের নাথ বন্ধু, কৃপার সাগর সিন্দু,
উদ্ধার করি লেহ অভাগীরে ॥
আমি একাকিনি ধনি, বিরহের অনাথিনী,
কিমতে বঞ্চিব[৩১২] একাশ্বরী ॥
এই বর মাঙ্গি[৩১৩] আমি, অলক্ষিতে[৩১৪] ছাড় তুমি,
তোমাজন পাব স্বর্গপুরি।
অধীন হাফেজ আলী কহে, বিলাপ না প্রাণে সহে,
মনের মানস পুরাও কর তার ॥

উন্মতি ভাব[৩১০]=উম্মাদ বা যে কোন বাঁধ মানে না।
তরিব[৩১১]=পরিত্রাণ। বঞ্চিব[৩১২]=বঞ্চনা।
মাঙ্গি[৩১৩]=প্রার্থনা। অলক্ষিতে[৩১৪]=আগোচরে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬তম পরিচ্ছেদ

কাঞ্চন মালার দুঃখ বর্ণনা

ঃ পয়ার ঃ

আহারে প্রাণের প্রিয়া অনাথের নাথ।
কলঙ্কিনী করিলা মোরে দিয়া চিলের[৩১৫] হাত ॥
সোহাগিনী নারি পাইয়া মোরে গেলা ছাড়ি।
নব জৈবন নারিকে তুমি করিলা যে রাঢ়ী[৩১৬] ॥
মোর পতিরাজ ইন্দ্র দেখিতে সুন্দর।
কিমতে করিব আমি হীন সাধুর ঘর ॥
কামদেব জিনি রুপ মোর পতি ছিল।
হংসরাজ ধ্বজ দেখি কলান্ধই[৩১৭] হইল ॥
রামের অনুজ[৩১৮] ভাই লক্ষণ আকৃতি।
হেন পতি মারি করিলা দুর্গতি ॥
ভজিয়া[৩১৯] চরণে আমি না করিণু সেবা।
আমাকে অনাথ করি পতি নিলা কেবা ॥
মোরে কর্ম্ম দোষে হেন পতি হারাইলাম।
দুষ্টের হাতে আমি জাতি হারাইলাম ॥
ইচ্ছায় ধরিলাম পতি আমি অভাগিনী।
কিবা দোষ দিব আমি প্রভু গুণমনি ॥
জিজ্ঞাসা করিল জবে নৃপতি রাজন।
তুরিত কহিলাম কর বিবাহের সাজন ॥
স্মরণে হৃদয় ফাটে না সহে পরাণে।
নির্শ্চয় পরিব আমি সমুদ্রে এক্ষণে ॥

চিল[৩১৫](সংস্কৃত শব্দ থেকে উদ্ভব)=এক জাতীয় হিংস্র পাখী ধারালো নখ বিশিষ্ট, মাংশাসী পাখী, এর ছোবল কখনো এড়ায় না। রাঢ়ি[৩১৬](সংস্কৃত রণ্ডা শব্দ থেকে উদ্ভূত) বিধবা, পতিহীন। কলান্ধই[৩১৭]=ইতস্তত পরিভ্রমণকারী মুসলমান ফকির বিশেষ। অনুজ[৩১৮] =ছোট। ভজিয়া[৩১৯]=প্রার্থনা করা।

Dhaka University Institutional Repository

শুণ গঙ্গাদেবী তুমি জল অধিকারী।
দয়া করি মোর পতি দেও যে উদ্ভারি ॥
নহে বদ[৩২০] দিব আমি তোমার উপর।
প্রিয়া বিনে বাঞ্ছা নাহি এ ভব সংসার ॥
গঙ্গী হরিয়া নিল মোর প্রাণপতি।
স্বর্গপুরি আমি তাকে করিব দূর্গতি ॥
এবে মোর পতি যেন দুঃখ নাহি পাই।
মিনতি করিয়া গঙ্গী তোমাকে শুনাই ॥
আহা প্রভু করতার কি করিবা মোরে।
কোন আশা করে জানি সাধু সওদাগরে ॥
যদি সে পরাণে মারে কাতি[৩২১] দিবা গলে।
নহে ঝাপ দিব আমি সমুদ্রের জলে ॥
দর্শনে কাটিয়া[৩২২] জিহবা ত্যাজিব জীবন।
অবশ্য এক দিন হবে আমার মরণ ॥
জন্মিলে মরন পন্থ আছয় নিশ্চর্য়।
মরণের প্রতি মোর কিছু নাহি ভয় ॥
মোর সঙ্গে হইল বুঝি অধর্ম সঞ্চার।
আশা নাহি দুষ্ট হাতে হইব উদ্ধার ॥
কামবাণে সাধু সদা করে ধরফড়ি[৩২৩]।
পঞ্চপ্রাণি[৩২৪] বৈরী হইয়া রহিল কুমারী ॥
কি কহিব কন্যা সঙ্গে ভাবে মনে মন।
কি মতে কন্যার সাথে হইবে মিলন ॥
ডিঙ্গা[৩২৫] আরোহিয়া যদি গেল কতদূর।
পাকেতে[৩২৬] পরিল ডিঙ্গা পায় দুঃখ ভার ॥

বদ[৩২০]=খারাপ, অভিশাপ। কাতি[৩২১]=এক প্রকার ধারালো অস্ত্র।
দর্শনে কাটিব[৩২২]=এক প্রকার দারালো অস্ত্র।ধরফড়ি[৩২৩]=অস্থিরতা প্রকাশ, ছটফট।
পঞ্চপ্রাণী[৩২৪]=কাম, ক্রোধ, লোভ, মায়া, মাৎশের্য।
ডিঙ্গা[৩২৫]=নৌকা। পাকেতে[৩২৬]=নদীর পানির স্রোতের ঘোল পড়ে যে স্থানে।

Dhaka University Institutional Repository

উর্ম্মি[৩২৭] পরে তল যায় গগন পায় হাতে।
হেটেতে নামিলে পরে বাসুকির মতে ॥
পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ চারিদিকে ধরে।
চরখায়[৩২৮] তুলিয়া যেন পাকেতে ঘুরায় ॥
ডিঙ্গার পরেতে ছিল যত সৈন্যগণ।
মনান্তরে দুঃখ ভাবি জুড়িল কান্দন ॥
জীবন নৈরাস দেখি গলে ২ ধরি।
কান্দিতে লাগিল সবে কুহুরি ২ ॥
সাধুয়ে কান্দন করে এই দুঃখ মন।
একদিন কন্যা সাথে না হইল মিলন ॥
স্বপত্য নির্ভর্য়[৩২৯] তথা রাজার কুমারী।
আজ শুভদিন বিধি করিলা আমারি ॥
আপ্তঘাতি[৩৩০] হই যদি মরিতাম প্রাণী।
অপরাধ হয় তাহা পুরাণে শুনি ॥
পতির সমাজে মোর সাফল্য হইল।
কলঙ্কিনী হইতে মোর উদ্ধার করিল ॥
আজি গিয়া পতির সঙ্গে হইবে মিলন।
স্বর্গপুরে রহিব যে কৌতুহল মন ॥
কিছু মাত্র অভাগির এই দুঃখ আসে।
কুল পাইলে প্রিয়া দুঃখ পাবে শেষে ॥
আমার না গিয়ে প্রিয়ে জাইবে কান্দিয়া।
আমি ত সমুদ্র মাঝে যাইব মরিয়া ॥

উর্ম্মি[৩২৭]=ঢেউ, উত্তাল তরঙ্গ।

চরখায়[৩২৮]=সুতা পাক দেওয়ার হাতল বিশিষ্ট কাঠের যন্ত্র।

স্বপত্য নির্ভয়[৩২৯](সংস্কৃত শব্দ) =নির্ভয়ে শত্রুর চলার গতি।

আপ্তঘাতি[৩৩০]= নিজের প্রাণ নিজে বিনাশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

এই নিবেদন করি ঈশ্বরের পায়।
মোরপতি প্রভু যদি আনি দেয় আমায় ॥
তবে ডিঙ্গা বাঁচাইয়া দেও নিয়া কুলে।
নহে ডুবাইয়া মার সমুদ্রের জলে ॥
হেনকালে ঈশ্বরের কৃপা আসি হইল।
কুমারীর তপস্যায় ডিঙ্গা কেনারা[৩৩১] পাইল ॥
নিজ জান সমুদ্রে হইল নৌকার মোচন।
কামাতুর হইল তবে সাধুর নন্দন ॥
কহিতে কন্যার ঠাঁই মনে ভয় করি।
আপ্তঘা দেহ ছাড়ি জাইবে কুমারী ॥
মনান্তরে দুঃখ ভাবি সাধুর নন্দন।
কহিতে লাগিল তবে সাধুর বচন ॥
শুন কন্যা নিবেদন করি তোমার তরে।
নিবর্বন্ধ আছিল কুমার গেল স্বর্গপুরে ॥
কুমার কারণে তুমি না কর ঘোষণা।
পাইবে অধিক বর[৩৩২] স্থির কর মনা ॥
আমি দেখ সওদাগর দেখিতে সুন্দর।
তোমা যুক্তপতি[৩৩৩] আমি বর হেন বর ॥
এবে কি জানিবা আমার গুণের বাখান।
প্রেম ভাব করি তবে মোর কর্ম্ম জান ॥
আমার বন্ধিয়ান বেটা ছিল তোমাপতি।
হেনস্বরে বঞ্চে বেটা মোর দুঃখ অতি ॥
এ কারণে বান্ধি তাকে ফেলিলাম আমি।
আমার ঘরের যুক্তরমণী[৩৩৪] যে তুমি ॥

কেনারা[৩৩১]=তীর, পার।অধিক বর[৩৩২]=উপযুক্ত পাত্র।
যুক্তপতি[৩৩৩]=যোগ্য স্বামী। যুক্তরমণী[৩৩৪] =যোগ্য স্ত্রী।

Dhaka University Institutional Repository

দাস দাসী আছে মোর নানা রত্ন আর।
রমণী বিহনে তাহা সব অন্ধকার ॥
সুপিতে[৩৩৫] তোমার স্থানে মোর মনে লয়।
যদি মোর হয় হেন ভাগ্যের উদয় ॥
পুনর্ব্বার বিবা তুমি দেহ আমার পাস।
নহে তোমা মারি আমি হইব নৈরাস ॥
তোমা রুপ দেখি মোর না রহে জীবন।
আলিঙ্গন দিয়া কন্যা করহ রক্ষণ ॥
ইস্বদ হাসিয়া কন্যা মাথায় দিল হাত।
পোড়া মুখে হাস্য আইসে শুনি এই বাত ॥
কিবা দর্প[৩৩৬] করে সাধু কিবা করে আস[৩৩৭]।
হেন ছাড় থুইয়া[৩৩৮] জমে করে উপহাস ॥
ক্রোধানলে জ্বলি ভাবি অপমান।
হিল্লল[৩৩৯] হইতে উদ্ধারিতে নাহি দেখি স্থান ॥
বিশেষ সন্তাপ তাপে অনল জ্বালায়।
নিবারিতে প্রভু বিনে নাহিক উপায় ॥
ভাবিয়া যে ছয় মাস বুঝিবে কারণ।
যদি সত্য[৩৪০] রাখে প্রিয়া প্রভু নিরাঞ্জন ॥
কহিতে লাগিল কন্যা অতি মিষ্ট স্বরে।
শুন সাধু মোর দুঃখ কহিজে তোমারে ॥
মারিলা সমুদ্রে ফেলি মোর প্রাণ পতি।
তুমি বিনে এবে আর কেবা আছে গতি ॥
পিতা মাতা নাহি এথা নাহি বন্ধুগণ।
কৃপা করি কেবা মোরে করিবেক পালন ॥

সুপিতে[৩৩৫]=বরণ করতে। দর্প[৩৩৬]=অহংকার।
আস[৩৩৭]=আশা। থুইয়া[৩৩৮] রেখে।
হিল্লল[৩৩৯]=বাতাস। সত্য[৩৪০]=প্রতিজ্ঞা।

Dhaka University Institutional Repository

তবে মাত্র এই কৃপা আমাকে করিবা।
ছয় মাস অবধি মোর বিলম্ব চাহিবা ॥
পিতা এবে মাতার বংশে বিধবা হইলে।
সমাপ্ত করায় তার ছয় মাস পুরিলে ॥
তারপর দৈবে মোর যেবা আছে আর।
তোমার সংসারে আমি লব দুঃখ ভার[৩৪১] ॥
হাস্যলাস[৩৪২] পুরাইব পতি লইয়া আস।
দিন যত ক্ষেম মোরে তুমি ছয় মাস ॥
ইতিমধ্যে যদি মোর দুঃখ দেও মন।
দর্শনে কাটিয়া জিহবা ত্যাজিব জীবন ॥
রাজকন্যার বাক্য শুনি সাধু পুলকিত।
আমাকে বরিবে হেন জানিনু নিশ্চিত ॥
মনের মানস যেবা কহিল কুমারী।
আমি বিনে একে আর জাবে কার পুরি ॥
তবেত কহিল সাধু শুন রাজসুতা।
তোমার বচনে আমি করিনু রক্ষতা[৩৪৩] ॥
কিন্তু যে তোমাকে দেখি ভুলে মুনিগণ।
তপস্যা ছাড়িয়া রূপ করিবে নিরীক্ষণ ॥
সংসারে না রহে মন তোমা দরশনে।
অবশ্য আমার প্রতি রাখিবে যেমনে ॥
তোমার বচনে আমার হইল ভরসা।
আমা হইতে পুরিবে তোমা মন আশা ॥
আখি ভ্রহ্মাহিয়া[৩৪৪] কন্যা রহিল আপনে।
কিবা আশা করে দুঃখ সাধুর নন্দনে ॥

দুঃখ ভার[৩৪১]=দায়-দায়িত্ব। হাস্যলাস[৩৪২]=আশা আকাঙ্খা।
রক্ষতা[৩৪৩]=রক্ষা করা। ভ্রহ্মাহিয়া[৩৪৪]=দৃষ্টি মেলে।

Dhaka University Institutional Repository

তবে কতুহলে সাধু আনন্দে চলিল।
আরোহণ করি ডিঙ্গা ঘাটে চাপাইল ॥
সাধুর নগরে পরে জয় ২ ধ্বনি।
আসিল পুরির লোক সাধুর কথা সুনি ॥
শীর্ঘ্র আজ্ঞা দিল সাধু সুপালা আনিতে।
কুমারী তুলিয়া আনে নিলেক পুরিতে ॥
তারপর ডিঙ্গার যত ধনমাল তুলিয়া।
অবশেষে অন্তপুরী গেলেন্ত চলিয়া ॥
সাধুকে কহিল শুন কহি তোমা তরে।
ভিন্ন এক পুরি দেও কন্যা বরে ॥
রন্ধন[৩৪৫] করিয়া আমি আপনে খাইব।
অন্য জনে কেহ্ মোরে দেখিতে না পাব ॥
তবে সাধু ভিন্ন করি দিল এক পুরী।
দুঃখিত হইয়া তথা রহিল কুমারী ॥
আইসে কিনা আইসে প্রিয়া এই দুঃখ গুণি।
নয়নের জল ঝরে দিবস রজনী ॥
প্রিয়া পন্থ হেরি কন্যা রহিল ভাবিয়া।
এবেত কহিব কুমার জাইতে তরিয়া ॥
যখন কুমার বান্ধি জলেতে ফেলিল।
হেতুবুদ্ধি[৩৪৬] পঞ্চপ্রাণী তখন ছাড়িল ॥
মরার আকৃতি কুমার ভাসে স্থানে ২।
অগাধ সমুদ্রের ঢেউ উঠায় গগনে ॥
হিল্লল পরে ভাসে যেন বটপত্র খসি[৩৪৭]।
ভেলার আকৃতি কুমার ভাসে নিশি দিশি[৩৪৮] ॥

হেতু বুদ্ধি[৩৪৫]=উপস্তি বুদ্ধি। রন্ধন[৩৪৬]=রান্না করে।

বটপত্র খসি[৩৪৭]=বটগাছের পরিত্যাক্ত পাতা।

নিশি দিশি[৩৪৮]=রাত্রি দিন।

ভাটিতে[৩৪৯] লইয়া যায় ক্ষীরনদী সাগরে।
জোয়ারে[৩৫০] তুলিয়া নেয় হিমালয় পরে ॥
উপরেতে তুলে যেন গগন সমান।
নিচেতে নামিলে যায় বাসুকির স্থান ॥
অধিক গভীর নদী দেখি ভয়ঙ্কর।
লক্ষ আর নাহি তথা বিনেতে ঈশ্বর ॥
বরুণের[৩৫১] বর আছে কুমারের পরে।
মন পবন ছাপাইয়া রাখিল অন্তরে ॥
শিতল মন্দিরে গিয়া রহিছে ছাপাইয়া।
নির্ব্বন্ধ পুরিলে বারি উঠিব আসিয়া ॥
উত্তরে হিমালা নদি দক্ষিণে ক্ষীর নদী[৩৫২]।
পঞ্চমাস কুমার ভাসে নিরবধি ॥
হেনকালে কৃপা হইল কৃপার বাখান।
এখন জাইবে কুমার কুমারীর স্থান ॥
জকুম নদীর কুলে এক বৃন্দাবন।
পাষাণ বান্ধিতে[৩৫২] ঘাট অধিক নির্ম্মাণ ॥
সেই ঘাটে যাইয়া যে কুমার ঠেকিল।
বন্ধি হইতে সেই ঘাটে ঈশ্বর আনিল ॥
দুই তিন বৎসরের মধ্যে বৃন্দাবন মাঝ।
না ফুটে মালঞ্চ[৩৫৩] নাহি ভেমরার সাজ ॥
সেই নিশি বৃন্দাবনে ফুল যে ফুটিল।
ভেমরার গুঞ্জন সেই বৃন্দাবনে হইল ॥

ভাটিতে[৩৪৯]=সাগরের দিকে বা দক্ষিণ দিকে। জোয়ারে[৩৫০]=পানি উথলিয়ে উঠে প্রবাহিত হওয়া। বরুণ[৩৫১]=জলের দেবতা। ক্ষীর নদী[৩৫২]=একটি নদীর নাম। বাঙলা রুপ কথায় এই নদী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ক্ষীর নদী আসলে ভাটির অঞ্চলে লবনাক্ত পানি বিশিষ্ট বুঝানো হয়েছে।পাষাণ বান্ধিতে[৩৫৩]=পাথর দিয়ে বাঁধা। মালঞ্চ[৩৫৪]=এক প্রকার ফুলের নাম।

Dhaka University Institutional Repository

মালিনী জাগিয়া উঠে দেখিয়া স্বপন।
অমনি[৩৫৫] শুনিল বনে ভেমরার গুঞ্জন ॥
সুগন্ধি চন্দন বহে বৃন্দাবনে তার।
কর্নে লাগে মালিনী কহে সভার গোচর ॥
হেনকালে নিশি ছাড়ি প্রভাত হইল।
সখিগণ সঙ্গে করি বৃন্দাবনে গেল ॥
ঘাটেতে নামিল আচন[৩৫৬] করিবার।
অদ্ভুত আকৃতি দেখি ঘাটের উপর ॥
মালিনী দেখিয়া কুমার ত্রাস ভারি[৩৫৭] পাইল।
পুষ্পের গন্ধে লোভে কিবা গান্ধর্বব[৩৫৮] আইল ॥
যেন পুষ্পের গন্ধ বিকাশ করিল।
পবন আকুল তথা বৃন্দাবনে আইল ॥
কুমারের রুপ দেখি বৃদ্ধ যে মালিনী।
নিকটে যাইয়া তাকে জিজ্ঞাসিল বাণী ॥
মালিনী কহিল তুমি হও কোন জন।
জল মধ্যে বন্দি হইয়া কিসের কারণ ॥
মনুষ্যের লক্ষ্য[৩৫৯] কিন্তু নাহিক তোমার।
কোন জাতি হও তুমি কহ সত্য সার ॥
আঁখি মেলিয়া তখন কুমার দেখিল।
নক্ষত্রের মধ্যে যেন শশি উদয় হইল ॥
চারিপাশে দাড়াইছে সখি সবগণ।
তার মধ্যে রুপ যেমন চন্দ্রের কিরণ ॥

অমনি[৩৫৫]=হঠাৎ, সহসা। আচন[৩৫৬](আচা+আন)=কোন কিছু খাওয়ার পরে বর্তন রেখে বাইরে গিয়ে হাত মুখ ধোয়া।ত্রাস ভারি[৩৫৭]= ভয়।

গান্ধর্বব[৩৫৮]= হিন্দুমতে এক প্রকার দেবযোনি, স্বর্গের গায়কগোষ্ঠী। মনুষ্যের লক্ষ্য[৩৫৯]=মানুষের আকৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

মালিনী দেখিয়া কুমার তুষ্ট হইর মন।
কহিব সকল কথা খোলহ বন্ধন ॥
সখি লইয়া মালিনী তার বন্ধন খুলিল।
মালিনীর তরে তবে কহিতে লাগিল ॥
কুমার কহিল তারে শুনতে করতার।
এই কোন রাজ্য হয় কি নাম এথার[৩৬০] ॥
মালিনী কহিল এই জকুম সহর।
শিত রাজা হয় এই রাজ্যের ঈশ্বর ॥
এতেক সুনিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
নির্শ্চয় জানিব শিত হয় কোন যে জন ॥
কিবা এই রাজ্যের রাজা পূবের্বতে আছিল।
কি রূপে পরের দেশে এই রাজ্য হইল ॥
তবেত কহিল কুমার মালিনীর তরে।
পরদেশি রাজা কিবা পূর্বের ঈশ্বরে ॥
মালিনী কহিল পূবের্বর কবিচন্দ্র রাজা।
স্বর্গবাসি হইল হস্তি ছাড়ি দিল প্রজা ॥
চাহিয়া পাটের রাজা[৩৬১] রাখিলেক আনি।
রাজপুত্র করি সবে করে অনুমানি ॥
চিনিতে না পারে কেহ ছিল কোন পুরি।
এমন যুজ্ঞতা কিবা জিজ্ঞাসন[৩৬২] করি ॥
এতেক সুনিয়া কুমার নির্শ্চয় জানিল।
এই মোর ভাই হেন বুঝিতে পাইল ॥
ভাসাইয়া আনে বিধি ভাইর সহরে।
এহাতে জানিনু আশা পুরিল আমারে ॥

এথার[৩৬০]=(সংস্কৃত অত্র) > প্রাকৃত এথ > এথ+আ > এথা=এখানে।

পাটের রাজা[৩৬১]=সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

জিজ্ঞাসন[৩৬২]= জেনে নেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়াকে আনিছে আমার এই দেশ মাঝে।
ঈশ্বর করিলে সেই হবে মোর কাজে ॥
মনেতে ভাবিয়া কুমার ভরসা করিল।
এই রমণী হই তোমার কর্য্যসিদ্ধি হইল ॥
সুনহ মালিনী তুমি মোর ধর্ম্মমাতা[৩৬৩]।
তোমার উদ্দেশে মোরে আনিল বিধাতা ॥
সংসারের সাজে মোর আর লক্ষ নাই।
বুঝি এ বলিয়া কহিবা সর্ব্ব ঠাঁই ॥
এক ভাই ছিল মোর নিদয়া নিঠুর।
বান্ধিয়া ফেলিল মোরে আকুল সমুদ্রর ॥
ভাসাইয়া আনিল বিধি তোমা এই স্থানে।
পালন করিবা মাতা পুত্র সম গুণে ॥
মালিনী কহিল আমি পুত্র কন্যা হীন।
ভাগ্য ফলে পাইলাম তোমা শুভ দিন ॥
কুমার পাইয়া অতি কৌতুক অন্তরে।
আনন্দে লইয়া গেল আপনার ঘরে ॥
রন্ধন করিয়া কুমার ভোজন করিল।
বহুত গৌরব করি[৩৬৪] মালিনী রাখিল ॥
কুমার আসিল তথা কন্যা নাহি জানি।
সদায় বিলাপ করে মনে দুঃখ গণি ॥
সাধুর পুরি থাকি কন্যা করে হাহাকার।
কিবা আশা করিছিলাম পতি পাইবার ॥

ধর্ম মাতা[৩৬৩]=ধর্ম সাক্ষী রেখে যাকে মা রুপে গ্রহণ করা হয়েছে।

বহুত গৌরব করি[৩৬৪]=অহংকার।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চমাস গেল দেখি দুঃখ অভাগিনী।
উদ্দিশ না পাই কোথা প্রভু গুণমনি ॥
ছয় মাস অবধি আমি ভাণ্ডিলাম সাধুরে।
এবে জানি কোন গতি হবে অভাগিরে ॥
নিস্ফল জৌবন গেল সংসারে আসিয়া।
অবশ্য ছাড়িব দেহ প্রিয়া উদ্দেসিয়া[৩৬৫] ॥
এই মতে দিবা নিসি ভাবে মনে মন।
সোগেতে আকুল হইয়া করে ক্রন্দন ॥
কান্দিয়া ধুলায় পড়ি করে হায়-২।
মনের দুঃখেতে রাণী বার ২ মুর্ছা[৩৬৬] যায় ॥

উদ্দেসিয়া[৩৬৫]=উপলক্ষ করে।

মুর্ছা[৩৬৬]= জ্ঞান হারায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৭ তম পরিচ্ছেদ

কাঞ্চনমালার বারমাসি

ঃ পয়ার ঃ

বৈশাখ মাস

বৈশাখ[৩৬৭] মাসেতে সখি ফুল নানা রাসি।
মত্ত[৩৬৮] হইয়া মধু খায় ভেমরায় বসি ॥
ভেমরা গুণ ২ করি 'ফুলের মধু খায়।
আমার ফুলের মধু অকারণে যায় ॥
ভেমরার রিতি দেখি দগধে পরাণ।
আমার ফুলের মধু কে করিবে পান ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস

জ্যৈষ্ঠ[৩৬৯] মাসেতে পাকা আমা সব লোকে খায়।
আমার গাছের আম কে খাইবে হায় ॥
পতিকে লইয়া সবে তুষ্ট হইয়া খায়।
আমার গাছের আম গাছেতে সুকায় ॥
বড় স্বাদ ছিল মনে পতিকে খাওয়াইব।
পতি বিনা কারে আমি নিচরিয়া[৩৭০] দিব ॥

বৈশাখ[৩৬৭]= বাঙলা মাসের প্রথম মাস। মত্ত[৩৬৮]=মাতাল।
জ্যৈষ্ঠ[৩৬৯]=বাঙলা মাসের ২য় মাস। তুষ্ট > তুষ্ট=সন্তুষ্ট।
নিচরিয়া[৩৭০]=নিগরিয়ে রস বের করার উপায়কে অবলম্বন করা।

Dhaka University Institutional Repository

আষাঢ় মাস

আষাঢ়[৩৭১] মাসেতে সখী গো ঘোন বরিসন।
ঘোন ২ মেঘ ডাকে বিজলি গর্জ্জন ॥
একা গলে[৩৭২] সুইয়া থাকি কাঁপি থরে ২।
কার গলা ধরি আমি পতি নাই ঘরে ॥
যার ঘরে পতি আছে ধরে জড়াইয়া।
কত রঙ্গ করে বুকে বুক লাগাইয়া ॥
আমি অভাগিনী পতি রহিল কোথায়।
জড়াইয়া ধরি আমি কাহার গলায় ॥

শ্রাবণ মাস

শ্রাবণ[৩৭৩] মাসেতে সখি গো উথলে[৩৭৪] সাগর।
নালা ডোবা ভরি গেল জলে জোয়ারের ॥
নবজল পাইয়া সব মাতল ভেকের দল।
আনন্দে অধীর হইয়া করে কতুহল ॥
আমার জৈবন জোয়ার বহে অনুক্ষণ[৩৭৫]।
পতি বিনে সে জোয়ার নহে নিবারণ ॥
জৈবনের নদী মোর জোয়ারের জলে।
দেখ ওগো সখী দেখ উথলিয়া উঠে ॥

আষাঢ়[৩৭১]=বাঙলা মাসের তৃতীয় মাস।

গলে[৩৭২](মূলে আছে)=ঘরে।

শ্রাবণ[৩৭৩]=বাঙলা মাসের চতুর্থ মাস। বর্ষা ঋতুর দ্বিতীয় মাস।

উথলে[৩৭৪]=ফুলে ফেঁপে উঠে। অনুক্ষণ[৩৭৫]=প্রতিক্ষণ।

Dhaka University Institutional Repository

ভাদ্র মাস

ভাদ্র[৩৭৬] মাসেতে সখি গো পানি সরবর।
আনন্দে চালায় নৌকা সাধু সওদাগর ॥
জৈবন নদিতে মোর কেবা দিবে পারি।
পতি নাই কে হবে জৈবন বেপারি[৩৭৭] ॥
জৈবনের তরি মোর ভাসিয়া চলিল।
হাল ধরি[৩৭৮] দাড় তায় কে বাহিবে বল ॥

আশ্বিন মাস

আশ্বিন[৩৭৯] মাসেতে সখি গো বরিষার শেষ।
পতি বিনে এ জৈবন বরই ক্লেশ ॥
আমি অভাগিনী হইনু নিম্মুর্ল[৩৮০] মতন।
ফুলে না বসিল অলি থাকিতে জৈবন ॥
জৈবন বহিয়া গেল কপালের দোষে।
তবু না আইল পতি বরিসার শেষে ॥

ভাদ্র[৩৭৬]=শরৎ ঋতুর প্রথম মাস ভাদ্র মাস।

হাল ধরি[৩৭৮]=কাণ্ডারী।

বেপারি[৩৭৭]=কারবারি।

আর্শ্বিন=বাঙলা সনের ৬ষ্ঠ মাস আশ্বিস মাস। অর্থাৎ শরৎ ঋতুর শেষ মাস।

নিম্মুর্ল[৩৮০]=শেষ।

Dhaka University Institutional Repository

কার্ত্তিক মাস

কার্ত্তিক[৩৮১] মাসেতে সখি গো হয় গজমতি।
ধান্যাদি শস্য সব হয় গর্ভবতি ॥
ভাগ্যফলে কেহু ধান্য কেহু পায় মতি।
আমি অভাগির হইল কুলের অখ্যাতি[৩৮২] ॥
মিছামিছি কলাঙ্কিনী হইনু জগতে।
না পরিল এক বিন্দু মোর উদরেতে ॥

আগণ মাস

আগণ[৩৮৩] মাসেতে সখি গো বড়ই উল্লাসে।
পতি সঙ্গে নবান্ন[৩৮৪] খায় বহু অভিলাসে ॥
পতি সঙ্গে রস রঙ্গ করায় ভোজন।
মুই অভাগির তনু অনলে দাহন ॥
লোকের কতুক দেখি মরি হায় ২।
এমন সময় পতি রহিলা কোথায় ॥

কার্ত্তিক[৩৮১]=হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস। অখ্যাতি[৩৮২]=দুর্নামগ্রস্ত।
আগণ[৩৮৩]=হেমন্ত ঋতুর শেষ মাস। এই সময় ধান্যাদির গর্ভের উপযুক্ত সময়।
নবান্ন[৩৮৪]= নতুন চালের ভাত। দুধ, গুর, নারিকেল কলা প্রভৃতির সঙ্গে নতুন আতপ চাল দিয়ে ভাত ও পায়েস খাওয়ার উৎসব। বিশেষ করে-হেমন্ত ঋতুতে ধান কাটার পর অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পৌস মাস

পৌস[৩৮৫] মাসেতে সখি গো হেমন্তের জোর[৩৮৬]।
সিতে অঙ্গ থর২ অধিক কাতর ॥
কি করিব হায়২ পতি নাই ঘরে।
কেমনে শুইব আমি কার গলা ধরে ॥
নারী পুরুষেতে থাকে গলাগলি ধরি ॥
পতি নাহি ঘরে আমি কার গলা ধরি।

মাঘ মাস

মাঘ[৩৮৭] মাসেতে সখি গো বাঘ কাঁপে বনে।
একাকি কেমনে রব পতির বিহনে ॥
থর২ কাপে অঙ্গ সিতের জ্বালায়।
এমন সময় পতি রহিলা কোথায় ॥
যার পতি ঘরে আছে শীত নাহি অঙ্গে।
অভাগিনী শীতে মরি পতি নাহি সঙ্গে ॥

পৌস > পউষ > পৌষ[৩৮৫](সংস্কৃত শব্দ)= বাঙলা বৎসরের নবম মাস ।
হেমন্তের জোর[৩৮৬]= প্রবল শীতল বাতাস।
মাঘ[৩৮৭]=শীত ঋতুর দ্বিতীয় মাস। এই সময় প্রচণ্ড শীত পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

ফাগুন মাস

ফাগুণে[৩৮৮] বসন্ত বাও[৩৮৯] কুহুরে[৩৯০] কুকিলে।
নারির জৈবন জ্বলে বিচ্ছেদ অনলে ॥
যার পতি ঘরে আছে নিভায় অনল।
অভাগির পতি নাই কেবা দিবে জল ॥
জৈবন কালেতে পতি ঘরেতে থাকিলে।
নিভাইয়া দিত অগ্নি প্রেম জল ঢেলে ॥

চৈত্র মাস

চৈত্র[৩৯১] মাসেতে বড় ধুপের তাড়ন[৩৯২]।
ছটফট করে অঙ্গ না সহে দাহন ॥
যার পতি ঘরে আছে সিতল সে নারি।
মোর পতি কোথা রইল আহা মরি ২ ॥
ধুপের[৩৯৩] যে তাপ তায় জৈবনের জ্বালা।
পতি বিনে কান্দি২ সুখাইল গলা ॥

ফাগুণ[৩৮৮]=ফাল্গুন মাস। বসন্ত ঋতুর প্রথম মাস।

বসন্ত বাও[৩৮৯]=দক্ষিণা বাতাস। কুহুরে[৩৯০]=ডাকে।

চৈত্র[৩৯১]=বসন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাস। এই সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে।

তাড়ন[৩৯২]=তীব্রতা।

ধুপ[৩৯৩]=ময়ুর কন্ঠী রঙ। রৌদ্র ও ছায়া মিশ্রিত রঙ। সুগন্ধিযুক্ত গন্ধদ্রব্য এবং হিন্দু মুসলমানদের ঘরে সন্ধ্যার সময় ধুম জ্বালিয়ে ধোঁয়া দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৮ তম পরিচ্ছেদ

কাঞ্চনমালার সাথে সাধুর কথন

ঃ পয়ার ঃ

মরণ ভাবিয়া কন্যা লাগিছে কান্দিতে
হেনকালে সাধু তথা গেল আচম্মিতে ॥
শুন কন্যা ছয় মাস নিকটে আসিল।
সমিপ্ত আনিবা কিবা আমি না জানিলাম ॥
যেবা যুক্তি হয় তুমি কহিবা আমারে।
এসব সংবাদ কেবল দেখহ তোমারে ॥
নাহি ছিল আশা এবার বিবা করিবার।
তোমাকে পাইয়া আমি খেমিলাম[৩৯৪] তাহার ॥
আমি হেন স্বামী যার ভাগ্য সেই জন।
তোমা ভাগ্য ফলে কন্যা দিল নিরাঞ্জন ॥
নানা দর্প[৩৯৫] করি সাধু কহিতে লাগিল।
শুনি মূর্চ্ছিতা কন্যা ভূমিতে পড়িল ॥
অরুণ বরণ বাণ হানিল অন্তরে।
এই সে কপালে বিধি লিখিল আমারে ॥
নির্শ্চয় জানিল সাধু তার ঘর করি।
হেন প্রাণে সাধ নাই বিষ খাইয়া মরি ॥
দিন কত বিলম্ব কির পতি তরে।
গলে ছুরি[৩৯৬] গৃহ ছাড়ি যাব নিজ ঘরে ॥
স্নান ভোজন ছাড়ি শয়ন ত্যাজিল।
ভূমিশয্যা[৩৯৭] করি নিশি কান্দিয়া কাটিল ॥

খেমিলাম[৩৯৪]=ত্যাগ করলাম। নানা দর্প[৩৯৫]= অহংকার।
গলে ছুরি[৩৯৬]=গলায় চাকু দিয়ে আত্মহত্যা।
ভূমিশয্যা[৩৯৭]=বিছানা ছাড়া মাটিতে শয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

হেথাতে মালিনী পুষ্প আনিল তুলিয়া।
গাঁথিতে লাগিল মালা সুতাতে বান্দিয়া ॥
কুমার কহিল শুন মাতা গো মালিনী।
কাহারে যোগাও[৩৯৮] ফুল কহত আপনি ॥
মালিনী কহিল এক রাজা মহাজন।
গঙ্গাধর নামে এই রাজ্যের ভাজন ॥
রাজর্ষি মহিমা সাধু রাজ্য ধন্য ধরে।
ডিঙ্গা লইয়া গিয়াছিল বাণিজ্য করিবারে ॥
এক কন্যা আনিয়াছে পরম সুন্দরী।
দেখিতে সুন্দর যেন আকাশের শশি ॥
এই মাত্র দুঃখ লাগে কন্যাকে দেখিয়া।
হেন চন্দ্র গ্রাসিল[৩৯৯] রাহুতে[৪০০] আসিয়া ॥
সদয়ে অনল জলে উদাশিনি পরি।
নয়ন ঝরয় তার মহাদুঃখ করি ॥
কিরূপে আনিয়াছে জানি সাধুর নন্দন।
রাজার কুমারী যেন বুঝিহে ধারণ ॥
সেই কন্যার তরে পুষ্প দিব পুনি ২।
বহুত গৌরব ধরি কর মোর বাণী ॥
মালিনীর কথা শুনি কুমার আনন্দিত।
প্রিয়ার সংবাদ আমি পাই আচম্বিতে ॥
দেখিব যে চন্দ্রমুখ দুই আখি হেরি।
পাইব যে হেন বুঝি রাজার কুমারী ॥
তবে মাত্র এই দুঃখ উঠে যে মনেতে।
কিবা ছান্দে[৪০১] রাখিয়াছে রাখিব কি মতে ॥

যোগাও[৩৯৮]=সরবরাহ। গ্রাসিল[৩৯৯]=গ্রাস করল।

রাহুতে[৪০০]=এক প্রকার দানব। ছান্দে[৪০১]=প্রকারে বা ভাবে।

Dhaka University Institutional Repository

সতিভঙ্গ[৪০২] হইল কিবা সতি আছ প্রিয়া।
নির্শ্চয় বুঝিয়া আমি যাইব ছাড়িয়া ॥
শুন হে মালিনী তুমি ধর্ম্মের মাতা।
কি মতে রাখিছে জান সেই রাজসুতা ॥
মালিনী কহিল এক ভিন্ন পুরি করি।
সেইত পুরির মধ্যে রাখিছে কুমারী ॥
তথায় না জায় সেই সাধুর নন্দন।
তাহা না বুঝিতে পারি কিসের কারণ ॥
কুমার ভাবিল এই ছয় মাস অবধি।
ভাণ্ডিয়া[৪০৩] রাখিছে কন্যা মোরে দিবে বিধি ॥
তবেত কহিল কুমার মালিনী তরে।
আজ পুষ্প লইয়া মাগো যাও সাধুর ঘরে ॥
কন্যার নিকটে তুমি বসিয়া আপনি।
ললিত বচনে[৪০৪] কিছু জিজ্ঞাসিবা বাণী ॥
কি কারণে তাকে সাধুয়ে আনিল।
বিবাহ হইল কিবা অবিবাহিতা ছিল ॥
পিতা মাতা বন্ধুগণ সকল ছাড়িয়া।
সাধুর সঙ্গেতে আইলা কিসের লাগিয়া ॥
ধর্ম্মমাতা হও তুমি জননির সমান।
কহিবা বৃত্তান্ত আসি কন্যার মর্ম্ম জানি ॥
এতেক সুনিয়া বৃদ্ধ পুষ্প লইয়া গেল।
প্রথম কন্যার পুরি গিয়া প্রবেসিল ॥
মহা দুঃখে পরিয়াছে ভূমির উপর।
নয়নের জল ঝরে বরিষার ধার ॥

সতিভঙ্গ[৪০২]=সতীত্ব নাশ হয়েছে এমন।

ভাণ্ডিয়া[৪০৩]=বঞ্চনা করে নিজেকে রক্ষা করা।

ললিত বচনে[৪০৪]=মধুর স্বরে।

Dhaka University Institutional Repository

অস্তে ব্যস্তে গিয়া কন্যা ধরিয়া তুলিল।
আপনার বসন দিয়া অঙ্গ মোছাইল ॥
ওগো কন্যা এত দুঃখ কেন ভাব মনে।
তোমার কান্দন মোর না সহে পারে ॥
জ্বলিয়া উঠিল মোর অন্তরের অগনি।
সংসারেতে আমি জান বড় অভাগিনী ॥
দুই পুত্র দুই কন্যা অভাগির ছিল।
বৃদ্ধকালে রাখি মোরে পরোলোকে গেল ॥
এক পুত্র গেল মোর বাণিজ্য করিবারে।
ফিরিয়া যে সেই পুত্র না আসিল ঘরে ॥
কি লাগিয়া কান্দে মাগো না বুঝি নির্শ্চয়।
সুনিতে তোমার কথা বড় শ্রদ্ধা লয় ॥
কহকন্যা সুনি কিছু তোমার কাহিনী।
খণ্ডাইতে অন্তরের দুঃখ আমি অভাগিনী ॥
মালিনীর কথা সুনি কন্যা হাহাঙ্কার।
আমা দুঃখ সুনিলে কি হইবে তোমার ॥
ইস্ট মিত্র নাহি কেহ নিলয়ের[৪০৫] সঙ্গিনী।
হেন কেহু নাহি আর নিভায় অগনি ॥
কহে হীন হাফেজদ্দীন ভাবিয়া খোদায়[৪০৮]।
মকছুদ[৪০৬] হাছেল[৪০৭] কর ওহে দয়াময় ॥

নিলয়ের[৪০৫]=যার কোন সঙ্গ সাথী নেই।

মকছুদ[৪০৬](আরবী শব্দ)=মনভাসনা।

হাছেল[৪০৭] (ফারসী শব্দ)=আয়ত্বে আনা।

খোদা (ফারসী খুদা)=আল্লাহ ঈশ্বর, প্রভু, দুনিয়ার মালিক, কর্তা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯ তম পরিচ্ছেদ

কন্যায় মালিনী নিকট আপনার দুঃখ কহে

ঃ ত্রিপদি ঃ

আমার দারুণ জ্বালা, পুরিয়া হইনু কালা,
সুন ওহে বৃদ্ধ যে মালিনী ॥
কহিতে পাঞ্জর[৪০৮] ফাটে, হিরার[৪০৯] ধারেতে কাটে,
আমি হেন নাহি অভাগিনী ॥
রাজবংশে জন্ম হইয়া, পিতা রাজ্য ত্যাগিয়া,
ইছি[৪১০] আমি ধরিলাম পতি ॥
আমি সে পাইয়া নিধি, দিয়া হরি নিল বিধি,
হইলেন তাহাতে দুর্গতি ॥
বহুত তপস্যা করি, ঈশ্বরের দিগে হেরি,
যৌবন কালে পাইলাম পতি ॥
মোর কর্ম্মফল দোষে, না পুরিল মন আসে,
পাইয়া নিধিকারে দিলাম জানি ॥
আমা প্রিয়া রূপ দেখি, গঙ্গাদেবী হইল খুশী,
লইয়া গেল জলের মাঝার ॥
আমি হত অভাগিনী, সাধুরে আনিল পুনি,
বড় দুঃখ আমার অন্তরে ॥
আসিলে বসন্ত নিশি[৪১১], রঙ্গে ঢঙ্গে সঙ্গে বসি,
প্রিয়া লইয়া পুষ্প সয্যা পরে ॥
প্রথম যৌবনকাল, দারুণ বিন্ধিল[৪১২] ছেল,
হেন যৌবন দিয়া যাব কারে ॥

পাঞ্জর[৪০৮]=পাঁজর। হিরা[৪০৯]=মূল্যবান ধাতু।

ইছি[৪১০]=স্বেচ্ছায়। বিন্দিল[৪১২]=বৃদ্ধ হল।

বসন্ত নিশি[৪১১]=খুশির রাত।

Dhaka University Institutional Repository

অল্প বয়েসে রাঢ়ী[৪১৩] হইনু, কুলের কলঙ্ক করিণু,
কিসেরে না গেলাম প্রিয়া সঙ্গে ॥
সিতা কলঙ্কিনী হইল, রাবণে সে হরি নিল,
অখ্যাতি হইল ত্রিভুবনে ॥
সেই মতে কলঙ্কিনী, সাধুয়ে করিল আনি,
এই ছিল আমার কপালে ॥
ভাল মতে হাস্যলাস, না পুরিল মন আস,
মিছা জৈবন গেল মোর বইয়া ॥
সুনগো মালিনী তুমি, এবে আর কি কহিব আমি,
প্রভু মোরে না দিল ছাড়িয়া ॥
এ হেন ব্যথিত নাই, কহ গিয়া গঙ্গা ঠাঁই,
ওয়াধা পুরিল মোর আসি ॥
কিবা মোর পতি পাব, কিবা যম ঘরে যাব,
কিবা হইব সাধুর যে দাসি ॥
প্রভুর চরণ সেবি, এত দুঃখে আমি মরি,
এবে আমি ছাড়িব সংসার ॥
ওয়াধার[৪১৪] অল্প আছে, না পুরিল আগে পিছে,
নিকটে হইল যমকাল[৪১৫] ॥
আমি অভাগিনী রামা, না চহিব ডানি বামা[৪১৬],
সমুদ্রেতে দিব আমি ঝাপ ॥
প্রিয়াকে ডাকিয়া আনি, আলিঙ্গন দিব পুনি,
খণ্ডাইব বিরহের তাপ ॥
মালিনী গো যাও ঘরে, পুষ্প না যোগাও মোরে,
অভাগিরে কর আশির্ব্বাদ ॥

রাঢ়ী[৪১৩]=স্বামী হারা যিনি বা বিধবা। ওয়াধা[৪১৪]=প্রতিজ্ঞা।
যমকাল[৪১৫]= মৃত্যুকাল। ডানি বামা[৪১৬]=ডাইন বাম।

Dhaka University Institutional Repository

প্রিয়া সঙ্গে এই ক্ষণে, মালা তুমি দেহ গলে,
তবেত পুরিত মন আসা[৪১৭] ॥
আর কেন ভাব দুঃখ, নিকটে হইল সুখ,
কর্ম্ম দোষে পতি হইল ভিন[৪১৮] ॥
বিরহের অভাগিনী, কামবানে হানে পুনি,
দুঃখ ভাবি কহে হাফেজদ্দীন ॥

মন আসা[৪১৭]=মনের আশা।
ভিন[৪১৮]=আলাদা।

Dhaka University Institutional Repository

২০ তম পরিচ্ছেদ

মালিনী কন্যা হইতে বিদায় হয় এবং কুমারের নিকট সকল বৃতান্ত কহে

ঃ পয়ার ঃ

সুনহ মালিনী বড় আমি অভাগিনী।
নিভাইয়া দেও মোর জলন্ত অগনি ॥
ভাগ্যহীন হইয়া আমি সংসারে রহিলাম।
কুলের কলঙ্ক আমি আসিয়া করিলাম ॥
ভরসা করিয়া আমি ছাড়িলাম সংসার।
কতদিন বাদে জঞ্জাল[৪১৯] ঘুচিবে আমার ॥
রামালোক হইয়া আমি সত্য নে পালিনু।
পুরুষ নিষ্ঠুর বড় স্মরণ না করিণু ॥
ওগো তুমি যাও ঘরে কেনে দুখ পাও।
মোরে জদি দয়া কর গঙ্গির স্থানে যাও ॥
নহে মোরে মিছা দুখ দেও কি লাগিয়া।
সাধুয়ে সুনিলে তোমায় ফেলিবে কাটিয়া ॥
ভয় পাইয়া মালিনী উঠিয়া গেল ঘরে।
পুস্পমালা দিল নিয়া সবাকার তরে ॥
তবেত চলিয়া গের আপনার পুরি।
মালিনী দেখিয়া কুমার হইল অগ্রসরি[৪২০] ॥
কুমার জিঙ্গাসে মাগো কহ সমাচার[৪২১]।
কি কথা কহিল আজি কন্যায় তোমার ॥
মালিনী কহিল পুত্র কি পৌছ[৪২২] আমারে।
কন্যার দুখ সুনি মোর কলেজা বিদরে ॥

জঞ্জাল[৪১৯]=দুর্দশা। অগসরি[৪২০]=সন্মুখের দিকে আসা।
সমাচার[৪২১]=সংবাদ।পৌছ[৪২২]=জিজ্ঞাসা করে।

Dhaka University Institutional Repository

কিবা কহে কিবা বলে বুঝিতে না পারি।
তার পতি গঙ্গী বলে নিয়া গেছে হরি ॥
কি মতে মনুষ্য নিয়া রাখিলেন্ত জলে।
এহেন সঙ্কট[৪২৩] কথা না শুনি কোন কালে ॥
তাথে বলে কন্যা সঙ্গে ওয়াধা করিছে।
পুরিলেক পতি আনি দিবে তার কাছে ॥
ক্ষেণে ২ বলে মৃত্যু নিকটেতে হইল।
মোর সত্ত পুরিল যে পতির সত্ত রইল ॥
এমন সঙ্কট বুঝে শক্তি আছে কার।
তাতে বৃদ্ধকালে আমি কর্ণে শুনি ভার ॥
এতেক শুনিয়া কুমার আঁখি ভার নিরে[৪২৪]।
ওয়াধা পুরিল মোর বুঝি হে অন্তরে ॥
আর দিন মালিনী যে সখিগণ লইয়া।
গাঁথিতে লাগিল মালা সুতাতে বান্ধিয়া ॥
কুমার কহিল শুন মাতা গো মালিনী।
বিনেসুতে মালা আমি গাঁথিবারে জানি ॥
নিকটে বসিয়া তুমি দেখহ সান্তরে[৪২৫]।
আজি মাগো গাঁথি দিব ঐ সাধুর ছারে[৪২৬] ॥
হরিষে মালিনী পুষ্প সাক্ষাতে আনিল।
বিনেসুতে মালা কুমার গাঁথিতে লাগিল ॥
কুমারীর মালা গাঁথে যত্তন করিয়া।
তার মধ্যে এক পত্র দিলেক লিখিয়া ॥
লেখিলেন্ত বিধি মোরে আনিল এথায়।
সাক্ষাতে আসিতে তোমার না দেখি উপায় ॥

সঙ্কট[৪২৩]=বিপদ কালীন অবস্থা। নিরে[৪২৪]=জলে।
সান্তরে[৪২৫]=ধীরস্থিরভাবে। ছারে[৪২৬]=সমীপে।

Dhaka University Institutional Repository

আমারে দেখয়[৪২৭] যদি সাধুর নন্দন।
নিশ্চয় মারিয়া মোরে বধিতে জীবন ॥
তোমার উদ্দেশে মোরে আনিল বিধাতা।
কিবা মোর কর্ম্মে আছে সাধু কাটে মাথা ॥
উপায় কহিবা আমি কিমতে আসিব।
প্রাণে মরিলে আমি ভাই না দেখিব ॥
পাইলাম সংবাদ তোমা পুরিলেক[৪৯৯] আস।
ঈশ্বর করিলে আসিব তোমার পাস ॥
এই মত পত্র লিখি মালা মধ্যে দিল।
যতনে মালিনী স্থানে কহিতে লাগিল ॥
এই মালা দিবা নিয়া সেই কন্যার তরে।
দেখিবা কন্যায় আজি কি কহে তোমারে ॥

দেখয়[৪২৭]=দেখে।

Dhaka University Institutional Repository

২১ তম পরিচ্ছেদ

মালিনী পুষ্প লইয়া সাধুর বাড়ি যায়
এবং মালা মধ্যে কন্যা পত্র পায়

ঃ পয়ার ঃ

ভাণ্ডভরি পুষ্প দিল সখির মাথে তুলি।
সখি সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ গেল সাধুর বাড়ি ॥
সব নারীর ঘরে গিয়া পুষ্প মালা দিল।
অপূর্ব্ব দেখিয়া সব কৌতুক বারিল ॥
আনন্দ হইল সব কৌতুক অন্তরে।
প্রসাদ[৪২৮] আনিয়া সবে দিলেক সত্তরে ॥
মহা দুখ ভাবি কন্যা আঁখি জল ঝরে।
কন্যা দুখ দেখি মালিনী কলেজা বিদরে ॥
মিনতি[৪২৯] করিয়া কান্দে উপায় মোর নাই।
ওয়াধা পুড়িল পতির উদ্দেশ নাহি পাই ॥
কি বুঝিয়া সাধুকে ভাণ্ডিব আমি আর।
নির্শ্চয় স্মরণ বিধি লিখিল আমার ॥
আজি নিসি মরিব আমি গলে রশি[৪৩০] দিয়া।
যেমতে প্রিয়াকে মোর ফেলিল বান্ধিয়া ॥
হেন কালে মালিনী যে মালা হাতে দিল।
আখি মেলি কন্যা তবে কহিতে লাগিল ॥
হেন পুষ্প মালা তুমি কিমতে আনিলা।
কে গাঁথিয়া দিল মালা কোথায় পাইলা ॥
মালিনী কহিল এক ভগ্নি পুত্র আছে।
আমার উদ্দেশ্য সেই এথাতে আসিছে ॥

প্রসাদ[৪২৮] (সংস্কৃত শব্দ)=হিন্দুদের দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত খাদ্য সামগ্রী।
মিনতি[৪২৯] (আরবী শব্দ) =প্রার্থনা। রশি[৪৩০]=দড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

সংসারের মধ্যে তার আর লক্ষ[৪৩১] নাই।
তে কারণে আসয়িা রহিছে আমা ঠাঁই ॥
হেনকালে আচম্বিতে দেখিল কুমারী।
একপত্র রাখিয়াছে মালা মধ্যে ভরি ॥
বুঝিলাম এই বেটা দুষ্টবর মতি।
কি মতে রাখিয়াছে মালা মধ্যে পাতি[৪৩২] ॥
তুরিত পড়িয়া আগে বৃত্তান্ত জানিব।
তবে ইহার শাস্তি আজি মালিনীকে দিব ॥
তবে খসাইয়া[৪৩৩] পত্র লাগিল পড়িতে
পত্র পড়ি দেখি পতি মালিনীর পুরিতে ॥
পাইয়া পতির পত্র প্রণাম করিল।
মৃত্যুদেহে প্রাণী আসি সঞ্চার হইল ॥
মধুর আলাপে কন্যা পাইল বড় হাসি।
ষোলকলা পাইল যেন পূর্ণশশি ॥
জলদ গর্জ্জন[৪৩৪] শুনি মুক্কের[৪৩৫] উল্লাস।
সর্ব্ব দুখ খণ্ডি কন্যা আনন্দ বিশেষ ॥
অমৃত অধিক বাণী ফিরিয়া শুনিব।
অঙ্গের কস্তুরি গন্ধ ফিরিয়া লইব ॥
রওন অঙ্গুরি খুলি মালিনীকে দিল।
মহানিধি[৪৩৬] পাইয়া কোতুক বাড়িল ॥
তবেত কহিল কন্যা মালিনীর তরে।
তিলেক[৪৩৭] রহিয়া তুমি যাও মোর ঘরে ॥

লক্ষ[৪৩১] (আর লক্ষ্য নাই)=পৃথিবীতে তার কেউ নেই। পাতি[৪৩২]=পাত্র বা চিঠি।
খসাইয়া[৪৩৩]=খুলে। গর্জ্জন[৪৩৪]=মেঘের ডাক। মুক্কের[৪৩৫]=ময়ুরের উল্লাস অর্থ্যাৎ মেঘের ডাক শনে ময়ূর পেখম মেলে নেচে নেচে আনন্দ প্রকাশ করে।
মহানিধি[৪৩৬]=কাঙ্খিত বস্তু। তিলেক[৪৩৭]=কিছু সময় বা ক্ষনেক।

Dhaka University Institutional Repository

তোর ভগ্নি পুত্র তবে রসিক নাগর।
আমি সাজ দিব[৪৩৮] কিছু নেও তার তরে ॥
তবে কন্যা পতির ঠাঁই লেখিতে লাগিল।
প্রণাম লেখিয়া আগে দুঃখ নিবেদিল ॥
অভাগির মন দুখ কিবা লিখিব।
ঈশ্বরে করিল তাহা সাক্ষাতে কহিব ॥
একে মরি খুদায় নিদ্রায়[৪৩৯] অন্ন নাহি খাই।
তাহাতে সাধু বেটার কথায় বড় দুখ পাই ॥
তুল্য মাংসে[৪৪০] কুকুর যেন হয় অগ্রপান[৪৪১]।
সেই মত হইয়াছে সাধুর পরাণ ॥
ভাণ্ডিয়া রাখিলাম আমি সাধু সওদাগারে।
ছয় মাস ওয়াধা করি রাখিছি তাহারে ॥
কহিলাম প্রিয়ার আগে শ্রদ্ধা করি লব।
পশ্চাতে তোমার ঘরে বিধাতায় লিব ॥
উরু[৪৪২] হইয়াছে বড় সাধুর নন্দন।
যে কহিব সেই মোর রাখিবে বচন ॥
সমিপ্তের সামগ্রি[৪৪৩] যত আনিতে কহিব।
চৌদল[৪৪৪] বানাইতে আমি ঐখানে পাঠাইব ॥
দেখিয়া লইবা আগে সাক্ষাতে বসিয়া।
এথায় আসিবা ফিরিয়া তাহাতে চড়িয়া ॥
চৌদিকে ঘেরিয়া লইবা করিয়া যতনে।
তার মধ্যে যেন না দেখে কোন জনে ॥
সাধুয়ে আনিবে তোমায় কান্ধেতে করিয়া।
মণ্ডবের[৪৪৫] সাক্ষাতে তবে রাখিবেক নিয়া ॥

দিব[৪৩৮]=দেওয়া। খুদায় নিদ্রায়[৪৩৯]=ক্ষুধা ও ঘুম। তুল্য মাংসে[৪৪০]=ঝুলানো গোশ্‌ত। অগ্রসর[৪৪১]=লালায়িত।উরু[৪৪২]=চঞ্চল। সমিপ্তের সামগ্রি[৪৪৩]=বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি। চৌদল[৪৪৪]=পাল্কী বা বেহারা। মণ্ডবের[৪৪৫]=উপরে ছাদ বিশিষ্ট চর্তুদিক খোলা প্রাঙ্গণ বা উৎসাবাদির জন্য চাঁদর দিয়ে ঢাকা স্থান বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

কহিব যে রাজা প্রজা আন নিমন্ত্রিয়া ।
যজ্ঞমন্ত্র[৪৪৬] কব আমি চৌদলে বসিয়া ॥
আদি অন্ত বৃতান্ত আমি রাজাকে কহিব ।
যা আছে নছিবে[৪৪৭] তাহা নির্শ্চয় হইব ॥
রাজাকে পাইবা তুমি আর কোন মতে ।
আনিব রাজাকে আমি তোমার সাক্ষাতে ॥
এই যুক্তি বিনা প্রভু উপায় নাহি এবে ।
তার পরে তোমার আমার কর্ম্মে যাহা হবে ॥
সন্দ না করিয়া আমি ঈশ্বরের দিকে চাই ।
নির্ব্বন্ধ লেখিত যাহা এরাইবারে নাই ॥
এই মত পত্র লিখি রাজার কুমারী ।
তাম্বুল পুরাই বান্ধিল যত্ন করি ॥
বান্ধিল অপূর্ব্ব পুরা[৪৪৮] দেখিতে সুন্দরি ।
মালিনীর হস্তে আনি দিলেক কুমারী ॥
তোমা ভগ্নিপুত্র স্থানে এই পুরা দিবা ।
আমার যে হাল তুমি আপনি কহিবা ॥
প্রসাদ বান্ধিয়া মালিনী সখির মাথে[৪৪৯] দিল ।
মহানন্দে মালিনী তথা ঘরেতে চলিল ॥
মরা হংসে[৪৫০] জল পাইলে জীবন সঞ্চার ।
হরিষে কহিল গিয়া কুমারে খবর ॥
পাইলাম অমূল্য ধন তোমার কারণে ।
চিরদিনের দুখ মোর খণ্ডিল এক্ষণে ॥

যঙ্গমন্ত্র[৪৪৬] (সংস্কৃত শব্দ)=রেদবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য হিন্দুদের দেববিহিত অনুষ্ঠানে যে মন্ত্র পড়া হয়। নছিবে[৪৪৭]=ভাগ্যে। পুরা[৪৪৮] =সমস্ত জিনিসপত্র একত্রে বাধা।
মাথে[৪৪৯] =মাথায়।
মরা হংসে[৪৫০]= মৃত প্রায় পাতি হাস হাঁস।

Dhaka University Institutional Repository

পুত্র বিহনেতে আমি যত দুখ পাইলাম।
তোমাকে পাইয়া আমি সব পাসরিলাম ॥
আজ তোমার পুস্পমালা কুমারী দেখিয়া।
বহুত প্রসাদ দিল গৌরব ধরিয়া ॥
হস্তের আঙ্গুরী[৪৫১] মোরে খুলিয়া যে দিল।
মিষ্ট বচনে কথা কহিতে লাগিল ॥
র্কপুর তাম্বুল দিল পুরিয়া বান্ধিয়া।
যত্ন করি কন্যা তোমা দিল পাঠাইয়া ॥
পুরা নিয়া মালিনীয়ে কুমারকে দিল।
প্রিযার পত্র পাইয়া কুমার কহিতে লাগিল ॥
মোর লাগি দুখ প্রিয়া পাইলা জন্মান্তর।
সেই হইতে যেবা উদ্ধার হইবে আমার ॥
হেন বান্ধব প্রিয়া মোর কোথায় রহিল।
ভাই সঙ্গে দেখা হইবে নির্শ্চয় জানিল ॥
কেমনে যাইব আমি ভাইর গোচরে।
সেই ভাই আপনি আসিবে তথাকারে ॥
ভরসা করিয়া কুমার পন্থ হেরি রইল।
এথায় সাধুকে ডাকি কুমারি কহিল ॥
সুন সওদাগর[৪৫২] আমি কহি যে বচন।
ওয়াধা পুরিল আসি বিলম্ব হয় কেন ॥
সমিপ্তের সামগ্রি যত আনহ সকল।
সুগন্ধি আনহ আর নানা পুস্প ফল ॥
আখোর চন্দন[৪৫৩] আর আনহ কস্তুরী।
গোলাপ আতস কুম[৪৫৪] আন শীর্ঘ্র করি ॥

হস্তের আঙ্গুরি[৪৫১]= হাতের আংটি। সওদাগর[৪৫২](ফারসী শব্দ) =ব্যবসায়ী।
আখোর চন্দন[৪৫৩]=এক প্রকার সুগন্ধী যুক্ত গাছ। গোলাপ আতস কুম[৪৫৪]=সাজনের সরঞ্জাম।

Dhaka University Institutional Repository

ধুপ দিপ আন আর নানা যুক্ত সাজ।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সব আন সভা সাজ ॥
বড় উচা ব্যক্তি[৪৫৫] সব রাজা প্রজাগণ ।
আনিবা তোমার রাজ্যের রাজা মহাজন ॥
পুস্পের চৌদল আন করিয়া যে সাজ।
যজ্ঞমন্ত্র কব আমি বসি তার মাজ ॥
বিলম্বনা কর সব আন শীর্ঘ্র করি।
প্রভু বিনা একেস্বরি রহিতে না পরি ॥
কন্যার বচনে সাধু প্রাণ সত্ত করিল।
পুলকিত হইয়া তবে বাহিরে আসিল ॥
দুতগণ ডাকি আনি কহে প্রেম কথা।
নানা দ্রব্য আন ভাই যাও যথা তথা ॥
মালিনী ডাকিয়া আনি কহে তার তরে।
পুস্পবর চৌদল আনি দেওত আমারে ॥
হিরামন কাঞ্চন[৪৫৬] দেও ত নানা রত্ন ধন।
চৌদল নির্ম্মান হয় সুন্দর মতন ॥
ধনের গৌরব[৪৫৭] আমি করিণু বিস্তর।
প্রথম চাহিল কন্যা এই ধন আমার ॥
বিবাহ হইবে আমার তাহাতে চড়িয়া।
সুন্দর না হইলে তোমা ফেলিবে কাটিয়া ॥
সুনিয়া মালিনী মাথে বর্জ্জাঘাত পড়িল।
মনান্তরে দুঃখ ভাবি ঘরে চলি গেল ॥

উচা ব্যক্তি[৪৫৫]=সমাজদার লোক বা সম্মানিত মানুষ।

হিরামন কাঞ্চন[৪৫৬]=মূল্যবান ধাতব পদার্থ।

ধনের গৌরব[৪৫৭]=সম্পাদের অহংকার।

Dhaka University Institutional Repository

মালিনী দেখিয়া কুমার জিজ্ঞাসিল তারে।
আজি মাগো বিরস কেনে দেখিহে তোমারে ॥
মালিনী কহিল মোর বিষম হইল।
পুস্পের চৌদল আজি সাধুয়ে চাহিল ॥
কিমতে চৌদল বান্ধে আমি নাহি জানি।
রাজ্য ছাড়ি যাইব কিবা মরিব পরাণি ॥
কুমার কহিল আমি দিব বানাইয়া।
ইহার লাগি চিন্তা তুমি কর কি লাগিয়া[৪৫৮] ॥
মালিনী ভরসা পাইয়া আনন্দিত মন।
জয়-২ করি উঠে লইয়া সখিগণ ॥
চৌদল বান্ধিতে তবে কুমার লাগিল।
সখিগণ পুস্প আনি যোগাইয়া দিল ॥
কাঞ্চনের তার দিয়া বান্ধয়[৪৫৯] চৌদল।
চারিপাশে মুক্তা তার করে ঝলমল ॥
দেওয়ালের চুড়া যেন করয়ে নির্ম্মান।
কাঞ্চন রত্তন দিয়া বান্ধে স্থানে স্থান ॥
যেমন অমরাপুরি পাটমন্দির[৪৬০] ঘর।
দেখিতে সুন্দর কিবা হিমগিরি বর ॥
হরিষ বদনে কুমার বান্ধিল যত্তনে।
এহাতে চড়িয়া যাইমু ভাই দরশনে ॥
কতবা কহিব আমি চৌদলের বান্ধ।
থরে২ মুক্তা জ্বলে দিনে ঝরে চাঁদ ॥
অপূর্ব্ব করিল সাজ যেন দিপ্তি জ্বলে।
তিমির বঞ্চিত সদা থাকে এক স্থলে ॥

কি লাগিয়া[৪৫৮]=জন্য বা কারণ।

বান্ধয়[৪৫৯]=বাঁধে। পাটমন্দির[৪৬০]=রাজ ঘর।

Dhaka University Institutional Repository

সুরঙ্গ সুঠাম রূপ জ্যোর্তির আকার।
পুস্তক বারয়ে হেতু না লিখিনু আর ॥
অবিলম্বে কর্ম্ম করে যত লোকজন।
সাধুয়ে চলিয়া গেল নৃপতি ভুবন ॥
সুবর্ণের থালে করি সহস্র মহর[৪৬১]।
তাম্বুল পুরায় করি রাখিল হুজুর ॥
এসব দেখিয়া সবে জিজ্ঞাসা করিল।
কিশের লাগিয়া সাধু তাম্বুল আনিল ॥
কর জোরে[৪৬২] কহে তবে সাধুর নন্দনে।
অপরাধ ক্ষেম মোর নিবেদি চরণে ॥
দক্ষিণ রাজ্যেতে গেলাম বানিজ্যের কার্য্যে
এক কন্যা বিধি মোরে দিল সেই রাজ্যে ॥
দেশেতে আনিয়া বহু করিলাম মিনতি।
দেহ ছাড়ি যাইতে চাহে হইয়া আপ্তঘাতি ॥
অবেশেষে এবে মোরে চাহিল বরিতে।
তোমার রাজ্যের রাজা যদি পারহ আনিতে ॥
যজ্ঞমন্ত্র আমি জানি কহিমু বচন।
শুনিবেন্ত বসি সবে রাজা প্রজাগণ ॥
গৃহবাস ঘরের ঘরনী[৪৬৩] আমার নাই।
একারণে মহারাজা আইলাম তোমা ঠাঁই ॥
দাসতুল্য জানি মোরে কৃপাশিল হইয়া।
স্থির তোমার রাজ্যে মোরে রাখহ আসিয়া ॥
নহে আমি তোমা রাজ্য ছাড়িব নির্শ্চয়।
সেই কন্যা বিনে মোর প্রাণি নাহি রয় ॥

মহর[৪৬১]=স্বর্ণমুদ্রা।

কর জোরে[৪৬২]=হাত জোর করে।

ঘরনী[৪৬৩]=স্ত্রী বা বউ।

Dhaka University Institutional Repository

সাধুর বচনে রাজা কহেন্ত[৪৬৪] হাসিয়া।
কিবা মন্ত্র কহে তাহা সুনিব যাইয়া ॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া তবে সাধু সওদাগর।
শীর্ঘ্রগতি চলি গেল আপনার ঘর ॥
সামগ্রি সকল আনি প্রস্তুত করিল।
কন্যার সাক্ষাতে গিয়া সমাচার দিল ॥
রাজা প্রজা ব্রাহ্মণ আদি আসিল সকল।
মালিনী সংবাদ দিল হইল চৌদল ॥
আনিব চৌদল এবে কেমন করিয়া।
যেবা যুক্তি হয় তবে কহ বিবরিয়া ॥
কন্যায় কহিল তুমি আপে[৪৬৫] কান্ধে করি।
যতনে রাখিবা আনি বর মাঝে ধরি ॥
তবে সাধু চলি গেল মালিনীর ঘরে।
চাহিল চৌদল কোথা দেওগো আমারে ॥
বিলম্ব না হয় আনি দেও তরা করি।
নৃপতি আইল এবে যাব শীর্ঘ্র করি ॥
তবেত কুমারে গিয়া মালিনীরে কহিল।
চৌদল নিবার তরে সাধুয়ে আসিল ॥
চল ২ পুত্র তুমি চৌদল লইয়া।
সাধুর হুজুরে তুমি ভেটহ[৪৬৬] আসিয়া ॥
মালিনীর বচন সুনি কহিল কুমার।
সাধু ভেটি কিবা কার্য্য হইবে আমার ॥
এই নিবেদন মাগো করি তোমা তরে।
চৌদলে চড়িয়া যাব বৌ দেখিবারে ॥

কহেন্ত[৪৬৪]=বললেন।

আপে[৪৬৫]=আপনি।

ভেটহ[৪৬৬]=নজরানা।

Dhaka University Institutional Repository

না কহিবা সাধু স্থানে মাতা গো মালিনী।
সুনি বসে গিয়া আমি কন্যার কাহিনী ॥
মালিনী কহিল পুত্র কি কহ বচন।
কাটিবে তোমার শির সাধুর নন্দন ॥
বংশনাস[৪৬৭] করিতে তুমি আসিলা এই ঠাঁই।
কোন ভগ্নি পুত্র তুমি বুঝিতে না পাই ॥
কুমার বলিল তুমি ঈশ্বর ভাবিয়া।
মোর প্রতি দয়া মাগো তুমিত রাখিবা ॥
এবেত কহিতে মাগো দহে মোর অঙ্গ।
সাক্ষাতে দেখিবে সব চল মোর সঙ্গ ॥
এই মত কহি বহু মালিনীর তরে।
লুকাইয়া বসিল গিয়া চৌদল ভিতরে ॥
চতুর্দ্দিকে ফিরি ২ মালিনী দেখয়।
অন্তপাট[৪৬৮] ছের[৪৬৯] তার দেখিতে না পায় ॥
তবেত মালিনী গিয়া পুরির ভিতরে।
ডাকিয়া চৌদল নিতে ডাকিল সাধুরে ॥
সৈন্যগণ সঙ্গে করি সাধুর নন্দন।
কান্দে করি লইয়া তবে করিলে গমন ॥
এই সব চরিত্র দেখি মালিনী জানিল।
ঐ কন্যার পতি এই নির্শ্চয় বুঝিল ॥
পাছে ২ সঙ্গে করি সখিগণ লইয়া।
নাচিতে ২ যায় অঙ্গ ঢুলাইয়া[৪৭০] ॥
মালিনী কৌতুক বরা আনন্দিত মন।
বৃর্দ্ধকালে হইল যেমন নতুন জৈবন ॥
জড়াজড়ি সখিগণ হুড়াহুড়ি করি।

বংশনাস[৪৬৭] =ধ্বংশ করা। অন্তপাট[৪৬৮]=আবরন যুক্ত কক্ষ। ছের[৪৬৯]=পর্দা।
অঙ্গ ঢুলাইয়া[৪৭০]=নেচে নেচে। হুড়াহুড়ি[৪৭১]=কোলাহল।

Dhaka University Institutional Repository

আনন্দে চলিয়া গেল সওদাগরের পুরি ॥
রাখিল চৌদল নিয়া বরখানা[৪৭২] মাঝে।
সাধুর পুরিতে বাদ্য নানা শব্দে বাজে ॥
কাশ করতাল বাজে মৃদঙ্গ ভেউর।
সানাই করতাল বাজে চরণে নেপুর ॥
নারিগণে হুলাহুলি দেয় জয় ২।
ঢাক ঢোলে ডাকি বলে নৃপতি আইশয় ॥
মহাশব্দ[৪৭৩] পড়ি গেল রাজার পুরিতে।
রাজা আদি ব্রাহ্মণ সব বসিল সভাতে ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সব বসে সভা মাজ।
পাঁচালি প্রবন্ধে করি কুমারীর সাজ ॥
হীন হাফেজ আলি কহে জোনাবে সভার।
কহিব কন্যার বাণী সভার গোচরে ॥

বরখানা[৪৭২] =বিয়ের বাড়ীতে জামাইকে যে স্থানে রাখা হয়।
মহাশব্দ[৪৭৩] =আনন্দ উৎসব।

Dhaka University Institutional Repository

২২ তম পরিচ্ছেদ

কুমার কুমারী দোহে আলাপ করে

ঃ রাগ ত্রিপদি দীর্ঘ ছন্দ ঃ

রূপে যে কাঞ্চনমালা, নবরূপ যৌবন জ্বালা.
দরশনে যে হেন মুকুতা ॥
চিকন চিরণ নাসা[৪৭৪], কস্তুরীর গন্ধ বাসি,
অধর রত্ন হেন জ্বলে ॥
লাজ পাই নিসাপতি[৪৭৫], কলঙ্ক যে ছিল মতি,
ইন্দ্র শশি নিলা যে নিন্দিয়া[৪৭৬] ॥
ললাটেতে চন্দ্র জিনি, কর্নে তুলি দিলা মনি,
নাকেতে নোলক অতি বেস ॥
কটিতে শিকল দিল, গলে কন্যা মালা ভাল,
আর দিল অঙ্গুলে অঙ্গুরি ॥
খিরপাট[৪৭৭] পরাইল, মুখে না শিরেত দিল,
ষোল কলা পুরায়ে কুমারী ॥
সুগন্ধি দিলেক অঙ্গে, নানা কৌতুহল রঙ্গে,
কস্তুরি কুমকুম দিল আনি ॥
বড়ইল অভিলাস, চলি গেল পতির পাস,
নারীগণে দিলেক জোবার ॥
চৌদলে প্রবেশ করি, প্রভুর করুণা স্বরি,
বহুত মিনতি কন্যা করে।
প্রিয়া আলিঙ্গন মিলি, ললাটেতে চুম্ব দিল,
বসাইল উরুর উপর ॥

নাসা[৪৭৪]=নাগ। নিসাপতি[৪৭৫]=রাত।

নিন্দিয়া[৪৭৬] =ঘৃণা করে। খিরপাট[৪৭৭] =এক প্রকার অলংকার।

Dhaka University Institutional Repository

দেখিলেক চাঁদমুখ,   খণ্ডিলেক দোহার দুখ,
কুমারের মনে বড়া ভয় ॥
ভাই না চিনিলে মোরে,   মারিবেক সওদাগরে,
এইত আছয় মোর ভয় ॥
বৈশ আসি চন্দ্রমুখী,   তোমারূপ আমি দেখি,
ফিরিয়া দেখিতে নাহি আস ॥
না জানি এ সওদাগরে,   কি কব তোমার তরে,
কিবা মোরে করিবে নির্দ্দন ॥
তোমা মন্ত্রনা সুনিয়া,   ভাই যাইবে যে উঠিয়া,
মারিবেক সাধুর নন্দন ॥
মোরে প্রিয়া কর ক্ষেমা[৪৭৮],   তুমি মোর প্রাণসামা[৪৭৯],
কেন চাহ বধিতে জীবন ॥
চৌদলের ঝিল[৪৮০] দিয়া,   আমি বড় অভাগিয়া,
দেখিলাম ভাইর চন্দ্রমুখ ॥
সমুদ্রে তরিয়া আইলাম,   তোমা সঙ্গে দেখা পাইলাম,
খণ্ডিলেক মনের যেবা দুখ ॥
বিবাহ করিলাম তোরে,   সেই সও পাল মোরে,
বৈকুণ্ঠের[৪৮১] কর কিছু কাম ॥
নির্শ্চয় যে সওদাগরে,   ধরিয়া কাটিবেক মোরে,
ছাড়ি দেহ যাই দূর দেশ ॥
প্রভুর বচন সুনি,   কান্দে কন্যা পুনি ২,
এত দুখ পাই কি কারণ ॥
হীন হাফেজ আলি বলে,   এস্ক যার আছে দেলে,
তার মন সদা উছাটন ॥

ক্ষেমা[৪৭৮] = ক্ষমা করা। প্রাণসামা[৪৭৯] =প্রাণের সমান।

ঝিল[৪৮০]=খড়খড়ি। বৈকুণ্ঠ[৪৮১] =বিষ্ণু।

Dhaka University Institutional Repository

২৩ তম পরিচ্ছেদ

রাজ পুত্রের বিলাপ।

ঃ পয়ার ঃ

কি কার্য্য করিলা প্রিয়া বুঝিতে না পারি।
মারিতে আনিলা মোরে সওদাগরের পুরি ॥
পাটের ঈশ্বর ভাই রাজ্যের রাজন।
মন দিয়ে না সুনিবে তোমার বচন ॥
পূর্ব্ব বাক্য ভাই মোর ভুলিছে নির্শ্চয়।
তোমা মন্ত্র ভাই যদি কর্নে না সুনয় ॥
তবেত মারিয়া মোরে ফেলিবে সত্তরে।
তোমাকে লইয়া যাবে সাধু সওদাগরে ॥
এই যুক্তি করি তবে সাধুর সঙ্গতি[৪৮২]।
আনিলা আমারে এথা করিতে দুর্গতি ॥
আমাকে মারিলে প্রিয়া কি হইবে তোমারে।
ছাড়ি দেহ অভাগিয়া যাই দূরান্তরে ॥
সকল পাইলা প্রিয়া পুরিলেক আস।
সাধুর ঘরেতে তুমি কর গৃহবাস ॥
এতেক সুনিয়া কন্যা ক্রোধ মনান্তরে।
কহিতে লাগিল তরে কুমারের তরে ॥
কিবা কথা কহ প্রভু বেথা পাই মনে।
ধরেতে[৪৮৩] না রহে প্রাণ এ সকল বচনে ॥
যদি মনে ছিল আমি সাধুর ঘর করি।
তবে কেন ছয় মাস এত দুখে মরি ॥
এবেসে জানিলাম প্রিয়া আমি অভাগিনী।
ভাল কাজে মন্দ কেনে বুঝিলা আপনি ॥

সঙ্গতি[৪৮২] =নিকটে।

ধরেতে [৪৮৩] = দেহে ।

Dhaka University Institutional Repository

চৌদল সমেত তুমি করিও গমণ ॥
আপন পুরিতে নিয়া রাখিব ছাপাইয়া[৪৮৪]।
নিসিকালে দূর দেশে যাইও চালিয়া ॥
এ রাজ্য ছাড়িয়া যদি যাও দূর দেশ।
যেবা মোর কর্ম্মে আছে বুঝিব বিশেষ ॥
নির্শ্চয় জানিবা প্রভু ধর্ম্ম সাক্ষি করি।
নহেত তোমার সাক্ষাত বিষ খাইয়া মরি ॥
প্রিয়ার নিষ্ঠুর সুনি কুমারের মন।
একের মরণে হইল দোহার মরণ ॥
হেনকালে নরপতি কহে উচ্চস্বরে।
এবেত বিলম্ব কন্যা করহ কিসেরে ॥
দিবা শেষ হইল আমি মন্ত্র যে সুনিব।
তোমাকে বিবাহ দিয়া ঘরে চলি যাব ॥
সন্দ কিছু না করিবা সাধুর কারণ।
গঙ্গাধর সাধু এই রাজ্যের ভাজন[৪৮৫] ॥
হেন জন পতি যার ভাগ্যের উদয়।
এহা লাগি দুখ কন্যা না ভাব হৃদয় ॥
নৃপতির কথা সুনি অতি ক্রোধ হইল।
মিষ্টস্বরে তুরমানে কহিতে লাগিল ॥
সুন নরপতি তুমি পাটের ঈশ্বর।
অভাগিরে কেন কহ এত খরতর[৪৮৬] ॥
নিবারিতে অগ্নি মোর বড় ছিল আস।
প্রথম বচনে মোর বুদ্ধি হইল নাস ॥
আগে মন্ত্র কহি লইতাম তোমার ঠাঁই।
তারপরে মোর প্রতি যে করে গোঁসাই ॥

ছাপাইয়া[৪৮৪]=লুকাইয়া। ভাজন[৪৮৫]=হিতাকাঙ্খী বা শুভাকাঙ্খী।
খরতর[৪৮৬] = কর্কশ ও দ্রুত।

Dhaka University Institutional Repository

আর এবে নরপতি তুমি যে ভরসা।
যদি কৃপা কর মোর পুরিবেক আস ॥
কিন্তু বড় ভয় পাইলাম প্রথম বচনে।
কিমতে কহিব মন্ত্র মহাশয়ের স্থানে ॥
না বুঝিয়া মন্দ কহি দেহ দুঃখ ভার।
মহারাজা হইয়া কেন এত অবিচার ॥
তুমি বিনা মন্ত্র আর কেহ না বুঝিবে।
শাস্ত্রেতে বিচার নাই কিমতে পাইবে ॥
এই সব শাস্ত্র রাজা পড়িছ আপনে।
চিত্ত দিয়া[৪৮৭] সুনিবেক হইয়া এক মনে ॥
সংসারের দিগে মন তিলেক না দিবে।
এক মন হইয়া মন্ত্র যে সুনিবে ॥
পাটের ঈশ্বর হইল ইস্ট মিত্রগণ।
ভাই বন্ধু কিছু তার না থাকে স্মরণ ॥
সুনিলে কহিতাম কিছু আদি অন্তবাণী।
নহে মিছা কেন দুখ পাই অভাগিনী ॥
সর্জ্জিত[৪৮৮] হইল রাজা কন্যার বচনে।
কিবা মন্ত্র কহে কন্যা বুঝিবে কেমনে ॥
চাতুরীকরিয়া কন্যা লজ্জা দিল মোরে।
দুখের একান্ত দুখ কন্যার শরীরে ॥
মহাবংশে জন্ম কিবা এই কন্যা ছিল।
কোন ছলে সাধু জানি এথায় আনিল ॥
তবেত কহিল রাজা সুন কন্যা বাণী।
সুনিবারে শ্রদ্ধা অতি তোমার কাহিনী ॥
সবাকে কহিল রাজা নিঃশব্দে রহিবা।
কন্যা যেবা মন্ত্র কহে সকলি সুনিব ॥

মূলে আছে সর্জ্জিত, লিপিকরের ভুলের জন্যই হয়েছে।

চিত্ত দিয়া[৪৮৭] =মন দিয়া।

সর্জ্জিত[৪৮৮] =লজ্জিত।

Dhaka University Institutional Repository

২৪ তম পরিচ্ছেদ

কাঞ্চন মালা কন্যায় যজ্ঞমন্ত্র কহে

ঃ পয়ার ঃ

রাজার বচন যদি কন্যায় শুনিল।
আদি অন্ত সব কন্যায় কহিতে লাগিল ॥
পূর্ব্ব পুঁথি হস্তে করি কহে মিস্ট স্বরে।
সুন নরপতি আমি কহি যে তোমারে ॥
ভীম রাজ্যের নরপতি প্রচণ্ড মহিমা।
প্রতাপ ভীম নিজ নাম গুণের নাহি সীমা ॥
ঈশ্বরী[৪৮৯] নামেতে রাজার রমণী আছিল।
সিত-বসন্ত দুই পুত্র গর্ভেতে জন্মিল ॥
পুত্র প্রসবিয়া দেবি গেল পরলোক।
পুত্র পালনে রাজা পাইল বড় শোক ॥
পুসিয়া লইতে দুই দিল দাই তরে।
কবুতর[৪৯০] আনিয়া রাজা দিল খেলিবারে ॥
বিবাহ করিল আর রাজা মহামতি।
দিবা নিসি রহে দোন[৪৯১] দাইর সঙ্গতি ॥
আর দিন[৪৯২] গেল শিকার করিতে।
দুই ভাই সন্দি পাই গেলেন্ত খেলিতে ॥
কবুতর ছাড়িয়া দিল গেল রাজপুরি।
ধরিয়া বান্ধিল দেবি বহু যত্ন করি ॥
খেলিয়া আসিয়া দোহে ডাকে কবুতর।
না পাইয়া দুই ভাই হইল ফাঙ্কর[৪৯৩] ॥

ঈশ্বরী[৪৮৯]=ভীম রাজ্যের রাজা প্রতাপ ভীমের স্ত্রী।
কবুতর[৪৯০]=গৃহপালিত পাখি। দোন[৪৯১]=দুই।
আর দিন[৪৯২]=অন্য দিন। ফাঙ্কর[৪৯৩]=হতবুদ্ধি।

Dhaka University Institutional Repository

দাই ঠাঁই জিজ্ঞাসিল কবুতরের কথা।
বন্ধি করি রাখিয়াছে তোম[৪৯৪] সত মাতা ॥
এতসুনি দুই ভাই পুরি মধ্যে গেল।
বন্ধি হইতে কবুতর ছাড়িয়া আনিল ॥
দুখিত হইয়া দেবি কান্দে বিলাপ করি।
হেনকালে নরপতি আইল নিজপুরী ॥
জিজ্ঞাসা করিল তবে নৃপতি রাজন।
ধরণি পড়িয়া দেবি কান্দ কি কারণ ॥
এতেক সুনিয়া দেবি কহে রাজা তরে।
দুই পুত্র আইল রাজা বল করিবারে[৪৯৫] ॥
সুনি ক্রোধ হইলেক রাজা নৃপবরে।
কাটিতে কহিল পুত্র কোতয়ালের তরে ॥
না কাটিয়া দুই ভাই যুক্তিতে বান্ধিল।
দুই অশ্বে দুই ভাই অরণ্যে আসিল ॥
ছোট ভাই কহিলেন্ত বড় ভাইর তরে।
জল দিয়া প্রাণ ভাই রাখহ আমারে ॥
চিন্তিত হইল ভাই অনুজ কারণ।
পদান্তে[৪৯৬] জলের লাগি করিল গমন ॥
অশ্ব সঙ্গে ভাই বৃক্ষতলে থুইয়া।
জকুম নদির কুলে গেলেন্ত চলিয়া ॥
কবিচন্দ্র রাজা সেই দেশেতে আছিল।
আয়ু শেষ হইল রাজা পরলোকে গেল ॥
হস্তি ছাড়ি দিল রাজা মন্ত্রনা[৪৯৭] করিয়া।
নদী তির হইতে কুমার নিলেক ধরিয়া ॥

তোম[৪৯৪]=তুমি। বল করিবারে[৪৯৫]=শ্লীলতাহানি।
পদান্তে[৪৯৬]=পাঁয়ে হেঁটে। মন্ত্রনা[৪৯৭]=পরামর্শ।

Dhaka University Institutional Repository

তবে যে কুমার নিয়া পাটেতে[৪৯৮] থুইল।
নৃপতি হইয়া তবে ভাই পাসরিল ॥
এথায় রহিল কুমার পন্থ যে হেরিয়া।
দিবা শেষ হইল ভাই না আসলি কিয়া ॥
এতেক সুনিয়া রাজা চমকিত মন।
অন্তরে উঠিয়া গেল ভাইর স্মরণ ॥
আমার ছোট ভাই ছিল বসন্ত তার নাম।
অরণ্যে আসিয়া জল চাহিল স্বনাম[৪৯৯] ॥
সকল বৃতান্ত রাজা অনুছলে[৫০০] কয়।
জনক জননি মোর ভাইর নাম লয় ॥
আদি অন্ত সুনি আগে বুঝিব কখন।
কিবা সও মোর ভাই ছিল অন্য জন ॥
কিবা ক্ষেণে আইনু আমি মন্ত্র সুনিবারে।
ভাইর স্মরণ ছেল হানিল অন্তরে ॥
কিমতে জানিল কন্যা মোর আদি অন্ত।
নিকটের কন্যা নাহি ছিল দুর পন্থ ॥
কোন ভিতে ভাই মোর গেল কোন দেশ।
শুনিয়া সকল আজি বুঝিব বিশেষ ॥
কহিতে লাগিল রাজা কুমারীর ঠাঁই।
পূর্ব্ব মত মোর তরে কহনা বুঝাই ॥
তোমার বচন শুনি অমৃতের ধার।
জ্বলিয়া উঠিল মোর অন্তর মাজার ॥
জ্বলিয়া উঠিল মোর জ্বলন্ত অগুনি।
সুনিয়া তোমার বাক্য প্রকাশ পরাণি ॥

পাটেতে[৪৯৮]=সিংহাসনে।
স্বনাম[৪৯৯]=নিজ নাম।
অনুছলে[৫০০]=কৌশলে।

Dhaka University Institutional Repository

জানিয়া লইব আমি কহে কোন কথা।
নহে প্রাণ দিতে আজি আসিয়াছে হেথা ॥
এতেক সুনিয়া কন্যা প্রভু দিগে হেরি।
পুরাইবে মনবাঞ্ছা রাজা সন্তমরি ॥
তোমার স্মরণ রাজার হইল নির্শ্চয়।
অন্তপাট আড়ে দেখ মুর্চ্ছিত প্রায় ॥
তবে কন্যা কহে রাজা সুন কহিয়া আর।
ভাইর উদ্দেশে যায় নৃপতি কুমার ॥
সেই বৃক্ষ তলে কুমার জাগিয়া রহিল।
প্রভাতে উঠিয়া ভাইর উদ্দেশে চলিল ॥
দুই অশ্ব করে ধরি গেলন্ত চলিয়া।
সেই নদী তিরে চিহ্ন পাইলেন আসিয়া ॥
মনেতে ভাবিল ভাই কুম্ভীরে খাইল।
খাইতে বসিয়া কুমার কান্দিতে লাগিল ॥
ভাইরে কোতয়ালে নিল চোর যে বলিয়া।
হাতে গলে রশি দিয়া বান্ধিল কষিয়া ॥
হরিষে কাটিতে[৫০১] সাধু নিলা ডিঙ্গা পরে।
ঈশ্বরের কৃপা হইল কুমারের তরে ॥
যখনেতে ডিঙ্গা ধরি কুমার ঠেলিল।
অমনি যাইয়া তরি জলেতে নামিল ॥
তথাচ না ছারে তারে জেহেল ভরিয়া।
বান্ধিয়া লইয়া গেল সঙ্গতি করিয়া ॥
এতেক সুনিয়া সাধু বর্জ্রাঘাত পরিল।
আচম্ভিতে পুষ্পবন অনলে দহিল ॥
ছটফট করে সাধু মুখে নাহি রাও[৫০২]।
কিবা মন্ত্র কহে কন্যা না বুঝি তার বাও ॥

হরিষে কাটিতে[৫০১]=দ্রুত কাটিতে।
রাও[৫০২]=শব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

নানা মিল ডিঙ্গা মোর আনিছিলাম চোর।
জেহেল ভরিয়া সঙ্গে আনিছি সত্বর ॥
রাজকন্যা বিবা দিল তখনি জানিল।
তবে কেন বান্ধি তারে সমুদ্রে ফেলিল ॥
কিবা সাদ হইল মোর ধরিবারে চাঁদ[৫০৩]।
আপনি পাতিলাম আমি আপনার ফাঁদ ॥
হাসলাস দুরে গেল কামান্তর কায়[৫০৪]।
ললাটে মারিয়া ঘাও[৫০৫] করে হায় ২ ॥
নির্শ্চয় জানিলাম আমি আপনার কলে।
আপনি হানিলাম আমি আপনার ছলে ॥
কন্যার চরিত্র আমি বুঝিতে না পারি।
মিছা জঞ্জালেতে আমার প্রাণি নিল হরি ॥
সেই বার্ত্তা হয় স্বত্ত হারাইলাম প্রাণ।
কুমারের ধর্ম্ম কভু না জায় এরাণ ॥
মন্ত্রবাদ[৫০৬] হয় কিবা রাজা উঠি যায়।
সাধুর চরিত্র ভাবি রাজায় বুঝায় ॥
আখিশানে[৫০৭] আজ্ঞা রাজা দিল দূত তরে।
সাধুরে রাখিবা যেন সভার নজরে[৫০৮] ॥
রাজ আজ্ঞা পাই সাধু কহে সর্ব্বজন।
পুনমন্ত্র কহে কন্যা সুনহ রাজন ॥
জঙ্গি সহরে গিয়া ডিঙ্গা লাগাইল।
বিকি কিনি করে সাধু রাজদ্বারে গেল ॥

ধরিবারে চাঁদ[৫০৩]=অসম্ভব বস্তু। কামান্তর কায়[৫০৪]=কামভাব অর্ন্তনিহিত হল।
ঘাও[৫০৫]=আঘাত। মন্ত্রবাদ[৫০৬]= অনুষ্ঠানে যে মন্ত্র পড়া শেষ হয়।।
আখিশানে[৫০৭]=(আরবী শব্দ)=চোখের ইশারায়। সভার নজরে[৫০৮] =নজর বন্দী।

Dhaka University Institutional Repository

সেইত রাজ্যেতে ছিল কিস্বর নৃপবর।
সাত মানিক্য লইল তথা সাধু সওদাগর ॥
মানিক লইয়া সাধু নৌকায় গেল যবে।
সাধু স্থানে অন্ধ বলি কহিলেন্ত তবে ॥
তবেত কহিল রাজা এই বন্ধিয়ান।
শীর্ঘ্র করি আন গিয়া আমা বিদ্যমান ॥
সুপালা পাঠাইয়া রাজা কুমার আনিল।
রাজপুত্র জানি রাজা কুমার রাখিল ॥
তবে সাত মানিক দিল সওদাগর তরে।
আনন্দে চলিয়া গেল নৌকার উপরে ॥
কাঞ্চনমালা কন্যা তার স্থানে বিয়া দিয়া।
রাখিলেন্ত সেই কুমার যওন করিয়া ॥
দিবা নিসি হাহাঙ্কার ভাই ভাই বলি।
শয়নেতে নিদ্রা নাহি সদা ব্যাকুলি[৫০৯] ॥
আসিবার কালে সেই সাধুর নৌকায় চড়ি।
সঙ্গতি করিয়া কুমার আনিল কুমারী ॥
হাতে গলে বান্ধি কুমার সমুদ্রে ফেলিল।
বিধবা করিয়া সাধু কুমারী আনিল ॥
সেই কন্যা সাধুর ঠাঁই দিবা নৃপমনি।
পতির সমন্ধে মোর ভাসুর আপনি ॥
অভাগির মন্ত্র যাহা হইল বিশেষ।
বিদায় দেও যাব আমি পতির উদ্দেশ ॥
এই মন্ত্র কহে যদি কাঞ্চনমালা নারি।
হাহাঙ্কার করি রাজা উঠিল আপনি ॥

ব্যাকুলি[৫০৯]=উদ্বিগ্ন।

Dhaka University Institutional Repository

কাটাবৃক্ষ[৫১০] ভূমে যেন পরে আচম্বিতে।
এইরূপ ঢুলিয়া রাজা পরিল ভূমিতে ॥
চিন্তিত হইল যত পাত্র মিত্রগণ।
শীর্ঘ্রগতি আসি রাজা ধরে সর্ব্বজন ॥
না শুনে কর্ণেতে রাজা কাহার বচন।
চেতন পাইয়া রাজা উঠিয়া বসিল ॥
কান্দি ২ রাজা তবে কহিতে লাগিল।
তোমার বচনে কন্যা বড় পাইনু বেথা।
তোমাতে সুনিনু আজি মোর ভাইর কথা ॥
নির্শ্চয় কহত কন্যা আছে কিবা নাই।
নহে আজি প্রাণ আমি দিব সভা ঠাঁই ॥
মধুর বচনে কন্যা ভাইর নাম যে কহিলা।
অমৃতে যে বিষ কন্যা শেষে কেনে দিলা ॥
ভাইর মরন্ শুনি রহে না জীবন।
এমন নিষ্ঠুর বাক্য করিলা কি কারণ ॥
সেইত সমুদ্র মোরে দেহ দেখাইয়া।
ডুবি ২ চাইমু[৫১১] আমি বহু বিচারিয়া ॥
সমুদ্রে যাইয়া আমি কুম্ভীর ধরিব।
মৎস্য ধরিয়া আমি কাটিয়া চাহিব ॥
যাহার উদরে আমি হাড় মাংস পাব।
অনলে দহিয়া আমি পরলোকে খাব ॥
কি করিব রার্জ্য মোর এই সকল সুখ।
যাবৎ না দেখি আমি ভাইর চন্দ্রমুখ ॥

কাটাবৃক্ষ[৫১০]=গাছের গুড়ি।
চাইমু[৫১১] =খোজে।

Dhaka University Institutional Repository

সংসার ছাড়িয়া যাব বৈষ্ণব হইয়া।
সেই নদী তীরে আমি রহিব পারিয়া ॥
এইত রাজ্যের জন্য ভাই হারাইলাম।
আর না যাইব আমি সকল ছাড়িলাম ॥
সঙ্গতি করিয়া ভাই যে মতে আনিলাম।
সঙ্গে আনি তার ফল হাতে দিলাম ॥
অরণ্যে প্রবেশ করি যথা তথা যাব।
কোথা গেলে ভাই আমার সঙ্গে দেখা হইব ॥
সও বন্ধ করিল রাম ভাইর কারণ।
পর্ব্বত আনিল তবে পবননন্দন[৫১২] ॥
ঔষধ ভক্ষণে প্রাণ দিল অনুজেরে।
আমিত ঔষধ আনি দিব কাহারে ॥
মরণ বিনেতে আর না দেখি উপায়।
অবশ্য ভাইকে আমি পাইব তথায় ॥
পরলোক গেলে আমি ভাই দর্শন পাই।
একস্তর[৫১৩] হই গিয়া দোহে সেই ঠাঁই ॥
জননি প্রসবে দোন ছিলাম এক সাতে।
হেন ভাই ছাড়ি আমি রহিম কি মতে ॥
আহারে দারুণ যম লইয়া যাও মোরে।
ভাই বিনা বাঞ্ছা নাই এ ভব সংসারে ॥
তুমি মারিবা কি আপনে আমি মরি।
এই বলি অস্ত্র তুলি দিল গলে ধরি ॥
হাহাঙ্কার করিয়া আইসে পাত্র মিত্রগণ।
কন্যা বলে প্রভুত্বে বিলম্ব কি এখন ॥

পবননন্দন[৫১২] =হনুমান।

একস্তর[৫১৩] =একস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

মরি গেলে রাজা শেষে সঙ্কট[৫১৪] হইবে।
মোরে সাধু নিয়া তোমার দুর্গতি করিবে ॥
আমার দুর্গতি জানি কিবা হয় পুনি।
ভাইকে ভেটহ গিয়া প্রভু গুণমনি ॥
আচম্বিতে চৌদল হইতে ভূমিতে পরিল।
কুমার দেখিয়া সবে নিঃশব্দে রহিল ॥
ভাল বিভা করিবেক সাধু সওদাগর।
গন্দর্ব্ব আইন দেখি কন্যা সঙ্গে বর ॥
ভয় পাই সাধু তবে ললাটে ঘাও দিল।
সমুদ্রে ফেলিলাম বেটা কি মতে আসিল ॥
কান্ধে করি আনি দিলাম যার পতি তারে।
ঘোষনা রহিল মোর ত্রিভুবন সংসারে ॥
ভালা যে মন্দ করে এই ফল তার।
মরণ লিখিত হেতু এই ছিল আমার ॥
তবেত কুমার ভাইর চরণে পারিল।
বিলাপ করিয়া দোহে বিস্তর কান্দিল ॥
ধুলায় দোসর দোহে গড়াগড়ি যায়।
নৃপতি ভাইকে ধরি কান্দে উচ্চ রায়[৫১৫] ॥
আহা মোর প্রাণের ভাই গেছিলা কোথায়।
এইত কারণে মোরে আনিলা এথায় ॥
পিতা মাতা বৈরী হইল আসিলাম সঙ্গতি।
নৃপতি হই তোমা করিনু দুর্গতি ॥
নির্শ্চয় জানিতাম আগে তুমি আমার ভাই।
তবে কেন বান্দি দিব সওদাগরের ঠাঁই ॥

সঙ্কট[৫১৪] =বিষম।
উচ্চ রায়[৫১৫]=বিকট শব্দে, উচ্চ স্বরে, চিৎকার করে।

Dhaka University Institutional Repository

কিবা ক্ষেণে রাজা হইয়া বুদ্ধি হারাইলাম।
দয়ার বান্ধব ভাই উদ্দেশ না পাইলাম ॥
কাটিবারে দিনু আখি সওদাগরের ঠাঁই।
মোর ভাগ্য ফলেতে বাচিয়া আইলা ভাই ॥
অবশেষে স্মরণ ভাই হইত তোমার।
না জানি কি কপালেতে হইত আমার ॥
অপরাধ ক্ষেম ভাই মোর প্রতি।
যে মারিলে তোমায় তাকে করিব দূর্গতি ॥
তার শাস্তি দিব আজি আমি সাধুর তরে।
তবেত ফিরিয়া আমি যাব নিজ ঘরে ॥
উঠ ২ ভাই মোর আসি দেহ কোলে।
চিরকালের দুখ মোর খন্ডাও আসিয়ে ॥
নয়ানে নয়ান রাখি ঝরায় দুই আখি।
অধরে অধর রাখি চাঁদ মুখ দেখি ॥
ললাটে ললাট রাখি চাঁদের উপর চাঁদ।
করে ধরি গলে চাপে একি বান্দে[৫১৬] বাঁধ ॥
বুকের উপর বুক রাখি অন্তরে অগনি।
দুই ভাইর নিবে যাউক[৫১৭] মনের অগনি ॥
পরাণে পরাণ রাখি অন্তরে মিশুক দুই ভাই।
মধুর বচন কহ কর্নেতে জুরাই ॥
ছাতির পর ছাতি রাখি স্থির কর মোরে।
যে মতে আছিলাম দোহে মায়ের উদরে ॥
পাঞ্জরে পাঞ্জর রাখ ~~উঠিল~~ ফাটিয়া।
পৃষ্ঠের উপর পৃষ্ঠ রাখ উঠায় ফারিয়া ॥

একি বান্দে[৫১৬] =একই সূত্রে।
নিবে যাউক[৫১৭] =দূর হ'ক।

Dhaka University Institutional Repository

২৫ তম পরিচ্ছেদ

শীত-বসন্তের দুই ভাইর মিলন

ঃ পয়ার ঃ

মন পবন আমার যে দুই ভাগ ছিল।
আয়ু শুভদিন বিধি ঘটাইয়া দিল ॥
আহারে মন্ত্রনি[৫২১] তুমি শুন মোর কথা।
দুত পাঠাইয়া আজি দেও যথা তথা ॥
নির্ত্যগীত কর মোর রাজ্যের ভিতর।
বাজনার শব্দ কর বাজারে বাজার ॥
দেবতার পূজা কর ছাগল কাটিয়া ।
দান দক্ষিণা[৫২২] করো ব্রাহ্মণ ডাকিয়া ॥
রাজা হইলাম সত্য মনে না রচয়[৫২৩]।
অন্তর মাজার মোর প্রাণি না রয় হায় ॥
কি জানি অন্তরে মোর হইল তাপ ২।
কার ঠাঁই না কহিলাম কি হইল তাপ[৫২৪] ॥
এবে সে জানিলাম আমি ভাইর কারণ।
নিবিল অনল মোর তোমা দর্শন ॥
দারুণ বিধি ভাইর নাম ভুলাইল মোরে।
পুরিয়া আন্দার[৫২৫] করে সরিল মাজারে ॥
রাজায় বিলাপ করে ভাইর গলা ধরি।
চৌদলে বসিয়া সব দেখয় কুমারী ॥
নয়ানের জলে দোহার অঙ্গ যে তিতিল[৫২৬]।
হেন ভাই ভিন্ন হইয়া কিমতে আছিল ॥
প্রজাদি জত লোক কান্দে পুনি ২।
কতবা লিখিব আমি উঠায় অগনি ॥

মন্ত্রনি[৫২১]=মন্ত্রনা সভা। দান দক্ষিণা[৫২২] =দান খয়রাত।
রচয়[৫২৩] =রচনা করে।তাপ[৫২৪] =দুঃখ।
আন্দার[৫২৫] =অন্ধকার। তিতিল[৫২৬]=ভিজিল।

Dhaka University Institutional Repository

তবে কুমার ভাই ঠাঁই করে নিবেদন।
ফিরিয়া দেখিলাম আমি তোমার চরণ ॥
দেখিবার হেন আসা নাহি ছিল আর।
সাধু বেটা মারি ফেল সমুদ্রের মাজার ॥
যত দুখ পাইয়াছিলাম জলে তৃষ্ণা পরি।
কত দুখ পাইনু তোমার বন্দখানা পুরি ॥
সব হইতে অতি দুখ সমুদ্রের মাজে।
ঈশ্বর করুণা নহে মরি সেই সাজে ॥
পিতায় কাটিতে নারে তুমি হে কাটিতা।
অগনি কুণ্ডেতে নাহি বান্ধিয়া ফেলিতা ॥
সেই ভাল একেবারে যাইতাম মরিয়া।
হেন দুষ্টের হাতে এত দুখ কি লাগিয়া ॥
প্রাণী ফেটে যায় মোর উপর ফাফরে।
না ফাটে পবন সেই সমুদ্র মাজারে ॥
হেট পরে তল[৫২৭] যাই ক্ষেণে আসা মন।
আর না দেখিব আমি ভাইর চরণ ॥
করম নির্ব্বন্ধে লেখা খণ্ডাইতে নারে।
তুমি হেন ভাই মোর ক্ষেমিলা[৫২৮] কিসেরে ॥
যখনেতে পিতামাতা কাটিতে চাহিলে।
তখন জানিলাম দুখ করমে আছিলে ॥
কিন্তু তোমা লাগি ভাই আইলাম বাঁচিয়া।
নৃপতি হইবা তুমি এথয়ে আসিয়া ॥
না ছিল করমে সত্ত তুমি হেন ভাই।
তবে কেন বান্ধি দিলা সওদাগরের ঠাঁই ॥

হেট পরে তল[৫২৭] = ঢেউ।

ক্ষেমিলা[৫২৮] =ক্ষমা করা।

Dhaka University Institutional Repository

পুরিল মনের আসা বিদায় দাও মোরে।
এই সব দুর্গতি মোর না সহে সরিরে ॥
পাটেতে বসিলে যদি ভাল আরবার[৫২৯]।
না জানি কি করে মোরে সাধু সওদাগর ॥
লিখিত আছিল মোর খণ্ডিবে কি মতে।
পিতা না কাটিলে তুমি কাটহ সাক্ষাতে ॥
নহে মোরে ছাড়ি দেও অন্য দেশে যাই।
তোমার রাজ্যেতে মোর কিছু সাদ নাই ॥
মিনতি করিলাম আমি দুই কর ধরিয়া।
তথাচ সমুদ্রে মোরে ফেলিল বান্ধিয়া ॥
রাজকন্যা আনিলেক সুন্দরি দেখিয়া।
তোমা বিনে কারে কব দুঃখ বিনাইয়া[৫৩০] ॥
স্মরণে পাঞ্জর ফাটে কিমতে সহিব।
তুমি বিনে দুখ আর কারে নিবেদিব ॥
আসিবার কালে রাজা নিষেধ করিল।
তার ফল সাধু মোরে হাতে ২ দিল ॥
সিতার হরণে রাম যত দুঃখ পাইল।
তার অধিক দুখ আমার হইল ॥
দুই দুখ একেবারে হইল আসিয়া।
তথাচ দারুণ প্রাণ না জায় ছাড়িয়া ॥
তুমি দুখ দিলা ভাই সে ছিল করমে।
সাধু দিল ভাই তা রহিল মরমে ॥
ডিঙ্গা নামাইয়া দিলাম জলের ভিতরে।
সাত মানিক দিল মোর শ্বশুর নৃপবরে ॥
অপরাধ করিলাম তোমা সাধুর ঠাঁই।
কোন অপরাধে যে মরিতে চাহিল ভাই ॥

আরবার[৫২৯]=পুনরায়।
বিনইয়া[৫৩০]=বিস্তৃত করে বা ব্যাখ্যা করে।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার কৃপান[৫৩১] আছে গলায় ধরিয়া।
দেহ যে ছাড়িব আমি ঈশ্বর ভাবিয়া ॥
দেহ ত্যাগ করি আমি পরলোকে যাই।
যারে ইচ্ছা হয় কন্যা দিও তার ঠাঁই ॥
ইঙ্গিত বচনে রাজা লজ্জা গত হইল।
কি কথা কহিলা ভাই হৃদয়ে হানিল ॥
একে তোমা দুখে গরল হানিছে অন্তরে।
তাহে হেন বাক্য মোর না সহে পরাণে ॥
কি মতে জানিলাম আমি সাধু সওদাগরে।
তোমাকে মারিয়া কন্যা আনিয়াছে ঘরে ॥
বরতে ত বরতিমা[৫৩২] মোরে সওদাগরে।
বিধাতা আনিল এথা তোমার গোচরে ॥
সতি পতিব্রতা এই রাজার নন্দিনী।
এহার লাগিয়া ভাই না ভাব আপনি ॥
ভাল আসা করি কন্যা বুদ্ধি বড় ধন।
সেই হইতে তোমা সঙ্গে হইল দর্শন ॥
চেষ্টাইতে দুঃখ দশা খণ্ডান না জায়।
মহা বুদ্ধিমন্ত কন্যার গুণের নাহি ক্ষয় ॥
চিন্তা স্থির কর ভাই নহে হুতাসন[৫৩৩]।
সাধুর তরে সাজা দিব এই ক্ষণ ॥

কৃপান[৫৩১]=তরবারি।

বরতে ত বরতিমা[৫৩২]=বিধি মতে বরণ করা।

হুতাসন[৫৩৩]=আগুন।

Dhaka University Institutional Repository

২৬ তম পরিচ্ছেদ

রাজার নিকট কুমার সমুদ্রের কথা বয়ান করে

ঃ পয়ার ঃ

কহ সমাচার ভাই দুঃখ পরিহরি।
কিমতে আসিলা ভাই সমুদ্রেতে তরি ॥
কন্যা সঙ্গে একন্তর কি মতে হইলা।
এই সব বৃত্তান্ত ভাই নির্শ্চয় কহিবা ॥
কুমার কহিল মোর নিলক্ষের লক্ষ।
সমুদ্রে ঈশ্বর আসি হইল মোর পক্ষ ॥
অনেক দিবস আমি সমুদ্রে ভাসিলাম।
মালিনীর ঘাটেতে আমি আসিয়া ঠেকিলাম ॥
প্রভাতে মালিনী গেল সেই বৃন্দাবন।
জল হইতে খুলিয়া যে ছাড়িল বন্ধন ॥
তবে জিঙ্গাসিলাম রাজ্যের খবর।
এই কোন রাজ্য হয় কেবা নৃপবর ॥
যত আদি[৫৩৪] সমাচার মালিনী কহিল।
তোমা নাম সুনি মোর জীবন সঞ্চারিল ॥
ধর্ম্মমাতা মালিনী ধর্ম্ম পুত্র করি।
রাখিল আপন পুরি বহু কৃপা করি ॥
গতাগতে[৫৩৫] মালিনীতে খবর পাইয়া।
পুষ্পমালা মধ্যে পাতি লেখিয়া যে দিয়া ॥
সংবাদ পাইয়া মোর প্রিয়া করে ছন্দ।
সমিপ্তের সামগ্রি যত করে নানা ছন্দ ॥

যত আদি[৫৩৪]=ইত্যাদি।

গতাগতে[৫৩৫]=সূত্রেমতে।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র পাঠাইয়া দিয়া তাম্বুল পুরাতে।
পুস্পের চৌদলে চরি আসিলাম এথাতে ॥
সাধুকে কহিল রাজা বাউতে[৫৩৬] বসিবা ।
চৌদল আনিয়া পূঁজার মধ্যেতে রাখিবা ॥
তোমার সাক্ষাতে আমি বসিব সভাতে।
যত পূর্ব্ব সমাচার কহিব রাজাকে ॥
যে মত কহিল প্রিয়া সেই মত করিল।
আপন শ্রদ্ধায় ভাই আপনি আসিল ॥
সমিপ্ত হইল মোর সাধু হরষিত।
করিবা যে যুক্তি যাহা আমাকে তুরিত ॥
এ সকল সুনিয়া রাজা হয় খান২।
আমার ভাণ্ডারে কহে কন্যা বড়মান[৫৩৭] ॥
তবে ক্রোধ আজ্ঞা রাজা করে দুত তরে।
সাধুকে ধরিয়া আন আমার গোচরে ॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া সবে হাতে ২ ধরি।
সাধুকে লইয়া গেল রাজার হুজুরি ॥
সাধুকে দেখিয়া রাজা অগ্নি অবতার[৫৩৮]।
সুন এবে সওদাগর বচন আমার ॥
তখনে কহিল রাজ্যের লোক দিয়া।
ধরিয়া টানিল ডিঙ্গা নানা মিল গিয়া ॥
সেই ডিঙ্গা নামাইল একেলা মোর ভাই।
তবে কেন গিয়া কইলা মোর ঠাঁই ॥
এ সব সংবাদ আমি আগেতে পাইলে।
অবশ্য চিনিতাম ভাই সাক্ষাতে আসিলে ॥

বাউতে[৫৩৬]=বরের জন্য নির্দ্দিষ্ট জায়গা।

অগ্নি অবতার[৫৩৭] =রোষান্বিত।

বড়মান[৫৩৮]=শ্রদ্ধা।

Dhaka University Institutional Repository

আমার ভাইকে দুখ দিয়াছ যে তুমি।
এহার যে শাস্তি দিব দেখহ তা তুমি ॥
সাধুকে কহিল রাজা বুদ্ধি তোমা নাই ।
অবিচারে ক্রোধ কর এ কোন বারাই ॥
ধন পাইয়া তখনি যে হইলা সন্তোষ।
ভাই কাটিবারে দিলা এবে আমার দোষ ॥
নির্শ্চয় জানিবা সাধু মৃত্যু এরাণ নাই।
অঘোর বচন[৫৩৯] আজি নৃপতির ঠাঁই ॥
ধনের অধিক ইস্ট কেবা আছে আর।
সুন ওহে রাজা তুমি বচন আমার ॥
লক্ষ্মীর মত সুন্দরী কন্যা দাও মোরে।
কুমারের ৰিয়া তুমি চলি যাও ঘরে ॥
আগেতে ভরসা দিয়া হইলা নিঠুর।
রাজধর্ম্ম এ নহে সভার হুজুর ॥
এতেক সুনিয়া রাজা কাঁপে থরে ২।
লজ্জিত হইয়া দহে শরিল অন্তরে ॥
সুনহ কোতয়াল সব সাধুর বংশ ধরি।
সমুদ্রে ডুবাও নিয়া সেই ডিঙ্গা ভরি ॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া তবে কোতয়ালগণ।
সাধুর বংশ ডুবাইয়া করিবা নির্দ্দন ॥
যুবক যুবতি চাহি রাখিল সুন্দরী।
পরিচর্য্যা করিবারে রাজার কুমারী ॥

অঘোর বচন[৫৩৯] =নির্মম কাব্য।

Dhaka University Institutional Repository

তবে রাজা কহিলেক মোর প্রাণের ভাই।
রাজত্ব সকল আমি দিলাম তোমা ঠাঁই ॥
রাজপাট ধনজন সুঁপিলাম তোমারে।
অন্ন বস্ত্র বিনা কাজ নাহিক আমারে ॥
কুমার কহিল ভাই কিমতে জানিব।
রাজপাট যজ্ঞ আজি কিমতে হইব ॥
বিধাতা করিছে তোমা পাটের ঈশ্বর।
মোর শক্তি আছে কিবা তাথে বসিবার ॥
সেই সব জুজ্ঞতা[৫৪০] যদি করিত বিধাতা।
তবে কেন এত দুখ পাইনু যথাতথা ॥
রাজপাট সংসারেতে কিছু কার্য্য নাই।
ভিন এক পুরি দেহ রব সেই ঠাঁই ॥
তবেত কহিল রাজা সাধুর সংসার।
সকল সুপিনু আমি জান তোমা পর ॥
দাস দাসী ধন জন এ রাজ্যেতে বাস।
সকল সুপিনু তোমায় দুখ কর নাস ॥
পুনরপি ভাইর তরে কন্যা বিভা দিয়া।
আপন পুরিতে রাজা গেলেন্ত চলিয়া ॥
সাধুর পুরিতে তবে কুমার রহিল।
আপনার মনান্তরে ভাবিতে লাগিল ॥
সুন্দরী দেখিয়া কিনা সাধুর নন্দন।
শ্রদ্ধায় করিল কিনা বুজিব কারণ ॥
প্রথম জৈবন কালে কামান্তর কয়।
হেন অগ্নি নিবারিছে বুজন না যায় ॥

জুজ্ঞতা[৫৪০] =যোগ্যতা।

Dhaka University Institutional Repository

কি মতে কন্যাকে আমি করিব বিচার।
ভাঙ্গিয়া কহিলে[৫৪১] আমি পাব দুখ ভার ॥
না বুজিয়া প্রিয়া লই কিমতে বঞ্চিব।
ইহলোক পরলোক মহাপাপী হইব ॥
মোর লাগি দুখ প্রিয়া পাইল জন্মান্তরে।
অবিচারে ক্ষেমিবারে দুখ লাগে মনে ॥
বিচার করিতে কিছু বুদ্ধি নাহি সরে।
নিবান না যায় অগ্নি সরিল অন্তরে ॥
বিরস বদনে কন্যা শয়ন করিল।
প্রভুর বিরস মতি কন্যায় বুঝিল ॥
দুখ অনলেতে জ্বলি ভাবে অনুমান।
কি কার্য্য হইল আসি এই স্থান ॥
নির্শ্চয় জানিল পতি দুষ্টমতি মোরে।
অনলে অনল না সহে শরিলে ॥
প্রাণত্যাগ করি আজি জাব নিজ ঘরে।
জার লাগি এত দুখ জেন হে আমার ॥
নির্শ্চয় জানিনু আমি বর ভাগ্যহীন।
বারে ২ প্রভু মোর হইয়া যায় ভিন ॥
মনে ভাবে গরল আমি করিব ভক্ষণ।
নহে অগ্নি মাজে আমি হইব দাহন ॥
মরণ ইছিয়া[৫৪২] কন্যা ক্রোধ মুখ ভরে।
ঘোর নয়ন করি কহে পতির গোচরে ॥
সংসারে জানিলা প্রভু আসি অভাগিনী।
ত্রিভুবনে নাহি হেন আমি ত দুখিনী ॥

ভাঙ্গিয়া কহিলে[৫৪১] =বিশ্লেষণ করে।

ইছিয়া[৫৪২] = সংকল্প ।

Dhaka University Institutional Repository

মরিবারে ছিল আশা গলে দিয়া কাতি।
সমুদ্রেতে দিতাম জাপ তোমার সঙ্গতি ॥
তাথে তোমার মত রাখি এই হইল ফল।
সংসারে না ছুঁইবে কেহ্ মোর হাতের জল ॥
কলঙ্কিনী করিলা মোরে অবিচার করি।
ভালত আছিলাম আমি তোমা পন্থ্ হেরি ॥
সাধুকে ভাণ্ডিলাম আমি নানা ছন্দকলা[৫৪৩]।
অবধি করিলাম প্রভু যে কহিয়া গেল ॥
এহার মধ্যে জদি না আসিতাম এই দেশ।
বিচারি চাহিতাম বৈরাগীর বেশ ॥
সত্তবন্ধ[৫৪৪] হইলা বেউলা ভাইর কারণ।
সে মতে ভাসিয়া আমি জাইতাম দেবস্থান ॥
সাফল্য হইল আমি দেখিলাম তোমারে।
এখন বিদায় দেও জাই যম ঘরে ॥
দোচরণি[৫৪৫] নারি রাখা নাহি প্রয়োজন।
শুনিয়া হাসিবে সব রাজার নন্দন॥
কিন্ত যে পরীক্ষা আছে লও মোর ঠাঁই।
তবে প্রাণ দিব আমি কলঙ্কি এরাই॥
অগ্নিকুণ্ডেতে মোরে ফেলাও বান্ধিয়া।
দোচরণি হইলে আমি যাব ভস্ম হইয়া ॥
নিরাঞ্জন আছে জান ত্রিভুবন সার।
পাপ পূণ্য যেই মোর করিবে বিচার ॥
জন্মিলাম রাজঘরে রাজার নন্দিনী।
সতীর সমাজে হইল অসত্ত কাহিনী ॥

ছন্দকলা[৫৪৩] =নানা প্রকার।

সত্তবন্ধ[৫৪৫] =প্রতিজ্ঞা।

দোচরণি[৫৪৬] =অসতী।

Dhaka University Institutional Repository

নির্শ্চয় জানিল প্রভু আমি দুষ্টমতি।
কিশেরে বরিলাম আমি এতেক দুর্গতি ॥
কুমার কহিল প্রিয়া শুন চন্দ্রমুখী।
পুরাণ ভারতে আমি সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখি ॥
সীতা হেন পতিব্রতা ছিল বৃন্দাবন।
লেখিল করম ফল হরিল রাবণ ॥
অথচ শ্রীরাম তারে পরীক্ষায় দিল।
জয় ২ ধ্বনি তার সংসারে রহিল ॥
কিন্তু তোমা লাগি মোর সন্দ কিছু নাই।
সকল জানহ তুমি কুলের ভালাই ॥
নানা মতে দুখ পাইনু বল হইল ক্ষিণ।
দিন কত আছি আমি তোমা ভিন ॥
ঈশ্বর করিলে শেষে হইবে মিলন।
এসব মিনতি জদি রহে যে জিবন ॥
প্রভুর বচনে কন্যা বহুত কান্দিল।
হেনকালে নিশিগঞ্জে[৫৪৭] প্রভাত হইল ॥
তবেত কহিল কন্যা প্রভুর গোচরে।
পরীক্ষার সাজন করো শীর্ঘ্র তরে ॥
এক কুম্ভ করি তাথে শত ২ লরি।
অগ্নি জ্বালি দিল তার চতুর্দ্দির্গে বেরি[৫৪৮] ॥
ঘৃত তৈল আনি তাহা কুণ্ড মধ্যে দিল।
গগন সমান অগনি জ্বলিতে লাগিল ॥
নৃপতির আগে বার্ত্তা জানাইল চরে।
পাত্র মিত্র লইয়া রাজা আসিল সত্তরে ॥

নিশিগঞ্জে[৫৪৭] =রাত অহিবাহিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষণ দিতে কন্যা আসিলেক পুরি।
সতি অসতি কিবা মনে২ গুণি ॥
যুবক যুবতি আদি কুলবধুগণ।
লজ্জা ত্যাগি আইসে সব দেখে পরীক্ষণ ॥
পেরনাম করিয়া কন্যা অলঙ্কার পরি।
বসন পড়িল অঙ্গে পাটম্বর শাড়ী ॥
সুগন্ধি অঙ্গেতে দিয়া অঙ্গ সাজ করি।
সখিগণ সঙ্গে করি আসিল কুমারী ॥
কুণ্ডের নিকট গিয়া ঈশ্বরের স্থানে।
ভক্তি করেন কন্যা বহুত যতনে ॥
দোচরণি হই আমি ত্রিভুবন মাঝে।
ভস্ম করি প্রভু মোরে মার এই সাজে ॥
এই মাত্র দুখ মোর রহিলেক মনে।
পিতা মাতা কলঙ্ক রহিল ত্রিভুবনে ॥
সও যদি মার মোরে অনল মাজারে।
ঘোষণা রহিবে মোর জন্ম জন্মান্তরে ॥
আহা প্রভু করতার সংসারের সার।
পাপ পূর্ন্ন তুমি সব করিবা বিচার ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নিরাকার।
জগত দুর্লভ তুমি সংসারের সার ॥
তুমি ইন্দ্র[৫৪৮] তুমি চন্দ্র তুমি পুরন্দর[৫৪৯]।
তুমি বিনে নাহি হেন কৃপার সাগর ॥

ইন্দ্র[৫৪৮] =ঋগবেগের প্রধান দেবতা।
পুরন্দর[৫৪৯] =বিনাশক।

Dhaka University Institutional Repository

যত কিছু চলাচল তোমার কৃর্ত্তন[৫৫০]।
অন্য দল কিছু নাই তুমি নিরাঞ্জন ॥
জানিতে সংস্যারের মায়া জানিলাম অসার।
তুমি বিনে নিলক্ষের লক্ষ নাই আর ॥
ধর্ম্ম জানাইলাম আমি মরিবার কালে।
বিচার করিয়া মার দহিয়া অনলে ॥
তবে দণ্ডবত হইয়া ভাশুরের পায়।
মধুর বচনে কন্যা করে এই নিবেদয় ॥
তোমার ভাই আমার যুবপতি[৫৫১]।
নানাস্থানে জন্মান্তরে পাইল দুর্গতি ॥
পালন করিবে তুমি কৃপাশীল হইয়া।
আর দুখ নহে দিবা মনে পাসরিয়া ॥
পাপীর দারুণ দুখ অন্তর দাহন।
সেবিবারে না পারিলাম প্রভুর চরণ ॥
অপরাধ হইল মোর প্রভু হইল বাদ।
সাধুর ঘরতি বলি পুরাইলাম সাধ ॥
মোর লাগি প্রভূকে নাহি দিবা লাজ।
এই নিবেদন করি আমি সভা মাজ ॥
কোটি ২ পেরণাম আমি করি সব ঠাঁই।
বিদায় দেও এবে আমি পরলোকে যাই ॥
তবে কন্যা প্রভু পদে দণ্ডবৎ হইয়া।
অনল কুণ্ডের মধ্যে পরে জাপ দিয়া ॥
যখন পড়িল কন্যা ক্ষেপিল[৫৫২] আগুন।
তার মধ্যে আছে কন্যা শিতল বরণ ॥

কৃর্ত্তন[৫৫০] = কীর্তন বা গান।
যুবপতি[৫৫১] =স্বামী।
ক্ষেপিল[৫৫২]= দাউ দাউ করে জ্বলে উঠা।

Dhaka University Institutional Repository

অগ্নি তাপে ঘাস পুরি রাও না করে মুখে।
কন্যা যেন জল মধ্যে রহিলেক সুখে ॥
নির্শ্চয় জানি সবে মরিল কুমারী।
দুখের একান্ত দুখ সহিতে না পারি ॥
রাজা আদি প্রজা কান্দে আর সৈন্যগণ।
কান্দিতে লাগিল সব বিরস বদন ॥
দাস দাসী কান্দে সব কুহুরি ২।
আর না দেখিব মোরা রাজার কুমারী ॥
অগ্নিবাণ কুমারের অন্তরে হানিল।
স্থির নহে পঞ্চপ্রাণী বুদ্ধিহীন হইল ॥
মুখেতে না আইসে কথা প্রাণ নাহি থাকে।
প্রিয়া ২ করি কুমার ছেল মারে[৫৫৩] বুকে ॥
আহা প্রিয়া কিবা দোষে বধিলাম তোমাকে।
নয়ন ফিরিয়া কেন না চাহিলা মোকে ॥
ভাই শোক পাসরিলাম তোমা বুদ্ধি ছন্দে।
তোমা শোক পাসরিব আর কোন বন্দে ॥
হস্তে আনি দিল বিধি আকাশের শশি।
হেন চন্দ্র বুদ্ধি দোসে পারি গেল খসি ॥
নিশ্চয় জানিতাম জঙ্গি[৫৫৪] জাইবা মরিয়া।
বান্ধিয়া রাখিতাম আমি জত্তন করিয়া ॥
অভাগিয়া মনে যেন না বুজি কারন।
তে কারণে দহিলাম অনল ভুবন ॥
জনক জননি ছাড়ি রাখিল বচন।
করিলাম তাহার কার্য্য বধিলাম জীবন ॥

ছেল মারে[৫৫৩] =আঘাত হানে।

জঙ্গি[৫৫৪] =যুদ্ধবাজ।

Dhaka University Institutional Repository

মরণে পাঞ্জর ফাটে না সহে পরাণে।
অগ্নি কুণ্ডে পড়ি আমি আসি তোমা স্থানে ॥
উন্মত্তের প্রায়[৫৫৫] কুমার চতুর্দ্দিকে হেরে[৫৫৬]।
উঠিয়া পরিতে চাহে কুণ্ডের মাজারে ॥
নির্শ্চয় পরিবে কুণ্ডে রাজায় বুজিল।
তুবিতে উঠিতে ভাইর গলায় ধরিলা ॥
কি আশা করিয়াছে ভাই বুদ্ধি নাহি তোরে।
আগে না বুঝিয়া এবে চাহ মারিবারে ॥
দোষ নাহি এই রাজার নন্দিনী।
অনলে উদ্ধার হয় কার শক্তি জানি ॥
দেখহ সমুদ্রের জল আগুনের তেজে।
কি মতে রহিব প্রাণ হেন অগ্নি মাজে ॥
নিকট যাইতে নারে মুর্চ্ছিত প্রায়।
কাহার শকতি আছে তাহাকে বাঁচয় ॥
যে হউক সে হউক স্থির কর মন।
দৈব দোষে মর তুমি কন্যার কারণ ॥
কুমার কহিল ভাই ছাড়ি দেহ মোরে।
দেখিয়া আসিব আমি কুণ্ডের মাঝারে ॥
হেন বুদ্ধিমত্ত কন্যা মোর কর্ম্মে লেখা।
তোমা সঙ্গে ভাই মোর কর্ম্মে দেখা ॥
প্রিয়ার মন্ত্রনায় ভাই করিলাম স্মরণ।
হেন প্রিয়া হারাইলাম দৈবের লিখন ॥
সঙ্গতি আনিয়া প্রিয়া হইলাম বৈরি।
এই সে মনেতে রৈল সহিতে না পারি ॥

উন্মত্তের প্রায়[৫৫৫] =পাগল।

হেরে[৫৫৬] =চেয়ে বা তাকিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

এই সব স্মরণ পুন পরিল মনেতে।
প্রিয়া না দেখিয়া আমি রব কি মতে ॥
ধরিয়া রাখিল রাজা পরিবারে যায়।
পাত্রমিত্র দেখে রাজা ভাই সঙ্গে যায় ॥
জড়াজড়ি ধরাধরি রাখিতে না পারে।
দুভাই পরিতে যায় কুণ্ডের মাজারে ॥
এ সব চরিত্র কন্যা কাঞ্চন মালা সতি।
কুণ্ডেতে বসিয়া দেখে দুই ভাইর গতি ॥
কুণ্ডতে পড়িলে দোহে পুরিয়া মরিবে।
শেষেতে উঠিলে মোর কি কার্য্য হইবে ॥
ভয় মুক্ত হইল বড় কিশ্বরের সুতা।
উঠিল অনল হইতে যেন দেবীর সুতা ॥
ভানুর বরণ কন্যা ঝিলমিল করে।
ষোল কলা পূর্ন্ন শশী উঠিল আকাশে ॥
আচম্বিতে উঠে কন্যা দেখে সর্ব্বজন।
জয় ২ করি উঠে কুলের বধুগণ ॥
সাফল্য জনম হইল রাজার নন্দিনী।
থাকিবে অনেক দিন এহার কাহিনী ॥
আমাদের জন্ম হইল অসত্ত কারণ।
প্রভুদিগে উলিকুলি[৫৫৭] অন্য দিকে মন ॥
ব্রাহ্মণ পন্ডিত আদি রাজা প্রজাগণ।
সকলে লাগিল ধর্ম্ম করিতে স্মরণ ॥
ওহে প্রভু নিরাঞ্জন ত্রিভুবনের সার।
হেন অগ্নি হইতে কন্যা করিলা উদ্ধার ॥

উলিকুলি[৫৫৭] =উকি ঝুঁকি বা এদিক ওদিক তাকানো।

Dhaka University Institutional Repository

তবে বাদ্য শব্দ হইল রাজার ভুবনে।
সুস্থারিয়া[৫৫৮] মঙ্গল গাহে যত সখীগণে ॥
কন্যায় ভাসুর পদে পেরণাম করিয়া।
ভুমিতে পড়িল পতির চরণ ধরিয়া ॥
কহিতে লাগিল ওহে সুন প্রাণ পতি।
এবে দুখ ভাব কেনে সুন মোর পতি ॥
মহাপাপী জন্মিলাম ভুবনের মাজে।
ঘৃণা করিল মোরে অনলের তেজে ॥
কলিঙ্কিনীর প্রাণ নিতে ঘৃন্না করে কালে।
তে কারণে না দহিল অনলের জ্বালে ॥
মোর পিতা রাজ্যে বহু দোচরণি নারী।
তোমা রাজ্যো মহা সতি রাজার কুমারী ॥
চৌদল[৫৫৯] করিয়া আমি আনিলাম তোমারে।
মারিতে আনিলাম সাধুর গোচরে ॥
তোমা ভাগ্য ফলে রাজা সাধুকে মারিলা।
হেন দুষ্ট নারী আমি নির্শ্চয় জানিলা ॥
নিষেধ করিল পিতায় তোমা সঙ্গে আসতে।
তাহার যে ফল আমি পাই হাতে ২ ॥
আনিয়ে ঠেকাইলা মোরে হেন দুষ্টের হাতে।
সত্তভঙ্গ[৫৬০] হইলে শেষে কি গতি হইতে ॥
সতী নারী চাহি প্রভু বিবা কর তুমি।
ভাসুরের দেশে খাব মাঙ্গিয়া যে আমি ॥

সুস্থারিয়া[৫৫৮] =পালা করে।

চৌদল[৫৫৯] =চার পায়া যুক্ত শিবিকা।

সত্তভঙ্গ[৫৬০] =প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ।

কন্যার বচনে জত রাজা প্রজাগণ।
নিঃশব্দ হইয়া সব সুনে এক মন ॥
লজ্জিত হইয়া কুমার হেট সির[৫৬১] করি।
আর চোক্ষে[৫৬২] প্রিয়া দিকে দেখে হেরি ॥
অনলের ছটা জেন প্রিয়ার বচন।
নয়নের জল জরিতি[৫৬৩] ভিজিল বসন ॥
রাজায় কহিল ভাই বুদ্ধি নাহি তোরে।
হেন কন্যার অপরাধ কহ কোন ছারে ॥
বিস্তর বলিয়া রাজা নিজ পুরি গেল।
করে ধরি প্রিয়া কুমার ঘরেতে আনিল ॥
কুমার মন্দিরে গিয়া প্রিয়া কোলে করি।
অধরে রাখিয়া কহে সুন প্রাণেশ্বরি ॥
শুন প্রিয়া শাস্ত্র মত কহি যে তোমারে।
পাপ পুর্ন্ন্য বিচার হয় সংসার মাজারে ॥
ভাল কাজে ভাল হয় মন্দ ছার।
এথাতে করিলে ভাল তথাতে নিস্তার ॥
সুজনের মন্দ হেথা খণ্ডে দিনে ২।
দুর্জ্জনের কথা সব হয় এক স্থানে ॥

হেট সির[৫৬১] =মাথা নত।
আর চোক্ষে[৫৬২] =বাঁকা দৃষ্টি।
জরিতি[৫৬৩] =ফুটায় ফুটায় পড়া।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার পরীক্ষা আমি দিলাম এ কারণ।
ইঙ্গিত করিত[৫৬৪] মোরে জত রাজাগণ ॥
এখন করিব দর্প আমি সভামাজ।
সতির সমাজে প্রিয়া না পাইব লাজ ॥
জেবা পুরুষের নারি পতিব্রতা হয়।
সেইত পুরুষের দর্প সংসারেতে রয় ॥
মোর দর্প রাখিলা যে প্রিয়া প্রাণ ধন।
তোমার পাপ সংসারেতে খন্ডিবে এখন ॥
ইস্বদ হাসিয়া কন্যা কহে প্রভু তরে।
এই বিনে এবে আর কি কহিবা মোরে ॥
আনন্দ হইল দোহে কুমার কুমারী।
নানা ছন্দে করে ভেস সওদাগরের পুরি ॥
মালিনী বাসর ছাড়ি গেল কন্যা সঙ্গে।
কন্যায় আদর বহু করে নানা রঙ্গে ॥
প্রতিদিন যায় কুমার ভাইর হুজুরে।
দিবা অবসান[৫৬৪] হইলে আইশয় গৃহে ॥
হীন হাফেজ আলি কহে ভাবি করতার।
শুন এবে বসন্তের পিতার সমাচার ॥

ইঙ্গিত করিত[৫৬৪] =উপহাস।
দিবা অবসান[৫৬৫] =বেলা শেষে।

Dhaka University Institutional Repository

২৭তম পরিচ্ছেদ

ভমী রাজার মনে দুখ হইবার বয়ান

ঃ পয়ার ঃ

যখনেতে রক্ত আনি কোতয়ালে দিল।
দুই পুত্র ভুলি রাজা তখনি রহিল ॥
একদিন বহির্দ্বারে নৃপতি রাজন।
সভা মধ্যে বসিয়াছে আনন্দিত মন ॥
হেনকালে দুই শিশু লাগিছে কান্দিতে।
রাজার হুজুরে আইল কান্দিতে ২ ॥
এক শিশু কহিলেন্ত শুন নৃপবর।
আমাদের বিচার রাজা করহ সওর ॥
আগে ভাই পিছে আমি করি লড়ালড়ি[৫৬৫]।
ফিরিয়া যে ভাই মোরে কেন দিল বারি[৫৬৬] ॥
আমি নৃপতির চরণে এই নিবেদন করি।
বিনা অপরাধে মোরে কেন দিল বারি ॥
এই নিবেদন করি আমি নৃপতির চরণে।
বিনা অপরাধে মোরে মার কি কারণে ॥
বিচার লাগিয়া হেথা আসিলাম মোরা।
শীত-বসন্ত দুই ভাই তারা গেল মারা ॥
এত সুনি হইল রাজা পুত্রের স্মরণ।
চিন্তিত হইয়া ভুমে পরে ততক্ষণ ॥
অচৈতন্য হইয়া পরে বুদ্ধি নাহি সরে।
না কহে বচন রাজা হাহাঙ্কার করে ॥
ভুমিতে হানিয়া মাতা হানে বারে বার।
ধড়[৫৬৭] মধ্যে প্রাণ নাহি জীবন সংহার ॥

লড়ালড়ি[৫৬৬] = হানাহানি।
বারি[৫৬৭] =আঘাত।
ধড়[৫৬৮] (হিন্দি শব্দ)= শরীর বা দেহ।

Dhaka University Institutional Repository

দশরথ[৫৬৯] দুঃখ পাইল রামের কারণ।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাজা কান্দে ঘন ২ ॥
অবিলম্বে মরণ অধিক হইব তার।
তাহাতে অধিক রাজা করয়ে বিলাপ ॥
দুই পুত্র স্মরণেতে জত দুঃখ পায়।
আয়ু থাকিতে প্রাণ কত না ছাড়ায় ॥
পাত্রগণ বলে দুখে কি হইল রাজন।
কি হেতু ভুমিতে পরে না জানি কারণ ॥
কিবা দুই শিশু আসি কি বলিয়া গেল।
বৃদ্ধকালে রাজা দেখি প্রাণ হারাইল ॥
এতেক শুনিয়া সবে যুক্তি করে সার।
রাজা বিহনে রাজ্য হবে অন্ধকার ॥
জিজ্ঞাসা করিল সবে বুঝিবার কারণ।
কিসের কারণ রাজা তেজয় জীবন ॥
তবে যুক্তি করি কহে জোরে দোন হাত।
কান্দিয়া বিকল কেন শুন লক্ষনাথ ॥
এত দুখ ভাবি রাজা কান্দ কি কারণ।
নির্ব্বলি[৫৭০] হইলাম সবে তোমার কারণ ॥
গগন গর্জ্জিয়া যেন ঘোর বৃষ্টি পরে।
তেনমত রাজা তুমি কান্দহ কিশেরে ॥
তোমার বিহনে রাজা হইবে জঞ্জাল।
প্রেম আদি রাজ্য সব হবে অমঙ্গল ॥
রাজ্যের ঈশ্বর তুমি কেন দুঃখ পাও।
সংসারে দিকে রাজা কেন নাহি চাও ॥

দশরথ[৫৬৯] =সূর্য বংশীয় অযোধ্যার রাজা।
নির্ব্বলি[৫৭০]=বলহীন বা দুর্বল।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার হীন বল হেন বিপক্ষে সুনিয়া।
অন্য রাজায় নিবে রাজ্য তোমাকে মারিয়া ॥
আমা সবে বিদায় দেও রাজ্য সাধ নাই।
স্ত্রী পুত্র লইয়া মোরা অন্য দেশে যাই ॥
এতেক শুনিয়া রাজা চক্ষু মেলি দেখে।
কহিলে লাগিল রাজা হইয়া উর্দ্ধমুখে ॥
শীত-বসন্ত দুই পুত্র শিসু হেন ছিল।
মাতাহীন হইয়া তারা বহু দুখ পাইল ॥
এবে দুই ভাইর স্মরণ পরিল মনেতে।
দিয়াছিলাম দুই শিশু দাইকে পালিতে ॥
রজনী প্রভাত কালে মোর গলা ধরি।
অধরে তাম্বুল দিয়া লইতাম কোলে করি ॥
এবে না আইল দোহে আমার সাক্ষাতে।
দুই পুত্র স্মরণে পরিলাম বজ্রাঘাতে ॥
না দেখি নয়নে আমি না শুনি বচন।
না জানি আমার পুত্র নিল কোন জন ॥
কর্ণেতে কুন্দিলি[৫৭১] দিয়া যোগীরূপ বেসে।
পুত্রের কারণ আমি যাব দেশে ২ ॥
বৈষ্ণব ভেসেতে আমি করিব বিচার।
এ সব সংসার মোর কি করিব আর ॥
নহেত অনল মাঝে দিব আমি জাপ।
তবেত খণ্ডিতে মোর দুই পুত্রের তাপ ॥
দাইকে ধরিয়া আন আমার হুজুরে।
দুই পুত্র কি করিল জিজ্ঞাসিব তারে ॥
তুরিত আনিল দাই রাজার হুজুরে।
জিজ্ঞাসিল রাজা তাকে বহু ক্রোধ করে ॥

কুন্দিলি[৫৭১] (সংস্কৃত)=কর্নভূষণ, কানের অলংকার।

Dhaka University Institutional Repository

শিশুমতি দুই পুত্র দিলাম তোমা ঠাঁই।
এবে কেন না দেও খাও দুই ভাই ॥
নির্শ্চয় জানিবা এবে মারিব তোমারে।
পুত্র বিনে প্রাণ মোর নাহি রহে ঘরে ॥
রাজার বচনে দাই দুঃখ পাইল বরি।
কহিতে লাগিল দাই দুই হস্ত জুরি ॥
সুন কহি নরপতি আমি অভাগিনী।
পালন করিনু শিশু মাতাহীন জানি ॥
অনেক দুখেত আমি পালিয়া লইলাম।
মিছামিছি জঞ্জালেতে প্রাণ হারাইলাম ॥
দুই পুত্র শোক মোর না সহে পরাণে।
তুমি কি মারিবা মোরে মরিব আপনে ॥
তনুকস্ট[৫৭২] হইল মোর অন্নজল ছাড়ি।
পুত্র বিহনে মোর হস্তে হইল লরি ॥
এবে দুসি কর রাজা কিসের কারণ।
পূর্ব্ববার্তা রাজা তোমারে নাহিক স্মরণ ॥
আনিলা বিবাহ করি রাজার নন্দিনী।
দুই পুত্র বৈরী হইল তোমার সরণি ॥
স্মরণে পাঞ্জর কাঁটে সহিতে না পারি।
পূর্ব্ব বার্তা রাজা তুমি দেখহ মনে করি ॥
কবুতর লইয়া দোহে খেলেন সভায়।
এক তিল না দেখিয়া কান্দে উভরায়[৫৭৩] ॥
আর দিন গেল এবে শিকার করিবারে।
কবুতর খেলিতে গেল দোহাকারে ॥

তনুকস্ট[৫৭২]=শীর্নদেহ, শুকনা শরীর।
উভরায়[৫৭৩]=উন্মুক্ত করা।

Dhaka University Institutional Repository

কবুতর ছাড়িয়া দিল গেল অন্তপুরি।
দেখিয়া বান্ধিয়া দেবী বহু যত্ন করি ॥
কবুতর আনিয়া দেবী বান্ধিয়া রাখিল।
না পাইয়া দুই ভাই কান্দিতে লাগিল ॥
ঘরে ২ বিচারিয়া পায় দেবী স্থানে।
খসাইয়া আনে দাই বন্ধয়ান হইতে ॥
এই অপরাধ করি ছিল দুই ভাই।
নালিশ করিল রাণী আসি তোমার ঠাঁই ॥
অবিচারের আজ্ঞা দিলা কোতয়ালের তরে।
দুই পুত্র কাটি রক্ত আনি দিল তার তরে ॥
মাতাহীন দুই পুত্র পিতা বন্ধু ছিলা।
এতেক নিঠুর তাথে কি হেতু হইলা ॥
নারীর মর্ম্ম না বুঝিয়া হুকুমিলা[৫৭৪] তখন।
এবে দুখ কর রাজা কোন প্রয়োজন ॥
তুমি হেন মহারাজা এত অবিচার।
স্ত্রীর কথায় দুই পুত্র কাট আপনার ॥
সব লোকে বিচারে আইশে তোমা পাস।
কোন দোসে দুই পুত্র করিলা বিনাশ ॥
এবে মোরে ছারি দেহ পরলোকে যাই।
আছিলাম এত দিন কহি তোমা ঠাঁই ॥
দুই পুত্র স্মরণ রাজা শুনি নহে পুনি।
তে কারণে না কহিলাম আমি অভাগিনী ॥
দাইর বচনে রাজা পুত্র ২ বলি।
ক্রোধ করি খড়গ নিল হস্তে তুলি ॥

হুকুমিলা[৫৭৪] =আদেশ জারী হল।

Dhaka University Institutional Repository

কি কথা কহিলা দাই নিষ্ঠুর বচন।
পিতা হইয়া বধিলাম পুত্রের জীবন ॥
শুন ওহে কোতয়াল কি কার্য্য করিলা।
কিরূপে মোর দুই পুত্রকে কাটিলা ॥
শুনিয়া হইল দুখ কি কহি তোমারে।
কি মতে মারিলা খাড়া[৫৭৫] শিশুর উপরে ॥
শোকের অনলে জ্বলি উর্দ্ধমুখী চায়।
কুহুরি ২ কান্দি অন্তপুরে যায় ॥
কোথায় গেল ওহে প্রিয়া রাজার কুমারী।
মোর বংশ নাসিতে আইলা সত্ত করি ॥
কেমন রাজার তুমি আছিলা নন্দিনী।
সত্য প্রিয়া তুমি মোর মায়া রাক্ষসিনী ॥
নির্ঠুর কঠিন হিয়া বুদ্ধি নাহি তোর।
মিছা পরিবাদে পুত্র বধিলা কিশের ॥
বিবাহ করিতে তোমায় নাহি ছিল মনে।
আনিয়া ছিলাম দুই পুত্রের কারণে ॥
করিলি পালন ভাল দুই পুত্র তরে।
নির্দ্ধন করিলা বংশ আসি একেবারে ॥
বড়ই চঞ্চল বুদ্ধি কামাতুর কায়[৫৭৬]।
মোর গৃহ প্রিয়া নাহি কোন দায় ॥
দুই পুত্র সংহারিয়া কিমতে সহিলা।
ভাল যোগ্য দেশে প্রিয়া তুইত আছিলি ॥
রাজায় করুণাভাবে পুত্রের কারণ।
কহে হীন হাফেজদ্দীন দেবীর বচন ॥

খাড়া[৫৭৫] =ধাড়ালো অস্ত্র।

কামাতুর কায়[৫৭৬] = ব্যাভিচারে উন্মত্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২৮ তম পরিচ্ছেদ

ভীম রাজা পুত্র স্মরণে বিলাপ করে

ঃ ত্রিপদি ছন্দ ঃ

মোর কি হইবে গতি, ওহে প্রিয়া দুষ্ট মতি[৫৭৭],
দুই পুত্র বধিলা আমার ॥
ছাড়িলাম সকল সুখ, না দেখিব তোমা মুখ,
পরলোকে গমন আমার ॥
যথায় দুই পুত্র পাব, তথায় চলিয়া যাব,
জম ঘরে[৫৭৮] করিব বিচার ॥
সাধ নাহি তোর তরে, যাও তুমি পিতা ঘরে,
প্রতিজ্ঞা করিনু এই সার ॥
পুত্র মুখ না দেখিয়া, অর্ন্নজল ত্যাগিয়া,
মরিব যে অন্তর দাহনে ॥

দুষ্টমতি[৫৭৭]=খারাপ আচরণ।

জমঘর[৫৭৮]=যে ঘরে মানুষের মৃত্যুর রায় ঘোষণা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৯ তম পরিচ্ছেদ

বসন্ত কুমার পিতার চরিত্র স্বপনে দেখে

এবং মনে অতি চিন্তিত হইল

ঃ পয়ার ঃ

দেখিলেন্ত পিতার তরে কান্দে পুনি ২ ।
পুত্রের স্মরণে জ্বলে জলন্ত অগনি॥
শরিল হইয়াছে কাঠ মাংস[৫৭৯] সুকাইয়া ।
দুই পুত্র বিনে কান্দে বিলাপ করিয়া ॥
রাজপাট ছারি রাজা কান্দে নিরন্তর ।
পুত্র ২ করে রাজা হইয়া ফাফর ॥
স্বপন দেখিয়া কুমার জাগিয়া উঠিল ।
পিতা২ বলি তবে কান্দিতে লাগিল ॥
আহা পিতা তোমা দেখি পাইনু বড় শোক ।
সংসারেতে আছ কিবা গেছ পরলোক ॥
কান্দন শুনিয়া কন্যা জাগিয়া উঠিলা ।
আজি রাতে প্রভু কিবা স্বপ্ন দেখিলা ॥
পুনরায় ছাড়িয়া কিবা আমাকে খাইবা ।
কি লাগিয়া কান্দ প্রভু আমাকে কহিবা ॥
কুমার কহিল তবে শুন প্রাণ প্রিয়া ।
কাঁটা ঘায়[৫৮০] কেন দেও লবণ ছিটাইয়া ॥
আজি নিশি পিতা আমি দেখিনু স্বপনে ।
প্রাণি মোর নাহি রহে বিনা দরশনে ॥
আছে কিনা আছে পিতা দুই পুত্র শোকে ।
কিবা দশা হয় জানি নিজ রাজ্যের লোকে ॥

কাঠ মাংস[৫৭৯] = সুকনা শরীর ।

কাঁটা ঘায়[৫৮০] =ক্ষতস্থান ।

Dhaka University Institutional Repository

নির্শ্চয় জাইব আমি পিতা দরশন।
ভাগ্যে থাকে গিয়া আমি দেখিব চরণ ॥
সুন ওহে প্রিয়া তুমি বাক্য রাখ মোর।
থাকহ ভাইর দেশে ভাসুর তোমার ॥
আসিব দেখিয়া আমি জনক জননি।
মোর লাগি দুখ প্রিয়া না ভাব আপনি ॥
এতেক সুনিয়া ২ কন্যা প্রভু দিগে হেরে।
তোমার কথা আমার না সহে সরিলে ॥
জন্মের সাফল্য মোর সেই দেশে যাইমু।
শশুর ঠাকুরের আমি চরণ সেবিমু ॥
পিতা মাতা ছাড়ি আমি আসি তোমা সঙ্গে।
আমার ভাসুর দেশে রব কোন রঙ্গে ॥
তবে কুমার প্রাতে যে করিল গমন।
ভাইর সাক্ষাতে আসে বিরস বদন ॥
ভাইকে কুমার পৌছে তার তরে।
আজি বীর সভাই হইলা কিশেরে ॥
এবে আর কোন দুখ পাও মনান্তরে।
অধর মলিন কেন দেখিতে তোমারে ॥
বসন্ত কহিল ভাই কি কহ আমারে।
আজু[৫৮১] মোর যেন পিতা দেখিনু স্বপনে ॥
পিতা মোর রাজপাট সকলই ছাড়িয়া।
দুই পুত্র শোকে বাবা মরেণ কান্দিয়া ॥
নিশ্চর্য় জানিল পিতা মরে দুই ভাই।
এই তত্ত[৫৮২] জানিল তা আছে কিনা নাই ॥
মরার আকৃতি পিতা দেখিলাম স্বপনে।
না রহে প্রাণ পিতার দরশন বিনে ॥

আজু[৫৮১]=আজ। তত্ত[৫৮২] =সংবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

বিদায় দেও এবে আমি পিতা দেশে যাই।
এই দুখ মনে যেন দেখা নাহি পাই ॥
কর্ম্মেতে থাকিলে প্রিয়া দেখিব চরণ।
নহে পিতা দেশে আমি হইব নির্দ্ধন ॥
এই দুখ বিনে এবে আর দুঃখ নাই।
পুরাইব মানস মোর তব আজ্ঞা পাই ॥
ভাইর বচনে রাজা কান্দে পুনি ২।
উঠিল জ্বলিয়া তার হৃদয় অগনি ॥
নিবিছিল[৫৮৩] দুখ মোর কেন দিলা জ্বালি।
আমাকে ছাড়িয়া ভাই কোথায় যাবা চলি ॥
হারাইয়া পাইলাম পরাণের পরাণ।
ফিরিয়া মারিল অস্ত্র কিবা মর্ম্মজান ॥
পাইলাম দোসর ভাই গৌরবের নিধি।
কোন অপরাধে দিয়া নিয়া গেলা বিধি ॥
বিদেশে ফেলিয়া মোরে একেশ্বর করি।
হাস্য নিধি দিয়া মোরে কেবা নিল হরি ॥
কার মুখ দেখি আমি পাসরিব তোরে।
বিপদ কালেতে আমি ডাকিব কাহারে ॥
রহ ২ ভাই মেরে পাটে বৈস তুমি।
তোমার অধীন হইয়া রহিব আমি ॥
তবেত কহিল কুমার নৃপতি রাজন।
পুত্র জন্মে সংসারে আনন্দের কারণ ॥
মৈলে কাষ্ঠ অগ্নি[৫৮৪] দিবে জনক জননি।
বিপক্ষে[৫৮৫] মারিয়া রাজ্য খাইবেক পুনি ॥

নিবিছিল[৫৮৩] =দুঃখ দূর হয়েছিল।

মৈলে কাষ্ঠ অগ্নি[৫৮৪] =মৃত্যুর পরে মুখাগ্নি।

বিপক্ষ[৫৮৫] =হানাদার।

পূর্ব্বেতে আছিল যত মহারাজগণ।
রাজ্য জন্য যুদ্ধ করি হইব নির্দ্দন ॥
সংসারে রহিল ভাই কিসের কারণ।
পিতায় বসিয়া মোর খাইবে সর্ব্বক্ষণ ॥
বৃদ্ধকালে পিতা মোর আছে কিবা নাই।
অনাথ বুঝিবা হেন শুন প্রাণের ভাই ॥
যুদ্ধপতি[৫৮৬] মহারথি[৫৮৭] দেহত বাছিয়া।
পরদলে[৫৮৮] লইল রাজ্য জুজিব[৫৮৯] ভাবিয়া ॥
রাজায় কহিল ভাই আসি তোমা সাথে।
দুই ভাই এক সাথে জুজিব তথাতে ॥
ইঙ্গিত বচনে কুমার কহে ভাই তরে।
মরণের ভয় নাহি জানিবা আমারে ॥
ঈশ্বর করিছে তোমা রাজ্যের রাজন।
হেন রাজ্য ছাড়িজাইয়া মরিবার কারণ ॥
নিকটের পন্থ নাহি দূরেতে জাইবা।
ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য কিমতে পাইবা ॥
পরদলে আসি রাজ্য মারিয়া লইবে।
প্রজাদি সকল তোমা গালি দিবে ॥
ভাইর বচনে রাজা নিশ্বাস ছাড়িল।
আমাকে ছাড়িয়া যাইবে নির্শ্চয় জানিল ॥
বিশেষ কান্দিয়া আজ্ঞা দিল পাত্রগণে।
এক হাজার ডিঙ্গা দেও ভাই বিদ্যমানে ॥
এক লক্ষ মহারথি দেও সাজন করিয়া।
ভাই সঙ্গে ডিঙ্গা দেও সাজন করিয়া ॥

যুদ্ধপতি[৫৮৬] =সেনাপতি। মহারথি[৫৮৭] =যুদ্ধবাজ সেনা।
পরদল[৫৮৮]=শত্রু পক্ষ। জুজিব[৫৮৯] =যুদ্ধ করব।
মহারথি[৫৯০] =রফ ছলনাকারী।

Dhaka University Institutional Repository

রাজ আজ্ঞা পাইয়া ডিঙ্গা করিল সাজন।
যুদ্ধ সাজে চলে আসি জত রথিগণ ॥
তবেত সংবাদ কহে কুমারে তরে।
সাজন হইলর ডিঙ্গা চলহ সত্তরে ॥
এতেক সুনিয়া কুমার ডাকে মাতা বলি।
বিদাও দেও মালিনী গো দেশে যাব চলি ॥
করিলা বহুত পালন মাতার সমান।
বসন্ত কহিল কথা মালিনীর স্থান ॥
বিদায় দেও আমি জাব পিতা দেশ।
সুনিয়া মালিনী বড় পাইল তড়াস[৫৯১] ॥
মালিনী শুনিয়া পাইল ক্ষান্তের তাপ[৫৯২]।
পাঁচালি প্রবন্ধে কুমার বিলাপ ॥
হিন হাফেজদ্দীন কহে সভার পায়।
সুনিয়া বুড়ার জারি বিকল হৃদয় ॥
বিফল জীবন গেল আসিয়া ভুবনে।
না জানি আল্লা নবি দেলের গুমানে[৫৯৩] ॥

তড়াস[৫৯১] =ভয়।

ক্ষান্তের তাপ[৫৯২] =আশাহত।

গুমানে[৫৯৩] (ফারসী শব্দ)=গুপ্ত, লুকায়িত, লাপাত্তা।

Dhaka University Institutional Repository

৩০ তম পরিচ্ছে

নিজ পরিচয় ব্যক্ত করণ

ঃ ত্রিপদি ছন্দ ঃ

গন্ধর্ব্ব আসিল গন্ধে, জল মধ্যে পাইনু বন্ধে,
কিবা দোষে যাও মোরে ছাড়ি ॥
ভাগ্য ফলে আইল ভাসি, জল মধ্যে পাইনু শশি,
তুলিয়া আনিলাম যত্ন করি ॥
হীন জনে পাইনু নিধি[৫৯৪], দিয়া তরি নিল নিধি,
অন্ধকার করি মোর পুরি ॥
গগনে উঠিল চাঁদ, কর্ম্মেতে পাতিনু ফাঁদ,
কুপ মধ্যে পাইনু শশ্যধরি ॥
অঞ্চলে[৫৯৫] বান্ধিনু ধরি, দিল বিধি নিল হরি,
লইয়া গেল আকাশ উপরে ॥
রাজ্য হইল দিবাকর, মোর পুরি অন্ধকার,
হারাইলাম রবির কিরণ ॥
ক্ষেণে২ ক্রোধ মতি, ক্ষেণে কৃপা তোমা প্রতি,
ভাঙ্গিয়া পাহাড় গড়িবারে ॥
ক্ষেণের আছে ক্ষেণের নাই, বিচারিয়া নাহি পাই,
জাতিকুল কে রাখিবে মোর ॥
বাঁচাইলা সর্ব্বদায়, মৃত্যুকালে দেখি ভয়,
বান্ধে হোস হইল ফাফর[৫৯৬] ॥
সন্ধাকালে বৃক্ষে আসি, নানা পক্ষী রহে বসি,
পূর্ব্বেতে উঠয় ভানুকর ॥

নিধি[৫৯৪]=গচ্ছিত ধন।

অঞ্চলে[৫৯৫] =আঁচলে।

ফাফর[৫৯৬] (ফারসী শব্দ)= নিরূপায়।

Dhaka University Institutional Repository

কার পুত্র দিল আনি, আমি পাপী অভাগিনী,
জাইবার কালে ফিরি নাহি চায় ॥
সুন গো মালিনী ঝি, মিছা দুঃখ ভাব কি,
কেবা কার ত্রিভুবনে ॥
সর্ব্ব দুঃখ পাসরিয়া, প্রভুনাম ভজ[৩৯৭] গিয়া,
অধীন হাফেজদ্দীন বলে ॥
জিলা বাকেরগঞ্জ বাস, ভ্রমি আমি নানা দেশ,
অল্প বুদ্ধি থোরাই[৩৯৮] বয়েস ॥
ত্রিপদি ছাড়িয়া তবে, পয়ারেতে লিখি যবে,
শুন সবে বসন্তের দুঃখের কাহিনী ॥

ভজ[৫৯৭] = প্রার্থনা।
থোরাই[৫৯৮] =অল্প।

Dhaka University Institutional Repository

৩১ তম পরিচ্ছেদ

বসন্ত কুমার পিতার দেশে যায়

ঃ রাগ পয়ার ঃ

মালিনী করুণা বহু রাজার কুমারে।
শাস্ত্রনীতি[৫৯৯] কহি তবে শান্ত করে তারে ॥
সাধুর পুরি ধনমাল মালিনীকে দিল।
কুমারী লইয়া তবে নৌকায় উঠিল ॥
শুনিয়া নৃপতি আইল ভাই দরশনে।
এ জনমে ভাই তোমা না দেখিব আর।
নয়ন ভরিয়া রুপ দেখি যে তোমার ॥
আমি তোমার দুখ ভাই দিনু জন্মান্তরে।
স্মরণ করিয়া গালি না দিবা আমারে ॥
পিতার চরণে মোর কহিও পেরণাম।
অপুত্রা[৬০০] হইলে তাথে নাহি কোন কাম ॥
সেবিবারে না পরিলাম তাহার চরণ।
কি কহি এব মোর কপালের লিখন ॥
কুমার কহিল ভাই ছাড়ি দেহ যাই।
কহিব সকল কথা পিতা যদি পাই ॥
তবে ভাইর চরণেতে পেরণাম করিয়া।
নৌকায় চড়িল তবে বহুত কান্দিয়া ॥
আশির্ব্বাদ কর ভাই সমুদ্রেতে তরি।
পিতার চরণ দেখি তথা গিয়া মরি ॥
তবে রাজকন্যা কহে ভাসুর চরণে।
আমি হেন পাপী নাই জগত ভুবনে ॥

শাস্ত্রনীতি[৫৯৯] =শাস্ত্র বাক্য।

অপুত্রা[৬০০] =পুত্র হীন।

Dhaka University Institutional Repository

পিতা রাজ্য ছাড়ি আসি পতির সংহতি।
নানা মতে পন্থে আমি পাইলাম দুর্গতি ॥
ভাগ্য ফলে বিধাতা আনিল তোমা স্থানে।
আছিলা যে রাজা তুমি শ্বশুর যেমনে ॥
পুনর্ব্বার ভুপতির সুনিয়া যে কথা।
প্রভুর স্মরণে মোর মনে পাই বেথা ॥
কান্দিয়া নৃপতি তবে কহে কন্যা ঠাঁই।
তুমি হেন ভাগ্যবতী সংসারেতে নাই ॥
সতী পতিব্রতা[৬০১] তুমি বুদ্ধিতে আকুল।
আমার অনুজ ভাই যেমন পাগল ॥
বুদ্ধি দোষে দুর্গতি যে পাইল ফিরিয়া।
তোমা ঘরপতি তুমি রাখিও বান্ধিয়া ॥
আর আমার সত মাতা তোমার শ্বাশুরী।
সারিয়া রাখিও জেন নাহি হয় রাঢ়ী ॥
এতেক শুনিয়া কন্যা কান্দিতে লাগিল।
ভূমিতে পরিয়া তবে লন্টবাদ[৬০২] করিল ॥
বিদায় দেও ভাসুর তুমি শ্বশুর দেশে যাব।
আশির্ব্বাদ কর জেনে সিঁথির সিন্দুর পাব ॥
তবেত নৌকায় চড়ি আরোহণ করিল।
কান্দিতে ২ রাজা ঘরেতে আসিল ॥
ধুম ২ শব্দ অতি সিহংনাদ ছাড়ি।
সখিগণ জয় ২ দিল অহরি[৬০৩] ॥
পঞ্চশব্দে নানা বাদ্যি বাজে উচ্চস্বরে।
কর্ণে নাহি শুনে কেহ নৌকার উপরে ॥

পতিব্রতা[৬০১]=স্বামীর অনুগামী।

লন্টবাদ[৬০২] =এলোমেলো।

অহরি[৬০৩] =সমবেত কণ্ঠে গান।

Dhaka University Institutional Repository

মেঘের বরুণ ডিঙ্গা দরিয়া[৬০৪] চলিল।
জলদ গর্জ্জন জেন সমুদ্র বেড়িল ॥
পক্ষীর আকৃতি ডিঙ্গা পবনগতি[৬০৫] ধায়।
তৃতীয় বৎসরের পন্থ ছয় মাসে যায় ॥
রাজ্যের নিকট গিয়া দেখয় কুমার।
সত ২ নৌকা ভাসে সমুদ্রের মাঝার ॥
পুত্র দারা লইয়া সঙ্গে দুখিত অন্তরে।
ভয় মন হইয়া ভাসে নদীর মাঝারে ॥
কুমারের ডিঙ্গা দেখি আরও পাইল ভয়।
এরাক আসিল আর না দেখি উপায় ॥
ডিঙ্গার সাজন দেখি প্রমাদ গুণিল।
মরণ ইচ্ছায় সবে অস্ত্র হাতে নিল ॥
ঘিরিল[৬০৬] সমুদ্র আসি মৃত্যু এরাণ নাই।
একবার যুদ্ধ কর সবে মিলি ভাই ॥
স্ত্রী পুত্র সব এই নৌকার উপরে।
কেবা আসি ধরি নিবে যাব কোথাকারে ॥
হেন কালে জিজ্ঞাসিল নৃপতি রাজন।
ভয় না করহ সবে সুনহ বচন ॥
এই কোন রাজ্য হয় কি নাম রাজার।
কি লাগিয়া ভাস সবে সমুদ্র মাজার ॥
এতেক শুনিয়া সবে কহে বিবরণ।
ভীম রাজ্য হয় এই প্রতাপ রাজন ॥

দরিয়া[৬০৪] =সমুদ্র।
পবনগতি[৬০৫] =দ্রুতবেগ।
ঘিরিল[৬০৬] =বেষ্টন করা।

Dhaka University Institutional Repository

আসিলা রক্ষিতাগণ কৃপাশীল অতি।
বিপক্ষ আসিয়া রাজ্য লইল সংহতি ॥
রাজাকে রাখিল জারা বন্ধিতে ফেলিয়া।
প্রাণ ভয় ভাসি মোরা এহার লাগিয়া ॥
তবে কুমার জিজ্ঞাসিল সব মর্ম্ম দিয়া।
হেন দসা হইল রাজা কিশের লাগিয়া ॥
বৃদ্ধ রাজা কিবা দশা বল ক্ষিণ হইল।
তেকারণে আসি রাজ্য পরদলে লইল ॥
পিতা বন্ধি সুনি কুমার হাহাঙ্কার করে।
সত্য পিতা শোকে কুমার ছাড়িল সংসারে ॥
ডাকিয়া বলিল তবে সুন সৈন্যগণ।
নির্দ্দন করিব আজি বিপক্ষের গণ ॥
চিন্তা না করিও সবে সঙ্গে আইস মোর।
সংগ্রাম করিয়া রাজ্য লইব সত্তর ॥
কুমারের দর্প শুনি কহে সৈন্যগণ।
এই মর্দ্ধ নিবে রাজ্য না জায় কহন ॥
চলহ এহার[৬০৭] সঙ্গে যা থাকে কপালে।
অবশ্য হইবে ভাল ঈশ্বর করিলে ॥
ভয় যুক্ত হইয়া যারা সঙ্গে নাহি গেল।
ক্রোধিত হইয়া কুমার নৌকায় আসিল ॥
কহে অধম হাফেজ আলী সবার জোনাবে।
যে পড়িবেন যে শুনিবেন দোয়া দিবেন মোরে ॥
সার ২ করি ডিঙ্গা চালাইল ধারে।
হস্তে খর্গ লইয়া কুমার উঠিল কিনারে ॥

এহার[৬০৭] =এর।

Dhaka University Institutional Repository

বিপক্ষ সকল আজি করিব সংহার।
তবে অন্ন জল আমি খাইব যে আর ॥
বন্দি হইতে পিতা আনি দেখিব চরণ।
নহে আমি রণ মধ্যে ত্যজিব জীবন ॥
এই মতে প্রতিজ্ঞা যে করিয়া কুমার।
সিংহ গর্জ্জন মতে লাগে ভয়ংকর ॥
সৈন্যগণ মহারথি সঙ্গতি করিয়া।
পিতার পুরিতে কুমার জায়ান্ত চলিয়া ॥
সিংহনাদ করি চলে নিপুরের[৬০৮] ঝনঝনি।
বাসুকি পালায় তার অপমান শুনি ॥
বিপক্ষ অসুর সব সংগ্রাম মাজার।
হেনকালে মহাশব্দ সুনিল কুমার ॥
কর্নে তালি সুনি হেন রাজ্য ধ্বংসিয়া যায়।
অসুর আইসয় কিবা স্বর্গ ছাড়িয়া যায় ॥
অর্জ্জুর্ন আইসে কিবা বুঝিতে না পারি।
ভীম শহরের মাটি কম্পবান করি ॥
হেনকালে চতুর্দ্দিকে আসিয়া ঘেরিল।
বিপক্ষের সৈন্য সব কাটিয়া ফেলিল ॥
খর্গ বিদরিয়া সবে বাণবৃষ্টি করে।
গদা[৬০৯] ঘুরাইয়া মারে মস্তক উপরে ॥
প্রচণ্ড মহিম কুমার রণ মধ্যে ধায়।
সিংহ দেখিয়া যেন হস্থীনি পালায় ॥
বিপক্ষের সৈন্য তথা আছারি পাছারি[৬১০]।
দুর্জ্জয় কুমার তথা সহিতে না পারি ॥

নিপুরের[৬০৮]=তলোয়ারের।

গদা[৬০৯] = এক প্রকার যুদ্ধাস্ত্র।

আছারি পাছারি[৬১০]=এদিক সেদিক পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামে দুর্জ্জয় কুমার বাণ মহাবীর।
কার শক্তি আছে সাক্ষাতে হয় স্থির ॥
পড়িল অনেক সৈন্য ধরণি লোটায়।
লক্ষ ২ সৈন্য সব গড়াগড়ি যায় ॥
অবশেষে বিপক্ষ তুরুক সেনাপতি।
হস্তে খর্গ লইয়া আসে শীর্ঘ্র গতি ॥
অতি ক্রোধে খর্গ মারে কুমার উপর।
খর্গ বিদরিয়া তবে ফেলিল কুমার ॥
দুই বীরের সংগ্রাম করে অতিশয়।
কারে কেহ না পারে এক সময় বয় ॥
হেন কালে বিপক্ষ তুরুক নৃপবর।
অগ্নিবাণ মারিলেক কুমার উপর ॥
বিন্দিল[৬১১] শরিল তার হয় জার ২।
বিক্রম টুটিল কুমার হইল ফাফর ॥
অগ্নি হেন ক্ষেপে অঙ্গ সহিতে না পারে।
রণ মধ্যে স্থির নাহি নানা স্থানে ফিরে ॥
হেন কালে বিদরিয়া পূর্ব্বের কথন।
বৃক্ষমুলে স্বপ্ন কথা হইল স্মরণ ॥
কল্পনা করিতে বেথা সাক্ষাতে আসিলা।
যক্ষের অমৃত দিয়া অগ্নি নিবারিলা ॥
চিন্তা না করিয়া কুমার যুদ্ধ করে পুনি।
মারেত বিপক্ষ সৈন্য লোটায়[৬১২] ধরণী ॥
এই মতে কুমারের বিক্রম বারিল।
হস্তে খর্গ লইয়া কুমার মারিতে লাগিল ॥

বিন্দিল[৬১১] =গেঁথে।

লোটায়[৬১২] =গড়াগড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

দুই বীরে মুখামুখী করে মহারণ।
শব্দ শুনি পলায়ন্ত মহারথিগণ ॥
হেন কালে কুমারের খর্গ ভাঙ্গি গেল।
লম্ফ দিয়া বিপক্ষের মস্তকে পরিল ॥
হস্তেতে ধরিয়া মাথা দিলেক চাপন।
মুখে রক্ত বিপক্ষের পড়িল তখন ॥
আচম্বিতে বৃক্ষ যেন উথারিয়া[৬১৩] পরে।
সুমেরু পর্ব্বত যেন ভাঙ্গি ফেলে ধরে ॥
তুরুক বিপক্ষ সৈন্য ধরণি লোটায়।
হাজার ২ সৈন্য কাটিয়া ফেলায় ॥
কুমারের সৈন্য রথী করে জয় ২।
বিপক্ষের সৈন্য আর পালাইয়া যায় ॥
জয় ২ সিংহনাদ করি বাজাইল কারা।
বিনাশ বিপক্ষ সব হইয়া গেল সারা ॥
যুদ্ধে জিনি পিতা বন্ধি মন অন্ত মাজে।
আজ্ঞা দিল এবে কোথা আন নৃপরাজে ॥
কুমার ভাবিল মনে পরিচয় না দিব।
পিতার মনভাব এবে বুঝিয়া লইব ॥
আজ্ঞা পাই দুতগণ গেল বন্ধি ঘরে।
রাজাকে কহিলা তুমি চলহ সত্তরে ॥
সুনিয়া কহিল রাজা গুণিয়া ২।
কিবা দুই অসুর আসি করিব কি জয় ॥
সেইত আসিয়া ভাল রাজ্য মোর নিল।
বন্ধিতে ফেলিয়া মোর প্রাণ দান দিল ॥

উথারিয়া[৬১৩] =উপড়ে ফেলা।

Dhaka University Institutional Repository

এরাক আসিয়া মোকে নির্দ্ধন করিল।
আমাকে মারিবে হেন দ্রুত পাঠাইল ॥
আহা প্রিয়া তুমি এবে বিধবা হইলা।
পুত্র মরণের ফল এইত পাইলা ॥
বিধবা হইয়া তুমি এই যে রহিলা।
পর লোকে চলি আমি যাইব একেলা[৬১৪] ॥
তুমি যার ঘরে তাহার ত প্রাণ।
আমার মরণ এবে নাহিক এরাণ ॥
পালাইয়া যাও তুমি ইস্ট আছে যথা।
কুলের কলঙ্ক তুই না কর সর্ব্বথা[৬১৫] ॥
হেনকালে দুত সব ধরিলেক করে।
রাজাকে লইয়া গেল কুমারের গোচরে ॥
অস্তি চর্ম্ম সুকাইছে কাষ্ঠের মত।
পিতাকে দেখিয়া কুমার দুঃখ পায় যত ॥
কান্দিতে লাগিল কুমার সজল নয়নে।
এই মত পিতা আমি দেখিনু স্বপনে ॥
ভাগ্য ফলে দেখি আসি চরণ জনক।
বিলম্বে আসিলে আমি পাইতাম বড় শোক ॥
সেই অঙ্গ সেই বান্ধ সেইত সুন্দর।
দেখিলাম সব অঙ্গ পুত্রের আকার ॥
যম ঘর হইতে কিবা ঈশ্বর আনিল।
অভাগিয়া দুখ দেখি কৃপাশীল হইলা ॥
আহারে দারুণ মন কি আসা করিলা।
দেহ রূপ আনি মোরে কিশেরে দেখাইলা ॥
সেই হইতে অভাগিয়া সংসার ছাড়িয়া।
পড়িয়া রহিলাম আমি পুত্র শোগী হইয়া ॥

একলা[৬১৪]=একা।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরেতে দুখ ভাবি কান্দে পুনি ২।
অধর ভাসয় রাজার দুই নেত্রের পানি ॥
পিতার কান্দনে কুমার সহিতে না পারে।
তবে আজ্ঞা দিল জুজ্ঞজনের[৬১৬] তরে ॥
স্নান করাইয়া আনি পরাও বসন।
সুগন্ধি অঙ্গেতে দেও অখোর চন্দন ॥
এতেক সুনিয়া রাজা মুর্চ্ছিত হইল।
এই যে কাটিবে মোরে নির্শ্চয় জানিল ॥
আজ্ঞা পাই পাত্র সব করাইল স্নান।
তথা হইতে আনি বুঝি কাটিবে গর্দ্দান ॥
কাতর হইয়া কহে কুমারের ঠাঁই।
কাটিবা আমারে তাথে ভয় কিছু নাই ॥
ভাল মতে তোমা রুপ দেখি লই আগে।
কাটিবারে আজ্ঞা মোরে দিও শেষ ভাগে ॥
তোমা রুপ দেখি মোর জ্বলিল অগনি।
জানিয়া যাইতে মোর না সহে পরাণি ॥
কাটিলে এ হেন চাঁদ না দেখিব আর।
বড় অভাগিয়া আমি সংসার মাজার ॥
দিয়া ছিল চাঁদ বিধি পুন হরি নিল।
বৃদ্ধকালে কর্ম্ম ভোগ সেই হইতে হইল ॥
শিশুকালে মাতা মরে দাইকে সুপিলাম।
ভাল মতে চন্দ্রমুখ ফিরে না দেখিলাম ॥
এই সন্ধি পাই কুমার পোঁছে সমাচার।
আমাকে দেখিলে কার্য্য কি হইবে তোমার ॥
কহ ২ সত্ত রাজা শুনি বিবরণ।
না কাটিব এবে তোমার হইবে মোচন[৬১৭] ॥

জুজ্ঞজনের[৬১৬] =অভিজ্ঞ ব্যক্তি।
মোচন[৬১৭] =মুক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা মারি রাজ্য আসি লইলাম আমি।
হেনজন চাহিতে কেন আসা কর তুমি ॥
রাজা মারি রাজ্য আসি লইলাম আমি।
হেনজন চাহিতে কেন আসা কর তুমি ॥
রাজায় কহিল তবে আমি জ্ঞানহীন।
মোর দুই পুত্র ছিল তোমার গঠন ॥
মারিয়া যে দুই পুত্র পরলোকে গেল।
সেই হইতে আমার বড় দুর্গতি[৬১৮] হইল ॥
সেই তুল্য রুপ আমি তোমার দেখিয়া।
তেকারনে শ্রদ্ধা রাখি চাহি নিরক্ষিয়া ॥
তবেত কহিল কুমার শুনহ রাজন।
দুই পুত্র মরে তোমার কিসের কারণ ॥
এতেক শুনিয়া রাজা কহে দুখ মনে।
দুই পুত্র প্রাণ আমি মারিনু আপনে ॥
অপরাধ দুই ভাই করিলেন্ত শুনি।
কাটিবারে ক্রোধে আজ্ঞা দিলাম আপনি ॥
ধর্ম্মশীল রাজা আমি ধর্ম্মেতে বিচার।
আমার সাক্ষাতে নাহি অন্যায় আচার ॥
আমার সাক্ষাতে নাহি অন্যায় কারণ।
তে কারনে বধিলাম পুত্রের জীবন ॥
আমার সাক্ষাতে বড় অধর্ম্ম শুনিলাম।
সেই হেতু দুই পুত্র কাটিয়া ফেলিলাম ॥
অবশেষে শুনিলাম অপরাধ নাই।
তবে কেন কাটিতে কহিলাম দুই ভাই ॥

দুর্গতি[৬১৮]=জাতনা।

Dhaka University Institutional Repository

এ কারণে বিপক্ষেতে রাজ্যপাট মারি।
এবে আমি আছ তুমি কাট মোরে ধরি ॥
কিঞ্চিত পাসরিণু[৬১৯] দুখ দেখি তোমা মুখ।
তুরিতে কাটিয়া ফেল খণ্ডিবেক শোক ॥
কুমার কহিল রাজা দুখ ভাব কেনে।
আগেতে মারিলা এবে পাইবা কেমনে ॥
বুদ্ধিমন্ত রাজা তুমি ধর্ম্মশীল ছিলা।
অবিচারে দুই শিশু কিসেরে বধিলা ॥
মহারাজা রাজ্যেশ্বর হেন দশা কার।
অন্ন জলে সুকাইয়া মারিছে দুস্কর[৬২০] ॥
এতেক কহিয়া কুমার সন্তাসিতে নারে।
উঠিয়া পড়িল পিতার চরণউপরে ॥
সত্য চিনিলে বাবা আমি তোমা সুত।
কাটিতে কহিলা যবে না কটিল দূত ॥
তখনেতে নেকালিয়া[৬২১] গেলাম দুই ভাই।
নানা মতে দুখ আমি পাইলাম ঠাঁই ॥
এবেত আসিলাম আমি উদ্দেশে তোমার।
বসন্ত আমার নাম জানহ সত্তর ॥
এতেক শুনিয়া রাজা তুলি লইল কোলে।
লক্ষ ২ চুম্ব দিল বদন কমলে ॥
গলে ধরি পুত্র মোরে চাপি দেও কোল।
চিরকালের দুখ মোর খণ্ডাক সকল ॥

পাসরিণু[৬১৯] =ভুলে যাওয়া।

দুস্কর[৬২০] =কঠিন অবস্থা।

নেকালিয়া[৬২১] = দেখে শুনে।

Dhaka University Institutional Repository

৩২ তম পরিচ্ছেদ

রাজা পুত্র পাইয়া বড় খুশী হয়
এবং পিতা পুত্রে দোহে মিলন

ঃ পয়ার ঃ

বৃদ্ধ অঙ্গ ঢুলাইয়া পুত্র কোলে করি।
নাচিতে লাগিল রাজা মহা সুখে তরি ॥
অপুত্রারে পুত্র দিলা তুমি গুণমনি।
মৃত্যুকালে পাব বুঝি কাষ্ট হে অগনি ॥
কহ ২ পুত্র তোমার ভাইর খবর।
আমার দোচরা[৬২২] পুত্র রহে কোন সহর ॥
কুমার কহেন ভাই রহে জকুম সহর।
বিধাতা করিছে তারে রাজ্যের ঈশ্বর ॥
সেইখানের রাজা যিনি গেছেন মরিয়া।
রহিলেক ভাই সেই রাজ্যেশ্বর হইয়া ॥
আমিত আসিলাম পিতা তোমা দর্শনে।
হাজার ২ পেরণাম তোমার চরণে ॥
কহিলেন্ত ভাই মোরে অনেক যতনে।
দুঃখের একান্ত দুঃখ রহে ভাইর মনে ॥
কর্ম্মেতে আসিয়া মোর বন্ধু হবে বৈরি।
অনুক্রমে[৬২৩] বারে ২ রাখে মোরে ধরি ॥
আদি অন্ত বৃতান্ত সব কহিল কুমার।
এ সব শুনিয়া রাজা কহিল বিস্তর ॥
দুই পুত্রের কুশল বার্তা রাজায় শুনিয়া।
পুনর্ব্বার নাচে বৃদ্ধ অঙ্গ ঢুলাইয়া ॥

দোচরা[৬২২] (ফার্সী শব্দ)=দুই।

অনুক্রমে[৬২৩]=ক্রমে ক্রমে, বারে বারে।

Dhaka University Institutional Repository

আজি মোর শুভ দিন আসিয়া ঘটিল।
ফিরিয়া পুত্রের মুখ নয়নে দেখিল ॥
আহা প্রভু নিরাঞ্জন সংসারের সার।
সব দুখ খণ্ডাইলা[৬২৪] বৃদ্ধ হে রাজার ॥
এই মত ঘাটে ২ উদ্ধারিয়া লবা।
অপুত্রারে পুত্র দান সময়েতে দিবা ॥
তবেত সুনিল বার্ত্তা দাই আচম্বিতে।
তুরিত শুনিয়া আইল নাচিতে ২ ॥
দাইকে দেখিয়া কুমার চরণে পড়িল।
তোমা সব দেখিবারে ফিরিয়া আসিল ॥
তার পড়ে খবর পায় কোতয়ালগণে।
দেখিতে আসিল সবে হরষিত মনে ॥
কুমার দেখিয়া গলা ধরিল তাহার।
প্রাণদান দিলা ভাই তুমি হে আমার ॥
সংবাদ শুনিয়া রাজ্যের সব লোক।
সকলে দেখিল আসি কুমারের মুক ॥
স্ত্রী পুত্র লইয়া সবে সমুদ্রে ভাসিল।
সংবাদ শুনিয়া সবে বাড়ী ঘরে আইল ॥
সকলের সঙ্গে কুমার প্রেম ভাব দিয়া।
পিতার চরণে কহে ভক্তি করিয়া ॥
এবে ছাড়িদেহ আমি যাইব যে বটে।
যাইতে পরম আশা ভাইর নিকটে ॥
দেখিব চরণ তোমা এই ছিল আস।
বিদায় দেহ আমি যাব তোমার পাস ॥
রাজায় কহিল পুত্র কি করিলা বাণী।
শরিলে না সহে মোর এ সব কাহিনী ॥

খণ্ডাইলা[৬২৪] =দূর করলা।

Dhaka University Institutional Repository

এবে ত ছাড়িয়া পুত্র ভাই সত্ত মোরে।
প্রাণদান দিব আমি তোমার গোচরে ॥
রাজ্য দেশ লইয়া তুমি বিপক্ষ মারিয়া।
পাটে বদন দেখি আমি নয়ন ভরিয়া ॥
বৃদ্ধকালে তপজপ[৬২৫] তাথে আমি সুখী।
রাজত্ত্ব করহ পুত্র নয়নেতে দেখি ॥
পিতা মনভাব কুমার আপনে বুঝিল।
নৌকা হইতে রাজকন্যা আনিতে কহিল ॥
বধুর সংবাদ রাজা সুনিলেক জবে।
হরিষ অন্তরে বড় কতুক হইল তবে ॥
কহ ২ পুত্র কোন রাজার নন্দিনী।
বিবাহ করিয়া এথা আনিলা আপনি ॥
কুমার কহিল পিতা জঙ্গিন শহর।
কিশ্বর নৃপতি সেথা ধর্ম্মশীল বর ॥
তার কন্যা কাঞ্চনমালা অতি সুচরিতা[৬২৬]।
বিবাহ করিয়া আমি আনিয়াছি এথা ॥
কর্নেতে শুনিয়া রাজা সাফল্য মানিল।
পঞ্চবাদ্যে নানা শব্দ অতিশয় হইল ॥
ডাকিয়া কহিল রাজা সখীগণের তারে।
নৌকা হইতে বধু আন অতি শীর্ঘ্র করে ॥
এত শুনি সখীগণ আনন্দিত মনে।
জয় ২ হুলাহুলি দিল রামাগণে ॥
জয় জোবার কোলাহল জঞ্জাল গাহেন।
সোহাগিনী সখি সব কতুক করেন ॥
নাচিতে গাহিতে সবে নৌকা ঘাটে গেল।
চৌদলে সাজাইয়া কন্যা পুরিতে আনিল ॥

তপজপ[৬২৫] =ধর্মীয় কাজ।

সুচরিতা[৬২৬] =নিপুণা।

Dhaka University Institutional Repository

আজ্ঞা দিলা করে রাজা বাদ্য বাজনার তরে।
বহুত উৎসব হইল রাজার পুরিতে ॥
ভুমে দণ্ডবৎ কন্যা শ্বশুর চরণে।
আশির্ব্বাদ করে রাজা ঈশ্বর স্মরণে ॥
চিরজিবী চিরকাল দীর্ঘ্র পরমায়ু।
এই পুত্র বধু বিনে আর লক্ষ ন্যায়ু ॥
তবে কন্যা শ্বাশুরীর চরণ সেবিলা।
বধু দেখিয়া শ্বাশুরী প্রমাদ গুণিলা ॥
নির্শ্চয় জানিল মোরে রাজায় মারিবে।
এই পুত্র বধু মোর কি কামে আসিবে ॥
কাটিয়া ফেলিলাম সেই কি মতে আইল।
আমারে মারিতে কিবা বিধি পাঠাইল ॥
শ্বাশুরীর মনভাব কন্যায় বুঝিয়া।
কহিতে লাগিল তবে হাসিয়া ২ ॥
বিরষ বদন কেন দেখি গো তোমারে।
কিসের লাগিয়া দুখ ভাব মনান্তরে ॥
বধু দেখিয়া তুমি খুশী হইবা মনে।
তাহাতে বিরষ তুমি হইলা কি কারণে ॥
ইঙ্গিতের ছলে কন্যায় আসিল কহিয়া।
রাজায় বসিছে হেথা খর্গ হাতে লইয়া ॥
পুত্রকে ডাকিয়া কহে এই সত মাতা।
কাটিয়া ফেলিয়া দিব এই দুষ্ট সুতা ॥
না জানি কি আমার করে আরবার[৬২৭]।
না রাখিব হেন জন পৃথিবীর মাঝার ॥
ঈশ্বর ভাবনা কর সেই করতার।
নির্ব্বন্দ আছয় কিবা সেই মাত্র তার ॥
মিছা অপরাধে জেবা মন্দ করে।
আপনার মন্দ হেন জানহ সত্তরে ॥

আরবার[৬২৭] =পুনরায়।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা (Massaging)

উষা-বি[১] প্রাতঃকাল, ভোরবেলা, প্রত্যুষ।[২] বাণরাজার কন্যা অনিরুদ্ধর পত্নী। ঋগবেদের কুড়িটি সূক্তে ইনি স্তুতিলাভ করেছেন। উষা জ্যোর্তিবাসনা, স্বর্গকন্যা ও আদিত্যের ভগিনী, চির যৌবনা ও সকল সৌন্দর্য্যের আঁধার এবং উষা প্রাতঃকালের দেবতা।

কৃষ্ণ- কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। যদুবংশে তার জন্ম। নহুষ, কার্তবীর্যাজুন, শিনি, নৃষ্ণি, হার্দিক, শুরসেন, বসুদেব হরিবংশে ২৮ শ দ্বাপরে জন্ম।

ব্রহ্মার ঔরসে পার্বতীর গর্ভে কৃষ্ণ ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব কৌশলে কারাগার হতে কৃষ্ণকে নন্দস্থানে নিয়ে যায় এবং শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। কংস তার ভবিষ্যত হত্যাকারীকে সন্ধান করতে গিয়ে পুতনা রাক্ষসীর সাহয্যে অনেক সন্তানকে হত্যা করে। কিন্তু পুতনা রাক্ষসী কৃষ্ণকে দুধ পান করাতে গিয়ে নিজেই মৃত্যুবরণ করে। কংস বুঝতে পারে এই তার শত্রু। এই শত্রুকে হত্যা করতে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত কংসই কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়।

গঙ্গাধর সাধু - অতিশয় নীচ, কুটিল ও খল নায়ক। দুষ্ট কল্পনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। কুট কৌশলে না পারে এমন কোন কাজ নেই। পরনারী অপহরণের কৌশলের কাছে একালের ভিলেইনরাও হার মানতে বাধ্য।

ইষ্টদেব - ঋকবেদে আর্যদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র। যাস্কের মতে সে অন্তরীক্ষের দেবতা ও শেষ্ঠ যোদ্ধা। জন্মেই আকাশকে উজ্জ্বল করে। জন্মাবধি থেকে যোদ্ধা, শত্রুদমনকারী ও অজেয়। দেবতারা রাক্ষস বধের জন্য ইন্দ্রকে সৃষ্টি করে। সে দেবতাদের সম্রাট। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন শক্তির অধীন। সোমরস ইন্দ্রের প্রিয় পানীয়। সোমপানে উত্তেজিত হয়ে রূপান্ত র হয় মহাযোদ্ধায়। সোম হতেই ইন্দ্রের উৎপত্তি। ইন্দ্র বহুভোজী ও চির যুবা। সে প্রকৃতির দেবতা অন্তরীক্ষের প্রধান দেবতা, ঝড় ও বজ্রের দেবতা। তিনি অসুরকে বিনাশ করেন। তার শরীর প্রকাণ্ড, শক্তি প্রচুর এবং সে বজ্রবাহু। ইন্দ্রের আর এক নাম গোপতি। বলির ছেলে পুরকে হত্যা করার জন্য নাম হয় পুরুন্দর। মেঘ এর বাহন বলে নাম হয় মেঘবাহন। ইন্দ্র আদিত্যগণের অন্যতম। সে সংবর্ত পুস্কর প্রভৃতি মেঘের অধীশ্বর বলে মর্ত্যের রাজন্যবর্গ ও ঋষিগণ শস্য ও অন্নের প্রাচুর্য কামনায় ইন্দ্রের অর্চনা করেন। এই জন্য সে হিন্দুদের কাছে ইষ্টদেব হিসাবে পরিচিত।

বর্জ্রাঘাত - বজ্রাঘাত ইন্দ্রের প্রধান অস্ত্র। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে বৃত্র ও অসুরদের মৃত্যু হয়। বৈদিক মতে বজ্রাঘাত খড়গাকার অমোঘ ও ভীষণ অস্ত্র।

যোম - মৃত্যু অধিপতি। হিন্দু পুরাণে দক্ষিণের দিকপাল। সূর্যের ঔরসে এবং তার স্ত্রী সংজ্ঞার গর্ভে জন্ম। জোম বৈবস্বত মনুর ভ্রাতা। স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা ছায়াকে স্বামীর

Dhaka University Institutional Repository

নিকট রেখে পলায়ণ করেন্ কিন্তু ছায়া সংজ্ঞার সন্তানদের যথোচিত যত্ন করতেন না বলে ক্রুদ্ধ হয়ে বিমাতা ছায়াকে পদাঘাত করেন। বিমাতার শাপে তার পদদ্বয় ক্ষত ও কীট দষ্ট হয়। যম, পিতা সূর্যকে সমস্ত বৃতান্ত জানালে সূর্য তার ক্ষতস্থানের পূজঁ কীট ভক্ষণের জন্য একটি কুকুর দান করে। এই কুকুর ক্ষত হতে নির্গত পূজঁ ও কীট ভক্ষণ করে যমকে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু দুর্বল পায়ের জন্য মহিষ বাহণে ভ্রমন করতে বাধ্য হয়। একবার ঋষি মাণ্ডব্য এক পতঙ্গের দেহে তৃন বিদ্ধ করেছিলেন বলে যমের আদেশে শূলবিদ্ধ হতে হয় এবং অনীমাণ্ডব্য নামে পরিচিতি লাভ করে। অনীমাণ্ডব্য ও ক্রদ্ধ হয়ে যমকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেয়। ফলে যম মর্ত্যে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করে। যম পতিব্রতা সাবিত্রীর ব্যবহারে ও স্তবে তুষ্ঠ হয়ে তার মৃত পতি অত্যবাণকে জীবিত করে দেয় এবং সাবিত্রীর অন্ধ ও রাজ্যভ্রষ্ট শ্বশুরকে চক্ষু ও রাজ্য ফিরিয়ে দেয়। দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশটি কন্যাকে বিয়ে করে এবং যমের ঔরসে ত্রয়োদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শান্তির গর্ভে সর্ব, ক্রিয়ার গর্ভে যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, তিতিক্ষার গর্ভে মঙ্গল, লজ্জার গর্ভে বিনয়, সৃর্তির গর্ভে নরনারায়ণ, কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করে। যম স্বর্গের দেবতা হলেও নরকের অধিশ্বর। যমের পুরীর নাম সংযমনী। এর সামনে বিরাজ করে পাশমুর্দগরধারী ত্রিলোক সংহার মৃত্যু, পাশে জলদগ্নিতুল্য কালদণ্ড,তাই দণ্ডদর নামে খ্যাত। দেবগণের মধ্যে যমের নাম ধর্মরাজ। শান্তি এনে দেয় বলে তাই এর নাম শমন। অন্ত আনে বলে আর এক নাম অন্তক। পিতৃ পুরুষের উপর এর প্রাধান্য আছে বলে পিতৃপতি। জীবের পাপ পূণ্যের বিচারকর্তা, এই কাজে সাহায্য করবার জন্য পাপপূণ্যের হিসাব রক্ষক চিত্রগুপ্ত এর মন্ত্রী। যমের দেশের রং সবুজ, রক্তবর্ণের পরিচ্ছদ এরা দু'জন অনুচর রয়েছে মহানন্দ ও কালপুরুষ নামে। যমের দূতরা যমদূত নামে খ্যাত। এর মৃত আত্মাকে যমালয়ে নিয়ে আসে।

ঋগবেদের ১০ মণ্ডলের তিনটি শূক্ত যমের উদ্দেশে রচিত। আর একটি শূক্তে যম ও তার ভগিনী যমীর কথপোকথন আছে। যমের নাম প্রায় ৫০ বার ঋগবেদে উল্লেখ আছে। যম পূন্যাত্মা মৃতদের ও নেতৃগণের প্রধান। তিনি প্রথম মৃত হন। তিনি দেবতাদের সঙ্গে একত্রে বৃষের উপর বাস করেন। যমের দেহ সহচর হলেও কোথাও তাকে দেবতা বলা হয় নাই। । যম স্বর্গীয় পিতৃগণের সহচর। ঋগবেদে বিন্মান ও সরন্যুর সন্তান যম-যমী যমজ ভ্রাতা ও ভগিনী। যম-যমীর সহবাস আকাঙ্খা করে কিন্তু যমী তা প্রত্যাখান করেন। বেদে যমকে এই ভাবে বলা হয়েছে যে দেবতা সকল ভূত জাতির পরিচিত কিন্তু পূণ্যবাণ বা পাপী সকলের মন্তব্য পথের পরম সহায়। বিন্মানের পুত্র পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে কার্যফল অনুসারে জীবদের এ লোক হতে অন্য লোকে যাবার উপযুক্ত শরীর দান করে থাকেন। জীবমাত্রের রাজা বলে পরিচিত সেই যম। মহাভারতে পাওয়া যায় উদ্দালক মুনির শাপে তার পুত্র নচিকেতা যমপুরে গমন করে। যমালয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে নচিকেতা তিন রাত্রি যমের জন্য অপেক্ষা করে- আত্মা সম্মন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব যমের কাছ থেকে জানতে পারে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে বিশ্বকর্মার কন্যা সজ্ঞার গর্ভে ও সূর্যের ঔরসে এক পুত্র সন্তান জন্মায় তার নাম প্রজা সংযম-যম। যমলোক মনুষ্যলোক হতে ৮৬০০০ যোজন দূরে অবস্থিত। যমরাজার পুরী চার হাজার যোজন দীর্ঘ এবং দুই হাজার যোজন বিস্তৃত। উচ্চ স্বর্ণময় প্রাচীর দ্বারা এই পুরী বেষ্টিত। যম পূণ্যবাণ লোকদের দেখলে নারায়ণ রূপে দেখা দেয় আর পাপীদের কাছে তিন ভীষণরুপ ধারণ করে। (পৌরাণিকা অভিধান-সুধীরচন্দ্র সরকার পৃষ্ঠা নং-৩৩০)

মুসলিম রীতিতে যম বলতে হযরত আজরাইল (আঃ) কে বুঝায়। তিনি নুরের তৈরী। প্রধান চার ফেরেস্তাদের মধ্যে একজন। তাকে আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর হুকুম যথা সময় পালন করাই তার ধর্ম এবং কর্ম। দুই দল ফেরেশতা রয়েছে। একদল বেদনাদায়ক ভাবে পাপাচারীদের জানকবচ করেন আর দ্বিতীয় দল মৃদু আকর্ষণে তা করেন। হযরত আজরাইল (আঃ) একমাত্র মৃত্যুর ফেরেস্তাই নন- তিনিই প্রধান এবং তার সহযোগী আরো ফেরেস্তা রয়েছে। নির্দিষ্ট সময় আসবার পূর্বে হযরত আজরাইল (আঃ) জানেন না, কখন কার মৃত্যু হবে?

ফেরেস্তারা অশরীরি জ্যোতির্ময় জীব। তাদের দুই, তিন, চার কিংবা ততোধিক ডানা আছে- যা দ্বারা আল্লাহর আদেশে তারা অতি ক্ষিপ্রগতিতে সর্বত্র বিচরণ করেন। ইহুদী সূত্রে প্রাপ্ত উপাখ্যানে জানা যায়- মৃত্যুর দূত আজরাইলের আকৃতি, অবস্থান এবং জীবন হরণ প্রণালী সম্বন্ধে বহুল চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়। চতুর্থ বা পঞ্চম আকাশে তার একটি আসন আছে যাতে তার একখানি পা রয়েছে। অপর পা রয়েছে বেহেশত ও দোযখের মধ্যখানের সেতুর উপর। বর্ণনায় পাওয়া যায় তার সাত হাজার পায়ের উল্লেখ আছে। তার চার হাজার ডানা আছে, এবং সমস্ত শরীরে চক্ষু ও জিহ্বায় আকীর্ণ। জীবন হরণ করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি বাধাগ্রস্থ হন এবং আল্লাহর নির্দেশে বিভিন্ন উপায় সেই বাধা অতিক্রম করেন। আহলে হাদীসে আছে হযরত মুসা (আঃ) এর চপেটাঘাতে আজরাইলের একটি চোখ থেতলাইয়া দেন। তিনি আল্লাহর দরবারে নালিশ করেন। আল্লাহ তার চোখের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া দেন এবং মুসা (আঃ) এর কাছে বলে পাঠাইলেন- তিনি যদি এখন মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছুক না হন তবে একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখতে পারেন। ষাড়টির যতগুলো লোম তার হাতের তলায় পড়বে ততগুলি বৎসর তার বর্ধিত আয়ুষ্কালরূপে গণ্য হবে। এই বার্তা শুনে হযরত মুসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করেন, 'তারপর', উত্তরে বলা হল মৃত্যু, অতপর রাজী হলেন। এই আজরাইল (আঃ) ইনিই যমদূত। আঞ্চলিক ভাষায় যম নামে অভিহিত। (ইসলামী বিশ্বকোষ-সম্পাদনায় ইসলামীক ফাউণ্ডেশন ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা-৪৯)

বাসুকি - বাসুকি অর্থাৎ নাগরাজ। দক্ষ কণ্যা কদ্রুর জ্যেষ্ঠপুত্র বাসুকি। বাসুকি শেষনাগ ও অনন্ত নাগ নামেও পরিচিত। মনসা বা জরৎকারু তার বোন। দেবগণ সমুদ্র মন্থনকালে নাগরাজ

Dhaka University Institutional Repository

বাসুকিকে মন্থনরজ্জু রূপে ব্যবহার করেন। হাজার বছর মন্থনের ফলে কিছুই উত্থিত না হওয়ায় বাসুকি তীব্র বিষ ঢেলে দেয় এবং শিলা দংশন করতে আরম্ভ করে। বিষে পৃথিবীর স্থলভাগ ভেসে যাবার উপক্রম হওয়ায় দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব সমস্ত বিষ পান করে ফেলে। কোন এক সময় কদ্রু সপত্নী বিনতাকে দাসী করবার জন্য সর্পপুত্রদের সহযোগিতায় কপট উপায় অবলম্বন করে। যে সর্পরা কদ্রুর প্রস্তাবে রাজী হয়নি-তাদের জনমেজয়ের সর্পসূত্রে দগ্ধ হবার অভিশাপ দেন। এই অভিশাপের পর বাসুকি নানা তীর্থস্থানে তপস্যা করে। তপস্যার ফলে ব্রহ্মা তার বাসনা জানতে চাইলে-বাসুকি পরলোকে তার দুর্মতিসম্পন্ন ভাইদের সাথে পাতালে গিয়ে এই চঞ্চলা পৃথিবীকে স্থীরভাব ধারণ করতে বলেন। বাসুকিও পাতালে গিয়ে পৃথিবীকে ধারণ করেন। এবং নাগেরা তাকে নাগরাজারূপে অভিষিক্ত করেন। ব্রহ্মার ইচ্ছায়- গরুড় তার সহায় হয়। মাতৃশাপ অভিশাপ মোচনের উপায় চিন্তা করে এলাপত্র নামে এক নাগ বাসুকিকে অভিহিত করেন। তপস্বী জরুৎকারুর ঔরসে বাসুকির ভগিনী জরুৎকারুর গর্ভজাত আস্তীক ধার্মিক সর্পদের রক্ষা করবেন। বাসুকি ঋষি জরুৎকারুকে অন্বেষণ করে তার হস্তে ভগিনীকে সম্প্রদান করেন এবং তাদের পুত্র আস্তীককে জনমেজয়ের সর্পসত্রে প্রেরণ করেন। আস্তীক জনমেজয়কে যজ্ঞ হতে নিবৃত্ত করে সর্পকুল রক্ষা করেন। পৌরাণিক অভিধান, সুধীর চন্দ্র সরকার পৃষ্ঠা-৩৩৭]

বৃন্দাবন - মথুরার তিন ক্রোশ দুরে যমুনার বামতীরে অবস্থিত নগর, বন এবং তীর্থস্থান। কৃষ্ণ প্রথমে গোকুলে দানবদের হত্যা করেন। তারপর নন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তিনি বৃন্দাবনে আসেন। রাধা কৃষ্ণের প্রধান লীলাভূমি বলে বৃন্দাবন হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান।

বরুণ - বরুণ ঋষিদের একজন প্রধান দেবতা। দশ দিকপালের অন্যতম ও একজন লোকপাল এবং জলের দেবতা নামে খ্যাত। সূর্য তার চোখ এবং সুবর্ণময় তার রথ ও প্রাসাদ। তার বহু অনুচর ছিল। সমুদ্র মন্থন হতে উত্থিত বারুণী নামক সুরা পান করত। বেদে বরুণ সহস্রলোচন বলে কথিত আছে। বেদে বহু স্থলে মিত্র ও বরুণ একত্রে মিত্রাবরুণ নামে পুজিত হয়। মিত্র আলোর দেবতা আর বরুণ অর্থাৎ আবরণ। ঋগবেদে ঋষিরা আকাশকে সমুদ্রের সঙ্গে কল্পনা করে জলময় মনে করে। এই জন্য ঋকবেদ আকাশ ও সমুদ্রের মিলন রেখাতেও বরুণের অবস্থিতি ধারণ করে। বরুণ সূর্যের গমনের পথকে বিস্তার করে দেয়। বরুণের শত সহস্র ঔষধের নাম জানা আছে অর্থ্যাৎ ইনি যমের ন্যায় পাপ পূন্যের বিচারকর্তা। বরুণ ধনাধিকারী, জলবিন্দুর মত শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের মত বলবান। সে বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে ভিজিয়ে দিয়েছে। ঋষিরা প্রকৃতির বিস্ময়কর কার্য পরস্পরা দেখে বরুণ, ইন্দ্র ইত্যাদিকে স্বাতন্ত্র্য মনে করেছিল কিন্তু পরে সে ধারণা ভ্রান্ত্র মনে হয়। আসলে তারা স্বাতন্ত্র্য নয় একই। মহাভারতে বর্ণিত আছে- বরূণ কর্দম ঋষির পুত্র ও পুষ্করের পিতা। উর্বশির কামনায় মিত্রা বরুণের এক কুম্ভমধ্যে শূক্রপাত হয়। এ থেকে প্রথমে অগস্তা ও কিছুকাল পরে বৈশিষ্ঠের জন্ম

হয়। খাণ্ডবাহনের সময় অগ্নিকে সাহায্য করার জন্য বরুণ অর্জুনকে চন্দ্রপ্রদত্ত গাভীর ধনু, দুটি অক্ষয় তুনীর ও কপিধ্বজ রথ এবং কৃষ্ণকে একটি চন্দ্র ও কৌমোদকী নামে গদা প্রদান করেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে, বরুণ চন্দ্রের কন্যা ও উতথ্যের স্ত্রী ভদ্রার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে হরণ করে নিয়ে যায়। কিন্তু বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়েও ভদ্রাকে ফিরিয়ে না দেয়ায় মহর্ষি উতথ্য জলরাশি পান করে ফেলেন। তখন ভীত হয়ে ভদ্রাকে প্রত্যার্পণ করে।

বেউলা/বেহুলা- মনসামঙ্গলের কেন্দ্রীয় চরিত্র বেউলা। চাঁদ সওদাগরের সন্তান লখিন্দরের স্ত্রী বেউলা। বেউলা পাঁচালীতে বিপুলা নামে পরিচিত এবং শাপগ্রস্ত উষা। সে সতী সাধ্বী। বেউলার বিয়ে হয় লখিন্দরের সাথে। বাসর ঘরে সাপের ছোবলে স্বামী লখিন্দর মারা যায়। তখন সে মৃত স্বামী লখীন্দরকে ভেলায় নিয়ে ভেসে যায়। শর্ত দিয়ে যায় সতীত্ববলে পথের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে স্বর্গে গিয়ে নৃত্য করে দেবতাদের সন্তোষ্টি অর্জন করে মৃত স্বামীকে বাঁচাইয়া নিয়ে আসে এবং সাথে সাথে অন্যান্য মৃত ভাইদেরকেও তাদের সহায় সম্পত্তি নিয়ে চাঁদ সওদাগরের বাড়ীতে ফিরে আসে। ফিরে এসে চাঁদ সওদাগরকে দিয়ে মনসা দেবীর পূঁজা দিতে বাধ্য করে। (পদ্ম-পুরাণের ভূমিকা-পৃষ্ঠা-৪)

ব্রজমন - ব্রজমন অর্থ্যাৎ কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণবংশীয় বসুদেব ও কংসের বোন দেবকীর অষ্টম সন্তান। বিষ্ণুর অষ্টম অবতার কৃষ্ণ বড় হয়ে কংসকে হত্যা করে। বৈষ্ণবদের মতে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বররূপে কল্পিত হয়েছে। তিনি পরমাত্মা ও রাধা তার হলাদিনী শক্তি। ভক্ত হচ্ছে জীবাত্মা। বৈদিক ঋষি কৃষ্ণ, মহাভারতের রাজনীতিক ও যোদ্ধা কৃষ্ণ, গীতার দার্শনিক কৃষ্ণ, বৈষ্ণবদের প্রেমাসম্পদ কৃষ্ণ ও পৌরাণিক কৃষ্ণ মিলে এক অবতারের সৃষ্টি।

অগ্নিবাণ - এক প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র। অগ্নিদেবের বাণ।

ইন্দ্র - ঋগবেদের প্রধান দেবতা। বেদে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান প্রথম। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রই প্রধান যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু পুরাণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর- এই তিন শক্তির অধীন। অন্যান্য দেবতাদের উপর কর্তৃত্ব করে বলে দেবরাজ নামে খ্যাত। (বঙ্গীয় শব্দকোষ-প্রথম খণ্ড (অ-ন)-পৃষ্ঠা-১৮)

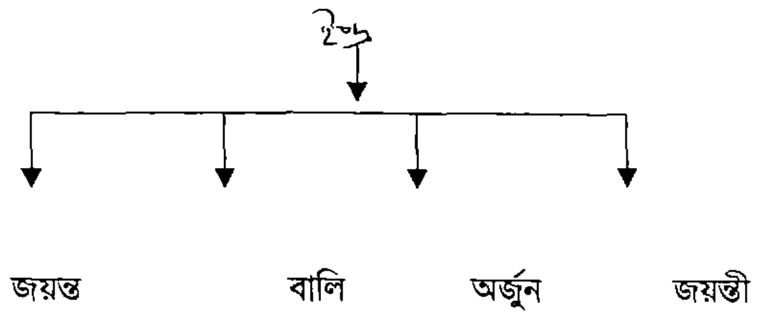

(ইন্দ্রের বংশের তালিকা)

Dhaka University Institutional Repository

উজানি নগর - উজ্জয়নী > উজানি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে নাম ছিল- উজানি নগর। আধুনিক কালে উজ্জায়িনী নগর নামে পরিচিত। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। হিন্দু ভৌগোলিকবিদগণ এই স্থান হতে সব রকম ভৌগলিক গণনা করেন।

অসুর - অসুর দানব বিশেষ। বেদের প্রাচীনতম অংশে এবং পারসিক আবেস্তায় অসুর অর্থ্যাৎ পুরাণোক্ত অদ্ভুত কর্মা মহাবল জাতি বিশেষ। দেবতাদের বিপক্ষ শক্তি হিসাবে অসুরের প্রকাশ। অর্থ্যাৎ দেবতাদের সমুদ্র মন্থনের সময় উত্থিত অমৃত (সুধা) যারা পায়নি- তাদেরই অসুর বলে। বেদের পরবর্তী অংশে অর্থ্যাৎ ঋকবেদের শেষে এবং অর্থববেদে যারা দেবতা বিরোধী, যাদের সুধা নেই- এই অর্থেই এখন ব্যবহার হয়। ঐতয়ের ব্রাহ্মণে প্রজাপতির নিঃশ্বাস একবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সেই প্রাণবন্ত নিঃশ্বাস হতে অসুরের সৃষ্টি। বিষ্ণুপুরাণ মতে ব্রহ্মার জন্ম হতে অসুরদের জন্ম। দেব-শত্রুদের অসুর নামে চিহ্নিত করা হয়। এরা পূজা ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অসুররা হিরণ্যকশিপু, বলি ও প্রহ্লাদ তিনটি ভাগে বিভক্ত (ব্রহ্ম পুরাণ)। যে সমস্ত অসুররা যুদ্ধে নিহত হত, তারা দৈত্য, দানব এবং কল্যাণের বংশধর বলে অভিহিত হয় কিন্তু পুলস্ত্যের বংশধর রাক্ষসদের বুঝায় না।

কামদেব - কামদেব প্রেমের দেবতা। কামের জন্ম সম্বন্ধে অথর্ববেদে দেখা যায় যে, সেখানে কাম বলতে যৌনাকাঙ্খাকে বুঝায়। কামদেব শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে পূজিত হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণে কামের বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে ব্রহ্মার হৃদয় হতে কামদেবের জন্ম। ব্রহ্মা নিজে তার শরে জর্জরিত হয়ে নিজ কন্যা শতরূপাকে গ্রহণ করে। এজন্য মহাদেব কর্তৃক ভস্মীভূত হবে। পরে কামদেবের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মা বলেন- কাম প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে ও পরে ভরত বংশে জন্মগ্রহণ করবে। তারপরে বিদ্যাধরদের পিতা ও সর্বশেষে দেবত্ব লাভ করে। ঐতিত্তিরীয় ব্রাহ্মণে কাম ধর্ম ও শ্রদ্ধার পুত্র এবং হরি বংশে লক্ষ্মীর পুত্রময়ী বলে উল্লেখ আছে (মায়াসূত শ্রীনন্দন)। শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণে আছে- সতী দেহ ত্যাগ করে হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করে মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য তপস্যা করে। এই সময় মহাদেব হিমালয়ে তপস্যায় নিযুক্ত ছিল। পার্বতী সে কথা জ্ঞাত হয়ে প্রতিদিন তার পূজা করতে থাকে। ইন্দ্র তা অবগত হয়ে কামদেবকে সেখানে গিয়ে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে বলে। বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট মহাদেবের উপর পুষ্পশর নিক্ষেপ করলে ক্রুদ্ধ হয়ে মহাদেব তার তৃতীয় নেত্র দিয়ে ভস্মীভূত করেন। পরে অনুতপ্ত হয়ে কামদেবকে কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নরূপে জন্মগ্রহণ করতে বলেন। প্রদুাম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ ও কন্যা কৃষ্ণা। রতি অর্থাৎ আকাঙ্খার দেবী কামদেবের স্ত্রী। তার নাসিকা সুচারু, উরু, কটি ও জঙ্গা সুবৃত্ত, কেশ নীল ও কুঞ্চিত, বক্ষ সুবিশাল এবং চক্ষু, মুখ, পদতল ও নখ আরক্তবর্ণ, গায়ে বকুলের সৌরভ। মকর এর বাহন। ইনি পুষ্পময় পঞ্চশর ও কুসুমকর্ম দ্বারা শোভিত। কামদেবের বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে- মন্মথ, মদন, কন্দর্প, অনঙ্গ,

Dhaka University Institutional Repository

অভিরূপ (সুন্দর), কালকেশী, প্রেমিক, শৃঙ্গারযোনী, মকরকেতু, পুষ্পকেতন, অজ, অনন্যজ, ইষ্ট, কঞ্জন, কিঙ্কিন, মদ, রম, রমণ, স্মর, মনোজ, দর্পক, দীপক, মার, মধুদীপ।

রাহু - রাহু এক দানব বিশেষ। বিপ্রচিত্তি দানবের ঔরসে ও দিতির কন্যা সিংহিকার গর্ভে উৎপন্ন চতুর্দশ সন্তানের অন্যতম। সমুদ্র মন্থনের সময় উত্থিত অমৃত ভাগের মুহূর্তে বিষ্ণু মোহীনিরূপ ধারণ করে। তখন রাহু দেবরূপ ধারণ করে ঐ সভায় উপবিষ্ট হয়। রাহুর কণ্ঠ পর্যন্ত অমৃত প্রবেশ করলে চন্দ্র ও সূর্য চিনতে পেরে বিষ্ণু ও দেবতাদের কাছে তার স্বরূপ প্রকাশ করে। তখন বিষ্ণু নিজের সুদর্শন চক্রে রাহুকে হত্যা করে। কিন্তু অমৃত পান করবার ফলে কেতু নামে খ্যাত হলো। তখন থেকে চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে চিরশত্রুতার সূত্রপাত হয়। তাই রাহু এদের গ্রাস করে ফেলে। রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করলে চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং সূর্যকে গ্রাস করলে সূর্য গ্রহণ হয়। রাহু নবগ্রহের একতম ও নৈঋত কোনের অধিপতি। রাহুর রথ ধূসর বর্ণ। এই রথ আটটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব বহন করে। (বিষ্ণু পুরাণ)

দৈত্য - কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষরাজের অন্যতম কন্যা দিতির গর্ভজাত বংশধরগণ দৈত্য নামে পরিচিত। দেবতাদের সঙ্গে এদের চিরন্তন বিরোধ ও যুদ্ধ চলেছিল। এদের প্রধান কাজ ছিল দেবতাদের যজ্ঞ ও পূজা নষ্ট করা। দেবতাদের সঙ্গে অসংখ্য যুদ্ধের কাহিনী ও জয় পরাজয়ের বিবরণ রামায়ন, মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। দৈত্য ও দানব প্রায় একই শ্রেণীভুক্ত।

পুরাণ - পুরাণ বলতে আমরা বুঝি প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজ ধর্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা। পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত: মহাপুরাণ ও উপপুরাণ।

মহাপুরাণ- মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮ খানা। (১) ব্রহ্মা (২) পদ্ম (৩) বিষ্ণু (৪) শিব (৫) ভাগবত (৬) নারদ (৭) মার্কণ্ডেয় (৮) অগ্নি (৯) ভবিষ্য (১০) ব্রহ্ম-বৈবর্ত (১১) লিঙ্গ (১২) বরাহ (১৩) স্বরন্দ (১৪) বামন (১৫) কুর্ম (১৬) মৎস্য (১৭) গরুড় (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

উপপুরাণ- উপপুরাণের সংখ্যা ১৮ খানা। (১) শিবধর্ম পুরাণ (২) সনৎকুমার (৩) নরসিংহ (৪) নারদীয় (৫) দুর্বাসা (৬) কপিল (৭) মানব (৮) উষনস (৯) বরুণ (১০) কালিকা (১১) শাম্ব (১২) নন্দী (১৩) সৌর (১৪) পরাশর (১৫) আদিত্য (১৬) মহেশ্বর (১৭) ভাগবত (১৮) বশিষ্ঠ।

পুরাণ পাঠে ভূত-ভবিষ্যত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় এবং বুদ্ধির কৌশল ও প্রখরতা বৃদ্ধি পায়।

ভারত পুরাণ - ভারতবর্ষে প্রচলিত ১৮ খানা প্রচলিত পুরাণের কথা বলা হয়েছে। 'অষ্টাদশ পুরাণানি রমস্য চরিতানি চ'।

বৈকুণ্ঠ -বৈকুণ্ঠ বিষ্ণুর আর এক নাম। পঞ্চম (বৈরত) মন্বন্তরে শুক্রের ঔরসে ও তার স্ত্রী বৈকুণ্ঠের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মীর ইচ্ছায় বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠলোক নির্মাণ করেন (শ্রীমদ্ভাগবত)।

Dhaka University Institutional Repository

নিশাপতি - (সংস্কৃত শব্দ) চন্দ্র।

হংস দেবী - সরস্বতী দেবী মানেই হংস দেবী। হংস তার বাহন। হাঁসের ন্যায় মাথা নত ও নিতম্ব আন্দোলিত করে লীয়ায়িতভাবে গমনকারিণী। বেদে সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নাগ দেবীরূপে ব্রাহ্মণে ও মহাভারতে সরস্বতীর উল্লেখ আছে। এই দেবী শুক্লাবর্ণা, বীনাধারিণী ও চন্দ্রের শোভাযুক্তা। এই দেবী শ্রুতি শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিদের ইষ্টদেবতা- এই জন্য এই দেবীর নাম সরস্বতী।

পবননন্দন - হনুমানের আর এক নাম পবননন্দন। তাই পবননন্দন বলতে আমরা হনুমানকেই বুঝে থাকি। কেশরী বানরের ক্ষেত্রজ ও বায়ুর ঔরস পুত্র। ইন্দ্র, মহাদেব, বিশ্বকর্মা, বরুণ, যম, কুবের প্রত্যেক হনুমানকে বর দান করে। রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের পর সীতাকে খুঁজতে সুগ্রীব হনুমানকেই দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করে। রাম হনুমানকে নিজ নামাঙ্কিত আংটি দিয়ে দেয়। জটায়ুর কাছে সীতার সন্ধান পেয়ে রামের নামাঙ্কিত আংটি দেখিয়ে আশান্বিত করে। সীতাও তাকে চূড়ামণি দান করে। অশোক বনে প্রবেশ করে সীতাকে দেখতে পায় এবং নিজ পরিচয় ব্যক্ত করে। অতঃপর হনুমান অশোকবন ধ্বংস করে দেয়। অশোকবন ধ্বংসকারী হনুমানের বিরুদ্ধে রাবণ একদল সেনাবাহিনী পাঠায়। হনুমান তাদেরকে সহ পাঁচজন সেনাপতি ও কুমার অক্ষকে হত্যা করে। পরে ইন্দ্রজিত প্রেরিত হলে ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্যে হনুমানকে পরাস্ত ও বন্দী করে। রাবণের আদেশে হনুমানের শাস্তি স্বরূপ লেজে আগুন ধরিয়ে দিয়ে লঙ্কাপুরী ঘুরানো হয় এবং তার জ্বলন্ত লেজ দিয়ে লঙ্কাপুরীর ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাতে লঙ্কাপুরী পুড়ে যায় এবং হনুমান ছুটে পালিয়ে যায় রামের কাছে। রাম, হনুমান ও বানর নিয়ে লঙ্কাসাগর পার হয়ে- লঙ্কায় উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে পুরাণ মতে- হনুমান বেশ বীরত্ব দেখায়। রাবণের শক্তিসেলে লক্ষণ আহত হলে হনুমান ঔষধি পর্বতে ছুটে গিয়ে ঔষধি পাতা এনে দিয়ে লক্ষণকে বাঁচিয়ে তোলে। ইন্দ্রজিতকে হত্যার সময় হনুমান লক্ষ্মণকে সহায়তা করে। হনুমানের বায়ুর ন্যায় গতি এবং বায়ুর পুত্র বলে হনুমানের নাম হয়েছে পবননন্দ।

রামানুজ - রামের অনুজ অর্থ্যাৎ লক্ষ্মণ। রামের বৈমাত্রেয় বা সাত ভাই (কণিষ্ঠ) সুমিত্রার গর্ভে রাজা দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে। সুমিত্রার দুই পুত্র- লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। এরা যমজ ভাই। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ ভাই রামের অনুগত ছিল। রাক্ষসদের অত্যাচার হতে নিরাপদে থাকার জন্য বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে আশ্রমে প্রহরার জন্য আনে, তখন লক্ষ্মণ ও রামের অনুগমন করে। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামের বনযাত্রাকালে লক্ষ্মণ ও অনুগমন করে। লঙ্কার যুদ্ধে লক্ষ্মণ রামের সহায় ছিল।

স্বর্গপুর - দেবতাদের বসবাস করার স্থানকে বলা হয় স্বর্গপুর। স্বর্গপুর দেবতাদের বসবাস ছাড়াও পৌরাণিক জীবদের আবাসস্থল- অপ্সরা, গন্দর্ব, কিন্নর বা কয়েক রকম পৌরাণিক জীবজন্তু যথা: বিষ্ণুর গরুড়, গণেশের মুষিক ইত্যাদি।

গন্দর্ব - গন্দর্ব স্বর্গীয় নায়ক। এরা অতন্ত সঙ্গীত প্রিয়। এরা সুন্দরী রমণীদের সাথে অবাধে মেলামেশা করত এবং সুন্দরী স্ত্রীলোকদের প্রতি বিশেষ আসক্তি ছিল। পুরাণে গন্দর্বদের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। বেদের পরবর্তী যুগে অপ্সররা এদের স্ত্রীরূপে বসবাস করত। অন্তরীক্ষে স্বচ্ছন্দ গতিতে ও আনন্দে এরা বিচরণ করতে সক্ষম ছিল। কখনও কখনও সুন্দরী নারীর প্রতি আকৃষ্ঠ হয়ে গন্দর্বরা পৃথিবীতে অবরোহণ করত। তাদের নাম হতেই গন্দর্ব বিয়ের প্রথা প্রচলিত হয়। নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে যে বিয়ে হয়, তাই গন্দর্ব বিয়ে। কারণ বায়ুদেব তাই এই বিয়ের একমাত্র স্বাক্ষী এবং উপকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

দশরথ - সূর্যবংশীয় নৃপতি দিলীপের প্রোপৌত্র ও অজের পুত্র দশরথ। দশরথ অযোধ্যার রাজা ও রাম-লক্ষ্মণের পিতা। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তার তিনটি স্ত্রী ছিল। রাজা দশরথের শান্তা নামে একটি মেয়ে ছিল। তার কোন পুত্র সন্তান বহু বছর ধরে হয়নি। অপুত্রক দশরথ পুত্র কামনায় পুত্রোষ্ঠিযজ্ঞ কারণ এবং সেই যজ্ঞের পায়াস কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে পুত্রালাভার্থে খেতে দেয়। কৌশল্যা ও কৈকেয়ী এই পায়াসের অংশ সতীন, সুমিত্রাকে খেতে হয়। ফলে কৌশল্যার গর্ভে রাম- কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ নামে দুই যমজ পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের সাহায্য করতে গিয়ে দশরথ দু'বার আহত হয়। কৈকেয়ীর সেবা ও যত্নে দশরথ আরোগ্য লাভ করে। দশরথ কৈকেয়ীর সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দুইটি বর দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই সময় দাসী মন্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী দশরথের নিকট প্রতিশ্রুতির এক বরে ভরতের রাজ্যলাভ ও অন্য বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থনা করে। পিতৃসত্য পালনার্থে রাম সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসে গেলে শোকার্ত দশরথ কেঁদে কেঁদে প্রাণ ত্যাগ করেন।

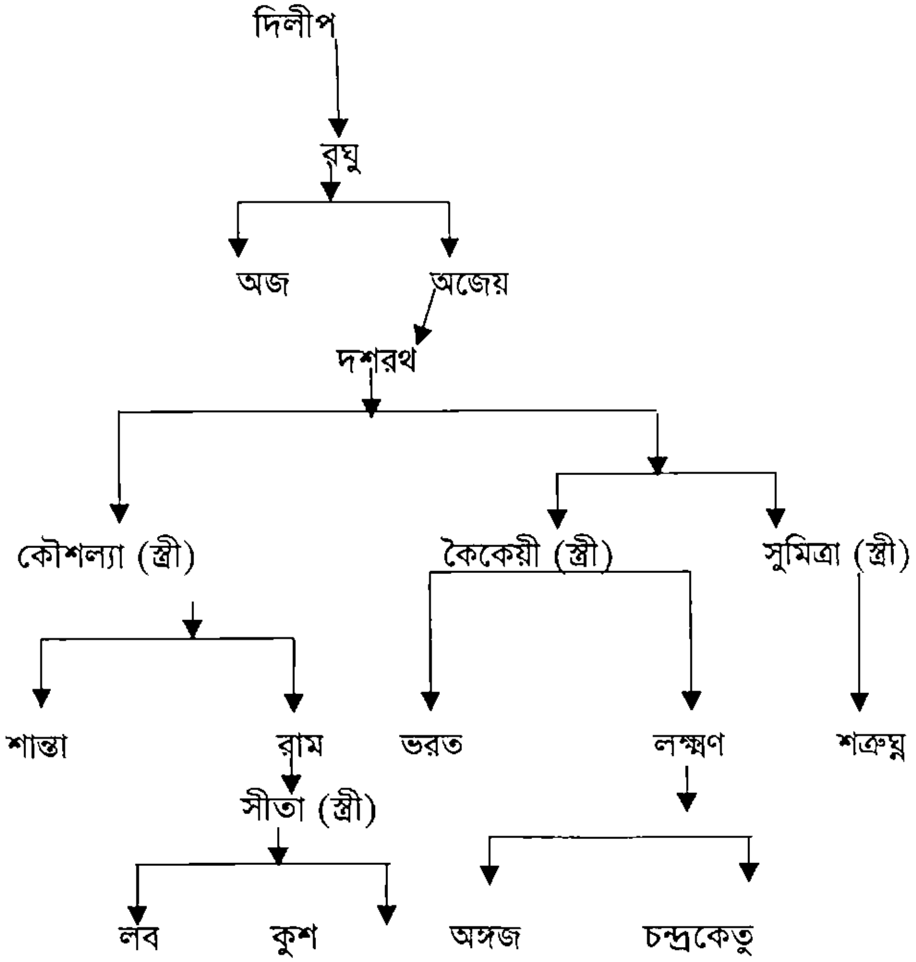

(সূর্যবংশীয়দের বংশ তালিকা)

Dhaka University Institutional Repository

রাবণ - নিকষার গর্ভজাত সন্তান রাবণ। রাবণ লঙ্কার অধিপতি এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য ছিলেন সচেতন ও দৃঢ়চেতা। তাই তিনি একজন জাতীয় বীর ছিলেন। রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণে কথিত আছে যে- রাবণের দশটি মাথা, কুড়িটি বাহু, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, কেশ প্রদীপ্ত লোহিতবর্ণ ওষ্ঠ। রাবণ রাক্ষসদের রাজা। মাতা নিকষার উপদেশে তিন ভাই ব্রহ্মার তপস্যা করতে থাকে। ফলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হয়ে বরদান করতে চান, তখন রাবণ অমরত্বের বর চেয়ে বসে কিন্তু ব্রহ্মা অসম্মত হলে রাবণ দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ ইত্যাদির অজেয় ও অবাধ্য হবার বর চায়। ব্রহ্মা রাবণকে এই বর দেয়। বিভীষণ প্রার্থনা করে যেন তার ধর্মে মতি থাকে। কুম্ভকর্ণ নিদ্রাসুখে জীবন কাটাবার বর পায়। দানব শিল্পী ময়দানবের কণ্যা মন্দোদরীর সাথে রাবণের বিয়ে হয়। বর পেয়ে রাবণ পৃথিবী জয়ের জন্য বেরিয়ে পড়ে। সেই সময় লঙ্কা রাজ্য বৈমাত্র ভ্রাতা কুবেরের অধীনে ছিল। রাবণ লঙ্কা রাজ্য দখল করে নেয়। মহাদেব রাবণকে 'চন্দ্রহাস' নামক এক দীপ্ত খড়গ দান করে। রাবণ সুরথ, গাধি, গর ও পুরুরবা প্রভৃতি রাজাকে পরাজিত করে।

পঞ্চবটি বনে লক্ষ্মণ সুপর্নখার কান ও নাক কেটে দিলে অপমানের প্রতিশোধ স্পৃহায় রাবণ সীতাকে হরণ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়। রাবণ পঞ্চবটী বনে তাড়কার পুত্র মারীচের স্বর্ণমৃগের রূপ ধরে সীতার সম্মুখে বিচরণ করে ও রাম সীতার অনুরোধে তাকে ধরতে যায়। অবশেষে তাকে হত্যা করার জন্য রাম বাণ নিক্ষেপ করলে মারীচ রামের স্বর অনুকরণ করে।

সীতার অনুরোধে লক্ষ্মণ তাঁকে একাকী রেখে রামের অনুসন্ধানে গেলে রাবণ ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে সীতার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে প্রলুব্ধ করতে থাকে। তাতে নিষ্ফল হয়ে রাবণ নিজ মুর্তী ধারণ করে সবলে সীতাকে অপহরণ করে লঙ্কায় নিয়ে যায়। সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাবার সময় পথিমধ্যে জটায়ু বাঁধা দিলে রাবণ তার পাখা কেটে আহত করে। সীতাকে নিয়ে অশোক বনে রাখে। তার উপর রাবণ কোন বল প্রয়োগ করেননি। অবশেষে রাম-লক্ষ্মণ সীতার অন্বেষণে সুগ্রীবের সহায়তায় বানর ও হনুমানের সাহায্যে সেতুবন্ধন করে লঙ্কায় উপস্থিত হয়। বিভীষণ রামের পক্ষে যোগদান করে দেশের স্বাধীনতা বিদেশীদের কাছে বিকিয়ে দেয়- বিভীষণ মিরজাফর আলীর ভূমিকায় ছিল। বিভীষণের রামের পক্ষে যোগদানের ফলে রাবণের বীর সেনাপতি ও সেনানী নিহত হয়। ইন্দ্রজিত নিহত হয়। রাবণ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। মূলতঃ এই যুদ্ধ ছিল স্বাধীন দেশের নাগরিকদের সাথে বর্হির আক্রমণকারীদের যুদ্ধ। অনার্যরা ছিল আদিবাসী। তাই অনার্যরা আর্যদের প্রতিহত করবেই এটাই নিয়ম ও চিরন্তন সত্য। রাবণ ছিলেন অনার্যদের প্রতিনিধি ও জাতীয় বীর। তাই তার বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশলে ভীত হয়ে বহিরাগত আক্রমণকারীরা রাক্ষস বলে অভিহিত করেছে। বহিরাগত আক্রমণকারী ছিল রাম-লক্ষ্মণ।

Dhaka University Institutional Repository

পুল্যস্ত
↓
বিশ্রবা
↓
সুমালী
↓
নিকষা (কৈকশী)
↓
রাবণ — কুম্ভকর্ণ — বিভীষণ — সূর্পণখা

রাবণ
↓
মেঘনাদ — ইন্দ্রজিত

(রাবণের বংশ তালিকা)

গঙ্গাদেবী - শিবপত্নীই গঙ্গাদেবী। গঙ্গাদেবীর আর এক নাম কালীদেবী। শক্তি উপাসকরা কালীকে আদ্যাশক্তি বলে উপাসনা করে। এর চারটি হাত রয়েছে। ডান দিকের হাতে রয়েছে খটাঙ্গ ও চন্দ্রহাস আর বাম দিকের হাতে রয়েছে চামরা ও পাশ। গলায় নরমুণ্ড ও দেহে বাঘের চামড়ার আবৃত। এর বাহন কবন্ধ (মস্তক বিহীন শব)। এই দেবীর অনেক নাম রয়েছে ভগবতী, চামুণ্ডা, পার্বতী, কৌষিকী, কালী, গঙ্গাদেবী।

গঙ্গী -ব্রহ্মবৈবর্ত্য পুরাণে গঙ্গীর নাম বিষ্ণুপদী। বিষ্ণুর স্ত্রী বলেই নাম হয়েছে বিষ্ণুপদী। হরি বংশে গঙ্গার পরিচয় পাওয়া যায় জাহ্নবী নামে। মহাভারত আদি পর্বে গঙ্গা কুরুরাজ শান্তনুর স্ত্রী ও দেবব্রত ভীষ্মের মাতা। পর্বতরাজ হিমালয় ও তার স্ত্রী মেনকার কন্যা গঙ্গা। ব্রহ্মার বরে গঙ্গা ভগীরথী নামে পরিচিতি পায়। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিত হয় বলে তার অপর নাম ত্রিপথগা। পুরাকালে অযোধ্যার সগর রাজার স্ত্রী বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। (পৌরাণিক অভিধান- সুধীরচন্দ্র সরকার, পৃষ্ঠা-১৩৪)

Dhaka University Institutional Repository

অধিবাস -অধিবাস বিবাহাদি শুভকর্মের পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান। সং অধি+√ বাসি (বস্+নিচ্)+অ (ভা)। বিবাহ শুভকার্যের পূর্বে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কার বিশেষ (চলন্তিকা)। বিয়ের পূর্বে শুভ কার্যাদির পূর্বে পালনীয় কিছু সংস্কার বিশেষ। প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম তথা ১৮ভাটি অঞ্চলে মুসলমান সমাজে ও হিন্দুদের মত বিয়ের আগের দিন অধিবাস পালন করার প্রথা প্রচলিত ছিল। ফটিকছড়ী থানার বক্তপুর নিবাসী আঠার শতকের কবি মোহাম্মদ রজা বিরচিত তসিম গোলাল চতুর্থ সিলাল কাব্যে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন-

অধিবাস রাত্রিজান অধিক উল্লাস
সখিগণে নাচে গায় ফিরি চারিপাশ।

সপ্তদশ শতকের তৃতীয় দশকের প্রারম্ভকাল থেকে সংস্কারধর্মী ইসলামী আন্দোলনের ফলে এই অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে অধিবাস প্রথা লোপ হয়ে যায়। কিন্তু বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজে এর প্রচলন রয়েছে। অধিবাস এক প্রকার উপবাস বিশেষ। বিয়ের পর নব বধুর পিতার ঘর থেকে আনিত কলার থোড় ও কলমী শাকের তরকারী দিয়ে ভাত খাইয়ে বধুর অধিবাস ভঙ্গ করা হয় এবং সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত আর কোন অনুষ্ঠানে সে থাকবে না। সন্ধ্যার সময় বর ও বধুকে ঘরের বাইরে উঠানে এনে দুধ ও কলা খাওয়ানো হত এবং তা কণের পিতার বাড়ী থেকে পাঠানো হতে হবে। ১৮ ভাটি কবি হাফেজদ্দীন তার 'বসন্তের দুঃখ' কাব্যে উল্লেখ করেছেন অধিবাস সম্পর্কে

এইরূপ সাত দিন অবসান হইল।
অধিবাস দিন তথা আসিয়া পৌছিল।।
রাজার লিখন পাই সকল রাজায়।
তৈয়ার হইল সবে আসিতে তালে।।

কলান্দই - ইতস্তত পরিভ্রমণকারী মুসলমান ফকির বিশেষ। এই তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পানিপথে নিবাসী হযরত শাহ্ বু-আলী কলন্দর (রাঃ)। তার মৃত্যু হয় ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে এই তরীকার প্রসার সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বজাতীয় তরীকাপন্থী সূফী দরবেশগণ কলন্দর নামে অভিহিত হতে থাকেন। তখনকার প্রতিটি সূফী দরবেশগণ কলন্দর নামে অভিহিত হতে থাকেন। তখনকার প্রতিটি সূফী দরবেশের বেলায় 'কলন্দর' শব্দটি একটি আখ্যায় পরিণত হয়েছিল। চট্টগ্রাম থেকে আবিস্কৃত আরবী হরফে মধ্যযুগে অনুলিখিত "যোগ কলন্দর" নামক কতকগুলো প্রাচীন পুঁথি থেকে তৎসম্পর্কীয় অনেক তথ্য জানা যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে, কলন্দরিয়া কোন নতুন তরীকার নাম নয়, তা চিশতিয়া তরীকা থেকেই উদ্ভূত একটি উপ-তরীকা। শৈখ শরফুদ্দীন বু-আলী শাহ কলন্দর-এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। পানিপথই তার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল এবং এখানেই তিনি সমাহিত হন। ইসলামে বৈরাগ্য নাই বলে সংসার ধর্ম পালনের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

পরলৌকিক ধর্মও পালন করতে হয়। কিন্তু বু-আলী কলন্দরের মতে- "ইহকাল ও পরকাল-এই দুইটি কি কখনও একসঙ্গে হাতে আসে?"

বু-আলী কলন্দরের সংসার ত্যাগী মন্ত্র শিষ্যরা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসে। তাদের প্রচার তৎপরতা ও প্রভাব এতই বৃদ্ধি পায় যে, মোঘল আমলে সূফী সাধক বুঝাতে বাংলা ভাষাতে কলন্দর শব্দই ব্যবহৃত হত। মুকুন্দরামের "চণ্ডী মঙ্গল" কাব্যই (১৫৯৮-১৬০৬) এর প্রধান প্রমাণ। সূফী সাধকদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি লিখেছেন-

"কলন্দর হৈয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি"

কিংবা

"ঋণ করি নাহি দাও, নহ কলন্দর"

কবি হাফেজদ্দীন লিখেছেন-

"কামদেব জিনী রূপ মোর পতি ছিল।
হংসরাজ ধজ দেখি কলান্দই হইল।।

আবার কেউ কেউ এই তরীকার ইমাম বা প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন স্পেনের হযরত শেখ ইউসুফ (রঃ) কে। আবার কেউ কেউ এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন পারস্যের হযরত শেখ জালাল উদ্দীন সাওয়াইজী কে (রঃ)। ভারতবর্ষে এই তরীকার প্রবক্তা ছিলেন হযরত শরফদ্দীন বু-আলী কলন্দর (রঃ)। এই তরীকাভুক্ত কোন পীর ফকির তাদের হাতে পায়ে লোহাকে চুড়ি বা রিং হিসাবে পরিধান করে থাকেন। তারা তাদের চুল, দাড়ি ও গোঁফ সব মুরিয়ে ফেলেন। আবার তাদেরই কেউ কেউ চুল দাড়ি গোঁফ কোন দিনও কাটেন না। এরা ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত ছাড়া আর কোন রকম এবাদত বন্দেগীর পক্ষপাতী নন। দেওবন্দ থেকেই কলন্দই তরীকার উদ্ভব। (সূফী তত্ত্বের আত্মকথা-মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী, পৃষ্ঠা-১৫১)

নরবলি - কাপালিকরা তান্ত্রিক সাধনার জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করত। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে নরমেধের প্রয়োজন হত। তাই তারা যজ্ঞে নরবলি দিত। তারা সর্বাঙ্গ সুন্দর একটি মানুষ ধরে নিয়ে দেবতার সামনে বলি দিত। ভারতের কোন কোন অঙ্গরাজ্যে এ নির্মম প্রথা চালু রয়েছে বলে গুজব আছে।

যখ্যার/যক্ষ - যক্ষ এক প্রকার দেবযোনী বিশেষ। এরা কুবেরের অনুচর এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; মুখ বিকৃতাকার ও পিঙ্গলাঙ্গ। বৃহৎ উদর, কেহ বা স্ফটিকবর্ণ, রক্তবেশ ও দীর্ঘস্কন্ধ। যক্ষরা সাধারণতঃ মানুষের বন্ধু ও কুবেরের ভৃত্য। এরা সব সময় ধন-সম্পদ পাহাড়ার কাজে বস্ত থাকে। অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়- যক্ষরা মাটির নীচে পোঁতা ধন-সম্পদ রক্ষা করে। প্রাচীন কিছু সমাজের প্রথানুসারে একটি জীবিত বালককে মাটির নীচে সঞ্চিত ধন রাশির সঙ্গে পুঁতে রাখাত যাতে সে ধন রাশির রক্ষক হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

হংসরাজ/হংরাজ - নির্লোভ সন্ন্যাসী 'অহং সঃ' এইরূপ ভাবনামুক্ত হয়ে যিনি সংসার বন্ধন হনন করেছেন। হিন্দুমতে একজন ক্ষত্রীয় বীর। হংসরাজ বলতে আমরা ব্রহ্মাকেই বুঝি।

গোঁসাই - গোঁসাই সংস্কৃত শব্দ। অর্থাৎ প্রভু জগদ্বিশ্বর। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরুবংশীয় ব্যক্তিদের উপাধি। বৈষ্ণব হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় সাধনায় পূজনীয় ব্যক্তিদের বলা হয় গোঁসাই।

মনসা-মনসা সর্পের দেবী। তিনি জরৎকারু মুনীর স্ত্রী। আস্তিকের মাতা এবং বাসুকির ভগিনী। ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করে তপোবলে মন দ্বারা মনসাকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে উৎপাদন করেন। সেই জন্য তিনি মনসা এবং একে কল্যাণের মানসী কন্যা বলা হয়। পুরাকালে মানুষরা সর্বদা সর্পভয়ে ভীত থাকত। কারণ নাগরা যাকে দংশন করে, তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। দেবী মনসা অত্যন্ত সুন্দরী বলে এর নাম জগৎগৌরী। শিবের শিষ্যা বলে শৈবী; বিষ্ণুভক্তা বলে বৈষ্ণবী জনমে জয়ের যজ্ঞে নাগদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন বলে নাগেশ্বরী। বিষ হরণকারিনী বলে বিষহরী; মহাদেবের কাছ হতে সিদ্ধযোগ পেয়েছিলেন বলে সিদ্ধযোগিনী, কশ্যপের মানসী কন্যা বলে মনসা। কশ্যপ মন্ত্র সৃষ্টি করে এই সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীরূপে মনসাকে সৃষ্টি করলেন। কুমারী অবস্থায় মনসা মহাদেবের কাছে যান এবং তার কাছ থেকে স্তব, পূজা, মন্ত্র ইত্যাদি সবই শিক্ষা লাভ করে সিদ্ধ হন। পরে দেবতা, মনু, মুনি, নাগ, মানুষ সকলেই মনসাদেবীর পূজা করতে যাকে এবং পৃথিবীতে মনসার পূজা চালু হয়।

ব্রহ্মা - অব্যয়, অব্যক্ত, চিরন্তন, সর্ব সৃষ্টিকর্তা, সর্ব ব্যাপক, স্বয়ম্ভু। যিনি নাম চিহ্নের অতীত, স্মৃতি ও সৃষ্টির কর্তা এবং স্বীয় মহিমায় অদ্বিতীয়, অদৃশ্য, আদি ও অন্তহীন। অসীম ও অনন্ত, সমস্ত জিনিস এর থেকে সৃষ্টি ও সমস্তই এতে বিলীন হয়। তিনি কালের ও সীমার অতীত। ব্রহ্মা চতুর্ভূজ, চতুরাণন ও রক্তবর্ণ। তার বাহন হংসরাজ। বেদে কিংবা ব্রাহ্মণে ব্রহ্মার নাম পাওয়া যায় না। সেখানে তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে।

বিষ্ণু - বিষ্ণুর অন্য নাম নারায়ণ ও কৃষ্ণ। বিষ্ণু ব্রহ্মাদি ত্রিমূর্তির একতম এবং সৃষ্টির পালক। লোক রক্ষার জন্য নানা অবতারের আবির্ভূত হয়ে মধুকৈটভ, হিরণ্যাদি লোক শত্রুকে বিনাশ করেছেন। বিষ্ণু দেবতাদের শ্রেষ্ঠ। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এর দুই স্ত্রী লক্ষ্মী ও সরস্বতী। পৃথিবীর ভাল কল্যাণের জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করে- পুরাণে এর দশ অবতারের কথা লিখিত হয়েছে। বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা। আর্যদের তিন প্রধান দেবতার মধ্যে বিষ্ণু অন্যতম। তিনি সদগুণের অধিকারী। মহাভারতে ও পুরাণে বিষ্ণু প্রজাপতি ও শ্রেষ্ঠ দেবতা। প্রজাপতি হিসাবে তার তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথমে সৃষ্টিকর্তা রূপে ব্রহ্মা, নিদ্রিত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হতে উত্থিত হয়েছে, দ্বিতীয় বিষ্ণু স্বয়ং রক্ষক হিসাবে অবতার। শ্রীকৃষ্ণ, তৃতীয় শিব বা রুদ্র, বিষ্ণুর কপালে উদ্ভুত ধ্বংসের দেবতা।

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তন- রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক গান। যা পালাক্রমে নট-নটীরা অভিনয় ও গান করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা হয়। এ গান এক থেকে একাদিক দিন গীত হয়ে থাকে।

কবুতর - বাঙলাদেশের গৃহপালিত পাখীদের মধ্যে অন্যতম। কবুতরের মাধ্যমে পূর্বে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা হত।

অর্জ্জুন/অর্জুন -অর্জুন পাণ্ডবের তৃতীয় কীর্তিমান পুরুষ। পাণ্ডুর ক্রোধে কুন্তীর গর্ভে ও ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুনের জন্ম হয়। প্রথমে কৃপাচার্য ও পরে দ্রৌণাচার্যের নিকট ইনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা লাভ করে। ধনুবিদ্যায় তৎকালীন সময়ে অর্জুনের সমকক্ষ ছিল না কেউ। পাণ্ডবদের মধ্যে তিনি মান্য, ন্যায়পরায়ণ ও মিষ্টভাষীর অধিকারী ছিলেন। লক্ষ্যভেদ পরীক্ষায় অর্জুন একাগ্রতার বলে উত্তীর্ণ হয়ে সকলের শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হয়। দ্রুপদ কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরা সভায় চন্দ্রমধ্যে মৎস্য লক্ষ্যবিদ্ধ করে তিনি দ্রৌপদীকে লাভ করেন এবং মাতার আদেশে পাঁচ ভাই একত্রে দ্রৌপদীকে বিয়ে করে। ভ্রাতৃবিরোধ নিরসনের জন্য তারা নিয়মাবদ্ধ হন, এক ভাই অবস্থানকালে যদি অন্য ভাই যদি উপস্থিত হয়, তাহলে ১২বছরের জন্য ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করতে হবে। ঘটনাচক্রে অর্জুনকে ১২ বছরের জন্য বনবাসী হতে হয়েছে। এই সময়ে তিনি নাগকন্যা উলুপী ও সনিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেন। দ্বারকায় অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণের সাথে তার সখ্যতা হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করে বিয়ে করেন। বনবাসকালে অর্জুন কৌরবদের যুদ্ধে পরাজিত করার জন্য নানা প্রকার অস্ত্রসস্ত্র লাভ করার জন্য হিমালয়ে যান। সেখানে কিরাত বেশী মহাদেবের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং পশুপাত অস্ত্র লাভ করেন। এভাবে ইন্দ্র, বরুণ, কুবের ও যমের সাথে সাক্ষাত হয় এবং তাদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র লাভ করেন।

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উপদেষ্টা সারথিরূপে পান। পরে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হন এবং যুদ্ধে স্বজনবধে অর্জুন বিমুখ হলে কৃষ্ণ তাকে যে সকল মহাবাক্য উপদেশ প্রদান করেন-তাই শ্রীভগবতগীতা বলে গৃহীত হয়। অর্জুনই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের একজন শ্রেষ্ঠ বীর। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দশম দিনে অর্জুনের সাথে যুদ্ধে ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করেন। দ্বাদশ দিনের যুদ্ধের ভগদত্ত, চতুর্দশ দিনের যুদ্ধে অভিমন্যু বধের প্রতিশোধ স্বরূপ তিনি জয়দ্রোথকে বধ করেন। পঞ্চদশ দিনে তিনি দ্রোণাচার্যকে বধ করেন। ষোড়শ দিনের যুদ্ধে মগধরাজ দণ্ডাধার ও সপ্তদশ দিনের যুদ্ধে তার প্রতিদ্বন্দী শ্রেষ্ঠ বীর কর্ণকে বধ করেন।

করুক্ষেত্রের যুদ্ধে রাজ্য লাভের পর যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় যজ্ঞের অশ্ব রক্ষার জন্য অর্জুন যাত্রা করেন। ত্রিগত, প্রাগজ্যোতিষপুর, সিন্ধুদেশ জয় করে মনিপুরে নিজ পুত্র বভ্রুবাহনের হস্তে নিহত হন। তখন অর্জুনের স্ত্রী নাগকন্যা উলুপী নাগলোক হতে আনীত সঞ্জীবন মনির সাহায্যে তাকে পুর্ণজীবন দান করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন দ্বারকার নারীদের নিয়ে

ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে আসেন। পথে আভীর দস্যুরা যাদব নারীদের লুণ্ঠন করে। কৃষ্ণের মৃত্যু ও নিজ দৈবশক্তি হারাণোর ফলে দস্যুদের বাধা দিতে পারে নাই।

পাণ্ডবগণ অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজা করে মহা প্রস্থান করেন। পথে লৌহিত্র সাগর তীরে অগ্নিদেবের অনুরোধে অর্জুন গাণ্ডীব ধনু অক্ষয় তুন দুইটি নিক্ষেপ করেন। হিমালয় পার হয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যেতে দ্রৌপদী, মহাদেব ও নকুলের পতনের পর অর্জুনের মৃত্যু হয়। অর্জুনের বেশ কয়েকটি নাম রয়েছে- ধনঞ্জয়, বিজয়, শ্বেতবাহন, ফাল্গুনী, কিরীটি, বীভৎসু, সব্যসাচী, শুভ্র, শত্রুজয়ী বিষ্ণু, গুড়াকেশ, পার্থ, কীর্তবীর্য।

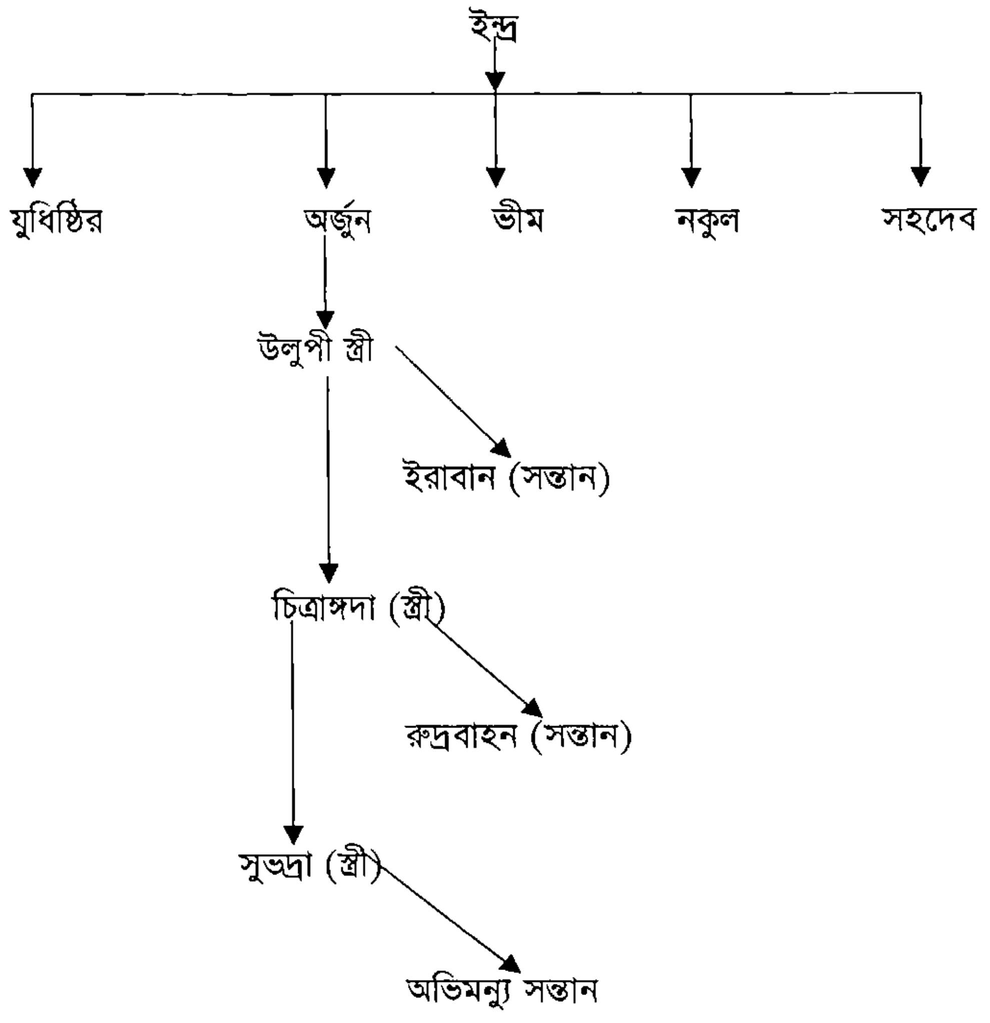

(পাণ্ডবদের ও অর্জুনদের বংশ তালিকা)

রায় - হিন্দু সম্প্রদায়ের পদবি বিশেষ। রাজা বা রাজার মত সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ব্যক্তি। ইংরেজ আমলে সরকার প্রদত্ত খেতার বিশেষ।

Dhaka University Institutional Repository

যজ্ঞপতি - শিব জটাধারী ও সিদ্ধি সেবক।

হুর (আরবী শব্দ) - অতিশয় সুন্দরী রমণী। জান্নাতবাসীদের জন্য কেবলমাত্র প্রযোজ্য। অন্য কথায় বেহেশতের কুমারী। তাদের ঘনকৃষ্ণ চক্ষু তারকা। পারস্য ভাষায় এক বচন, নাম পদ এবং আরবী ভাষায় হুরিয়্যা। আরবী গ্রন্থ সমূহে শব্দটি আলাদা অর্থ পাওয়া যায়। যার অর্থ দর্শক মাত্রই হতবাক হয়ে যায়।

আল-কুরানের বিভিন্ন আয়াতে এই সকল বেহেস্তী কুমারী বালা সর্ম্পকে বেশ বর্ণনা রয়েছে। (সুরা ২:২৫, ৩:১৫, ৪:৫৭) তাফসীরকারকদের অভিমতে এই উক্তির তাৎপর্য রয়েছে- তারা সমভাবে দৈহিক অপবিত্রতা এবং চারিত্রিক ত্রুটি মুক্ত। সুরা ৫৫:৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে- "তাদের চোখের দৃষ্টি আনত কোন মানব বা জ্বীন তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে নাই"। এই উক্তির তাৎপর্যে বলা হয়েছে, হুরগণ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত (১) এক শ্রেণী মানব সদৃশ (২) অপর শ্রেণী জ্বীন সদৃশ। তারা তাবুর মধ্যে বাস করে (৫৫:৭২)। তারা মুক্তা ও প্রবাল সদৃশ (৫৫:৫৬)।

পরবর্তী আরবী সাহিত্যে তাদের দৈহিক সৌন্দর্য সম্পর্কে আরো বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। কোন মুমীন বেহেস্তে প্রবেশকালে হুরদের একজন তাকে স্বাগতম জানাবে- বহু সংখ্যক হুর একজনের জন্য নির্বাচিত থাকবে। হুরীরা চিরকুমারী (৫৬:৩৬)। তারা সঙ্গীদের সমবয়স্কা হবে।

মারওয়ার > মারোয়া - মধ্যযুগে সমাজে বিয়ের বর কনেকে উপবেশনের জন্য মারোয়ার প্রচলন ছিল। মধ্যযুগের চট্টগ্রামের কোন এক কবি মারওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন-

আর পত্র ধার বহু কাঁচা বাঁশ আনি।
মারওয়া নির্মান্ত ইবলিসের বাসাখানি।।
চতুর্দ্দিকে সপ্তনাল সুতায় বেড়িয়া।
ঠামে ঠামে মুছহি বহু দেওন্ত ঢুলাইয়া।।
মারওয়ার বার্ত্তা নাহি শাস্ত্রের মাঝার।
মুসলমান কর্ম নহে কাফের সবার।।
বাঙ্গালে বাঙ্গালা বান্দিবারে ন পারন্ত।
ইবলিস কারণে বাসা নির্মিন্তে জালন্ত।।
সত্বর করি কলসী ভরিয়া আনি জল।
অতি মান্য করি রাখে মারওয়ার তল।।
চারিপাশে ভ্রমি ভ্রমি গাহন্ত সুস্বরে।
কলসী সানাই শুনাওন্ত ইবলিসের।।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের বাড়ীর উঠানে দৈর্ঘ্য ৮ হাত ও প্রস্থ ৮ হাত মাপের একটি স্থানের চারকোনায় চারটি কাঁচাবাশের খুটি পোতা হত। সে খুটির ফাঁকে চারটি কলাগাছপুতে, খুটি ও কলাগাছের চারদিকে সাতনালের সুতো পেচিয়ে বেধে দেয়া হত। আর এক কোনায়ে আমগাছের পাতায় সজ্জিত পানি পূর্ণ একটি মঙ্গল কলস ও বরণ কুলা স্থাপন করা হত। তারপর সেখানে নব দম্পতির বসার জন্য শীতল পাটির বিছানা পেতে দেয়া হত। এই মারোয়ায় সমূদ্র উপকুলবর্তী এলাকায় বর ও কনেকে বরণ করা হতো এবং বিয়ে বাড়ীতে আগত বরের বন্ধু-বান্ধব ও যুবতীরা মারওয়ার মধ্যে বসে গল্প গুজব ও হই হুললা করে আনন্দ উপভোগ করত। যুবতীরা মাওয়ার চারদিকে ঘুরে ঘুরে বর বধুকে অভিনন্দনমূলক হয়লা (এক পকার গান) গেয়ে আনন্দে সময় অতিবাহিত করে দিত। শুধু কেবল মুসলমান সমাজেই নয় চট্টগ্রামের হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের মারওয়ার প্রচলন ছিল। (ডঃ আব্দুল করিম সম্পাদিত নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত শরীয়তনামা-পৃ-১০০)১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে করি নসরুল্লাহ খোন্দকার তার শরীয়তনামায় উল্লেখ করেছেন মারোয়ার চারদিকে সাত নালা সূতা পেঁচিয়ে দেয়া হত। মুসলমান, বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজেও একই নিয়ম অনুসরণ করা হত। এই রীতিই তাদের আদিম কুলকেতু। মাররোয়া নববধুর জুলুয়া , গেরুয়া ও পাশা খেলা এবং কেচ্ছা বলার নিয়ম ছিল। কবি হাফেজদ্দীন তার "বসন্তের দুঃখ" কাব্যে মাররোয়ার উল্লেখ করেছেন।

যেমন- এই রুপে সাজাইয়া কুমারীর তরে।
মাররোয়ার নীচে রাখিলেক বরে।
কুমার কুমারী দোহে বসিলে যখনে।
মলিন হইয়া গেল শশিরাকারে।।

বিয়ের পর মাররোয়ায় বসেই বর ও কনের প্রথম পরিচয় হত। (চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি আব্দুল হক চৌধুরী, পৃষ্ঠা-১৮৫)।

পুরু কাগজ-হাতের তৈরী কাগজ। তৎকালীন সময় গ্রামে গঞ্জে ঢেঁকিতে ছাটাইকরে কাগজ তৈরী করা হত। আধুনিক কালেও গৌরনদী ও আগৈলঝারা অঞ্চলে কাগজী পারা রয়েছে। এই কাগজী পারায়-এখনোও হাতে কাগজ তৈরী করা হয়। কাগজ তৈরীর উপাদান হিসাবে গাছের পাতা, কুচুরীপানা ও বিভিন্ন লতা জাতীয় উদ্ভিদ ব্যবহার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

অ

১. অসীতকুমার বন্দোপাধ্যায় --- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-চতুর্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ-১৯৭৩, কলিকাতা।

২. অসীতকুমার বন্দোপাধ্যায় --- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৬৬, কলিকাতা।

৩. অতুলচন্দ্র গুপ্ত --- কাব্য জিজ্ঞাসা-১৯৬৯, ঢাকা।

৪. অমলকুমার বন্দোপাধ্যায় --- পৌরাণিকা, প্রথম খণ্ড (অ-ন), দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৮৫, কলিকাতা।

৫. অমলকুমার বন্দোপাধ্যায় --- পৌরাণিকা, দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৮৮, কলিকাতা।

আ

৬. আব্দুল খালেক মু.--- মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান,প্রথম প্রকাশ-১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭. আজাহার ইসলাম --- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি,প্রথম প্রকাশ-১৯৯২। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৮. আব্দুল হক চৌধুরী --- প্রাচীন আরাকান রোয়াহিঙ্গা হিন্দু ও বড়ুয়া বৌদ্ধ অধিবাসী,প্রথম প্রকাশ-১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৯. আশুতোষ ভট্রাচার্য শ্রী --- বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৭০, কলিকাতা।

১০. আশুতোষ ভট্রাচার্য শ্রী---বাংলা লোকসাহিত্য তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬৫, কলিকাতা।

১১. আশুতোষ ভট্রাচার্য শ্রী--- বাংলা লোকসাহিত্য চতুর্থ খণ্ড, ১৯৭৩, কলিকাতা।

১২. আশুতোষ ভট্রাচার্য শ্রী --- বাংলা লোকসাহিত্য প্রথম খণ্ড, ১৯৫৭,কলিকাতা।

১৩. আলী আহসান সৈয়দ--- পদ্মাবতী-প্রথম প্রকাশ-১৯৬৮, ঢাকা।

১৪. আব্দুল কাইয়ুম মু. সম্পাদিত --- সতী ময়না- লোর চন্দ্রানী, বাংলা একাডেমী-১৯৯২, ঢাকা।

১৫. আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা মু. সম্পাদিত --- চর্যাগীতিকা-১৯৭৩, ঢাকা।

১৬. আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা মু. সম্পাদিত --- বুড়ু চন্ডীদাসের কাব্য-১৩৭৪, ঢাকা।

১৭. আহমদ শরীফ ড. সম্পাদিত--- দৌলত উজির বাহরামের-লাইলী-মজনু, বাংলা একাডেমী, তৃতীয় মুদ্রণ-১৯৭৬, ঢাকা।

১৮. আহমদ শরীফ ড. সম্পাদিত --- নবী বংশ, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, ঢাকা।

১৯. আহমদ শরীফ ড. সম্পাদিত ---আলাওল বিরচিত-সিকান্দর নামা,বাংলা একাডেমী-১৯৭৭, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

২০. আহমদ শরীফ ড. সম্পাদিত ---বিচিত চিন্তা-১৯৭৫, ঢাকা।

২১. আহমদ শরীফ ড. ---- বাংলায় সুফী সাহিত্য-১৯৭২, ঢাকা।

২২. আহমদ শরীফ ড. --- সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৩. আলী আহমদ সম্পাদিত --- -ইমাম বিজয়,কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ণ বোর্ড-১৯৬৯, ঢাকা।

২৪. আলী নওয়াজ ড.--- খনার বচন ও কৃষি ও বাঙ্গালী সংস্কৃতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ১৩৯৬, ঢাকা।

২৫. আলী নওয়াজ --- ময়মনসিংহ গীতিকা ,প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯, ঢাকা।

২৬. আজিজুল হক সৈয়দ সম্মাদিত --- ময়মনসিংহ গীতিকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৯, ঢাকা।

২৭. আশ্রাব ছিদ্দিকী ড. --- লোকসাহিত্য-১৯৬৩, ঢাকা।

২৮. আশরাফ সিদ্দিকী ড.--- লোকায়ত বাংলা, বাংলা একাডেমী-১৯৭৮, ঢাকা।

২৯. আবুল কালাম মোঃ জাকারিয়া সম্পাদিত-বাংলা সাহিত্যে গাজী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান, বাংলা একাডেমী-১৯৮৯, ঢাকা।

৩০. আব্দুল খালেক মুহাম্মদ --- মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক উপাদান,১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩১. আব্দুল করিম ড. সম্পাদিত --- নসরুল্লাহ খোন্দকার বিরচিত-শরিয়ত নামা,১৯৭৫, চট্রগ্রাম।

৩২. আব্দুল হক চৌধুরী --- চট্রগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতি, প্রথম সংস্করণ-১৯৮০, চট্রগ্রাম।

৩৩. আব্দুল হাফিজ --- বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য-১৯৭৪, ঢাকা।

৩৪. আব্দুল হাফিজ --- লোক কাহিনীর দিগ দিগন্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৭৬, ঢাকা।

৩৫. আব্দুল কাদির --- বাংলা ছন্দের ইতিবৃত্ত-১৯৯৬, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়।

৩৬. আতাউর রহমান --- লোকসাহিত্যের কথা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩৭. আনিসুজ্জামান ড. --- স্বরূপের সন্ধানে-১৯৭৬, ঢাকা।

৩৮. আনন্দ মোহন বসু --- বাংলা ভাষার ইতিহাস-১৩৮০, বীরভুম, পশ্চিম বঙ্গ।

৩৯. আব্দুল কাইউম মোহাম্মদ --- পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ সমালোচনা, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৩৭৭ চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

৪০. আব্দুল হাই মুহম্মদ--- ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৬৭, ঢাকা।

ই

৪১. ইসলামী ফাউণ্ডেশন --- ইসলামী বিশ্ব কোষ,দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উ

৪২. উত্তম দাস --- বাংলা ছন্দের অন্তঃপ্রকৃতি-১৯৯২, চব্বিশ পরগণা, পশ্চিম বঙ্গ।

এ

৪৩. এনামুল হক ড. মু.--- মুসলিম বাংলা সাহিত্য-দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৯৬৫, ঢাকা।

৪৪. এনামুল হক ড. মু. সম্পাদিত --- শাহ্ মোহাম্মদ সগীরের ইউসুফ জুলেখা-১৯৯৯,ঢাকা।

৪৫. এনামুল হক ড. মু. --- বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাঙলা অভিধান, জুন-১৯৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪৬. এ.ই.হাউজ মান --- কাব্যের স্বভাব (সম্পাদনায় সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী) ঢাকা।

ও

৪৭. ওয়াকিল আহমদ --- লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ-১৯৯৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪৮. ওয়াকিল আহামদ --- বাংলার লোক সংস্কৃতি, জানুয়ারী-১৯৭৪-বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪৯. ওয়াকিল আহমদ --- বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৯৭৪, ঢাকা।

৫০. ওয়াকিল আহমদ --- মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫১. ওয়াকিল আহমদ --- বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ১৯৭৪, ঢাকা।

৫২. ওয়াকিল আহমদ --- বাংলা লোকসাহিত্যের ছড়া, বাংলা একাডেমী-১৯৯৮, ঢাকা।

৫৩. ওয়াকিল আহমদ --- বাংলা লোকসাহিত্যে মন্ত্র - ১৯৯৫, ঢাকা।

৫৪. ওয়াকিল আহমদ --- বাংলা লোকসাহিত্য প্রবাদ, প্রবচন, বাংলা একাডেমী-১৯৯৪, ঢাকা।

৫৫. ওয়াকিল আহমদ --- বাংলা লোকসাহিত্য ধাঁধাঁ, বাংলা একাডেমী-১৯৯৫, ঢাকা।

ক

৫৬. কল্পনা ভৌমিক ড.---- পাণ্ডুলিপি পাঠ সহায়িকা, বাংলা একাডেমী-১৯৯২, ঢাকা।

৫৭. কাজী আব্দুল মান্নান (ড.)---আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ১৯৬৯, ঢাকা।

৫৮. কাদির আব্দুল ---বাংলা ছন্দের ইতিবৃত্ত, ১৯৯৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫৯. কনক বন্দোপাধ্যায় শ্রী --- বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক যুগ-১৩৭১, কলিকাতা।

খ

৬০. খান বাহাদুর আব্দুল করিম --- বাংলা বিশ্ব কোষ, চতুর্থ খণ্ড প্রথম সংস্করণ-নভেম্বর-১৯৭৬, ঢাকা।

৬১. খান বাহাদুর আব্দুল করিম --- বাংলা বিশ্ব কোষ, তৃতীয় খণ্ড প্রথম সংস্করণ-জুলাই-১৯৭৩, ঢাকা।

৬২. খান বাহাদুর আব্দুল করিম --- বাংলা বিশ্ব কোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৬৩. খান বাহাদুর আব্দুল করিম --- বাংলা বিশ্ব কোষ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর-১৯৭২, ঢাকা।

৬৪. খন্দকার রিয়াজ উদ্দিন আহাম্মদ---শীত ও বসন্ত, ১৯৮৮, ঢাকা।

গ

৬৫. গোলাম কাদির----শীত-বসন্তের পুথি, প্রকাশ কাল-১৮৭৩, কলিকাতা।

চ

৬৬. চিত্তরঞ্জন দেব --- বাংলার লোকসাহিত্যে নারীর স্থান, দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৯৯১, কলিকাতা।

জ

৬৭. জীবেন্দ্র সিংহ রায় ড.--- বাংলা অলংকার, পঞ্চম সংস্করণ-১৯৮২, কলিকাতা।

৬৮. জীবেন্দ্র সিংহ রায় ড. --- প্রমথ চৌধুরী, চতুর্থ সংস্করণ-১৯৮৬, কলিকাতা।

৬৯. জৈনুদ্দীন --- রসুল বিজয়, ঢাকা।

দ

৭০. দীনেশ চন্দ্র সেন ড.--- আশরাফ হোসেনের চিঠি,২৩-১১-১৯২৫ইং তাং।

৭১. দীনেশ চন্দ্র সেন ড. --- বৃহৎ বঙ্গ,দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৫, কলিকাতা।

৭২. দীনেশ চন্দ্র সেন ড.--- বৃহৎ বঙ্গ,প্রথম খণ্ড, ১৯৯৩, কলিকাতা।

৭৩. দীনেশ চন্দ্র সেন ড. --- পূর্ববঙ্গ গীতিকা, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৩০, কলিকাতা।

৭৪. দীনেশ চন্দ্র সেন ড. --- বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-১৯০১, কলিকাতা।

৭৫. দীনেশ চন্দ্র সেন ড. --- মৈমনসিংহ গীতিকা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৩, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৭৬. দীন মুহম্মদ ড. --- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ১৯৬৮, ঢাকা।

৭৭. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার শ্রী --- ঠাকুরমার ঝুলি,১৩৭৬, কলিকাতা।

ন

৭৮. নীলিমা ইব্রাহীম ড.--- শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য পাঠের ভূমিকা, ঢাকা।

৭৯. নীলিমা ইব্রাহীম ড. --- শরৎ প্রতিভা, চতুর্থ সংস্করণ-১৩৮০, ঢাকা।

৮০. নরেন বিশ্বাস-অলংকার অন্বেষা-১৯৭৬, ঢাকা।

৮১. নীল রতন সেন --- আধুনিক বাংলা ছন্দ,১৯৯৫, নদীয়া, পশ্চিম বঙ্গ।

৮২. নীল রতন সেন --- বাংলা ছন্দ পরিচয়-১৯৮৪, নদীয়া, পশ্চিম বঙ্গ।

৮৩. নারায়ণ ও জানকিনাথ কবি --- পদ্ম পুরাণের, ষষ্ঠ সংস্করণ-১৩৮৬, ঢাকা।

৮৪. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মাদ সূফিয়ান --- বাঙ্গালা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মাদ সূফিয়ান --- বাঙ্গালা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা।

প

৮৬. প্রণব চৌধুরী --- রসতত্ত্ব ও অলংকার পরিচয়, ১৯৮৮, ঢাকা।

৮৭. পবিত্র সরকার --- ছন্দতত্ত্ব ছন্দ রূপ-১৯৯৯, কলিকাতা।

৮৮. প্রবোধ চন্দ্র সেন --- বাংলা ছন্দ শিল্প ও ছন্দ চিন্তার অগ্রগতি-১৯৮৯, কলিকাতা।

৮৯. প্রবোধ চন্দ্র সেন --- ছন্দ জিজ্ঞাসা-১৯৭৪, কলিকাতা।

ব

৯০. বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি --- ফোকলোর ৫ম বর্ষ, ২য় সখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর-২০০২, ঢাকা।

৯১. বরুণ কুমার চক্রবর্তী শ্রী --- বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস-১৩৮৪, কলিকাতা।

৯২. বিশ্বেশ্বর ধর শ্রী-----শীত-বসন্ত (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, ১৫৮৯)।

ভ

৯৩. ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর--- মানসিংহ ভবনান্দ উপাখ্যান, ১৯৭৩, ঢাকা।
(আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত)

৯৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ড.--- বাঙ্গালার ইতিহাস-১৩৮৩, কলিকাতা।

ম

৯৫. মমতাজুর রহমান তরাফদার ড.--- বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দি পটভূমি, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী-১৯৭১ ঢাকা।

৯৬. মযহারুল ইসলাম ড.--- পূর্ব পাকিস্তানী লোককাহিনী-১৯৬৯ রাজশাহী।

৯৭. মযহারুল ইসলাম ড.--- ফোকলোর পরিচিতি এবং লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন, বাংলা একাডেমী-১৯৭৪, ঢাকা।

৯৮. মযহারুল ইসলাম ড.--- লোকসাহিত্য সংগ্রহের ইতিহাস-১৩৭৬, ঢাকা।

৯৯. মযহারুল ইসলাম ড.--- একটি লোককাহিনী পাঠ পর্যালোচনা, সাহিত্য পত্রিকা শীত সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১০০. মযহারুল ইসলাম ড. সম্পাদিত --- কবি হেয়াত মামুদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৬১।

১০১. মযহারুল ইসলাম ড. সম্পাদিত---ফোকলোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি-১৯৮২, কলিকাতা।

১০২. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবি কঙ্কন--- চণ্ডী মঙ্গল, (সম্পাদনায় আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা)-১৯৭৩, ঢাকা।

১০৩. মোবাশ্বের আলী --- বিশ্বসাহিত্য, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৮, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১০৪. মোহিতলাল মজুমদার --- কবি শ্রী মধুসূদন, ৭তম সংস্করণ-১৯৯৮, কলিকাতা।

১০৫. মাওলা আহমেদ --- নজরুলের কথা সাহিত্য মনোলোক ও শিল্পরূপ-১৯৯৭, নজরুল ইনিস্টিটিউট, ঢাকা।

১০৬. মাহাবুবুল আলম (সম্পাদিত) --- সাহিত্য তত্ত্ব, ২য় সংস্করণ-১৯৭৭, ঢাকা।

১০৭. মনিরুজ্জামান মোহাম্মদ --- বাংলা কবিতার ছন্দ তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১০৮. মাওলানা আব্দুর রাহীম হাযারী --- সূফী তত্ত্বের আত্মকথা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯, ঢাকা।

১০৯. মোবাশ্বের আলী --- মধুসূদন ও নবজাগৃতি, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮১, ঢাকা।

১১০. মাওলানা মহিউদ্দীন খান সম্পাদিত --- আল-কাওছার, ১৯৮৭, ঢাকা।

১১১. মহাদেব প্রসাদ সিংহ----শীত- বসন্ত, সালকিয়া, হাওড়া।

র

১১২. রমেশ চন্দ্র মজুমদার --- বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, ১৩৭৭, কলিকাতা।

১১৩. রাজ শেখর বসু --- চলন্তিকা, প্রথম সংস্করণ, ৩৮০, কলিকাতা।

১১৪. রফিকুল ইসলাম ড.--- ভাষাতত্ত্ব, তৃতীয় সংস্করণ-১৯৮৬, ঢাকা।

ল

১১৫. লুৎফর রহমান এস,এম, ড.--- বৌদ্ধ চর্যাপদ-১৯৯৮, ঢাকা।

১১৬. লতিফ এম,এ, মেজর জেনারেল (অব.)--- বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার পটুয়াখালী, ১৯৬৮ বিজি প্রেস, ঢাকা।

শ

১১৭. শহীদুল্লাহ মু. ড.--- বাংলা সাহিত্যের কথা,প্রাচীন যুগ-দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০০ ঢাকা।

১১৮. শহীদুল্লাহ্ মু. ড.--- বাংলা সাহিত্যের কথা,দ্বিতীয় খণ্ড- ১৯৯৯ ঢাকা।

১১৯. শহীদুল্লাহ ড. মু. --- বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১২০. ড. মু. শহীদুল্লাহ --- পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান, নভেম্বর-১৯৬৫, বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

১২১. শ্রীশচন্দ্র দাস --- সাহিত্য সন্দর্শন, ঢাকা।

১২২. শাজাহান মুহাম্মদ ড.--- বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ সমীক্ষা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১২৩. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় শ্রী--- বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,১৩৪৫, কলিকাতা।

১২৪. শুক্কুর মাহমুদ কবি বিরচিত --- গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, বাংলা একাডেমী-১৯৭৪, ঢাকা।

১২৫. শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য ড. --- মধুসূদনের কাব্যলংকার ও কবি মানস,১৮ই আষাঢ়-১৩৬৯, কলিকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

১২৬. শান্তি রঞ্জণ ভৌমিক --- বাংলা ছন্দ ও সাহিত্য তত্ত্ব-১৯৭৪, কুমিল্লা।

১২৭. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত --- সংসদ বাঙ্গলা অভিধান। ২১তম সংস্করণ-১৯৯৭, কলিকাতা।

১২৮. শহিদুর রহমান মু.--- ময়মনসিংহ গীতিকায়-নারী চরিত্রের স্বরুপ, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, ঢাকা।

১২৯. শশীভূষন দাশগুপ্ত --- বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, সপ্তম সংস্করণ, ১৩৮৩, কলিকাতা।

১৩০. শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় --- শরৎ সাহিত্য সমগ্র, ১৩৯২, কলিকাতা।

স

১৩১. সিরাজ উদ্দীন আহম্মেদ --- বরিশালের ইতিহাস-প্রথম সংস্করণ-১৯৮৫, ঢাকা।

১৩২. সিরাজউদ্দিন আহমেদ --- হাশেম আলী খান, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪, ঢাকা।

১৩৩. সুখময় মুখপাধ্যায় শ্রী --- বাংলার ইতিহাসে দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানী আমল, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, কলিকাতা।

১৩৪. সুখময় মুখপাধ্যায় ---মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম তৃতীয় সংস্করণ-১৯৯৩, কলিকাতা।

১৩৫. সুখময় মুখপাধ্যায় ---মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়-১৯৮৭, কলিকাতা।

১৩৬. সৈকত আসগর --- আধুনিক বাংলা কবিতা শিল্পরূপ বিচার, প্রকাশ কাল-১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩৭. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী --- এ্যারিস্টটলের কাব্য তত্ত্ব , প্রথম প্রকাশ-১৯৭৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩৮. সুধীর চন্দ্র সরকার --- পৌরাণিক অভিধান, ষষ্ঠ সংস্করণ-১৪০৪, কলিকাতা।

১৩৯. সুভল চন্দ্র মিত্র --- সরল ছাত্র বোধ-১৯৯২, ইসলামী ফাউণ্ডেশন, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্ব কোষ (প্রথম খণ্ড) জুন-১৯৮২, ঢাকা।

১৪০. সাধন কুমার ভট্টচার্য ড.--- এ্যারিসটটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্য তত্ত্ব, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫, কলিকাতা।

১৪১. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় --- জসীমউদ্দিন, দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৭৩, ঢাকা।

১৪২. সেলিমা সাঈদ --- শরৎ সাহিত্যের ব্যক্তি ও সমাজ-১৩৯৪, ঢাকা।

১৪৩. সুকুমার সেন ড.--- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৯৭, কলিকাতা।

১৪৪. সুকুমার সেন ড.--- ভাষার ইতিবৃত্ত, পঞ্চম মুদ্রণ-১৯৯৬, কলিকাতা।

হ

১৪৫. হরে কৃষ্ণ মুখপাধ্যায় শ্রী --- পদাবলী পরিচয়-১৩৫৯, কলিকাতা।

১৪৬. হুমায়ুন কবির --- শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব, প্রকাশকাল-১৯৮০, ঢাকা।

১৪৭. হুমায়ুন কবির --- বাংলার কাব্য-১৯৭০, ঢাকা।

১৪৮. হেলাল আহম্মেদ --- সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় অলংকার জিজ্ঞাসা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৭, ঢাকা।

১৪৯. হাবিবুর রহমান খান --- ঐতিহাসিক ভৌগোলিক পদ্ধতিতে একটি লোককাহিনীর বিশ্লেষণ, ২০০৪।

১৫০. হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় --- বঙ্গীয় শব্দ কোষ, প্রথম খণ্ড তৃতীয় মুদ্রণ-১৯৮৮, নিউ দিল্লী।

১৫১. হর প্রসাদ মিত্র ড.--- সাহিত্য বিচিন্তা, প্রকাশ কাল-১৩৬৮, কলিকাতা-৯।

ক্ষ

১৫২. ক্ষিতিষ চন্দ্র মৌলিক শ্রী --- প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড-১৯৭০, কলিকাতা।

১৫৩. ক্ষিতিষ চন্দ্র মৌলিক শ্রী --- প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড-১৯৭০, কলিকাতা।

১৫৪. ক্ষিতিষ চন্দ্র মৌলিক শ্রী --- প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, তৃতীয় খণ্ড-১৯৭১, কলিকাতা।

১৫৫. ক্ষিতিষ চন্দ্র মৌলিক শ্রী --- প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, চতুর্থ খন্ড-১৯৭২, কলিকাতা।

১৫৬. ক্ষিতিষ চন্দ্র মৌলিক শ্রী --- প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, পঞ্চম খণ্ড-১৯৭৩, কলিকাতা।

১৫৭. ক্ষিতিষ চন্দ্র মৌলিক শ্রী --- প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ষষ্ঠ খণ্ড-১৯৭৪, কলিকাতা।

১৫৮. ক্ষিতিষ চন্দ্র মৌলিক শ্রী --- প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, সপ্তম খণ্ড-১৯৭৫, কলিকাতা।

১৫৯. ড. মু. আব্দুর রহিম ---
ড. আ. মমিন চৌধুরী-----
ড. এ,বি,এম মহিউদ্দীন মাহমুদ--- বাংলাদেশের ইতিহাস, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৯৮, ঢাকা।
ড. সিরাজুল ইসলাম---

A

১৬০. A vambery --- Gentlman with introduction-London-1891.

১৬১. Antti Aarne & stith thompson --- The types of the Folk Lore, 2nd rev. Helsinki-1916.

১৬২. Allan Dundes --- The study of Flok lore, Berkely-1965.

১৬৩. Alexander Heggerty krappe --- The scinece of Flok lore. London-1965.

B

১৬৪. Bradly A.C --- Oxford lectures on poetry, London-1955.

D

১৬৫. Dusan Zbativel--- Bengali Folk From Mymensingh and the problem of their Authentisity. University of Calcutta, 1963.

Dhaka University Institutional Repository

১৬৬. Dr. Denesh chandra sen---Folk literature of Bengal, unviersity of Calcutta, 1920.

E

১৬৭. Dr. Md. Enamul Huq --- A history of Sufi ism in Bengal,1976, Dhaka.

F

১৬৮. Fermas mendezpinto---The voyages and adventures of ferdinand mendezpinto transtated by H. cogan-London-1891.

১৬৯. Fsteingas --- Persian English Dictionary. London.

H

১৭০. H.BEVERIDGE --- The District of Bakarganj-1876, London.

১৭১. History of Bengal Vol-1, university of Dhaka.

L

১৭২. Lal Behari Dev. Folks tales of Bengal, London, 1880.

P

১৭৩. PAULMAAS --- TEXTUAL CRITICISM-1958-OXFORD.

S

১৭৪. Stith Tompson --- The Folk Tale, New York-1951.

১৭৫. S.m. Katre-Introduction to Indian Textual Criticism-1935,

T

১৭৬. THEODOR BENFEY --- PANTSCHATANRA LEIPZIG-1859.

Dhaka University Institutional Repository

আমি সব পাসরিলাম * আজ তোমার পুষ্প মালা কু
মারি দেখিয়া ॥ বহুত প্রসাদ দিল গৌরব ধরিয়া * হস্তের
অঙ্গুরী মোরে খসিয়া যে দিল ॥ মিষ্ট বচনে কথা কহি
তে লাগিল * কর্পুর তাম্বুল দিল পুরিয়া বান্ধিয়া ॥ যত্ন
করি কন্যা তোমা দিল পাঠাইয়া * পুষ্প নিয়া মালিনী
য়ে কুমারে কে দিল ॥ প্রিয়ার পত্র পাইয়া কুমার কহি
তে লাগিল * মোর লাগি দুঃখ প্রিয়া পাইল জ
ন্মান্তর ॥ সেই হইতে মোর দুঃখ হইবে আমার * সে
বান্ধব গিয়া মোর কোথায় রহিল ॥ তাই সঙ্গে দে
খা হইতে নিশ্চয় জানিল * কেমনে যাইব আমি তা
হার গোচরে ॥ সেই তাই আপনি আসিবে আবারে
ভরসা করিয়া কুমার পন্থ হেরি রহিল ॥ এথায় মা
লাধুকে ডাকি কুমারী কহিল * শুন সত্ত দাসীর
আমি কহি যে বচন ॥ ওয়াধা পুরিল আমি বিলম্ব
হয় যেন * সমিত্তের সামগ্রী যত আনহ সকল ॥
সুগন্ধি আনহ আর নাং পুষ্প ফল * অগোর চন্দন
আর আনহ কস্তুরী ॥ গোলাপ আতর কুম্ভ আন
শীঘ্র করি * ধুপ দীপ আন আর নানা মত সাধ
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সব আন সভা মাঝে * বহু ভাগ্য

Dhaka University Institutional Repository

তিসব রাজ্য প্রবেশন ॥ আনিয়া তোমারে রাজ্যের
রাজা মহাজন * পুত্রের চৌদল আন করিয়াছে সাধ
যদ্যপি কব আমি বাসি গুরুমাতে * বিলম্ব না কর সব
আন শীঘ্র করি ॥ পুত্র বিনা এ ঈশ্বরী রাইতে না পারি
কনক্য বচনে সাধু প্রাণ মত করিল ॥ পুনরপি হইয়াছল
বাহিরে আসিল * দূতগণ ডাকি আনি কহে প্রেম কথা
নানা দ্রব্য আন ভাই যাও যথা তথা * মালিনী ডাকি
য়া আনি কহে তার তরে ॥ পুত্রের চৌদল আনি দেও
ত আমারে * হিরা মন কাঞ্চন দেও নানা রত্ন ধন ॥
চৌদল নির্মাণ হয় সুন্দর মতন * ধনের গৌরব আ
মি করিনু বিস্তর ॥ প্রথম চাহিল কন্যা এই ধন আমার
বিবাহ হইবে আমার তাহাতে রহিয়া ॥ সুন্দর নাহই
লে তোমা ফেলিব কাটিয়া * শুনিয়া মালিনী মাথে
বজ্র ঘাত পড়িল ॥ সদাগরে দুঃখ ভাবি ঘরে চলি
গেল * মালিনী দেখিয়া কুমার জিজ্ঞাসিল তারে ॥
আজি মাগো বিরস কেনে দেখিহে তোমারে * মা
লিনী কহিল মোর বিষম হইল ॥ পুত্রের চৌদল
আজি সাধু মোরে চাহিল * কি মতে চৌদল বান্ধে আ
মি নাহি জানি ॥ রাজত্ব ছাড়ি যাইব কিবা মরিব
[illegible]নি * কুমার কহিল আমি দিব বানাইয়া

Dhaka University Institutional Repository

পুরিলেক পাক আনি দিয়ে তার কাছে২ ফেলেং
বলে মৃত্যু নিকটেতে হইল ॥ মোর মত্র পুরিলয়
পাতির মত্র রইল * এমন সঙ্কট বুঝে শাক্তি আছে
কার ॥ তাতে বৃদ্ধকালে আমি কর্ণে শুনিতাম *
তেক শুনিয়া কুমার আখিজোর নিরে ॥ ওমাধা
পুরিল মোর বুঝি হে অন্তরে * আর দিন মালি
নী যে সখীগন লইয়া ॥ গাঁথিতে লাগিল মালা
সুতাতে বান্ধিয়া * কুসুম [illegible] মাগো
মালিনী ॥ বিন সুতে মালা [illegible] নামিরা
পারি জানি * নিকটে বসিয়া তাম দেখেহ
তরে ॥ আজ মোগো নামি [illegible] সাধুর ঘরে
হরিষে মালিনী পুষ্প [illegible] আনিল [illegible]
নে সুতে মালা কুমার গায় [illegible] লাগিল [illegible]
মারির মালা গাথে যতন করিয়া ॥ তার [illegible]
ধ্যে একপত্র দিলেক লিখিয়া * লৌখি [illegible]
খি মোরে আনিল এথায় ॥ সাক্ষাতে আনি
তে তোমার না দেখি উপায় * আমারে

Dhaka University Institutional Repository

দেখেয় যদি সাধুর নন্দন ॥ নিশ্চয় মারিয়া মোর বধিবে জীবন * তোমার উদ্দেশে মোরে আনিল বিধাতা ॥ কিবা মোর কর্ম্মে আছে সাধু কাটে মাথা * উপায় কহিবা আমি কিমতে আসিব ॥ প্রানে মারিলে আমি তাই না দেখিব পাইলাম সংবাদ তোমা পুরি নেক আস ॥ ঈশ্বর করিলে আসিব তোমার পাস * এই মত পত্র লিখি মালা মধ্যে দিল ॥ যতনে মালিনী স্থানে কহিতে লাগিল * এই মালা দিবা নিয়া সেই কন্যার তরে ॥ দেখিয়া কন্যায় আজি কি কহে তোমারে *

* মালিনী পুষ্প লইয়া সাধুর বাড়ী যায় *

* এরং মালা মধ্যে কন্যা পত্র পায় *

তাণ্ড ভরি পুষ্প দিল সখীর মাথে তুলি ॥ সখীর সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ গেল সাধুর বাড়ী * [illegible] বলরে গিয়া পুষ্প [illegible] দিল ॥ অপূর্ব্ব দে[illegible] [illegible]নের কৌতুক মাগিল * আনন্দ হইল

Dhaka University Institutional Repository

সব কৌতুক অন্তরে ।। প্রসাদ অমিয়া সবে
দিলেক যত্নরে * মহাদুঃখ ভাবি কন্যা আঁখেজ
ল ঝরে ।। কন্যা দুঃখ দেখি মালিনী কলেশু
বিদরে * মিনতি করিয়া কান্দে পায় ধোর
পাই ।। ওয়াধা পুরিস পতির উদ্দেশ নাহি পাই
কি বুঝিয়া সাধুকে তাস্তির আমি আর ।। নি
শ্চয় মরন বিধি লিখিল আমার * আজি নি
শি মারিব আমি গলে বাশি দিয়া ।। যেমত প্রি
য়া মোর ফেলিল বান্ধিয়া * হেনকালে মালি
নী মে মালা [illegible] দিল ।। [illegible] কন্যা
[illegible] মালা তুমি
কিমতে আনিলা ।। [illegible] দিল মালা
কোথায় পাইলা * মালিনী কহিল এক ভগ্নপুরী
আছে ।। আমার উদ্দেশে সেই এথাতে আসিছে
সংসারের মধ্যে [illegible] নাই ।। তেকার
নে আসিয়া রহিছে আমার ঠাই * হেন কালে আ
চম্বিতে দেখিল কুমারী ।। এক রূপ বা[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

মালা মধ্যে তুরি* বুঝিলাম এই বেটা দুষ্ট বর
মাতি॥ কিমতে রাখিয়াছে মালামধ্যে পাতি*
তুরিত পাড়িয়া আগে বৃতান্ত জানিব॥ তবে ইহা
র শাস্তি আজি মালিনীরে দিব* তবে এইমত রূপা
সাইয়া পত্র লাগিল পড়িতে॥ পত্র পড়ি দেখি
পতি মালিনীর পুরিতে* পাইয়া পত্রি পত্র প্র
নাম করিল॥ মৃত্যু দেহে প্রাণ আসি সঞ্চার হ
ইল* মধুর আহ্লাদে কন্যা পাইল বড় হাসি॥
ষোলকলা পাইল যেন পূর্ণ শশী* জলদ গর্জন
শুনি ময়ুরের উল্লাস॥ সর্ব দুঃখ খাণ্ডি কন্যা
আনন্দ বিশেষ* অমৃত আধিক বাণী ফিরিয়া
আনিব॥ অঙ্গের কস্তুরি গন্ধ ফিরিয়া লইব*রু
তন অঙ্গুরী খুলি মালিনীরে দিল॥ মহানিধি
পাইয়া কৌতুক বাড়িল* তবে ত কহিল কন্যা
মালিনীর তরে॥ তিলেক রাখিয়া তুমি যাও মোর
রে ত্রের ভগ্নি পুত্র তবে রসিক নাগর॥ আমি
র কিছু লেও তার তরে* তবে কন্যা পতি

Dhaka University Institutional Repository

ইহার লাগি চিন্তা তুমি কর কিস্যা নিশ্যা * মালি-
নী তরসা পাইয়া আনন্দিত মন ॥ জগৎকারি মতে
লইয়া সখীগন * চৌদল বান্ধিতে তবে কুমার লাগি
ল ॥ সখীগন পুষ্প আনি যোগাইয়া দিল * কা
নের তার দিয়া বান্ধয়ে চৌদল ॥ চারিপাশে সু
ন্দর করে কানমন * দেউলেন চন্দ্র মনোহর
মে নির্ম্মান ॥ কাঞ্চন রতন দিয়া বান্ধে শোভে মো
ন * যেমন অমরা পুরি পাট সুন্দর ঘর ॥ দেখি
তে সুন্দর কিবা হিম গিরিবর * হরিষ বদনে কু
মার বান্ধিল যতনে ॥ এহাতে চড়িয়া যাইমু তোহ
দরশনে * কতবা কহিব আমি চৌদলের বান্ধ ॥
অরুণ মুক্তা জুলে দিপ্ত যেন চান্দ * অপূর্ব্ব কারিগ
[illegible]
[illegible] একস্থলে * [illegible] জ্যোতির্ময়
কার ॥ পুচ্ছক বারুয়ে হেতু না [illegible] * অতি
যত্নে কর্ম্ম করে যত লোকগন ॥ সাধুয়ে চলিয়া গে
ল নৃপতি গোচরন * সুবর্ণের থালে করি [illegible]
তাম্বুল পুনাম করি রাখিল [illegible] * এসব দেখি
য়া সবে জিজ্ঞাসা করিল ॥ [illegible]
ধু তাম্বুল আনিল * কর জোরে [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

বুজুর্গ উমেদপুর জেলা

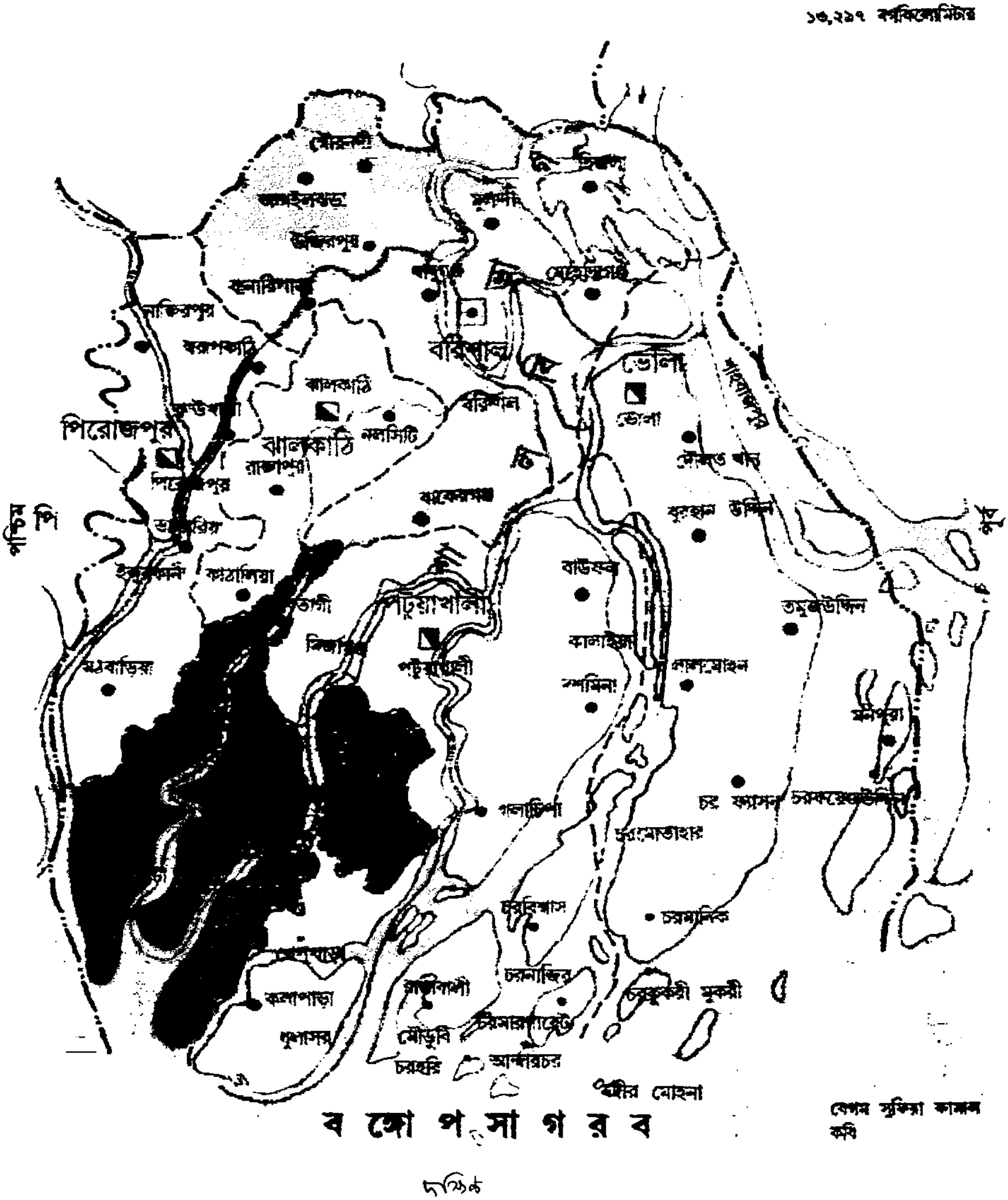

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাণীর কমন্স সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিষ্টার লস ১৭৮১ সালে চন্দ্রদ্বীপ, সেলিমাবাদ, জাফরাবাদ, সৈয়দপুর, আওরঙ্গপুর এবং আজিমপুর পরগণা নিয়ে বুজুর্গ উমেদপুর জেলা গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পটুয়াখালী জেলা

সাবেক আওরঙ্গপুর পরগণা

Dhaka University Institutional Repository

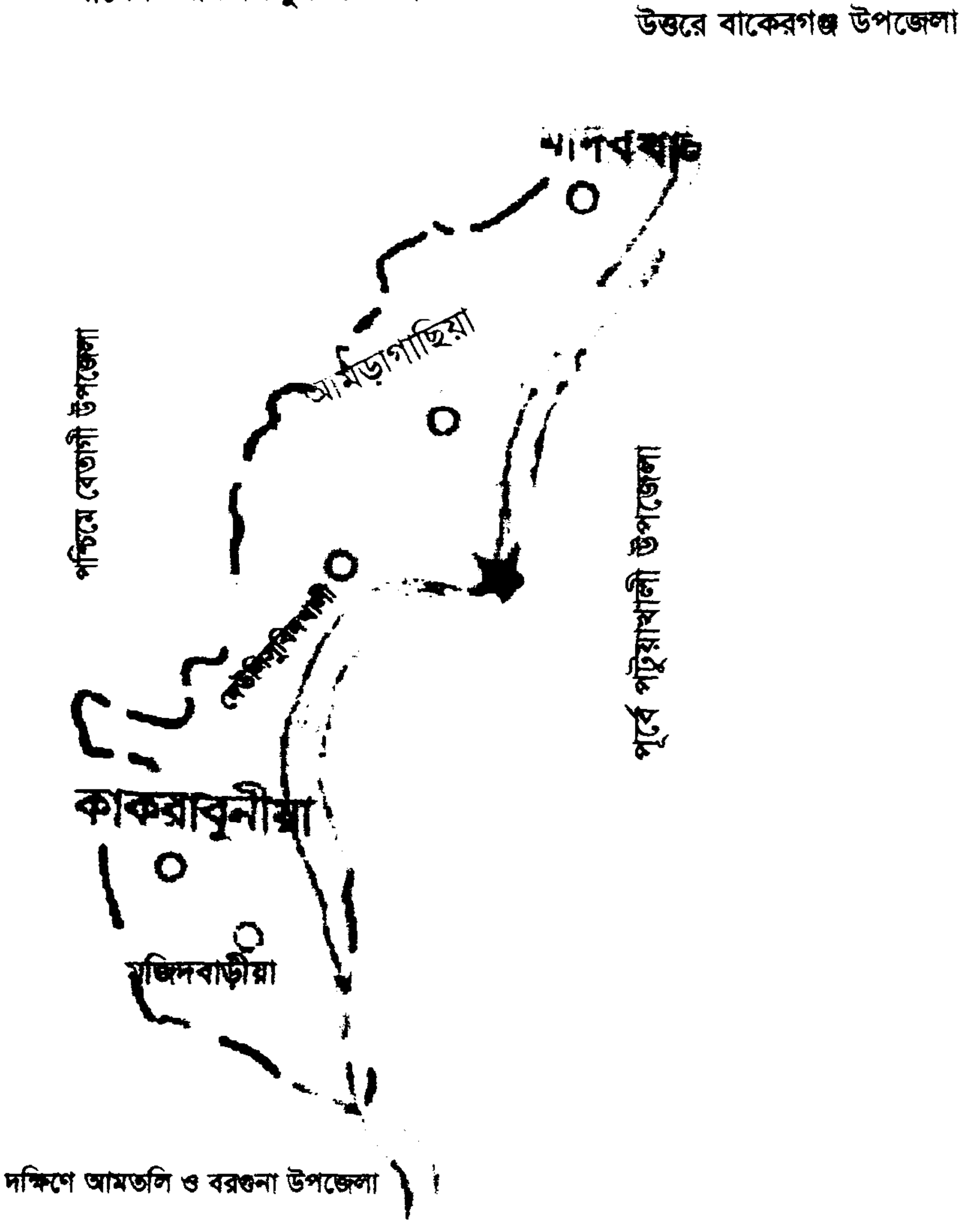

১৮১২ খ্রিঃ মীর্জাগঞ্জ থানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩ নং আমড়াগাছিয়া ইউনিয়নের মহিষকাটা গ্রামে কবি হাফিজদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন এবং 'ওসোত নিম হাওলা' ইজারা নিয়ে চাষাবাদ করেন। কবি অল্প বয়সে ১৭৯৭ থেকে ১৮১২ খ্রিঃ মধ্যে "বসন্তের দুঃখ" কাব্যখানি লিখেন।